ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২। টাকা মাত্র।

ব্রহ্মচারী প্রদত্ত লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

সুগন্ধে, স্নিগ্ধকারিতায়, যাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে হাত পা জ্বালা ও চর্ম্মরোগ নিবারণ এবং মস্তিকের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই। নৈসিক পরিশ্রমকারীদিগের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য। কেশ বৃদ্ধি করিতে লক্ষ্মীবিলাস একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷০ বোতল ২৲ মফঃস্বলে প্যাকিং ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বাতরাজ তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে, বাত, গেঁটে-বাত, কোমোরের বাত, বাতরোগ যত বড় উৎকট হউক না কেন এক শিশি ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবেক।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ১৲, ও ছোট শিশি ৷৷০ আনা, মফঃস্বলে পাঠাইতে হইলে প্যাকিং ও ডাকমাশুল সতন্ত্র লাগিবে।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং
১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

রমণীবিলাস বাক্স।

এস্, সি ঘোষ এণ্ড ব্রা

প্রথমাবিষ্কারক

১৩০১ সনে স্থাপিত

ইহা বঙ্গললনার আদরের, সোহাগের ও বিলাসের চূড়ান্ত সামগ্রী। ইহা হিন্দু-রমণীর কবরী-বন্ধনের একমাত্র প্রধান উপাদান। ইহা দেখিতে অবিকল ১খানি বিলাতী পুস্তকের ন্যায়। এই পুস্তকরূপ বাক্সের ডালা (পাতা) খুলিবামাত্র নিম্নলিখিত দ্রব্যসমূহ দেখিতে পাইবেন।

১। একখানি কবরী বাঁধিবার দর্পণ।
২। এক শিশি অত্যুত্তম গোলাপজল।
৩। এক শিশি কস্তাবতী তৈল।
৪। এক শিশি সুবাসিত তরল আল্‌তা।
৫। এক কৌটা হেমন্তবালতী পমেটম।
৬। এক কৌটা সতীশোভা সিন্দূর।
৭। এক কৌটা মোহিনী টীপ ও আটা।

মেরিণাফ্লুট হারমোনিয়ম।

ইহার সুর মিষ্ট, মজবুৎ ও দেখিতে সুন্দর। ইহা বাজার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, মূল্যও সুবিধা, একবার ব্যবহার করিলে জানিতে পারিবেন।

আমরা মফস্বল বাসিগণের সুবিধার জন্য কলিকাতা বাজার দরে সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য অতি যত্নের সহিত পাঠাইয়া থাকি, এবং বিদেশীয় দোকানদারগণের জন্যও পাইকারিদরে মাল সরবরাহ করিয়া থাকি, প্রয়োজন হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র দিবেন।

জেনারেল অর্ডারসাপ্লায়ার্স। ১২।১ পুটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। কলিকাতা।
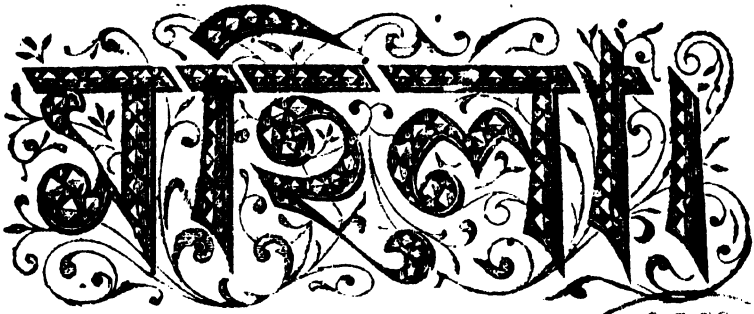
মাসিক পত্রিকা।
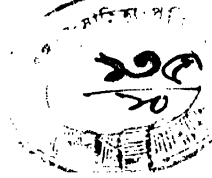
"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১০ম ভাগ] শ্রাবণ, ১৩১১; আগষ্ট ১৯০৪। [১ম সংখ্যা।

মহিলার দশম বৎসর।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অনুগ্রহে মহিলা বর্ত্তমান শ্রাবণমাসে নির্ব্বিঘ্নে দশম বৎসর বয়ঃক্রমে উপনীত হইলেন। তিনি গত সংবৎসরকাল স্বীয় ব্রতপালনে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন পাঠক পাঠিকারা তাহা অবগত আছেন। নিজকার্য্যে তাঁহার যে ত্রুটি হয় নাই, তিনি ইহা বলিতে পারেন না। ভবিষ্যতে নিজকর্ত্তব্য যাহাতে উত্তমরূপে সম্পাদন করিতে পারেন, তজ্জন্য ভগবানের নিকটে তিনি আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন, এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদিগের সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রার্থী আছেন। মহিলা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করেন যে, গত বৎসর অনেক বিদুষী মনস্বিনী মহিলার ও নারীহিতৈষী সহৃদয় সুবিজ্ঞ পুরুষের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া উপকৃত ও উৎসাহিত হইয়াছেন।

জীবনে ধর্ম্ম ও নীতির উন্নতি ভিন্ন কোন জাতির উন্নতি হয় না, ইহা ধ্রুব সত্য। উকিল বারিষ্টার হাকিম ইত্যাদির পদ লাভ করিয়া পুরুষদিগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিলেই নারীর জীবনের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয় অনেকে এরূপ মনে করেন, কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করি না।

বঙ্গীয় নারীদিগের বিদ্যালাভ ও ধন সম্পদমানমর্য্যাদা হয়, ইহা অবশ্য প্রার্থনীয়; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয় জীবনে নীতি ও ধর্ম্মের সমুন্নতি। তাহা না হইলে পার্থিব বিদ্যা ও ধনসম্পদাদি অনর্থের কারণ হইয়া থাকে। তাঁহাদের যাহাতে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও সুনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত হয়, এবং অসার বিলাসিতা ও বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি বিরাগ জন্মে, এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনা করা মহিলার লক্ষ্য। চিরকাল

তিনি প্রধানতঃ এই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন।

হিন্দু রমণীর পতিভক্তি।

পতিভক্তি হিন্দু রমণীর জীবনের বিশেষত্ব। পতিভক্তির জন্য ভারতের হিন্দু-রমণীগণ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইহারা এ বিষয়ে জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল। অন্য কোন দেশের অন্য কোন জাতীয় নারী ইহাদের ন্যায় পতিভক্তিপরায়ণা নহেন। সীতা দেবী পতিভক্তি ও সতীত্বের যে সুদৃষ্টান্ত জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন ইতিহাসে অন্য জাতীয় রমণীর মধ্যে সেইরূপ দৃষ্টান্ত কোথায় আছে? শ্রীরামচন্দ্র রাজাধিপত্য পরিত্যাগ করিয়া পিতৃসত্যপালনার্থ জটাবল্কল পরিধানপূর্ব্বক সন্ন্যাসীর বেশে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য অরণ্যে যাত্রা করিলেন, পতিদেবরামগতপ্রাণা সতী সীতা দেবীও সমুদায় সুখভোগবিসর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। তিনি রাজকুমারী রাজবধূ রাজমহিষী ছিলেন, রাজপ্রাসাদে অগণ্য দাসদাসী কর্ত্তৃক সাদরে সেবিত হইতেছিলেন; এক্ষণ অরণ্যে ফলমূলমাত্রভোজনপূর্ব্বক স্বামিসহ পূর্ণকুটীরে জীবনযাপনে আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিলেন; কোন দুঃখকে দুঃখবোধ করিলেন না। পরে তাঁহাকে বনে একাকিনী পাইয়া দুরাচার নিশাচরপতি রাবণ লঙ্কাদ্বীপে হরণ করিয়া লইয়া যায়। তিনি সেখানে অশোক বনে অশেষ ক্লেশ ও অপমান সহ্য করিয়া আপন পতিভক্তি ও সতীত্বের জলন্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। পরিশেষে শ্রীরামচন্দ্র সমরে সেই পাপাশয় রাবণকে সবংশে নিহত করিলেন, দেবী সীতা সতীত্বের পরীক্ষা দান করিয়া তাঁহা কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেন, এবং প্রাণাধিক পতিসহ অযোধ্যারাজধানীতে যাইয়া রাজপ্রাসাদে রাজসুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে প্রজারঞ্জনানুরোধে রাজা রামচন্দ্র সেই সতীকুলশিরোরত্ন দেবী সীতাকে অন্তঃসত্বাবস্থায় অরণ্যে বিসর্জ্জন করিলেন। কি ভয়ানক নিষ্ঠুর কাণ্ড! এই ভয়ঙ্কর দুঃখের অবস্থায়ও সেই মহাসতী আপনার প্রিয়তম দেবর লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া সকাতরে বলিয়াছিলেন, "দেব ঠাকুরপুত্র প্রজারঞ্জনানুরোধে আমাকে দুঃখিনী বনবাসিনী করিয়াছেন, তাঁহার মন অতিশয় কোমল ও দয়ার্দ্র, তিনি আমাকে অরণ্যে পাঠাইয়া নিশ্চয় অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছেন, সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিয়া নানা উপায়ে তুমি তাঁহার আন্তরিক ক্লেশ ও শোক নিবারণ করিবে। তিনি রাজা, প্রজারঞ্জন করা তাঁহার কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যানুরোধে তিনি এ কার্য্য করিয়াছেন। আমি এখানে তাঁহার রাজ্যেই রহিলাম, তুমি তাঁহাকে আমার এই নিবেদন জানাইও, যে সামান্য প্রজা বলিয়া যেন এই দুঃখিনীকে স্মরণ করেন। আমি ভগবানের নিকটে চিরকাল এই প্রার্থনা করিব, যেন জন্মান্তরে তাঁহাকে স্বামিরূপে প্রাপ্ত হই।" পতির ঈদৃশ নিদারুণ নিষ্ঠুর ব্যবহারেও তাঁহার প্রতি এই প্রকার অচলা ভক্তি কোথায় কোন্ সতী প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন? এমন

ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার উচ্চ দৃষ্টান্ত কোথায়? নবীনা পাঠিকা, তুমি এ সকল কথাকে অতিরঞ্জিত কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দিও না; ইহার মূলে সত্য আছে বিশ্বাস করিও। সতী সাবিত্রী ও দময়ন্তীর আখ্যায়িকা তোমাদের অনেকে পড়িয়া থাকিবেন। পতিভক্তির যে উচ্চ দৃষ্টান্ত তাঁহারা জীবনে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার তুলনা কোথায়? পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, হিন্দুদিগের পরমারাধ্যা দেবী সতী ভগবতী যজ্ঞস্থলে দক্ষরাজ পিতার মুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া মহাদুঃখে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এ সকল আখ্যায়িকার ভিতরে গভীর সত্য আছে, পাঠিকা, তোমরা আদর পূর্ব্বক গ্রহণ কর।

স্বামীর আত্মা সহ ধ্রুবলোকে—স্বর্গলোকে পরমসুখে বাস করিবে, এই সংস্কারে যে, সহস্র সহস্র ভারতরমণী স্বামীর মৃত্যুর পর সহমৃতা হইয়াছেন জ্বলন্ত চিতানলে দগ্ধ হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুর্দান্ত মোসলমান বীরপুরুষদিগের সমরানলে হিন্দু বীরপুরুষগণ জীবনাহুতি দান করিলে পর তাঁহাদের সাধ্বী সহধর্ম্মিণীগণ বিজেতা পুরুষেরা বা স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মোসলমানগণ রাজপুতনার রাজধানী চিতোর প্রভৃতি নগর জয় করিলে পর সহস্র সহস্র হিন্দু বীরপত্নী নিজের সতীত্ব ও পাতিব্রত্যরক্ষার জন্য প্রজ্বলিত হুতাশনে আত্মবিসর্জ্জনপূর্ব্বক জগতে সতীত্বের অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

পতিবিয়োগবিধুরা হিন্দুবিধবা চিরজীবনের জন্য অকুণ্ঠিতহৃদয়ে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা দিবসে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করেন, কোনরূপ আভরণ অঙ্গে ধারণ করেন না; কেশবিন্যাস ও বিলাসবস্ত্র পরিধান এবং সুখসেব্য বিলাসসামগ্রী ইত্যাদি সম্ভোগে সম্পূর্ণ বিরত থাকেন, চিরকালের জন্য দুঃখব্রত গ্রহণ করেন। এই রূপ পতিভক্তির পবিত্র দৃষ্টান্ত অন্য কোথায় আছে? সচরাচর দৃষ্ট হয় যে, অপর জাতীয় রমণীগণ স্বামিবিয়োগমাত্র পত্যন্তর গ্রহণের উদ্যোগ করেন। ইহার মূলে যে অপবিত্রতা ও ইন্দ্রিয়লালসা একেবারে নাই তাহা কে বলিতে পারে? হিন্দু বালবিধবাদিগকে এবং যে সকল বিধবা যুবতী বৈধব্যব্রতে অনিচ্ছু তাহাদিগকে দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনে যে বাধ্য করা হয়, এ বিষয়ের অনুকূলে আমাদের কোন কথা নাই, বরং প্রতিবাদই আছে। স্ত্রীর মৃত্যু হইবামাত্র, বা আসন্ন মৃত্যুকালে যে পুরুষ দারান্তর গ্রহণের প্রস্তাব করে, সে বিশেষ কৃপাপাত্র। ঈদৃশ যথেচ্ছাচারী পুরুষের অভাব নাই।

এক্ষণও শত শত হিন্দু পরিবারে দৃষ্ট হয় যে, দুর্দান্ত পাষণ্ড স্বামীর অত্যাচার সাধ্বী স্ত্রী অম্লানবদনে সহ্য করেন, তদবস্থায় প্রাণের সহিত তাহাকে ভাল বাসিয়া থাকেন, এবং যত্নপূর্ব্বক তাহার সেবা করেন। গত সংখ্যায় আমরা "নারীমর্য্যাদা" শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছি যে, একটী যুবতী তিন চার বার কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন বলিয়া ক্রোধান্ধ নির্ব্বোধ

স্বামী তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিয়াছিল, পরে তীক্ষ্ণ দায়ের আঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। শেষ বারে ভাগ্যক্রমে পুত্র প্রসূত হওয়াতে তিনি রক্ষা পান। শুধু তাহা নয় সেই দুর্দান্ত পুরুষাধম কোন না কোন কথার ছলে প্রায়ই সেই দুঃখিনী বধূটীকে প্রহার করিয়া রক্তারক্তি করিত। পরে মদ্যপানাদি অমিতাচারে তাহার উৎকট পীড়া হয়। সে দীর্ঘকালব্যাপী জ্বর, যকৃৎ ও প্লীহাদি রোগে শয্যাগত থাকে। তাহার যকৃতে বিষম স্ফোটক হয়, জীবনের কোন আশা থাকে না। চিকিৎসার জন্য ঢাকা নগরের মিটফোর্ড হাঁসপাতালে তাহাকে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। সেখানে বধূটী ভক্তিনিষ্ঠার সহিত অনাহারে অনিদ্রায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া দিবারাত্রি তাহার সেবা করেন। সেই রোগী বাঁচিবে না সিবিলসার্জ্জন প্রথমে এই রূপ বলিয়াছিলেন। উদরাভ্যন্তরস্থ স্ফোটকে অস্ত্র করাতে সুফল হইল, সুচিকিৎসায় ও সুপত্নীর প্রাণগত যত্ন ও সেবাশুশ্রূষায় কিয়ৎকাল পরে সেই মুমূর্ষু রোগী আরোগ্য লাভ করিল। সাধ্বী পত্নী এরূপ মহোপকার করিয়াছিলেন বলিয়া সুস্থ ও সবল হওয়ার পর তাঁহার প্রতি কি তাহার অন্তরে এক বিন্দু কৃতজ্ঞতা হইয়াছিল? ইহা কে বলিতে পারে? পরেও গালি তিরস্কার ও প্রহারের নিবৃত্তি হয় নাই। ইহা তো ভদ্রমহিলার পতিভক্তি ও সহিষ্ণুতার পরিচয়। নিম্নশ্রেণীর নারীর পতিভক্তি কাহিনী শ্রবণ কর। কাটোয়ার অনতিদূরবর্ত্তী নিরল গ্রামে একটী বাগ্দী জাতীয় যুবতীর কুষ্ঠরোগাক্রান্ত স্বামী ছিল। গলিত কুষ্ঠে তাহার হস্ত পদের অঙ্গুলি সকল খসিয়া পড়িয়াছিল, সে অচল অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল। যুবতী নিত্য পরিশ্রম করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিত, এবং যত্নপূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাহাকে খাওয়াইত ও পরাইত। রথযাত্রাদি উপলক্ষে দুই এক মাইল দূরে কোন মেলা হইলে কুষ্ঠরোগী স্বামীর মেলা দেখিবার সাধ হইত, যুবতী তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া মেলাস্থলে লইয়া যাইত. আবার তদ্রূপ ক্রোড়ে করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিত। তাহাতে তাহার কোনরূপ কষ্টবোধ ও বিরক্তি ছিল না, বরং মুখমণ্ডলে প্রফুল্লতা ছিল। সে নিম্নশ্রেণীর বাগ্দী জাতীয় কন্যা, কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিত। কেন না সেই জাতিতে স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্বামী গ্রহণে বাধা নাই। তথাপি সেই কুড়ে স্বামীর প্রতি তাহার আশ্চর্য্য ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। সে আমেরিকার শিক্ষা ও সভ্যতা প্রাপ্ত হয় নাই, এক স্বামীতে চিরজীবন বদ্ধ থাকিতে হইবে না, এরূপ Free Love এর মন্ত্রে সে দীক্ষিত হয় নাই, তাহার দুর্ভাগ্য। যাহা হউক সকলে তাহার সতীত্ব ও পাতিব্রত্য দেখিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ধন্য ধন্য সাধ্বী বাগ্দিনী বলিয়াছেন। কিছুকাল হইল উক্ত সতী বাগ্দিনীর ছবি সহ তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত মহিলায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ইয়ুরোপের অনেক স্থলে স্বামী স্ত্রীর

সমান অধিকার, উভয়ের মধ্যে গুরু লঘু ও জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বলিয়া কোন প্রভেদ নাই। বরং কোন কোন স্থলে পতিভক্তির পরিবর্ত্তে পত্নী-ভক্তির ভাব প্রবল দেখা যায়। স্ত্রীর চরণপদ্মের জুতার ভিতরে মদ ঢালিয়া কোন কোন পুরুষ বা স্বামী ভক্তিপূর্ব্বক পান করিয়াছেন, এরূপ শুনা গিয়াছে। ইহা অপেক্ষা স্ত্রী-ভক্তির পরাকাষ্ঠা আর কি হইতে পারে? হিন্দু পরিবারে পতি পত্নীর পরস্পর সমানাধিকার নাই, পত্নী-ভক্তিও দৃষ্ট হয় না। বরং তদ্বিপরীত অধিকাংশ স্থলে পত্নীর প্রতি অনাদর ও অবজ্ঞাই লক্ষিত হয়। পত্নীর প্রতি শ্রদ্ধা সম্মানের স্থলে অনাদর অবজ্ঞা, পাপ ও অতিশয় দুঃখের ব্যাপার। স্ত্রীর প্রতি পতির কর্ত্তব্যবিষয়ে শাস্ত্রীয় বচন এই ;—"ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতাভাষণৈঃ, সদা সন্তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং কচিদাচরেৎ।" অর্থাৎ ধন বস্ত্র শ্রদ্ধা প্রেম মিষ্ট বাক্য দ্বারা পতি সর্ব্বদা পত্নীর সন্তোষ সাধন করিবে, কখনও তাহার প্রতি অপ্রিয়াচরণ করিবে না। এই ঋষিবাক্য—শাস্ত্রীয় বচনের প্রতি কয় জন পতি সম্মান প্রদর্শন করেন?

পতি বড় না পত্নী বড়? না উভয়ে পরস্পর তুল্য? আমরা এই প্রশ্নের উত্তরে কে শ্রেষ্ঠ কে বা অশ্রেষ্ঠ ইত্যাদি না বলিয়া প্রকৃতি ও অবস্থার উপরে এই কথার মীমাংসার ভার অর্পণ করিতেছি। যাঁহার জীবনে বিশুদ্ধ প্রণয় ক্ষমা সহিষ্ণুতাদি দেবগুণ প্রস্ফুটিত, তিনি অবিশুদ্ধচরিত্র অমিতাচারী অসহিষ্ণু ক্রোধী লোক অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ, ইহা কে অস্বীকার করিবে? এ দেশে পুরুষের চরিত্র অপেক্ষা আমরা নারীচরিত্র অধিকতর পবিত্র প্রণয় ক্ষমা ও সহিষ্ণুতাদি দেবগুণে ভূষিত দেখিতে পাই। তবে পতিকে বাপান্ত করিয়া গাল দেয় ও জুতা ঝেঁটা মারে এরূপ পত্নীও আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা বিরল। পতির সুখে সুখ বোধ, পতির দুঃখে দুঃখানুভব, পতির জন্য সর্ব্বদা প্রাণ আকুল, পতি সেবাতেই আনন্দ ও উৎসাহ, পতির সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য সর্ব্ববিধ দুঃখ ক্লেশ অকাতরে বহন করিতে প্রস্তুত, কুরূপ কুচরিত্র বা চির-রুগ্ন পতিকে দেবতাজ্ঞানে তাহার সেবায়রত, এরূপ হিন্দু রমণী সচরাচর দৃষ্ট হয়। ইহাতে পতির না পত্নীর শ্রেষ্ঠতা, পাঠিকা, বিচার কর। কিন্তু অপর দিকে সাধারণতঃ পতি বয়োজ্যেষ্ঠ পত্নী বয়ঃকনিষ্ঠ হইয়া থাকেন। তরু ও লতার ন্যায় পতি ও পত্নীর পরস্পর আশ্রয় আশ্রিত সম্বন্ধ। বল বুদ্ধি সাহস ও কার্য্যক্ষমতায় পতি পত্নীর আশ্রয় অভি-ভাবক ও রক্ষক। লোকে পতিকে ভর্ত্তা (ভরণ-পোষণকর্ত্তা) এবং পত্নীকে ভার্য্যা (ভরণ পোষণের যোগ্যা) বলিয়া থাকে। প্রকৃতি উভয়ের মধ্যে শারীরিক মানসিক অবস্থার প্রভেদানুসারে এরূপ প্রভেদ নিরূ-পণ করিয়াছেন। এই বৈষম্যসত্ত্বেও পতি ও পত্নীর সমান অধিকার, বয়সে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ হইলেও প্রেমে তাঁহারা এক। সংসারে সমতুল্য কার্য্যের বিভাগ থাকাতে তাঁহারা কেহ কাহাকেও হীন দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। স্বভাব ও ঈশ্বর উভয়ের মধ্যে যে সমতা স্থাপন করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়।

মহাভারত হইতে আমরা পতিভক্তি-সূচক কয়েকটি অনুশাসন বচন ও তাহার অর্থ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ দেবতুল্যং প্রকুর্ব্বতী বশ্যাভাবেন সুমনাঃ সুব্রতা সুখদর্শনা।"

সদাচারা প্রিয়দর্শনা নারী সন্তুষ্টচিত্তে দেবতুল্য স্বামীর বশ্যভাবে সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকেন।

"পরুষাণ্যাপি চোক্তা যা দৃষ্টা ক্রুদ্ধেন চক্ষুষা। সুপ্রসন্নমুখী ভর্ত্তুর্যা নারী সা পতিব্রতা॥"

কঠোর কথা বলিলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিলেও যিনি ভর্ত্তার প্রতি প্রসন্নমুখী তিনিই পতিব্রতা।

"যা সাধ্বী নিয়তাচারা সা ভবেদ্ধর্ম্ম-চারিণী। শ্রুত্বা দম্পতীধর্ম্মং বৈ সহধর্ম্ম কৃতং শুভম্।"

যে সাধ্বী স্ত্রী সদাচারা হইয়া দাম্পত্য-ধর্ম্ম শ্রবণপূর্ব্বক উত্তমরূপে তদ্ধর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, তিনিই ধর্ম্মচারিণী হয়েন।

"দরিদ্রং ব্যাধিতং দীনমধ্বনা পরি-কর্ষিতম্। পতিং পুত্রমিবোপাস্তে সা নারী ধর্ম্মচারিণী।"

দরিদ্র রোগী দীন ও পরিশ্রান্ত স্বামীকে পুত্রের ন্যায় যিনি সেবা করেন, তিনিই ধর্ম্মাচরণ করেন।

"শুশ্রূষাং পরিচর্য্যাঞ্চ করোত্যবিমনাঃ সদা। সুপ্রীতাচ বিনীতাচ সা নারী ধর্ম্মভাগিনী॥"

যে নারী প্রীতিমনে বিনীতভাবে সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে পতির সেবা শুশ্রূষায় তৎপর, সেই নারীই ধর্ম্মভাগিনী হন।

"বিশুর্ত্ত্যন্নপ্রদানেন, কুটুম্বঞ্চৈব নিত্যদা। ন কামেষু ন ভোগেষু নৈশ্বর্য্যেণ সুখে তথা। স্পৃহা যস্যা যথা পত্যো সা নারী ধর্ম্ম-ভাগিণী॥"

যে নারী নিত্য অন্নদান করিয়া কুটুম্ব-দিগকে প্রতিপালন করেন, পতিতে যেমন স্পৃহা এমন ভোগৈশ্বর্য্যে সুখ ও কামনার বিষয়ে স্পৃহা নাই, সেই নারীই ধর্ম্মভাগিণী হন।

"ব্রতং চরতি যা নিত্যং দুশ্চরং লঘু সত্বরা, পতিচিত্তা পতিহিতা সা পতিব্রত-ভাগিনী।"

যে নারী পতির প্রতি অনুরক্তা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া আত্মাকে সংযত করত নিত্য দুশ্চর ব্রত আচরণ করেন তিনিই পতির ব্রতভাগিনী হন।

"পুণ্যমেতত্তপশ্চৈব স্বর্গশ্চৈব সনাতনঃ। যা নারী ভর্তৃপরমা ভবেৎ ভর্তৃ-ব্রতা সতী॥"

যে সতী স্ত্রী স্বামীর প্রতি ভক্তি করেন, এবং স্বামীর ব্রতই যাঁহার একমাত্র ব্রত, তাঁহার সেই ভক্তি ও ব্রতই তাঁহার পক্ষে তপস্যা, পুণ্য ও নিত্য স্বর্গ।

শাস্ত্রে ইহাও উক্ত হইয়াছে,—"অজ্ঞাত-পতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাং নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্।" অর্থাৎ যে কন্যা পতিমর্য্যাদা, পতিসেবা এবং ধর্ম্মশাসন জানে না, পিতা তাহাকে বিবাহ দিবেন না।

ভগবানের প্রতি ভক্তি না হইলে—পরম পতি বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতে না পারিলে কোন নারীর অন্তরে বিশুদ্ধ

পতিভক্তির সঞ্চার হয় না। তিনি পতিকে ভক্তি করুন, অশেষ যত্নে পতির সেবা করুন না কেন; পরম পতি ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তির যোগ না থাকিলে তাঁহার সেই পতি ভক্তি পার্থিব ও শারীরিক হইবে। যে সতী নারী পতির সঙ্গে এক-হৃদয় একপ্রাণ হইয়া ভগবানের মঙ্গল চরণ পূজা করেন, ও তাঁহাকে ভক্তি করেন, এবং পতিতে পরম পতি ঈশ্বরের আবির্ভাব—দেবত্ব দর্শন করেন, তিনিই পতিকে যথার্থ ভক্তি করিতে পারেন; তিনিই ধন্যা। তিনি পতির অনিত্য দেহের সেবা অপেক্ষা তাঁহার অবিনাশী আত্মার সেবায় অধিকতর নিযুক্ত থাকেন, তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি কল্যাণ নিত্য ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। পতির সঙ্গে সাংসারিক ও শারীরিক যোগ অপেক্ষা পবিত্র আধ্যাত্মিক যোগ সেই সতীর অধিকতর প্রার্থনীয় হয়। এরূপ ভাগ্যবতী পুণ্যবতী পতিব্রতা সতী বিরল। টাঙ্গাইল অঞ্চলের একটী হরিভক্তিপরায়ণা সাধ্বী হিন্দুমহিলার জীবনের ভক্তিপ্রভাবে ও পুণ্যবলে স্বামীর জীবনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। পতি কঠোর প্রকৃতি শাক্ত পুরুষ ছিলেন, সহধর্ম্মিণীর ভক্তি প্রবাহে তাঁহার হৃদয়ও ভক্তিরসার্দ্র হয়, তিনি সরল ভক্তি-পথ আশ্রয় করেন। পতি বিদেশে পরলোক প্রাপ্ত হন, অন্তিমকালে সতী তাঁহার নিকটে ছিলেন না, মনের সাধে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে পারেন নাই, চরমকালে তাঁহার দর্শনলাভে বঞ্চিত ছিলেন, তজ্জন্য উক্ত সতীর বিষম মর্ম্মযাতনা হয়। তদবধি প্রত্যহ স্বামীর কাষ্ঠপাদুকা সম্মুখে রাখিয়া তিনি ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেন, এবং নিজে শোকাশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতেন। পরে তিনি বৃন্দাবন তীর্থে যাইয়া জীবনের শেষ লীলা সমাপ্ত করেন। নবীনা মহিলাগণ, প্রাচীন শ্রেণীর ভক্তিমতী নারীদিগের ভগবদ্ভক্তি ও পতিভক্তি কি তোমাদের অনুকরণীয় নহে? মানিলাম তোমরা লেখা পড়ায় সমুন্নত হইতেছ, কিন্তু উচ্চ ধর্ম্ম ভাব ভক্তি ভাব ভিন্ন অনেক স্থলে বিদ্যা অনর্থের কারণ হইয়া অবিদ্যায় পরিণত হয়, হৃদয়ের শুষ্কতা ও অহঙ্কার বৃদ্ধি করে।

স্ত্রীশিক্ষা।

মতভেদ জন্য এদেশে স্ত্রীশিক্ষাদানার্থিগণ দুই দলে বিভক্ত। একদল বলেন, স্ত্রী পুরুষ সমান, ছাত্রদিগের অনুরূপ ছাত্রীগণ স্কুল কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাদানের জন্য প্রস্তুত হইবেন, যুবক ছাত্রদিগের ন্যায় যুবতীগণ আপনাদের নাম বি এ এম্ এ উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত করিবেন, পুরুষেরা ওকালতী বারিষ্টারী হাকিমী ইত্যাদি যে সকল উচ্চপদ এক চেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন, নারীগণ তাহার অনেক গুলি আপনাদের জন্য অধিকার করিয়া লইবেন অপর দল বলেন, স্ত্রী ও পুরুষ ভিন্নজাতি এবং ভিন্নপ্রকৃতিসম্পন্ন। উভয়ের শারীরিক মানসিক গঠন সমান নহে, ভিন্ন উভয়ের জীবনের কার্য্য ভিন্ন; স্ত্রীকে স্ত্রী প্রকৃতির অনুযায়িনী শিক্ষা দান করিতে

হইবে। তাহাকে পুরুষের ন্যায় শিক্ষা দিলে তাহার কোমল প্রকৃতির বিকৃতি ও শারীরিক মানসিক ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। নারী লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া গুরুতর শ্রমসাধ্য বিষয় কার্য্যে লিপ্ত থাকিবেন, বা বি এ, এম্ এ উপাধি ভূষণে ভূষিতা হইয়া রাজকীয় উচ্চপদ অধিকার করিবেন, বিধাতার এরূপ অভিপ্রায় নহে; এ প্রকার কার্য্যে জীবন যাপন করিবার জন্য তিনি জন্ম গ্রহণ করেন নাই। নারী সুগৃহিণী সুমাতা হইবেন, প্রকৃতি দেবী গম্ভীর স্বরে এই কথা বলিতেছেন। পূর্ণমস্তিষ্ক সবলকায় পুরুষ ছাত্রের ন্যায় কঠিন গণিত ও দুর্ব্বোধ বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের চর্চ্চা করা কোমলপ্রকৃতি অবলার ক্ষীণ মস্তিষ্কের পক্ষে অতিশয় ভারবহ। তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্কবিকারজনিত শারীরিক মানসিক নানা প্রকার দুরারোগ্য রোগের উৎপত্তি হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। সম্ভাবনা আর বলি কেন? তাহা সচরাচর প্রত্যক্ষ হইতেছে। এ দেশে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত স্ত্রী শিক্ষার রীতি—পুরুষদিগের ন্যায় উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া কোমলপ্রকৃতি নারীদিগকে গ্রেজুয়েট করিবার নীতি তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। গ্রাজুয়েট হওয়ার প্রলোভনে প্রলুব্ধা অনেক বঙ্গবালা দুরূহগণিত বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের চর্চ্চায় নিজের সাধ্যের অতিরিক্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া বিষম মানসিক অবসাদ ও দুরারোগ্য ক্ষয় রোগাদিতে আক্রান্ত হইতেছেন, অনেকের অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে; কেহ কেহ অকালে অস্বাভাবিক রূপে বহু যাতনার পর মৃত সন্তান প্রসব করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছেন, অনেকে মানসিক স্ফূর্ত্তি ও শারীরিক উন্নতি হইতে বঞ্চিত হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্যের পরিচয় দান করিতেছেন। পুরুষের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তিবশতঃ সকল নারীই যে ব্যাধিগ্রস্ত ও চিরদুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়েন আমরা এ কথা বলিতেছি না; কেহ কেহ সুস্থমনে সুস্থ শরীরে থাকেন ও থাকিতে পারেন, কিন্তু তদ্রূপ শিক্ষায় সাধারণতঃ নারীদিগের শরীর মনে মন্দ ফলই ফলিয়া থাকে। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহার ফলভোগ করিতেই হয়। নারীর ন্যায় কোন কোন পুরুষ সাহস বীর্য্যবিহীন, ভীরু কোমলপ্রকৃতি আছে, কাহার বা পূর্ণ যৌবনেও নারীর মুখমণ্ডলের ন্যায় গোপ শ্মশ্রুশূন্য মুখমণ্ডল দৃষ্ট হয়; আবার কোন কোন নারী বীর পুরুষের ন্যায় ভীষণ কঠোর প্রকৃতি। পরন্তু ফ্রান্স দেশের অনেক মহিলার ওষ্ঠ দেশে যুবা পুরুষের ন্যায় গোপের রেখা প্রকাশ পায়। কিন্তু উহা সাধারণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। স্ত্রীমাত্রই কোমলস্বভাবা, পুরুষমাত্রই দৃঢ় সবল প্রকৃতি। লক্ষ পুরুষের মধ্যে দুই এক জন পুরুষ গোপ শ্মশ্রুবিহীনা কোমলাঙ্গী নারী সদৃশ হইলেন, আবার লক্ষ স্ত্রীর মধ্যে দুই একজন স্ত্রীর জীবনে পুরুষের ন্যায় বীরত্ব ও পারুষ্য প্রকাশ পাইল, এবং মুখে গোঁপ গজাইল, তাহাকে সাধারণ বলা যায় না। বিশেষ মানসিক শক্তিসম্পন্না স্ত্রীর শিক্ষা পুরুষের শিক্ষার ন্যায় হইতে

পারে, তাহাতে কিছু বিশেষত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু সাধারণ স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে শিক্ষা কল্যাণকরী নহে। অনেক বাঙ্গালী বাবু অন্য শত বিষয়ে সভ্য ইংরাজ জাতির শতপদ পশ্চাতে আছেন, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে সভ্য জাতিকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা শতপদ অগ্রসর হইতে সমুৎসুক। ইংলণ্ডও স্ত্রী পুরুষের ঈদৃশী তুল্য শিক্ষার পক্ষপাতী নহেন। ইয়ুরোপ আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পুরুষবৎ শিক্ষায় স্ত্রীজাতির শরীর মনের পক্ষে বিষম অনিষ্ট হয় বলিয়া তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ডাক্তরগণ শারীরিক তুল্যাবস্থাপন্ন তুল্যবয়স্ক স্ত্রী পুরুষের মস্তিষ্ক পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, পুরুষের মস্তিষ্কপিণ্ডের আয়তন স্ত্রীর মস্তিষ্কপিণ্ডের আয়তনাপেক্ষা অনেক বৃহৎ এবং তাহা ওজনে অধিক ভারি। সুতরাং উভয়ের মস্তিষ্কের শক্তি সমান নহে, পুরুষের ন্যায় স্ত্রী গুরুতর বিষয়ের চিন্তা ও ধারণা করিতে অক্ষম। দুই একটী খনা ও লীলাবতীর কথা ছাড়িয়া দেও। তাঁহারা সাধারণ নারীশ্রেণীর অন্তর্গত নহেন।

ইয়ুরোপের চিন্তাশীলন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-কুলের মধ্যে প্রফেসর হাকসলি অগ্রগণ্য এবং সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে তাঁহার মত আমরা গত আষাঢ় মাসে ব্যক্ত করিয়াছি। স্ত্রী পুরুষের তুল্য শিক্ষা ও জীবনের তুল্য কার্য্যবিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী; এবং তাহাতে স্ত্রীজাতির অধঃপতনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রফেসর হাক্সলি বলেন, "তাঁহাদের ইচ্ছা হইলে তাঁহারা বারিষ্টার বাণিজ্যব্যবসায়ী এবং রাজনীতিজ্ঞের পদ লাভ করুন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের জানা উচিত যে, এ ক্ষেত্রে তাঁহারা কোন প্রকার অনুগ্রহ-প্রত্যাশা করিতে পারেন না। সর্ব্ব দেশে এক প্রকৃতি অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রভাববিস্তার ও বলনির্দ্ধারণ করেন।" * * * জীবনক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কারের প্রত্যাশী হইয়া যখন পূর্ণ বিকশিত মহিলা এবং পুরুষের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইবে তখন দেখিবে বিশালবক্ষঃস্থল প্রকাণ্ড মস্তিষ্ক বলিষ্ঠ মাংসপেশী দৃঢ় শারীরিক গঠনবিশিষ্ট পূর্ণ বিকশিত পুরুষেরই জয় হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, নারীর শিক্ষার উন্নতিই তাঁহার (উদ্বাহার্থে) মনোনীত হওয়ার সম্ভাবনাকে ক্ষীণ করিয়া দিবে। উৎকৃষ্ট মাতারই উৎকৃষ্ট সন্তান জন্মিবে, পরবর্ত্তী বংশেও এই শ্রেষ্ঠতা অনুক্রামিত হইবে। ডারউইনের মতের নিতান্ত পক্ষপাতীরাও সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারেন না যে, এমন কোন উৎকৃষ্ট নিপুণ শিক্ষা প্রণালী উদ্ভাবন করিতে পারিবেন যাহাতে স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক শারীরিক অক্ষমতা দূর করিতে পারে।"

নারীজাতির পরমহিতৈষী বন্ধু স্বর্গগত কেশবচন্দ্র সেন নারীপ্রকৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াই নারীর উপযোগিনী শিক্ষাপ্রণালী উদ্ভাবনপূর্ব্বক ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এখানে

উচ্চদর্শন বিজ্ঞানাদিরও শিক্ষা হয়, কিন্তু পুরুষদিগের শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে নয়, সহজ প্রণালীতে শিক্ষাদান হইয়া থাকে; নারীপ্রকৃতির কোমলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদের উপযোগিনী সকল প্রকার শিক্ষা দান হয়। কেশব চন্দ্র অস্বাভাবিক শিক্ষাদানে—স্ত্রীপ্রকৃতিকে গড়ে পিটে পুরুষকরিবার শিক্ষাদানে নিতান্ত বিরোধী ছিলেন। নারী প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিয়া নীতি ও ধর্ম্মে সমুন্নতা, সংসারক্ষেত্রে সুমাতা, সুপত্নী ও সুগৃহিণী হইবেন, কেশবচন্দ্রের নারীশিক্ষাদানের এই উদ্দেশ্য। তিনি কখনও স্ত্রীলোক-দিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগৌরবে গৌরবান্বিতা করিতে, পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া অর্থোপার্জ্জনশীলা করিতে প্রয়াসী হন নাই। নারী সমুচিত শিক্ষিতা হইয়া বিধাতৃনির্দিষ্ট তাঁহার জীবনের কার্য্য-বিভাগে কার্য্যকরিবার উপযুক্ত হন, কেশবচন্দ্রের এই লক্ষ্য ছিল। আমরাও ইহাই প্রার্থনায় মনে করি। এই প্রণালীতে শিক্ষাদানে কার্য্যতঃ নারীজীবনের সার্থকতা হইবে বিশ্বাস করি। আমরা নারীর উচ্চ শিক্ষা পাইবার বিরোধী নহি। কিন্তু পুরুষপ্রকৃতির উপযোগী শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বনে তাঁহাদের শিক্ষা পাইবার সম্বন্ধে আমাদের প্রতিকূলমত। ইতিহাস সাহিত্য শিশুপালন গৃহকর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্র জীবনচরিত ইত্যাদি পুস্তক নারীদিগের বিশেষ পাঠ্য। গীত বাদ্য চিত্রবিদ্যা ও নানা প্রকার শিল্প কর্ম্মাদি সুকুমার বিদ্যায় প্রধানতঃ তাঁহারা পারদর্শিনী হন, ইহা প্রার্থনীয়। তাঁহাদের শিক্ষার ক্ষেত্র অতিশয় প্রশস্ত। বি এ এম এ উপাধি পাইয়া সম্মানিত হইবার উদ্দেশ্যে এবং পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জনকরিবার জন্য অনেক পিতা যে নিজ নিজ কন্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী অনুসারে শিক্ষাদান করেন, ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অকল্যাণজনক। আশু লাভের আশায় তাঁহারা নিজ কন্যা-দিগকে অনধিকারচর্চ্চা করিতে দিয়া বিধাতার অভিপ্রায়ের বিপরীত কার্য্য করেন, এবং কন্যাগণের উচ্চ প্রকৃতি বিনষ্ট ও বিকৃত করেন, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।

কাফ্রিনারী।

শারীরিক সৌন্দর্য্য-সম্পত্তি ইহুদিদিগের যেমন, পৃথিবীর মধ্যে অন্য কোন জাতির সেরূপ নহে। তাঁহাদের অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুখশ্রী যাহার পর নাই প্রিয়দর্শন। মুখে

আলতা মিশ্রিত করিলে যেরূপ সুন্দর রং হয়, তাঁহাদের শরীরের বর্ণ সেরূপ উজ্জ্বল আরক্তিম গৌর বর্ণ। ইহুদি যুবতীগণ ভূলোকে সুরাঙ্গনার ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকেন। তুরুস্ক রাজ্য তাঁহাদের আদিম বাসস্থান। সেই জাতি মহাপুরুষ মুসার ধর্ম্মমতাবলম্বী একেশ্বরবাদী। তাঁহারা শ্রেষ্ঠ আদিম আর্য্য জাতি, বনি এস্রায়িল অর্থাৎ এস্রায়িলের বংশধর বলিয়া জগতে পরিচিত। সেই ইহুদিবংশেই রাজর্ষি দাউদ সোলয়মান এবং মহর্ষি যিসুখ্রীষ্ট-প্রভৃতি অনেক ভগবদগতপ্রাণ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে নব ধর্ম্মালোক বিকীর্ণ করিয়াছেন। এক সময়ে ইহুদি জাতির গৌরব ও সৌভাগ্যের সীমা ছিল না, কিন্তু বহুকাল হইতে ইহুদিগণ রাজ্যচ্যুত ও ভাগ্যচ্যুত হইয়া পৃথিবীর নানা বিভাগে বাণিজ্যাদি উপলক্ষে বাস করিতেছেন। এই মহানগরী কলিকাতায়ও অনেক ইহুদি স্ত্রী পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়। বাণিজ্য ব্যবসায়ই তাঁহাদের প্রধান জীবনোপায়। তাঁহাদের মধ্যে প্রভূত ধনসম্পত্তিশালী লোক অনেক আছেন, এবং সৎকার্য্যে অকাতরে অর্থব্যয় করেন। ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণজাতীয় রমণীগণ অতিশয় রূপলাবণ্যশালিনী। পারস্য কবিগণ চিরবসন্ত বিরাজিত প্রকৃতি দেবীর রমণীয় বিহারোদ্যান কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সেই কাশ্মীররূপ রমণীয় স্বর্গোদ্যানে দিব্যকান্তি রমণীগণ প্রফুল্ল কণককমলের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

প্রায় সমুদায় অনার্য্য জাতি অঙ্গসৌষ্ঠব-বিহীন ও কান্তিলাবণ্যশূন্য। কিছু দিন পূর্ব্বে আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতীয় কতিপয় অনার্য্য বন্য নারীর প্রতিকৃতিসহ তাহাদের আচারব্যবহারাদিবিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাদের সকলের চেহারাই কুৎসিত। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে আফ্রিকানিবাসী অনার্য্য কাফ্রি বা নিগ্রোজাতি সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত। তাহাদের শরীরের বর্ণ দোওয়াতের মসীর ন্যায়, বা মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার ন্যায়, কিংবা দাঁড় কাকের ন্যায় ঘন কৃষ্ণবর্ণ, নাক মুখ চোক সমুদায় বিকৃত ও ভীষণদৃশ্য। পঁচিশ বৎসরেরও অধিক হইবে, লক্ষ্ণৌ নগরে আমরা এক জন দীর্ঘকায় ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কাফ্রি পুরুষ দেখিয়াছিলাম; তাহার এমন ভীষণ বিকটাকৃতি ছিল যে, তাহাকে হঠাৎ দেখিলে মন চমকিত হইত, ভূত বা দানব ভাবিয়া বালক বালিকাদিগকেতো ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিবার কথা। লণ্ডনের বা অন্য কোন নগরের মিয়ুজিয়মে লোক-প্রদর্শনার্থ তাহার সেই অদ্ভুত দেহটাকে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কিছু অর্থ-দানে তাহা হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন। সে এই অঙ্গীকারে বদ্ধ ছিল যে, লক্ষ্ণৌ ছাড়িয়া চির জীবন অন্যত্র যাইবে না। তাহা হইলে মৃত্যু ঘটিলেই সহজে তাহার শরীর পাওয়া যাইবে। পরে গবর্ণমেণ্ট দ্রব্য বিশেষযোগে দেহটাকে পচিতে না দিয়া যথা স্থানে স্থাপন করিবেন। অবশেষে বহুকাল সেই কাফ্রি পুরুষ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমরাও লক্ষ্ণৌ ছাড়িয়া

চলিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার কি অবস্থা ঘটিয়াছে জানি না; বোধ করি সে আর ইহলোকে নাই, তাহার দেহ যথাস্থানে রক্ষিত হইয়া থাকিবে। উপরে যে চিত্র প্রকাশিত হইল, উহা মধ্য আফ্রিকানিবাসিনী একটী কাফ্রি নারীর মুখচ্ছবি। পাঠিকাগণ এই ছবি দেখিয়াই বুঝিতে পারিবেন উহার মুখমণ্ডল কি রূপ কুৎসিত। মহানগরী কলিকাতার পথেও সচরাচর কাফ্রি পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সেই ঘন কৃষ্ণাঙ্গ, শুভ্রকান্তি ইংরাজদিগের পরিচ্ছদ হ্যাট কোটে শোভিত। ইহারা এক অদ্ভুত সাহেব। যে অদৃশ্য হস্ত সৌরভ ও সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার শতদল পঙ্কজ সৃজন করিয়াছে, সেই জনমনোহর অনুপম পঙ্কজের আধার দুর্গন্ধ মলিন পঙ্কও সেই হস্তেরই রচনা। বিবিধ মনোহর কুসুমতরুরাজি-সমাচ্ছন্ন কাচ-স্বচ্ছ কলনাদিনী সরিৎনির্ঝরিণী সমাকীর্ণ ভূমণ্ডলে স্বর্গস্বরূপ কাশ্মীরের সুরম্য উপত্যকাভূমি যে বিধাতার বিধানে হইয়াছে, পাদপগুল্ম তৃণ লতিকাদিশূন্য অগ্নি-কণবৎ উত্তপ্ত শুষ্কবালুকাকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ ভীষণ শাহারামরুপ্রান্তরও সেই বিচিত্র কর্ম্মা বিধাতারই বিচিত্র বিধান। তদ্রূপ সুরাঙ্গনা সদৃশী স্বর্ণকান্তি কমনীয়া আর্য্যকামিনীর মনোহর মুখচন্দ্র আর বিকটাকার দানবী তুল্যা ঘোরতর কৃষ্ণাঙ্গী অনার্য্যা কাফ্রিললনার ভীষণ বদনমণ্ডল এক মহাশিল্পীর হস্তে রচিত। কাফ্রি নারীদিগের অধরোষ্ঠ পুরু, দশনপঙ্‌ক্তি উচ্চ, নাসিকা নিম্ন, চক্ষু ক্ষুদ্র, ললাটদেশ উন্নত, কপোলযুগল স্থূল, মস্তকে অদীর্ঘ আকুঞ্চিত পিঙ্গল কেশদাম, ভ্রূরেখা ক্ষীণ অস্পষ্ট, তাহা শরীরের বর্ণের সহিত একীভূত। পাঠিকা, কাফ্রি ললনার উত্তমাঙ্গের এই সাধারণ বর্ণনা। যে শিল্পী সুন্দর ও কুৎসিত বস্তু গঠন করেন, শুভ্রবর্ণ ও তদ্বিপরীত নীলবর্ণ, জ্যোতি ও অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া থাকেন; উদ্ভিজ্জ বিশেষে রসনাতৃপ্তিকর পীযূষতুল্য সুমিষ্ট রস ও বিশেষ বিশেষ তরু লতায় প্রাণনাশক সুতিক্ত বিষরসের সঞ্চার করেন, এবং যিনি নানাবিধ ফুল্ল কুসুমে মনোহর সুগন্ধি এবং বিশেষ বিশেষ পুষ্পে ঘৃণাজনক দুর্গন্ধি উৎপাদন করিয়া থাকেন, তিনিই রমণীর মুখমণ্ডল রমণীয় বা কুৎসিতরূপে রচনা করেন। সাদাতে কালতে, সুরূপে কুরূপে, সুখে দুঃখে ও ধনে নির্দ্ধনাদি সমুদায় অবস্থার মধ্যেই ভগবানের মহিমা ও লীলা প্রকাশ পাইতেছে।

আফ্রিকানিবাসী অধিকাংশ কাফ্রি চিরহতভাগ্য স্থূলবুদ্ধি বর্ব্বর। পূর্ব্বে তাহারা ইয়ুরোপ ও আমেরিকার এবং অন্য অন্য স্থানের সভ্য ও অর্দ্ধ সভ্য লোকদিগের দ্বারা সর্ব্বদা উৎপীড়িত ও হৃত সর্ব্বস্ব হইত, এবং তাহাদের দাসত্ব নিগড়ে বদ্ধ থাকিত। সময়ে সময়ে ইয়ুরোপ আমেরিকানিবাসী লোভান্ধ নিষ্ঠুর দাস-বণিগ্‌গণ অর্ণবযানারোহণে আফ্রিকায় আগমনপূর্ব্বক সহস্র সহস্র নিরীহ নিগ্রো নর নারী বালক বালিকাকে বন্দী করিয়া নানা স্থানে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। এক্ষণ যেমন কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ টাকা

শুল্ক আদায় হয় বলিয়া আমাদের গবর্ণমেণ্ট বিষস্বরূপ মদ গাঁজা আফিং ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের বাণিজ্য কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন, দাসবাণিজ্যে শুল্করূপে রাশি রাশি টাকা আদায় হইত বলিয়া তদানীন্তন স্বার্থপর নিষ্ঠুর রাজারা তদ্বিষয়ে সহায়তা ও পোষকতা করিতেন। স্বার্থান্ধ নির্দ্দয় বণিগগণ শহরে বন্দরে হাটে বাজারে গোমহিষাদি গৃহপালিত পশুর ন্যায় নির্দ্দোষ কাফ্রি নর নারী ও বালক বালিকাদিগকে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। বয়ঃক্রম, দৈহিক শক্তি ও স্বাস্থ্যাদি নানা উপায়ে পরীক্ষা করিয়া মূল্যনির্দ্ধারণপূর্ব্বক ক্রেতারা গো মেষাদি পশুদিগকে যেরূপ ক্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ উপায়ে অবস্থা জ্ঞাত হইয়া উপযুক্ত মূল্যদানে দাস করিয়া রাখিবার জন্য হতভাগ্য কাফ্রিদিগকে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত, এবং তাহাদিগকে তাহাদের দুঃসাধ্য নানা নীচ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিত। তাহারা ক্রীতদাস নামে পরিচিত হইত, তাহাদের কোনরূপ স্বাধীনতা থাকিত না। দাস-স্বামীর অর্থের প্রয়োজন হইলে সেই দাসদাসীদিগকে আবার অপর লোকের নিকটে বিক্রয় করিত। অনেক সময় স্বামী হইতে স্ত্রীকে স্ত্রী হইতে স্বামীকে এবং জননীর ক্রোড় হইতে স্নেহভাজন শিশুদিগকে বিক্রয়ার্থ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যাইত। গোমহিষাদির পরিবর্ত্তে ক্ষেত্রে হলচালনার কার্য্যে অথবা অপর নিতান্ত কষ্টসাধ্য নীচ কার্য্যে উক্ত দাস দাসীদিগকে নিযুক্ত করা হইত। তাহারা তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে বা অক্ষমতা জানাইলে নিষ্ঠুর প্রভুর নিদারুণ প্রহারে ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইত। তাহাদের দেহ মন আত্মা সকলই প্রভুর চরণে উৎসর্গীকৃত ছিল, আপনার বলিবার কিছুই ছিল না। মনুষ্য হইয়াও সেই দুঃখী লোকদিগের পশুদিগের অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় হীনাবস্থা ছিল। চিরজীবন তাহাদিগকে এইরূপ দুঃসহ দুঃখ ক্লেশে যাপন করিতে হইত। অনেক সময় দুর্দ্দান্ত দস্যু বোম্বাটিয়া লোকেরা ভদ্রলোকদিগকেও কোন স্থানে নিঃসহায় পাইলে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া বাজারে বন্দরে বিক্রয় করিত। ভিন্‌সেণ্টনামক একজন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক কতিপয় সহচরসহ এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। একদা তিনি সমুদ্রপথে মারসেলিস হইতে নারবোলে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন তুরুষ্ক দেশীয় একদল বোম্বাটিয়া তাঁহাকে সহচরগণ সহ বন্দী করে, এবং তাঁহাদের সঙ্গে যে কিছু অর্থ ও দ্রব্য সামগ্রী ছিল, তাহারা তাহা লুণ্ঠন করে ও তাঁহার সহচরগণের সঙ্গে তাঁহাকে দাসরূপে বিক্রয় করিবার জন্য টলিসনামক নগরে লইয়া যায়। তিনি এ বিষয়ে স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল ;—"পরে তাহারা আমাদিগকে বিবস্ত্র করিয়া প্রত্যেককে এক জোড়া পায়জামা ও একটি সূত্রনির্ম্মিত কোর্ট এবং একটি টুপি প্রদান করিল, তৎপর আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া নগরের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহারা যেখানে উপস্থিত হইত সেখানেই লোকের

নিকটে আমাদিগকে বিক্রী করিবে, এরূপ প্রস্তাব করিত। তাহারা আমাদের গলদেশে শৃঙ্খল সংলগ্ন করিয়া নগরের চতুর্দিকে আমাদিগকে লইয়া গিয়া প্রদর্শন করিল, অবশেষে আমাদিগকে এই উদ্দেশ্যে অর্ণব-পোতে ফিরিয়া আনিল যে,আমরা অধিক না অল্পাহার করি, শরীরে কোন বিশেষ ক্ষত ও ব্যাধি আছে কি না ক্রেতাদিগকে যেন উত্তম রূপে দেখাইতে পারে। (ভিন্‌সেণ্ট বাণাহত হইয়াছিলেন,কিন্তু আঘাত মারাত্মক ছিল না।) এই প্রদর্শন ক্রিয়া হইয়া গেলে আমাদিগকে পুনর্ব্বার সেই বাজারে লইয়া যাওয়া হয়, যেখানে ক্রেতৃগণ আমাদের সকলকে পরীক্ষা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। কোন অশ্ব বা বলীবর্দ্দকে ক্রয় করিবার কালে ক্রেতারা যেরূপ পরীক্ষা করিয়া থাকে, যাহারা আমাদিগকে ক্রয় করিতে আসিয়াছিল ঠিক সেইরূপ পরীক্ষা করিতে লাগিল। মুখ ব্যাদান করিয়া দন্তপংক্তি প্রদর্শন করিতে আমরা সকলে বাধ্য হইয়াছিলাম। ক্রেতৃগণ পার্শ্বে আসিয়া আমাদের শরীর অক্ষত কি না পরীক্ষা করিয়াছিল, আমাদিগকে হাঁটা-ইল, দৌড়িতে ও লাফাইয়া চলিতে বাধ্য করিল, এবং গুরুতর ভার বহন করিতে দিল। ইহা এজন্য করিল যেন তাহারা আমাদের ব্যক্তিগত শক্তি বিচার করিতে পারে। তাহারা আমাদিগকে সহস্ররূপে অপমানিত হইতে বাধ্য করিয়াছিল।"

পাদরি ভিন্‌সেণ্ট এক জন ধীবরের নিকটে বিক্রীত হইয়াছিলেন। সে অচি-রেই তাঁহাকে এক জন রসায়নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের নিকটে বিক্রয় করে। সেই ব্যক্তি মৃত্যুকালে দানপত্র লিখিয়া ভিন্‌সেণ্টকে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। সে আবার সেই হতভাগা ধর্ম্মযাজককে এক জন স্বধর্ম্মত্যাগী খ্রীষ্টানের নিকটে বিক্রয় করে। একটি সাধু পুরুষের জীবনে এইরূপ ঘোরতর দুঃখ বিপৎ পরীক্ষা ঘটিয়াছিল।

১৩ শত বৎসর পূর্ব্বে একেশ্বরবাদধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহম্মদের বিদ্যমানতার সময়ে মক্কা মদিনার প্রত্যেক ভদ্র পরিবারে কাফ্রি দাসদাসী ছিল। বাজারে বন্দরে বাহুল্য-রূপে তাহাদের ক্রয় বিক্রয় হইত। মক্কা-নিবাসী ওম্মিয়ানামক এক জন দুর্দ্দান্ত ভদ্র-লোকের বেলাল নামে এক কাফ্রি দাস ছিল। সে মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়াছিল। তাহার প্রভু ওম্মিয়া একেশ্বরবাদের ঘোরতর বিরোধী পৌত্তলিক ছিল। কাফ্রি দাস বেলাল একেশ্বরবাদী হইয়াছে বলিয়া ওম্মিয়া তাহার প্রতি বিষম অত্যাচার করে। ওম্মি-য়ার নিষ্ঠুর প্রহারে রক্তস্রোতে বেলালের কৃষ্ণাঙ্গ লোহিতাঙ্গ হইয়াছিল। এস্‌লামধর্ম্ম অর্থাৎ একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পৌত্তলিক হইবার জন্য নিষ্ঠুর প্রভু ওম্মিয়া বিশ্বাসী দাস বেলালের বুকে পাথর চাপা দিয়া মক্কার পথে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত বালুকার উপর শোওয়াইয়া রাখিত, গলায় দড়ী বাঁধিয়া তাহাকে তপ্ত সৈকত ভূমির উপর ইতস্ততঃ টানিয়া লইয়া যাইত, কখন কখন তাহাকে নিষ্ঠুর দণ্ডাঘাত করিত, প্রস্তর ছুড়িয়া মারিত, প্রহারযাতনায় বেলালের ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছিল,তথাপি সে নিজের অবলম্বিত

বিশ্বাস পরিত্যাগ করে নাই। মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রধান প্রচারবন্ধু আবুবেকর সদ্দিক একদিন নগরের পথে বিশ্বাসী বেলালের উপর এরূপ নিদারুণ অত্যাচার দেখিয়া এবং তাহাকে ওষ্ঠাগতপ্রাণ দর্শন করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি প্রচুর অর্থ দানে দুঃখী বেলালকে ক্রয় করিয়া ওম্মিয়ার নিদারুণ নিপীড়ন হইতে মুক্ত করেন, এবং তাহাকে স্বাধীনতা দানপূর্ব্বক মহাপুরুষ মোহম্মদের নিকটে লইয়া আইসেন। বেলালের উপর উক্ত মহাপুরুষের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি হয়। তিনি বেলালকে নমাজের আজানদাতার পদে নিযুক্ত করেন। বেলাল অতিশয় দীর্ঘাকৃতি পুরুষ ছিল, তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উচ্চ ও গম্ভীর ছিল। বহুদূর হইতে তাহার আজানের ধ্বনি মণ্ডলীর লোকেরা শুনিয়া নমাজ পড়িবার জন্য মস্‌জেদে দৌড়িয়া আসিত। হজরত মোহম্মদ পরলোকপ্রাপ্ত হইলে বেলাল শোকে বিহ্বল হয়, এবং মদিনানগর পরিত্যাগ করিয়া তুরুষ্ক দেশে যাইয়া বাস করে, সেখানে তাহার মৃত্যু হয়। কোন এক জন ক্রীতদাসকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দান করিলে মহাপুণ্য হয় বলিয়া মোহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণ ও হদিসে উল্লিখিত আছে।

হতভাগা কাফ্রি নরনারীদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া স্থানে স্থানে বাজারে বন্দরে গোগর্দ্দভের ন্যায় লোভান্ধ নির্দ্দয় দাস বণিগ্‌দিগের বিক্রয় করা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল। পরে উত্তর আমেরিকানিবাসী পরম দয়ালু মহাত্মা থিয়োডোর পার্কার এই ঘৃণিত নিষ্ঠুর কুপ্রথার বিরুদ্ধে তেজস্বিনী বক্তৃতাদি করিয়া সে দেশে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় অনেক সহৃদয় সদাশয় লোকের মন দাস দাসী বিক্রয়-প্রথা একেবারে উঠাইবার জন্য সমুত্তেজিত হয়, দাস-বাণিজ্য রহিত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা বদ্ধপরিকর হন। কোন কোন সহৃদয়া বিদুষী রমণী নিগ্রো ক্রীত দাস ও দাসীদিগের প্রতি কিরূপ নিষ্ঠুরাচরণ ও অত্যাচার হয় অতিশয় অভিজ্ঞতাসহকারে তাহার যথাযথ বর্ণনা করিয়া পুস্তকাদি রচনা করেন। তাহা পড়িয়া সকলের মন অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইয়া উঠে। পুণ্যশ্লোক থিয়োডোর পার্কার দাসবাণিজ্য উঠিয়া গিয়াছে—দাসত্ব প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহা না দেখিয়াই পরলোক প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি যে অগ্নি লোকের হৃদয়ে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই উহা প্রবল দাবানলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল, এবং ভীষণ সমরানলে পরিণত হইল। স্বার্থসম্পর্কবশতঃ দক্ষিণামেরিকানিবাসিগণ দাসবাণিজ্যের ঘোরতর পক্ষপাতী ছিল, সেই বাণিজ্য রহিত করিবার চেষ্টার বিরুদ্ধে তাহারা ও তাহাদের রাজা দণ্ডায়মান হইল; তজ্জন্য উত্তরামেরিকার সঙ্গে তাহাদের তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হয়। সহস্র সহস্র লোকের শোণিতস্রোতে দেশ প্লাবিত হওয়ার পর উত্তর আমেরিকার জয় হইল। সমগ্র ইয়ুরোপ উত্তরামেরিকার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। জগন্মান্য দয়ার্দ্রহৃদয় পুণ্যাত্মা

পার্কার স্বর্গগত হইলে পর তাঁহার সাধু চেষ্টা ফলবতী হইল। আমাদের বাল্যাবস্থায় আমেরিকা মহাদ্বীপে এই মহাসংগ্রাম ঘটিয়াছিল। তখন এই যুদ্ধের জন্য আমেরিকার সঙ্গে অন্য দেশের বাণিজ্যের যোগ কিছু কাল বন্ধ ছিল, তন্নিমিত্ত কিয়ৎকাল কোন কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়াছিল। তদবধি দাস বাণিজ্য পৃথিবী হইতে একেবারে উঠিয়া যায়। দুঃখী কাফ্রি নরনারীগণ নিষ্ঠুর সভ্য পুরুষদিগের নিদারুণ অত্যাচার হইতে মুক্ত হয়। কিন্তু গুপ্তভাবে এখনও মোসলমান রাজ্যে—মক্কা মদিনায় নারীবিক্রয় হইয়া থাকে।

শ্রীমতী এডা লী।

পরসেবাপ্রিয়া স্বাধ্বী মনস্বিনী শ্রীমতী এডা লী ১৯।২০ বৎসর যাবৎ স্বামিসহ এদেশে স্থিতি করিয়া বঙ্গনারীদিগের এবং অনাথ বালকবালিকাদিগের কল্যাণার্থ অক্লান্তভাবে নানা সৎকার্য্য করিতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দার্জ্জিলীং পাহাড়ের কিয়দংশ অকস্মাৎ পতন হইলে ইঁহার গর্ভজাত পাঁচটি প্রিয়দর্শন পুত্র কন্যা ইঁহার চক্ষুর অগোচরে পাথর চাপায় পড়িয়া দেহত্যাগ করিয়াছে। এক যোগে এত গুলি পুত্র কন্যা হারাইয়া ইনি নিজের ধর্ম্মবিশ্বাসবলে সেই তীব্র শোককে সংবরণপূর্ব্বক অদম্য উৎসাহসহকারে আপনাকে পরসেবাব্রতে অধিকতর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সদয়হৃদয়া পুণ্যবতী মহিলা মাতৃস্থানীয়া হইয়া প্রায় তিন শত অনাথ বালকবালিকাকে নিজের নিকটে রাখিয়া পরম যত্নে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করিতেছেন। বাঙ্গলা ভাষা ইঁহার পক্ষে মাতৃভাষা তুল্য হইয়াছে। ইনি বাঙ্গলা ভাষায় অনর্গল শ্রুতিমধুর বক্তৃতা করিতে পারেন। এই মহানগরীস্থ ভদ্র মহিলাদের সঙ্গে নিরন্তর ঘনিষ্ঠতা করিয়া তাঁহাদের আচার ব্যবহার ও দোষগুণাদি বিষয়ে ইনি বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। অনেক দিন এই সদাশয়া পরম গুণবতী উচ্চ প্রকৃতি মহিলা আমাদের ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া, গৃহিণীর নীতি, নারীর কর্ত্তব্য ও সন্তানপালনাদিবিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। ইঁহার উপদেশ সকল ধর্ম্মভাবপূর্ণ সারগর্ভ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। উক্ত বিদ্যালয়সংস্পৃষ্ট মহিলাগণ তাহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছেন। সম্প্রতি গত ১২ই শ্রাবণ সেই বিদ্যালয়ে মহিলামণ্ডলীর সঙ্গে ইনি কিয়ৎক্ষণ বসিয়া সদালোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন আমাদের এমন একটী স্নেহের কন্যা আলোচনার মর্ম্ম আমাদিগকে লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা এস্থলে গৃহীত হইল ;—

"Mis Ada Lee তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত চারিটী সভার নিয়মের বিষয় বলেন। প্রথম, মাসে মাসে কয়েক জন মিলিয়া একটা সভা করা হয়, তাহার নাম Dotchar's Meeting, এই সভার কার্য্য অনাথ দরিদ্রদিগের জন্য জামা কাপড়াদি সেলাই করা। দশ বার জন মহিলা মিলিয়া সেলাই করেন

আর তিন জন আছেন, যাঁহারা ঐ সকল বস্ত্রাদি দান করিবার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোথায় কে অনাথ দরিদ্র আছে, তাঁহারা খোঁজ করিয়া তাহাদিগকে উহা দান করেন। দ্বিতীয় আর একটি সভা হয়, তাহাতে কয়েক জন মিলিয়া কোন ভাল বই পড়েন ও সেই বিষয়ে আলোচনাদি করেন। এই সভার নাম Reading Circle। তৃতীয় সভার নাম Mother's Meeting এই সভার কার্য্য ;—সকলে একত্র মিলিয়া অপরের সন্তানাদির মঙ্গলের জন্য প্রার্থনাদি করা। এমনকি সময় সময় কোন কোন বাড়ীতে যাইয়া সেই পরিবারের জন্য মঙ্গলপ্রার্থনা করা হয়। চতুর্থ Temperance Society (মাদকনিবারণী সভা।) এই সভায় সুরাপান বা অন্য কোন রকম মাদক দ্রব্যাদিসেবনের বিরুদ্ধে আলোচনাদি হয়; এবং ঐ সকল আলোচনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এরূপ নিয়ম বা প্রতিজ্ঞাদি গ্রহণ করা হয় যে, কুমারীগণ এমন কোন স্বামী গ্রহণ করিবেন না যিনি মদ্যাদি মাদকদ্রব্য সেবন করেন।

তিনি আরও বলিলেন যে সুরাপান-নিবারণ করিবার জন্য মেয়েদের সমধিক যত্ন চেষ্টা থাকা উচিত। কারণ স্বামী মাতাল হইলে স্ত্রীরই অধিক যাতনা ভোগ করিতে হয়। সুতরাং নারীগণেরই এ বিষয় অধিকতর চেষ্টা পাওয়া প্রয়োজন। মদ্যপানরূপ পাপের স্রোত আমাদের দেশ হইতে এদেশে প্রবাহিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের মেয়েরা পর্য্যন্ত মদ্য পান করে। ইনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, এদেশের ভদ্র ঘরের অনেক মেয়ে বৃথা গল্প করিয়া ও তাস খেলিয়া সময় নষ্ট করে। গল্পের সময় পর-চর্চ্চা ও পরনিন্দা করিয়াই তাঁহাদের আমোদ হয়। সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ ও সদালোচনা বড়ই কম হয়। আমাদের দেশের অনেক লোকের একটি কু অভ্যাস তাস খেলা। তাস খেলার আমোদ আমাদের দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছে, এবং অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে।

এক্ষণ এডা লীর বয়ঃক্রম ৪০।৪১ বৎসর হইবে, ইনি ২৫০।৩০০ শত মাতৃহীন ছেলে মেয়ের মা, ইঁহার নিজের গর্ভজাত সন্তানও আছে। এতগুলি ছেলে মেয়ে সম্বন্ধে ইঁহার কত কাজ। তথাপি লোকের সেবায় ইঁহার উৎসাহ উদ্যম কত। কোন কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য ইঁহাকে অনুরোধ করিলে, ইনি তাহাতে অত্যন্ত উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইঁহার মুখে আপত্তি ও ঔদাসীন্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। ইঁহার কিরূপ বিশুদ্ধ চরিত্র ও উৎসাহের জীবন এবং সুন্দর রীতিনীতি ইঁহার বক্তৃতায় অনেকটা প্রকাশ পায়। ইনি গত বৎসর ৭ই শ্রাবণ "আমাদের খাদ্য ও শরীর মনের উপর তাহার ক্রিয়া" বিষয়ে ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ প্রমাণস্বরূপ এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—

"আমরা যে রকম জিনিষ খাব আমাদের মনও সেই রকম হবে, বেশী তেল মসলা খেলে মন গরম হয়, মাংস খেলে মন কঠিন হয়, আমি বেশী মাংস খাই না। আমিও

বাঙ্গালীর মত ডাল ভাত খাই, আমি তাহা খেতে বেশ ভালবাসি। বাঙ্গালীরা বেশী মাংস খান না, ডাল ভাত খান, আর মাছ খান; মাছটা ভাল জিনিষ। মাংস সেরূপ নয়। কারণ মাছকে Brain food অর্থাৎ মস্তিষ্কের খাবার বলা হয়, এই জন্যই বোধ হয় বাঙ্গালীর বেশী বুদ্ধি। বড় Professor রা মাছ খান, কারণ তাঁহাদের মস্তিষ্কের কাজ বেশী। মাংস এদেশে বেশী না খাওয়াই ভাল; এবং একথা খুব সত্য যে, এ সব জিনিষ খেলে রাগ ইত্যাদি বেশী হয়। আপনারা যদি আমার কথায় বিশ্বাস না করেন,তবে বড় বড় ডাক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন। আপনারা অনেকে Vegetarin অর্থাৎ ফল মূল খান, শস্য বেশী খান। আমার মনে হয় ঈশ্বর প্রথমে আমাদের আহারের জন্য ফল মূল শস্য ইত্যাদিই কেবল ঠিক করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষ মাছ মাংস ইত্যাদি খায়।

"ঈশ্বর প্রথমে নিয়ম করে দিয়েছিলেন, মানুষ জল খাবে, কিন্তু শেষকালে মদ খেতে আরম্ভ করিল। আমাদের দেশে স্ত্রী পুরুষ সকলেই মদ খায়। আমি এ বিষয়ে অত্যন্ত সুখী হইয়াছি যে, এ দেশের মেয়েরা মদ খায় না। আমাদের দেশের মেয়েরা বলে যে একটু মদ খেলে শরীরে কত জোর পাই, খুব কাজ করিতে পারি, ক্রমে ক্রমে বেশী খেয়ে নেশা করে ফেলি। আমি জল খাই, আমি গ্রামে গিয়া ভাল জল না পাইলে ডাবের জল খাই। ইহা অতি সুন্দর জিনিষ, ইহাতে শরীর খুব ঠাণ্ডা থাকে। আর আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, তিনি কেমন আশ্চর্য্যরূপে ঐ গাছের উপরে ঢাকা দিয়া পরিষ্কার জল রাখেন।

"ছোট ছেলেরা দেখতে খারাপ হয় কেন? রোগা হয়,কাঁদে অর্থাৎ তারা দেখতে সুন্দর হয় না কেন? যেমন গোলাপ ফুল সুন্দর হয়, লাল হয়। কোন্ গাছের? যে গাছের খুব যত্ন হয়, মাটী খুঁড়ে দেওয়া হয়, সার দেওয়া হয়। আর যে গাছ অযত্নে হয় তার ফুল সুন্দর হয় না। তেমনি যে ছেলেকে যত্ন করা যায় না, সে সুন্দর হয় না। ঈশ্বর পৃথিবীতে ফুলকে একটি সুন্দর জিনিষ করিয়াছেন। আমার ছোট ছেলে ফুল খুব ভাল বাসে, ফুল দেখলে হাসে। আর পুকুরে যে পদ্ম ফুল ফোটে তাই বা কেমন সুন্দর। কিন্তু ঈশ্বর মানুষকেই পৃথিবীতে সব চেয়ে সুন্দর করিয়াছেন। ছোট ছেলেরা যে দেখতে সুন্দর হয় না, তাহা কেবল মার দোষ।

"রান্না করা মেয়েদের একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তুমি বড়লোক হও না কেন, তোমার রান্না করিবার বামুন থাকনা কেন, তোমার উচিত রান্না করিয়া তোমার স্বামী পুত্র কন্যাকে খাওয়ান। সকল মেয়েরই রান্না করিতে জানা উচিত। আমার কাছে যত মেয়ে আছে, তারা যদিও সকলেই পড়ে, তবুও তাদের প্রত্যেককে, খুব উচ্চ ক্লাশে পড়িলেও সপ্তাহে এক দিন করে রান্না করিতে হইবে। ৪।৫জনে মিলে এক একদিন রান্না করে। আমার কাছে অনেক মেয়ে আসে তারা বলে যে, মেম, আমার বুকে বড় ব্যথা, আমি রান্না বা কোন কাজ করিতে পারিব না। আমি বলি না কয়

গিয়ে। পরে সেই মেয়েরা এসে বলে মেম, আর আমার গায়ে ব্যথা নাই। মার কাছে হলে, মা বলবেন আচ্ছা শোও গিয়ে, ইহা অত্যন্তখারাপ।

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

কক্সবাজার। *

দ্বীতিয়।

১২ই শুক্রবার অপরাহ্নে যোগীন্দ্রলাল আমাদিগকে নগরের পার্শ্বস্থ একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতশিখরে লইয়া যান। তত্রত্য মুনসেফ বিক্রমপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়ও আমাদের সঙ্গী হইয়াছিলেন। সেই পর্ব্বতের পাদদেশকে সাগরের তরঙ্গমালা প্রতিনিয়ত চুম্বন করিতেছে। পর্ব্বতটি নাতি সমুচ্চ. তাহার চূড়া সমতল, তথায় একটি সাধনকুটীর বিদ্যমান। তত্রত্য মোনসেফীর ভূতপূর্ব্ব সেরেস্তাদার ধর্ম্মানুরাগী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রতিদিন সায়ংকালে তথায় যাইয়া বহুদিন সাধন ভজনে একাকী নিশাযাপন করিয়াছেন। উক্ত কুটীর তাঁহাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বহুকাল পূর্ব্বে এস্থানে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর শবের উপর সমাধিমন্দির ছিল, পরে কতক গুলি রাহুলী এখানে বাস করিয়াছিলেন। এক্ষণ সেই সমাধিমন্দিরের কোন চিহ্ন নাই। যোগীন্দ্রলাল সেই কুটীরটিকে "ইষ্ট কোষ্ট সাধনকুটীর" বলিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছা সেই স্থানে একটি নির্জ্জনাবাস স্থাপন করেন। স্থানটি অতি রমণীয়; গিরিশিখর বট অশ্বত্থাদি নানা জাতীয় বিশাল বৃক্ষরাজিতে সমাচ্ছন্ন, ইতস্ততঃ বন্য কুসুম সকল বিকশিত, গিরিমূলে সাগরের ঘোর আস্ফালন, সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনের সহিত তরুশাখাস্থিত কলকণ্ঠ বিহঙ্গকুলের মধুর কাকলী মিলিত হইয়া আমাদের শ্রুতিযুগলকে অপূর্ব্ব রসে অভিষিক্ত করিতেছিল, সাগরের শীতল বারিকণাসংস্পৃষ্ট মৃদু সমীরণ সংস্পর্শে পথক্লম ও শ্রান্তি বিদূরিত হইয়াছিল। কুটীরাভ্যন্তর অপরিষ্কৃত ও সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত ছিল, আমরা কুটীরের বাহিরে তাহার সম্মুখভাগে সেই প্রকৃতিদেবীর লীলাক্ষেত্র শৈলশিখরে প্রকৃতিপতির গুণকীর্ত্তনের জন্য উপবিষ্ট হইলাম; বিশাল বঙ্গোপসাগরকে নয়নের সম্মুখে রাখিয়া তরুমূলে পল্লবাসনে আসীন হইয়াছিলাম। আশুতোষ মধুরস্বরে একতন্ত্রিযোগে স্তান ও সময়োপযোগী কয়েকটি সঙ্গীত করিলেন, একটী প্রার্থনা হইল, কিয়ৎক্ষণ ধীর শান্তমনে ভগবচ্চরণ অনুধ্যান করিয়া সেই নিভৃত গিরিশিখর হইতে ধীরে ধীরে নিম্নে অবতরণ করা গেল। সাগরকূলে সিকতাময় পথে চিত্র বিচিত্র ঝিনুক ও শম্বুকাদি কুড়াইতে কুড়াইতে এবং সাগরগর্ভে সূর্য্যাস্তগমনের শোভা দেখিতে দেখিতে একজন ফকিরের আস্তানায় উপস্থিত হওয়া গেল। ফকির সমুদ্রের সৈকতভূমিতে একটি গর্ত্তে বাস করেন। সেই গর্ত্ত ও তাহার সম্মুখ-

---

* এই ভ্রমণবৃত্তান্তটি ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার অনেক অংশ পরিত্যক্ত ও এবং পরিবর্দ্ধিত করা গিয়াছে।

ভাগ তৃণাচ্ছন্ন চালায় আচ্ছন্ন। আমরা অনুমতি গ্রহণ করিয়া ফকিরের পার্শ্বে যাইয়া বসিলাম। তিনি তখন গর্তের পার্শ্বে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। দুই তিন জন মোসলমান তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট ছিল। সায়ংকালীন নমাজের সময় হইলে তিনি তাহাদিগকে বাহিরে যাইয়া আজান দান করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া আজান দিল, ফকির গর্তে প্রবেশ করিলেন। আমাদের সঙ্গে তাঁহার অতি অল্পই কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তাঁহার কথায় জানিলাম, তিনি আজমির হইতে এখানে আসিয়াছেন, দুই বৎসর যাবৎ এস্থানে এই ভাবে স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার প্রতি লোকের অগাধ ভক্তি। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া আমাদের তত ভক্তি হইল না, শুনিলাম তিনি গাঁজাও সেবন করেন। আমরা রাত্রিকালে আবাসে প্রত্যাগত হইলাম।

পরদিন শনিবার মাধ্যাহ্নিক ভোজনান্তে যোগীন্দ্রলালের সঙ্গে মহিষখালী দ্বীপাভিমুখে ক্ষুদ্র নৌকারোহণে যাত্রা করা যায়। সেই দ্বীপের পূর্ব্বপ্রান্তে আদিনাথ পর্ব্বত, তাহার অদূরে বঙ্গোপসাগর। উক্ত পর্ব্বতশিখরে আদিনাথনামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। বহুদূর হইতে হিন্দু তীর্থযাত্রিকগণ আদিনাথ দর্শন করিতে আসিয়া থাকে। চন্দ্রনাথ তীর্থদর্শনান্তে অনেক নরনারী আদিনাথে আগমন করে। শিব চতুর্দ্দশীতে সেখানে মহাজনতা হইয়া থাকে। এরূপ কিংবদন্তী যে, লঙ্কেশ্বর রাবণ মহাদেবকে মস্তকে ধারণপূর্ব্বক অমরবরপ্রার্থী হইয়াছিল। বিশ্বনাথ সেই বরদানে কিছুতেই সম্মত হন নাই। ব্রহ্মাধিপতি তাঁহাকে মাথায় করিয়া ভূমণ্ডলের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, নানা দেশভ্রমণের পর উক্ত পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করে। তাহাকেই মৈনাক পর্ব্বত বলে। মহেশ্বরকে বাধ্য করিয়া দুর্দ্দান্ত রাবণ তাঁহা হইতে অমর বর লাভ করিলে সে স্বর্গলোক পর্য্যন্ত অধিকার করিবে, এই ভাবিয়া দেবতারা ভীত হন। দেবগণের পরামর্শে বরুণদেব লঙ্কেশ্বরের উদরে প্রবেশ করেন। তাহাতে দশাননের বিষম লঘুক্রিয়ার আবেগ হয়। পূজনীয় শিবকে শীর্ষদেশে ধারণপূর্ব্বক তাদৃশক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হওয়া অসঙ্গত মনে করিয়া রাবণ তাঁহাকে ভূতলে স্থাপনপূর্ব্বক তৎক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়। তখন শিব পাষাণময় লিঙ্গাকার ধারণ করেন, দশাননের প্রবল মূত্রস্রোতে মূত্রখালী নামক একটি নদী উৎপন্ন হয়। পর্ব্বতের এক প্রান্ত দিয়া একটী ক্ষীণ নদী প্রবাহিত, লোকে তাহাকে রাবণের মূত্রে উৎপন্ন মূত্রখালী বলিয়া থাকে।

আদিনাথ পর্ব্বতের উপর হইতে বঙ্গোপসাগর ও মহিষখালী সাগরশাখা এবং ইতস্ততঃ শৈলশ্রেণী ও সমতল প্রান্তরের শোভা দেখিয়া মন মুগ্ধ হয়। তদ্দর্শনোদ্দেশ্যেই মহিষখালী দ্বীপে আমাদের যাত্রা হইয়াছিল। কিন্তু মহিষখালী প্রণালীর বিশাল তরঙ্গ আমাদের গমনে বাধা দেয়। প্রণালীর পরিসর প্রায় পাঁচ মাইল। তাহার সাগরসঙ্গমের অদূরে শামপান নামক ক্ষুদ্র তরীযোগে আমরা পরপারে

যাইতে সমুদ্যত হইয়াছিলাম। তখন বায়ু প্রতিকূল ছিল, প্রবল বায়ুসংস্পর্শে প্রকুপ্ত তরঙ্গাবলী পুনঃ পুনঃ নৌকাটীকে আঘাত করিয়া হেলাইয়া দোলাইয়া যে দিক্ হইতে যাইতেছিলাম সেই দিকেই লইয়া গেল। প্রণালীর বক্ষে তাহার অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত ও কর্ণধার নৌকা চালাইতে সমর্থ হয় নাই। শামপান তরি রাজহংসাকৃতি, তরঙ্গাঘাতে সহজে উহা জলমগ্ন হয় না, তরঙ্গের সঙ্গে খেলা করিয়া থাকে। বায়ুবেগে কাত হইয়া পড়িলে উহার বিপদের সম্ভাবনা। এক জনমাত্র নাবিক সেই নৌকা চালায়। মাঝি পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া দুই হস্তে দুইটি হাল সঞ্চালনপূর্ব্বক সবেগে শামপান চালাইয়া থাকে। ইহা শাম দেশীয় নৌকা বা যান, তজ্জন্য ইহার অপভ্রংশ নাম শামপান হইয়া থাকিবে। আমাদের শামপানের সুনিপুণ কর্ণধার প্রণালীর উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া পরাস্ত হইল। আমরা গৃহে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলাম। প্রাতঃকালে বায়ু নিস্তেজ থাকে, প্রণালী শান্তভাব ধারণ করে। তখন পার হওয়া যাইবে এরূপ স্থির করা গেল। ঘটনাবশতঃ আমরা প্রাতঃকালে যাত্রা না করিয়া সেইদিন মধ্য রাত্রিতে যাত্রা করিলাম। তখন আকাশ সম্পূর্ণরূপে মেঘোন্মুক্ত নক্ষত্রখচিত, বায়ু প্রশান্ত ও প্রণালীবক্ষঃ স্থির ছিল। বাঘখালীনামক অনতি পরিসর প্রণালী অতিক্রম করিয়া বৃহৎ প্রণালী মহিষখালীর কিয়দ্দূর শামপান চালিত হইলে এক খণ্ড কৃষ্ণ মেঘ গগনপ্রান্তে দেখা দিল। যোগীন্দ্র লাল তৎপ্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই কৃষ্ণ মেঘ খণ্ড বিস্তৃত হইয়া সমুদায় আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল, তারা সকল মেঘের আড়ালে লুক্কায়িত হইল। তখন রাত্রি একটা বা দুইটা বাজিয়াছে, ঘন অন্ধকারাবরণে চতুর্দ্দিক্ আবৃত। বারিদমালাকে আশ্রয় করিয়া বা হঠাৎ প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই, ক্ষুদ্র তরী বঙ্গোপসাগরের গর্ভে উপনীত হইবে, এই ভাবিয়া যোগীন্দ্র লাল বাঘখালীর দিকে সবেগে নৌকা চালনা করিবার জন্য মাঝিকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমাদের মাঝি হায়দর আলি ধার্ম্মিক পুরুষ, তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি অতিশয় বিশ্বাস ও নির্ভর। মাঝি বলিল "এতদূর আসিয়াছি ফিরিব না, খোদা আমাদের সহায় আছেন।" এই বলিয়া সে পরপারের দিকে নৌকা চালাইতে লাগিল। যোগীন্দ্র লাল ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে স্থির ভাবে আকাশে মেঘমালার গতি নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, লেখক অধোমুখে তরণীর প্রান্তভাগে প্রণালীর জলের শোভা দেখিতেছিলেন। হালের আঘাতে যে জলবিন্দু সকল উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাহা ফুলঝূড়ী বাজির অগ্নিকণাপুঞ্জের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। গভীর অন্ধকারে উহা অতি চমৎকার দৃশ্য। শ্রুত হইল আঁধারে সাগর বা সাগরশাখা হইতে উৎক্ষিপ্ত লবণময় সলিলকণা সকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। আশুতোষ দেহ প্রসারণ করিয়া মুকুলিত নয়নে নিঃশঙ্ক মনে নিদ্রা দেবীর সাধনা করিতে-

ছিলেন। আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই অভিনব অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিলাম। কিন্তু তাঁহার মুদ্রিত যোগনেত্রযুগল উন্মীলিত হইল না। যোগীন্দ্রলাল আকাশে মেঘের ঘটা দেখিয়া আতঙ্কিত, আমি ঝড় উঠিবার ভয়সত্ত্বে স্ফুলিঙ্গপুঞ্জসদৃশ জলবিন্দুরাশি দর্শনে আনন্দিত, আর আশুতোষ নির্ভয়ে সুনিদ্রিত। তিন জনের ত্রিবিধ অবস্থা ঘটিয়াছিল।

কিয়ৎক্ষণের মধ্যে আকাশ মেঘমুক্ত, তারকাবলী উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত, অপর কূল দৃষ্টিগোচর হয়। তখন আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ হইল ও রাত্রি প্রায় চারিটার সময় আমরা কূলপ্রাপ্ত হইলাম। ঘোড়াঘাটনামক খালের ভিতরে নৌকা রাখা হইল। ইতিমধ্যে এক বিপদ্ উপস্থিত। একটি প্রকাণ্ড জেলে নৌকা সেই সঙ্কীর্ণ খাল জুড়িয়া অন্ধকার ভেদ করিয়া সবেগে সমুদ্রাভিমুখে চালিত হইয়াছিল। যোগীন্দ্র লাল কিঞ্চিৎ দূর হইতে তাহা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে নৌকার পরিচালক দিগকে সাবধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহারা নৌকা সামলাইতে পারিল না। আমাদের মাঝি সত্বর হইয়া শামপান কিঞ্চিৎ তীরের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহাতেই রক্ষা পাওয়া গেল, নতুবা আমাদের শামপান চূর্ণ ও জলমগ্ন হইত, আমরা প্রাণ হারাইতাম। তথাপি সেই বৃহৎ জেলে নৌকার ধাক্কা লাগিল, শামপানের কিয়দ্দূর ভগ্ন হইয়া গেল। যোগীন্দ্রলাল চাপরাসীসহ বন্দুকহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত জেলে নৌকায় গতিবোধ করেন। কতক গুলি মঘ সেই নৌকার পরিচালক ছিল। শামপানের ক্ষতি পূরণস্বরূপ দুইটী টাকা মাঝি হয়দর আলিকে প্রদান করিলে যোগীন্দ্র তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেন।

প্রাতঃকালে আমরা মহিষখালিদ্বীপস্থ আদিনাথ পর্ব্বতে আরোহণ করি। পর্ব্বতশিখরে দুইটি পুরাতন মন্দির বিদ্যমান। মসজেদের অনুকরণে মন্দির দুইটি গঠিত। বড় মন্দিরে আদিনাথ শিবলিঙ্গ, অন্যতর মন্দিরে ষড়ভূজা শক্তিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। উভয় দেবতার উদ্দেশ্যে বলিদান হয়, এবং প্রতিদিন অন্ন ব্যঞ্জন নিবেদিত হইয়া থাকে। সেখানে কয়েক জন পাণ্ডা বাস করে। আদিনাথ গিরির ইতস্ততঃ সমতল ক্ষেত্রে মগদিগের বসতি। অধিকাংশ মগই 'জাল জীবী' বলিয়া বোধ হইল। পর্ব্বত মূলে একটি উদ্যানের অভ্যন্তরে বুদ্ধ মন্দির 'কেয়ান' বিদ্যমান। সেখানে মগ বালকগণ সমবেতস্বরে পুস্তক পাঠ করিতেছে, আমরা দূর হইতে শুনিতে পাইলাম। 'কেয়ানের' ভিতরে আমাদের যাওয়া হয় নাই। বাজার হইতে কিঞ্চিৎ জলযোগের সামগ্রী ও দুগ্ধ ক্রয় করিয়া আনিয়া আমরা সেই নৌকারোহণে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। নৌকাতে উপাসনা হয়, এবং মধ্যাহ্নকালে গৃহে যাইয়া অন্নাহার হইয়াছিল।

আদিনাথ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় পথে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। বাঘখালী প্রণালীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া কিয়দ্দূর শামপান চলিয়া আসিলে পর লব-

ণের দারোগা যোগীন্দ্রলাল প্রণালীর অদূরস্থ পর্ব্বতমূলে অরণ্যের ভিতরে ধূমপুঞ্জ দর্শন করিয়া মনে করিলেন, কোন লোক লবণ প্রস্তুত করিতেছে। চুরি করিয়া লবণ প্রস্তুত করিতেছে এঅবস্থায় কাহাকে ধরিতে পারিলে দারোগার বিশেষ পুরস্কার লাভ হয়। একটা শিকার হস্তগত হইল বলিয়া যোগীন্দ্রলালের অতিশয় আনন্দ হইল। তাঁহার আদেশে মাঝি হয়দরআলি শামপান তীরে সংলগ্ন করত গুপ্তভাবে সেই ধূম লক্ষ্য করিয়া উক্ত অরণ্যাভিমুখে চলিয়া গেল। তখন আমি প্রয়োজনবশতঃ কূলে অবতরণ করিলাম, পরে প্রণালার তীর হইতে শামপানে আরোহণ করিবার সময় তাহা সরিয়া গেল। পশ্চাদ্ভাগে উক্ত নৌকার উপর আমার দক্ষিণ পদ স্থাপিত হইয়াছিল, আমি শরীরের ভার সামলাইতে পারি নাই। যোগীন্দ্রলাল ও আশুতোষ হস্ত ধারণ করিয়া আমাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াও সমর্থ হইলেন না। কেন না শামপানের এরূপ গঠন যে, তাহার ছৈয়ের ভিতর হইতে বাহির হইতে সরীসৃপ জীবের ন্যায় বুকে ভর দিয়া ধীরে২ গলুয়ের দিকে বাহির হইতে হয়, সুতরাং তাঁহাদের বাহির হইয়া আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, তখন আমি জলে পড়িয়া গেলাম। সেস্থানে জল অগাধ ছিল না, মৃত্তিকাতে চরণস্পর্শ হইল। মৃত্তিকাস্পর্শ না হইলেও আমি জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতাম না, কেন না আমি সন্তরণে পটু, সন্তরণ করিয়া তীরে উঠিতে পারিতাম। আশুতোষ কক্স বাজারে আসিয়া সাগরজলে স্নান করিয়াছিলেন, আমার তাহা হয় নাই। সমুদ্রের লোণা জলে স্নান করিব না, আমি এরূপ ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু সেই দিন সাগরশাখায় লবণাক্ত জলে বাধ্য হইয়া অসময়ে আমার স্নান হইল। আমার জলে পতন দেখিয়া আমার সঙ্গিদ্বয় অতিশয় ব্যস্ত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। আমি কূল আশ্রয় করিলে, তাঁহারা আমাকে ধরিয়া শামপানে উঠাইলেন, আর্দ্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কর্ণধার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কেহ লবণ প্রস্তুত করে না, জঙ্গল পোড়ান হইতেছে।" যোগীন্দ্রলালের হর্ষ বিষাদে পরিণত হইল।

কক্সবাজার শৈলশ্রেণী ও সাগরের সম্মিলন ক্ষেত্র। সেস্থানে পরস্পরসন্নিহিত শৈল ও সমুদ্র দর্শন করিয়া ভাবিয়াছিলাম, সমাধিনিমগ্ন প্রশান্ত গম্ভীরাকৃতি মহাযোগীর পবিত্র ভাব অচলবর প্রদর্শন করিতেছে, এবং সমুদ্র মহাগর্জ্জনে তরঙ্গবাহু উত্তোলন করিয়া সঙ্কীর্ত্তনমত্ততায় বিহ্বল ভক্তের ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছে, এস্থানে প্রগাঢ় যোগ ও প্রমত্ত ভক্তির মিলন। পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাহিতা চঞ্চলপ্রকৃতি স্বৈরচারিণী ভয়ঙ্করী পদ্মানদী নিয়ত নিজের উভয় কূল ধ্বংস করে, কূলস্থিত লোকের সমুদায় সম্পত্তি গ্রাস করে ও উৎসন্ন করিয়া থাকে; কিন্তু সাগর মহাগর্জ্জন ও আস্ফালন করুন না কেন, তাঁহার অতিশয় মহত্ব, তিনি বেলা লঙ্ঘন করেন না, কেহ কোন বস্তু অর্পণ করিলে তৎক্ষণাৎ তরঙ্গবাহু বিস্তার করিয়া তাহা ফিরাইয়া দেন। সাগর কখন কাহারও কিছু গ্রহণ

করেন না কুল ধ্বংস করেন না। তিনি নিজে রত্নাকর, তাঁহার আর সামান্য ধনে প্রয়োজন কি? তাঁহার বাহিরে অশেষ প্রতাপ, কিন্তু অন্তর গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বে পূর্ণ।

সংবাদ।

বিগত ২৮শে শ্রাবণ শুক্রবার বর্ত্তমান ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয় ৪র্থ বৎসরে উপনীত। সেই দিন অপরাহ্ণে বহু মহিলা স্কুলগৃহে সমবেত হইয়াছিলেন। ইয়ুরোপীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা মিস্ এডী নাম্নী একটী নবযুবতী উপস্থিত হইয়া ইয়ুরোপীয় ও এতদ্দেশীয় নারীদিগের আচার ব্যবহার বিষয়ে সমাগত মহিলাদিগের সহিত বঙ্গভাষায় কথোপকথন করিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গলা গীত গাহিয়াছিলেন। কুমারী এডীর বয়ঃক্রম ২০। ২১ বৎসর হইতে পারে। তিনি বিলাত হইতে আসিয়া কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর যাবৎ এদেশে বাস করিতেছেন; এই অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গলাভাষায় বিশুদ্ধরূপে কথোপকথন করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। কুমারী এডী শ্রীমতী এডা লীর সহকারিণীরূপে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার পিতা মাতা বিদ্যমান। ১৭।১৮ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় এদেশীয় অজ্ঞান দুঃখী ও নিরাশ্রয় লোকদিগের সেবা করিবার জন্য বহু সহস্র ক্রোশের পথ ও বহু সাগর মহাসাগর অতিক্রম করিয়া এদেশে আগমন করিয়াছেন। ইহা সামান্য ব্যাপার নয়।

উক্ত বিদ্যালয়ের জন্মদিনে স্বর্গগত বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ রায়কে পুনঃ পুনঃ স্মরণ হইয়াছিল। তিনি দূর দেশে রোগশয্যায় শয়ান থাকিয়া এই বিদ্যালয়ের জন্য কত ভাবিয়াছেন, কত স্থানে অর্থ ভিক্ষা করিয়াছেন, নিরুদ্যম নিশ্চেষ্ট স্বদেশীয় বন্ধুদিগের মনে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মাইবার জন্য— আচার্য্য কেশবচন্দ্রের কীর্ত্তিরক্ষার জন্য পত্রিকায় কত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি মহিলাবিদ্যালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ যে কেবল নানা ব্যক্তি হইতে দান সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা নয়, নিজের ব্যবহার্য্য মূল্যবান্ ঘড়ী পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য পাওয়ার কথা শুনিয়া ভয়ঙ্কর রোগযাতনার মধ্যেও আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "আঃ বাঁচ্লাম, এত দিনে স্কুলটির স্থায়িত্বের আশা হইল।" এক্ষণ কুচবিহারের মহারাণী ও ময়ূরভঞ্জের মহারাণী উক্ত মহিলাবিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষিকা হইয়াছেন। আজ নারীহিতৈষী মহাত্মা গিরীন্দ্রনাথ রায় দেহে বিদ্যমান থাকিলে না জানি কত উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

বিগত ২৫শে শ্রাবণ মঙ্গলবার স্ত্রীবিদ্যালয়-সমূহের তত্ত্বাবধারিকা শ্রীমতী লিলিয়ন ব্রক ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি ছাত্রীদিগকে পরীক্ষা করিয়া ও তাহাদের সেলাই কার্য্য দর্শন ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সম্মানার্থ একদিবস বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ হইয়াছিল।

মহিলার দশমবৎসরের আরম্ভ বর্ত্তমান মাস হইতে নূতন অক্ষরে তাহা প্রকাশিত করিব, আমাদের এরূপ সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু অক্ষরাদির যোজনা করিতে বিলম্ব হইয়া পড়িল, তজ্জন্য মহিলা এবার যথাসময়ে প্রকাশিত হইতে পারিল না; ৩। ৪ দিন বিলম্ব হইয়া গেল।

—:*:—

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

"আরও কতক গুলি কথা" *।

আজকে আমি কোন্ বিষয় বলিব, তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই, সেজন্য ওরকম একটা নাম দিয়াছিলাম। আমি ইহার পূর্ব্বেও যা বলিয়াছি গল্পচ্ছলে কতকগুলি কথা বলিয়াছি। রীতিমত কোন বিষয় ধরিয়া আলোচনা করি নাই, কেবল বিলাতে যা দেখা গিয়াছিল তাই নিয়ে কিছু বলা গিয়াছিল। আজকেও সেই রকম গল্পচ্ছলে কতকগুলি কথা বলিব। গোড়ায় একটা কথা আছে, আজ কাল ইউরোপের লোকেরা সব বিষয় পূর্ব্বাপর (Historically) বুঝিতে চেষ্টা করে, অর্থাৎ তাহার ইতিহাস, তার উৎপত্তি, উন্নতি, অবনতি সকল বিষয় জানিতে চায়, তারা প্রত্যেক বিষয়ই এরকম করে জানিতে, শিখিতে চায়। আপনারা হয়ত বিলাতের আজকালকার বড় বড় পণ্ডিতের নাম শুনিয়াছেন, ডারউইন, স্পেনসর ইত্যাদি এঁরা যেমন বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা মানুষ কি করে হল, যা দেখছি তা কি করে হল; বিশেষতঃ ইউরোপে বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা কি করে কোন্ অবস্থার ভিতর দিয়া আসিয়া এপ্রকার হইয়াছে, এসব ভাল করে দেখেন। কারন এখনকার অবস্থা আমরা ভাল করে বুঝিতে পারি না, যদি ইহার মধ্যেও গোড়ায় ভাল করে না দেখি। কোন বিষয় পূর্ব্বাপর না জানিলে আমরা ভাল করে বুঝিতে পারি না। যদি একখানা নূতন বই লিখি তবে সে বিষয়টার গোড়ায় কি যোগাড় ছিল তাহা যদি তাহাতে ভাল করে না বুঝাই, তবে লোকে তার আদর করে না। যদি কোন বিষয়ে শুধু বর্ত্তমান অবস্থা লিখে যাই, তবে লোকের কাছে তার তত মূল্য নাই, বিশেষতঃ আজকালকার পণ্ডিতেরা তাকে কিছুই মূল্য দেন না। মনুষ্য-সমাজ, ধর্ম্ম, পৃথিবী, আচার ব্যবহার রীতিনীতি কোন বিষয় জানতে হলে সেটাকে পণ্ডিতেরা তন্ন তন্ন করে জানেন। কেহ কোন বিষয় জানিতে চাহিলে, ব্রিটিশমিউজিয়মে গিয়া তাহা যথেষ্ট জানিতে পারেন। কারণ সেখানে প্রত্যেক বিষয়ের মান্ধাতার আমল থেকে বর্ত্তমান কালের পর্য্যন্ত সব রকম বই আছে; প্রত্যেক বিষয়ের কত ছবি, কত পুঁথি আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, ঐতিহাসিক ভাবে না জানলে কোন বিষয় ভাল করে জানা যায় না। আমি বিলাতে গিয়া যখন ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে দেখা করিতে যাই, তিনি আমাকে দেখে বলিলেন, তুমি কি করিতে এসেছ? আমি বলিলাম, ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতে আসিয়াছি। তিনি বলিলেন, ধর্ম্ম ইতিহাস ভাল করে পড়, তবে ভাল করে পড়িতে পারিবে। পূর্ব্বাপর ইতিহাস মিলাইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র পড়াই সব চেয়ে ভাল, যারা এরকম করে কোন বিষয় না শিখেন তাঁরা অন্যকে সে বিষয়ে কোন জ্ঞান দিতে পারেন না, এবং যাহা দেন তাহা নিজের মনের ভাবমাত্র। যেমন ফুলের বিষয়ে যদি কেহ লেখেন, তিনি হয়ত অনেক গাছ দেখেছেন, ফুলের টব দেখেছেন, এ রকম ফুল নিয়ে অনেক দিন ধরে তিনি নাড়া চাড়া করেছেন, তিনি যদি তাতে তাঁর একদিনেরও অভিজ্ঞতার পর কোন

---

* ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯০২ শ্রীযুক্ত প্রমোথলাল সেনের বক্তৃতার সার।

নূতন বিষয়ে মত তাতে লিখিতে না পারেন তবে তাঁর বইয়ের আদর হবে না। ম্যাক্সমুলার একখানা বই লিখেছেন how to wo.k অর্থাৎ কি করে পড়ব, তা লিখেছেন, অর্থাৎ সে বিষয়টা মোটামুটি ভিতরটা জানা চাই, সে বিষয় আগেকার লোকে কি বলিয়াছেন, সে বিষয় জানা দরকার। ম্যাক্সমুলার বলেন, যখন কোন বিষয় পড়িবে, লাইব্রেরীতে গিয়া সেই বিষয়ে যত বই আছে দেখে নিয়ে সে বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান হওয়া দরকার। যেমন ফুলের বিষয় যদি পড়ি সে বিষয়ে অনেক বই আছে, লোকে অনেক কাল থেকে এ সব বিষয়ে আলোচনা করিয়াছে, তাহা পড়িবে, তার পর নিজে গাছ পুতে দেখবে, বই পড়ে ও নিজে অনুসন্ধান করে সকল বিষয় জ্ঞান লাভ করবে। জার্ম্মান পণ্ডিত গেটে প্রতি-বৎসরই জেলী গাছ পুততেন, তার পর তার ফল হত, আর চড়াই পাখী খেয়ে যেত, তবুও তিনি প্রতিবৎসর ঐ গাছ করিতেন। তখন তাঁর এক জন বন্ধু বলিলেন, তুমি গাছ কর আর চড়াইয়ে তার ফল খেয়ে যায়, কেন মিছা মিছি গাছ কর। তিনি বলিলেন, আমি যত দিন বাচিব প্রতি বৎসর গাছ পুতিব, এবং তাদের জন্ম বৃদ্ধি হইতে আমি জ্ঞান লাভ করিব। তিনি এ রকম করে শুধু উদ্ভিদ্ বিদ্যা নয় আরও অনেক বিষয় শিখেন; দেহতত্ত্ব এ রকম করে শিখেছেন; তিনি সূর্য্যের রশ্মির বিষয়ও এই প্রকারে শিক্ষা করেন, এবং নিউটন যা বলে গিয়াছেন, তার পর নূতন তত্ত্ব বাহির করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রকাণ্ড কবি হলেও তিনি যা বলেন বেদবাক্য বলে সবাই গ্রহণ করেন। সব জিনিষেরই উৎপত্তি, মাঝখান ও শেষ কাল সব দেখা উচিত; তার পর বই লেখা উচিত। পূর্ব্বাপর অবস্থা জানিয়া আলোচনা করার কথাটা বললাম, এই জন্য যে ইংরেজদের বুঝিতে হইলে সে রকম আলোচনা করা দরকার। না হলে ওঁদের ভাল করে বুঝতে পারিব না। উদাহরণ, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা কি, ইংরেজদের অধীন কোন সময় হইতে, কি করে এ জাতি ইংরেজের অধীন হইল? আমাদের অবস্থা তখন কি রকম ছিল, যাতে ওঁদের হাতে পড়লাম? এ রকম করে ৫০ বৎসর আগের অবস্থা যদি দেখি তবে বুঝিতে পারি। সমস্ত ভিতরের ইতিহাস জানলে তবে বোঝা যায়। যদি বোম্বাই কাপড় পরবার ভিতর দেখি তার বিভরে একটা ইতিহাস আছে। আমাদের কাপড় পরা সাহেবদের সঙ্গে মিলে না, আমরা হয়ত সেজন্য তাদের ঘৃণা করি, কিন্তু যদি ভাল করে, ভিতরটা দেখি, তবে আর ঘৃণা হয় না, সাহেবেরা অনেকে হয়ত আমাদের ঘৃণা করে, কিন্তু যদি তারা ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করে তবে আর ঘৃণা থাকে না। এ রকম যদি আমরা পরস্পর পরস্পরকে বুঝিতে চেষ্টা করি তবে খুব ভাল হয়। সাহেবেরা প্রথমটা এসে আমাদের যে রকম দেখে, তাহা ভাল লাগে না। আমাদের আচার ব্যবহার পরিচ্ছদ তাদের ভাল লাগে না, জঙ্গুলে লোক ভাবে। কিন্তু যদি তারা আমাদের কাপড় পরা ইত্যাদির ভিতর ইতিহাস দেখে, তবে অতটা মন্দ ভাব থাকে না। আজকালকার পণ্ডিতেরা দেশের জ্ঞান, উপাসনা রীতি কেন হল ভাল করে দেখেন। Sacred Books

of the East বই খানার গ্রন্থকার ইউরোপের লোকদের নিকট এশিয়ার ধর্ম্মমত সকল বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। কারণ তাঁহারা ভাল করে না জেনেই একটা মত পাশ করে দেন। তিনি সেই বই খানাতে ধর্ম্ম বিষয় যিনি ভাল করে পড়েছেন, তাঁকে দিয়ে সেই ধর্ম্মের কথা ভাল করে লিখিয়ে নিয়েছেন। আমরা ইংরেজদের একটা রীতি দেখেই হয়ত নিয়ে ফেলি, কিন্তু তা ভাল নয়, তার ভিতরে ইতিহাস জেনে ভাল মন্দ বিচার করে তবে লইতে হইবে। তারাও যদি একরকম করে আচার ব্যবহার ভাল মন্দ বিচার করে, ভালটা নেয় তবে উপকার হয়। এপ্রকারে তারাও আমাদের কাছে শিখিবে, আমরাও তাদের কাছে শিখিব, কিন্তু যদি না জেনে শুনেই মত দি ও গ্রহণ করি তাতে অপকার হবে। আমাদের ইংরেজদের সঙ্গে এক সঙ্গে থাকিতেই হইবে, অথচ বোঝা বুঝিও হবে না, পরস্পরের গুণ নেওয়াও হবে না. এ বড় মন্দ কথা। অনেকেরই হয়ত দু এক জন ইংরেজের সঙ্গে কথা বলে ভাল লেগেছে, তাহাকে হয়ত ভাল বলিবে, কিন্তু তার সাধারণ ইংরেজসম্বন্ধে কোন মত নাই। যদি আমরা শিখিতে চাই, তবে বিলাতে যাওয়া উচিত, এ দেশে যে সকল সাহেব আমরা দেখি, তারা তত ভাল নয়, তাদের আমাদের তত ভাল লাগে না, কিন্তু বিলাতে তাদের নিজের দেশে গিয়া তাদের দেখা উচিত। সেখানে তারা কি রকম ভাবে থাকে যদি দেখি, তবে অনেক বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় ও অনেক ভ্রম চলে যায়। যদি ঐতিহাসিক ভাবে ওদের রীতি নীতি আলোচনা না করি তাতে অপকার হবে। তাদের দৈনিক জীবন, পরিচ্ছদ, খাওয়া দাওয়া সাধারণ আচার ব্যবহার যদি আলোচনা করি তবে তাদের অনেকটা বুঝিতে পারিব। তাদের প্রত্যেকটা রীতির ভিতর একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে। আমি একটা মজার গল্প করিব। বিলাতে একটি সাহেবের সঙ্গে কথা হয়, জিজ্ঞাসা করিল কখন উঠ, আমি বলিলাম ৬ টায় উঠি, সেত শুনে অবাক, তারা উঠে ৯ টার সময়, কারণ কি তাদের দেশে বড় শীত, তাতে সকালে উঠিতে পারে না, সব জায়গায় এরকম ৯টার সময় উঠে, তা নয়। কিন্তু যে সহরের লোকের সঙ্গে আমার কথা হোলো তারা তার কম উঠে না। অক্সফোর্ডে উঠেই তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে কাপড় পরে কলেজে যায়, একটা পর্য্যন্ত কলেজ হয়। আমরা হয়ত ৯ টার সময় উঠে শুনে তাদের অমনি কুড়ে ঠাওরে নি, সেটা ঠিক নয়, উহার ভিতরে প্রবেশ করে দেখা উচিত। কারণ ওদের অত সকালে উঠিলে অপকার হয়। কিন্তু আমরা যদি ওদের নকল করে ৯ টায় উঠি আমাদের অপকার হবে। ওরা রাত্রিতে অনেক ক্ষণ পরিশ্রম করে, বিশেষতঃ ছেলেরা ১টা পর্য্যন্ত ত কলেজ করে, তার পর বিকাল বেলাটা খুব খেলে, কিংবা গাড়ীতে চড়ে কি ঘোড়ায় চড়ে কি হেঁটে খুব বেড়ায়. কিন্তু তার পর সন্ধ্যাবেলা লেখা পড়া করে, প্রায় ১১।১২।১টায় শোয়। ওরা ঘুমটা আদত বোঝে। যাতে ঘুমটি ভাল হয় খুব হয়, তাই করে, ওরা বলে ঘুম ভাল না হইলে শরীর মন কিছুই ভাল থাকে না। এমার্সন বলেছেন. যেমন ওরা খাওয়া বোঝে তেমনি

ঘুমটাও খুব বোঝে, ভাল ঘুম হলে, লেখা পড়াও ভাল করা যায়। আর অত সকালে উঠবের পক্ষে ওদের আর একটি বাধা আছে। তখন কে আগুন জ্বালাবে, অত সকালে আগুন না জালিলে ঠাণ্ডা লেগে অন্য অসুখ হইতে পারে। আমাদের এরকম করে ভিতরটা জানা উচিত, তা না হলে না জেনে শুনে একটা মতামত প্রকাশ করা ভাল নয়। আবার না বুঝে একটা গ্রহণ করাও অন্যায়; কারণ সাহেবেরা যা করে তাই যে ভাল, তা নয়,। আমি যে ৯টায় উঠার কথা বলিলাম সব জায়গায় সে রকম নয়, সব লোকও সে রকম নয়। যারা একটু বড় লোক ও স্কুলের ছেলে ও যারা আফিসে কর্ম্ম করে এরা ৮॥টায় প্রায় উঠে। কিন্তু অন্য লোক কামার, সূতার ইত্যাদি ও যারা কলে কাজ করে, তাদের বেলায় উঠিলে চলে না। তাদের ৫॥টায় উঠিতে হয়। ম্যাঞ্চেষ্টারের লোকেরা খুব সকালে উঠে, কারণ সেখানে অনেক কল কারখানা আছে। যেখানে কল কারখানা আছে সেখানেই লোকেরা সকাল সকাল উঠে, কিন্তু একটা একটা সহরে অনেক বেলা পর্য্যন্ত এত নিস্তব্ধ থাকে যে, দেখলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। অক্সফোর্ডে লোকেরা বড় বেলায় উঠে। কিন্তু সেখানে কলের লোকেরা অত বেলায় উঠে না, তারা কাজের চাপে বা টাকার চাপে যাই বল, খুব সকালে উঠে বাহির হইয়া যায়। তাদের কি শীত কি গ্রীষ্ম কাল সব সময়েই ৫॥টায় উঠিতে হয়। ওদের দেশে বেলা হলেও রোদ উঠে না, সব সময়ই এক রকম মেঘলা মেঘলা থাকে। ওদের রীতি নীতি সব ওদেরই সাজে। যেমন কাপড় পরা বিষয়ে শীত প্রধান দেশ বলে অনেক গরম কাপড় পরতে হয়। ওদের সৌন্দর্য্য বোধও আছে। যেমন ওরা কলার পরে, কিন্তু ওদের এটা দরকারও হয়। ওরা খুব কাজের লোক সেই জন্য ওদের পোষাক খুব আঁটা সাঁটা পরতে হয়, আর আমাদের ধুতি চাদর পরে তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিতে হয়, তাই আমাদের সুবিধা। ওদেরটা ওদের সুবিধা, আমাদেরটা আমাদের সুবিধা, কিন্তু সবটারই প্রয়োজনীয়তা আছে। সব দেশেরই রীতির উন্নতি হইতে পারে; কিন্তু এদেশের রীতি ওদেশের রীতি দুইই স্বাভাবিক। তার পরের কথা হচ্ছে যে পরিচ্ছদ প্রত্যেকে নিজের মত করে নেয়। একবার সকালবেলা উঠতে গিয়া খুব মজা হইয়াছিল। ওদের দেশে গরমিকালে ৩টার সময় সূর্য্য উঠে, কিন্তু তবুও তারা প্রায় সেই ৮৷৯টার সময় উঠে। আমি ৫টার সময় বেড়াইতে বাহির হইতাম, রোজই ফটকের চাবি সঙ্গে লইয়া যাইতাম, বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ফটক খুলে বাড়ী আসিতাম, কিন্তু এক দিন লইয়া যাই নাই, তখন ফিরিয়া আসিয়া দেখি ফটক বন্ধ, তখন কি করি দিরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিলাম, অনেক ক্ষণ পরে Landlady এসে খুলে দিল, এবং দেখিলাম সে একটু বিরক্ত হয়েছে, কারণ ওদের ঘুম ভাঙ্গানটা ওরা একটুও পছন্দ করে না। যদিও তখন খুব বেলা হয়েছিল রৌদ্র উঠিয়াছিল।

পরিচ্ছদসম্বন্ধে প্রত্যেকে নিজের পোষাক নিজের মত করিয়া নেয়, ইহাতে চরিত্র

প্রকাশ পায়। ওদের খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির কতকগুলি নিয়ম আছে। খাবার সময় মুখ খুলতে নাই, মুখ বন্ধ করে খেতে হয়, যেন দাঁত না দেখা যায়। আমার মনে হতো এটা কেন? কিন্তু এখন আমার মনে হয় বোধ হয়, ওদের দাঁত খুব অপরিষ্কার ও খারাপ বলে দাঁত বাহির করিবার নিয়ম নাই। এদিকে ওদের এত স্বাধীনতা আছে, কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে সৎসাহসের অত্যন্ত অভাব। খাবার সময় কিছুতেই মুখ খুলিবে না, ইহার মধ্যেও একটা ইতিহাস লুকান আছে। ইহাদের কতকগুলি ব্যবহারে সরলতা না থেকে কপটতা আছে, দোষটা ঢাকিতে চায় ওদের ঐ স্বভাব থেকে, শেষকালে দেশের একটা রীতিই হইয়া গিয়াছে যে, মুখ বন্ধ করিয়া খাইতে হইবে। মেয়েদের মধ্যে ইহা অত্যন্ত প্রবল। পোষাক পরা, চুল, ইত্যাদি সকল সৌন্দর্য্য রীতিমত হওয়া চাই, ইহার একটু অভাব হ'লে ভয়ের কারণ হয়, অর্থাৎ পোষাক পরা ইত্যাদিতে মহানিয়ম আছে, তাহার এক চুল ব্যতিক্রম ক'রে ওরা লোকের সামনে যাইতে পারে না। যদি চুল না থাকে তবে পর চুলা পরে কোন রকম করে সেজে যাইতে হইবে, এটা ওদের ভয়ে ভয়ে করিতে হয়। ওরা একদিকে খুব সাহসী, কত জায়গায় যাচ্ছে, কত আশ্চর্য্য কাজ করছে, কিন্তু গৃহে সমাজে এ'সব বিষয়ে অত্যন্ত সৎসাহসের অভাব। এবিষয়ে আমার একটি গল্প মনে হচ্ছে। একটি বাঙ্গালী একজন বড় পাদরীর স্ত্রীর সঙ্গে খাচ্ছিলেন, বিশপের স্ত্রীটি কেবল দেখিতেছিলেন যে বাঙ্গালিটি কেমন করে খায়। তাকে হাত দিয়ে খেতে দেখে তিনি ভয়ানক অভদ্রতা ভাবিলেন, এবং বিরক্ত হইয়া কিছু বলিতে লাগিলেন কিন্তু বিশপ বিরক্ত হন নাই, বলিলেন, যাদের দেশে যা রীতি তার প্রয়োজনীয়তা ও অর্থ আছে। বিলাতের বড় বড় পণ্ডিতেরা এ দেশের কাহাকেও পাইলে ডেকে দেশের রীতি নীতি ও তাহার কারণ সব ভাল করে জিজ্ঞাসা করেন, এবং বলেন যে, তোমাদের মুখে তোমাদের কথা জানিলে তার মূল্য আছে। কারণ যে সব সাহেবেরা ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া গিয়াছে, তারাত ভিতরের সব কারণ জানে না, কেবল বাহিরে দেখিয়া গিয়া কতকগুলি বলে। ওদের দেশে ঐতিহাসিক ভাবে জানিবার ভাবটা খুব বেড়েছে, মতামত স্থির আমাদের দেশে এখনও ভাল করে হয়নি, তবে অল্প অল্প হচ্ছে। ইহা যত হয় ততই ভাল। আমরা প্রথমে সহজে বুঝিতে পারি না কিন্তু বুঝিবার ইচ্ছা থাকিলেই বুঝিতে পারি। যারা বিলাত যায় নি তারা হয়ত ভাবে যে বিলাতের লোকেরা খুব পড়ে। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন আমি আগে ভাবিতাম বিলাতের লোকেরা বুঝি সকলেই হার্বার্ট স্পেন্‌সর ইত্যাদি বড় বড় লোকের বই পড়ে, কিন্তু বিলাতে খুব কম লোকই এ সব বই পড়ে। যেমন এদেশের মেয়েরা হয়ত ভাবেন, বিলাতের মেয়েরা হয়ত সংসার দেখেন না, ছেলে পিলেও দেখেন না, তাই চাকরের হাতে সব ভার দেন, আর নিজেরা কেবল আমোদ বিলাসে মত্ত থাকেন, কিন্তু তা নয়, তাঁরা নিজেরা সব করেন। আমি যাঁদের সঙ্গে ছিলাম সেই বাড়ীর কর্ত্তা আমাকে জিজ্ঞাসা

করেছিলেন যে, আচ্ছা আপনাদের দেশের মেয়েরা পাঁচজন এক জায়গায় হলে, কি কথা হয়? আর আমি বলিলাম,কেবল নিন্দা হয়। তিনি অমনি বলে উঠলেন, আমাদের দেশেও তাই, তাঁরা ধর্ম্ম কথা অন্য কথা বলবে না, কেবল অন্যের নিন্দা করবে। এরকম আমাদের কতকগুলি দোষ গুণের সঙ্গে মিলে যায়। যদি শেখবার ভাব থাকে তবে আপনিই ভালটা নিতে পারি। আমাদের এখান থেকে তাঁদের কতকগুলি রীতি নীতি বড় ভয়ানক মনে হয়, কিন্তু বিলাতে গিয়া তাঁদের সব দেখলে আর ততটা ভয়ানক মনে হয় না। যেমন ওদের নাচটা আমাদের ভয়ানক খারাপ লাগে। মেয়ে পুরুষ মিলে এক সঙ্গে নাচ। তাঁদের দেশে মেয়ে পুরুষ, ধর্ম্মসংস্কারক সাধু লোক সকলেই নাচেন ও এটাকে খারাপ ভাবে দেখেন না। আমি এক জন বিশপকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনাদের নাচটা কেন হল। উনি বলিলেন উহাতে আমাদের দেশের অনেক উপকার হয়েছে। ওঁদের নাচের ইতিহাস যদি খুঁজি কেমন করে এটি প্রথম হল, যদি অনুসন্ধান করি, তবে অনেকটা ভাল বোধ হবে। এরকম করে যদি ভিতরে প্রবেশ না করি, তবে ভাব নিতে পারব না। একদিনের কথা বলি; সেদিন বরফ পড়েছে, আমি রাত ১১টায় বাড়ী ফিরে এলাম। সকলে বলিল তুমি বুঝি স্কেট করে এসেছ? আমি বলিলাম, না। ইহা তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না যে, বরফ পড়েছে, চাঁদের আলো হয়েছে, এমন রাত্রিতে স্কেট না করে হেঁটে এলাম। ওরা ওরকম রাত্রিতে দলে দলে মেয়ে পুরুষ সব স্কেট করিতে বাহির হয়, আমরা হলে ঘরের ভিতর এসে আগুন পোহাই। তেমনি ওরা রাস্তায় দৌড়ায়। এ কথাটা বিলাতে গেলেই বুঝিতে পারি। কারণ এত শীত যে আস্তে আস্তে চলা যায় না। এরকম ওদের দেশে গেলে ওদের রীতি নীতির মানে বোঝা যায়, কেন কিসে থেকে কি করে হল। সমস্ত দিন যা কাজ করে, সব তার ভিতরেই একটা ইতিহাস লুকান আছে। এ সব জানতে বিলাতে যাওয়া ভাল। এসব বিষয়ে সেখানে অনেক বই আছে, তাহা পড়ে ও দেখে শুনে অনেক জানা যায়, এবং তার পর তাতে ভালটা নেওয়া উচিত, তা না হলে যদি অমনি না জেনে শুনে ওদের আচার ব্যবহার গ্রহণ করি, ভাল নিতে পারিব না, ছাই নেব, উপকার না হয়ে অপকার হবে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

৬ষ্ঠ বৎসর।

শ্রীমতী বরদা সুন্দরী দেবী,	হায়দরাবাদ	২৲

৭ম বৎসর।

শ্রীমতী বরদা সুন্দরী দেবী,	হায়দরাবাদ	২৲
শ্রীযুক্ত অদ্বৈত চরণ বসু,	লাহিরিয়া সরাই	২৲
„ কুমার ভবেন্দ্রনারায়ণ,	পাবনা	২৲
„ গঙ্গাধর দাস,	বাঁকিপুর	২৲

৮ম বৎসর।

শ্রীমতী বরদা সুন্দরী দেবী,	হায়দরাবাদ	১॥০
„ মনোমহিনী বসু,	কলিকাতা	১৲
„ রাণী শ্যামাসুন্দরী ও উমাসুন্দরী,	ডুবলহাটী	২৲
„ হেমকুসুম মল্লিক,	বাঁকিপুর	২৲
শ্রীযুক্ত কুমার ভবেন্দ্রনারায়ণ,	পাবনা	২৲
„ কালিকাদাস দত্ত রায় বাহাদুর,	কুচবিহার	২৲
„ জগন্নাথ রাও,	বোধ	২৲
„ বিপিনমোহণ সেহানবিশ,	কলিকাতা	২৲
„ রাধানাথ ঘোষ,	টাঙ্গাইল	২৲

৯ম বৎসর।

শ্রীমতী কুমুদিনী দাস,	কলিকাতা	২৲
„ রাণী শ্যামাসুন্দরী ও উমাসুন্দরী,	ডুবলহাটী	২৲
„ বিনোদমনি গুপ্ত,	কুমিল্লা।	২৲
„ ক্ষীরোদাসুন্দরী বসু,	কলিকাতা	২৲
„ মৃণালিনী দেবী,	গোবিন্দপুর	২৲
„ হেমন্ত বালা দেবী,	ঘুসরী	২৲
„ সুশীলা সুন্দরী সেন,	কলিকাতা	২৲
„ সূর্য্যকুমারী কান্তগিরী,	„	২৲
„ সরস্বতী সেন,	„	২৲
„ সুবোধ বালা দেবী,	টাঙ্গু	২৲
„ কে, বি, দত্ত,	মেদিনীপুর	২৲
„ যাদুমণি রায়,	কলিকাতা	২৲
„ জ্ঞানদাসুন্দরী মজুমদার,	কটক	২৲
„ তরঙ্গিণী ঘোষ,	কলিকাতা	১৲
„ অন্নদায়িনী সরকার,	„	২৲
„ সৌদামিনী দেবী,	নয়াখালি	২৲

শ্রীযুক্ত রাজা সচ্চিদানন্দ দেব,	বামড়া	২৲
„ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,	কলিকাতা	২৲
„ যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,	„	২৲
„ মধুসূদন সেন,	„	২৲
„ চুণীলাল বসু,	„	২৲
„ ইন্দ্রচন্দ্র নাহাটী,	„	২৲
„ প্রসন্ন কুমার মজুমদার,	ঈশ্বরগঞ্জ	১॥০
„ নলিন বিহারী সরকার,	কলিকাতা	২৲
„ কালিকাদাস দত্ত রায় বাহাদুর,	কুচবিহার	২৲
„ বিহারীলাল ঘোষ,	শিবপুর	২৲
„ পরেশ নাথ চট্টোপাধ্যায়,	বাঁকিপুর	২৲
„ গঙ্গাধর দাস,	„	২৲
„ কালিদাস দাস,	খুরুপ	২৲
„ শরৎ কুমার লাহিড়ী,	কলিকাতা	২৲
„ অমৃতলাল সরকার,	„	২৲
„ দামোদর পাল,	বাঁকিপুর	২৲
„ কুমার ভবেন্দ্রনারায়ণ,	পাবনা	২৲
„ জানকীনাথ বসু,	কটক	২৲
„ হেমেন্দ্রলাল কাস্তগিরি,	কলিকাতা	২৲
„ বিপিন মোহন সেহানবিশ,	„	॥৶০
„ ভোলানাথ কুণ্ডু	খগোল	২৲
„ অবিনাশচন্দ্র রায়	ফতেপুর	২৲
	১০ম বৎসর।	
শ্রীমতী মৃণালীনী দেবী,	গোবিন্দপুর	২৲
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার মজুমদার,	ঈশ্বরগঞ্জ	॥০

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকা প্রতিমাসের সংক্রান্তি দিবসে প্রকাশিত হয়। ডাক মাসুলসহ ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

অনেকে মহিলা পত্রিকা বৎসরাধিক কাল গ্রহণ করিয়া মূল্য দান করেন না, বড় দুঃখের বিষয়। যাঁহারা মূল্যদানে অসমর্থ তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া দেন, অথবা আমাদিগকে তাহা পাঠাইতে নিষেধ লেখেন। তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া প্রাপ্য মূল্য না পাইলে অনেক স্থলে আমরা সেই মূল্যের জন্ত ভি, পিতে মহিলা পাঠাইয়া থাকি।

সূচী।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

ব্রহ্মচারীপ্রদত্ত লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

সুগন্ধে, স্নিগ্ধকারিতায়, যাবতীয় শিরঃপীড়া দূরীকরণে হাত পা জ্বালা ও চর্ম্মরোগ নিবারণ এবং মস্তিষ্কের শীতলতা সম্পাদনে ইহার মত সর্ব্বগুণসম্পন্ন তৈল আর নাই। নিসিক পরিশ্রমকারীদিগের পক্ষে নিত্য ব্যবহার্য্য। কেশ বৃদ্ধি করিতে লক্ষ্মীবিলাস একমাত্র তৈল। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ বোতল ২৲ মফঃস্বলে প্যাকিং ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

বাতরাজ তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে, বাত, গেঁটে বাত, কোমোরের বাত, বাতরোগ যত বড় উৎকট হউক না কেন এক শিশি ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবেক।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ১৲, ও ছোট শিশি ॥৹ আনা, মফঃস্বলে পাঠাইতে হইলে প্যাকিং ও ডাকমাশুল সতন্ত্র লাগিবে।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং
১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

রমণীবিলাস বাক্স।

এস্, সি ঘোষ এণ্ড ব্রা
প্রথমাবিষ্কারক
১৩০৭ সনে স্থাপিত
মূল্য ১॥৹।

ইহা বঙ্গললণার আদরের, সোহাগের ও বিলাসের চূড়ান্ত সামগ্রী। ইহা হিন্দু রমণীর কবরী-বন্ধনের একমাত্র প্রধান উপাদান। ইহা দেখিতে অবিকল ১খানি বিলাতী পুস্তকের ন্যায়। এই পুস্তকরূপ বাক্সের ডালা (পাতা) খুলিবামাত্র নিম্ন-লিখিত দ্রব্যসমূহ দেখিতে পাইবেন।

১। একখানি কবরী বাঁধিবার দর্পণ।
২। এক শিশি কঙ্কাবতী তৈল।
৩। এক শিশি সুবাসিত তরল আল্‌তা।
৪। এক শিশি হেমন্তমালতী পমেটম।
৫। এক কৌটা সতীশোভা সিন্দুর।
৬। এক কৌটা মোহিনী টীপ ও আটা।
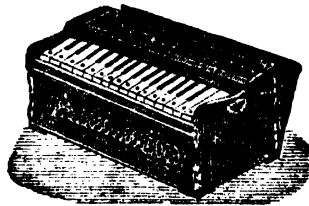
মেরিণাফ্লুট হারমোনিয়ম।

ইহার সুর মিষ্ট, মজবুৎ ও দেখিতে সুন্দর। ইহা বাজার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, মূল্যও সুবিধা, একবার ব্যবহার করিলে জানিতে পারিবেন।

৩ অক্‌টিভ ৩ষ্টপ ১সেট রিড ২৫৲ ও ৩০৲
ঐ ৪ষ্টপ ২সেট রিড ৪০৲ ও ৪৬৲

আমরা মফস্বল বাসিগণের সুবিধার জন্য কলিকাতা বাজার দরে সর্ব্বপ্রকার দ্রব্য অতি যত্নের সহিত পাঠাইয়া থাকি, এবং বিদেশীয় দোকানদারগণের জন্যও পাইকারিদরে মাল সরবরাহ করিয়া থাকি, প্রয়োজন হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র দিবেন।

জেনারেল অর্ডার্‌সাপ্লায়ার্স। ১২।১ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। কলিকাতা।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ ।"

১০ম ভাগ] ভাদ্র, ১৩১১ ; সেপ্টেম্বর ১৯০২। [য় সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;—"পরুষাণ্যপি চোক্তা যা দৃষ্টা ক্রুদ্ধেন চক্ষুষা। সুপ্রসন্নমুখী ভর্তুর্যা নারী সা পতিব্রতা ॥" অর্থাৎ কঠোর কথা কহিলে এবং ক্রূর দৃষ্টিতে দেখিলেও যিনি ভর্ত্তার প্রতি প্রসন্নমুখী, তিনিই পতিব্রতা।

পাতিব্রত্য নীতি সহজ নয়, যে নারী পতিপ্রাণা পতিব্রতা পতি ক্রুদ্ধ হইয়া কটূক্তি করিলেও তিনি তাঁহাকে কখনও কটূক্তি করেন না, পতির কোপকষায়িত দৃষ্টিতে তিনি ক্রুদ্ধ হন না ; বরং তদবস্থায় প্রীত প্রসন্ন মুখে তাঁহার সঙ্গে কথা কহেন ও তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। পতিব্রতা সর্ব্বতোভাবে পতিকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখিতে যত্নবতী থাকেন। দুর্ব্বৃত্ত পতির দুর্ব্ব্যবহারে পতিব্রতার আন্তরিক প্রীতির হ্রাস হয় না। পবিত্র প্রেমের প্রভাবে তিনি পতিকে বশীভূত করেন, তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতাসাধন করিয়া থাকেন।

ক্ষমা, প্রীতি, সহিষ্ণুতা দেবভাব। এই সকল দেবগুণ পতিব্রতার জীবনের অলঙ্কার। তিনি অন্তরের কোমলতা ও স্বর্গীয় উচ্চ প্রীতি ও নীতি দ্বারা চালিত হইয়া অসাধু অজিতেন্দ্রিয় পতিকে স্বর্গাভিমুখে আকর্ষণ করেন, তাঁহার হৃদয়ে পবিত্র প্রীতি ও সাধু ভাবের সঞ্চার করিয়া থাকেন। পতিব্রতা পতির পরিত্রাণের উপায় হন। সতী পতিব্রতা ভূলোকে দেবীরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। তিনি পতিব্রত্য ধর্ম্ম-পালন ও পতির আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করিয়া পরমসুখী হন ও পরম জননীর শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করেন।

দ্বিজপ্রমণী।

যাঁহার পুনর্জন্ম—দুই বার জন্ম হইয়াছে তাঁহাকে দ্বিজ বা দ্বিজাত্মা বলে। সকলেই জানেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী দ্বিজ শব্দে বাচ্য হইয়া থাকেন। তাঁহারা পুনর্জন্ম বা দুই বার জন্ম কি প্রকারে প্রাপ্ত হইলেন? ব্রাহ্মণবর্গ প্রথমে একবার শারীরিক জন্ম, তাহার পর আধ্যাত্মিক জন্ম লাভ করেন, ইহা ভাবিয়া লোকে তাঁহাদিগকে দ্বিজ বলিয়া থাকে। উপনীত ও দীক্ষিত হইলে পর তাঁহাদের আত্মার পুনর্জন্ম—ধর্ম্মজীবন হয়, এই বিশ্বাসে লোকে উপনীত ও উপবীতধারী ব্রাহ্মণদিগকে দ্বিজ বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু উপনয়ন ও দীক্ষার কেবল বাহ্যিক প্রণালীর অনুসরণ করিলে যে, কেহ ধর্ম্মজীবনপ্রাপ্ত দ্বিজ হয়, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। সাধারণ উপবীতধারী দীক্ষিত বিপ্রদিগের চরিত্র ও জীবন তাহার প্রমাণ। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন—দ্বিজত্বলাভ ভগবানের কৃপায় হইয়া থাকে। বাহ্যিক উপায়ে কোন মানুষ কাহাকে দ্বিজ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ না করিলে যে, কেহ দ্বিজ হইতে পারে না, এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও তপঃপ্রভাবে ও ভগবৎ-প্রসাদে ঋষিশ্রেষ্ঠ দ্বিজ হইয়াছিলেন। দ্বিজ হইলে পার্থিব জীবনের ক্ষয় ও ধর্ম্মজীবনের প্রভাববৃদ্ধি হয়। "চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।" কেহ চণ্ডাল-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি হরিভক্তিপরায়ণ হন, তিনি দ্বিজ-শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। যৌবনকালে ঈশা জর্ডন নদীর জলে অরণ্যচারী ঋষি যোহন কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া পবিত্রাত্মার অভ্যুদয়ে দেবজীবন দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মুসা দেব সায়না গিরিতে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া দ্বিজজীবনলাভে জগতে অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীমোহম্মদ হেরা পর্ব্বতে পবিত্রাত্মার প্রভাবে নূতন জীবন প্রাপ্ত হন, ধর্ম্ম বিশ্বাসের অলৌকিক বল প্রকাশ করেন; দস্যু রত্নাকর সাধুসঙ্গ ও ভগবানের নামের প্রভাবে মহামুনি বাল্মীকি হইয়াছিলেন। মার্ভ প্রদেশের দস্যুদলপতি ফজিল আইয়াজ কোরাণের একটি প্রবচনশ্রবণে বিষম অনুতপ্ত হন, এবং পবিত্র ঋষি-জীবন লাভ করেন। উন্মার্গচারী কলুষিতচরিত্র অগষ্টাইন ভগবৎ-কৃপায় জগজ্জন শ্রদ্ধেয় সাধু-শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ না করিয়া পুণ্যপ্রভাবে যে দ্বিজ হইয়াছিলেন এ বিষয়ে কে সন্দেহ করিতে পারে? নদিয়ার চন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে পবিত্র হরিনামের প্রভাবে জগৎ-পূজ্য দ্বিজ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার মহা-পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব ছিল, দ্বিজ হওয়ার পর তিনি তৃণাদপি সুদীন হন। কিন্তু হরু ঠাকুর ও শ্যামু ঠাকুরকে আমরা দ্বিজত্বের সম্মান দান করিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহি। ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব নির্ব্বাণধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাজকুমার শাক্যসিংহ কঠোর তপস্যার পর সিদ্ধিলাভ করিয়া দ্বিজ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজেও অনেকে দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। বংশ-বিশেষ বা ধর্ম্ম-দীক্ষার প্রণালীবিশেষ দ্বিজাত্মা হওয়ার কারণ নহে। ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন কেহ দ্বিজ হইতে

পারে না। ম্লেচ্ছ বংশেও দ্বিজজীবনের অভ্যুদয় হয়, সেই জীবন সেই বংশকে পবিত্র করে। প্রত্যাদিষ্ট মহাজনমাত্রই দ্বিজাত্মা।

পুরুষেই যে কেবল দ্বিজ হইয়া থাকেন, রমণী হন না, ইহা কে বলিতে পারে? স্ত্রী পুরুষ সকলের উপর ভগবানের কৃপা-বারি তুল্যভাবে বর্ষিত হয়। দ্বিজ-রমণীর প্রসঙ্গ করাই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। তাপসমালা পুস্তকে তপস্বিনী রাবেয়ার জীবন-বৃত্তান্ত পাঠিকাদিগের অনেকে পড়িয়া থাকিবেন, তিনি বসোরা প্রদেশে একজন ধনবান্ লোকের সামান্যা দাসী ছিলেন। পরে তাঁহার অলৌকিক দ্বিজ-জীবন লাভ হয়। তিনি নিজজীবনপ্রভাবে ধনী মানী জ্ঞানী প্রভৃতি সমুদায় লোকের নিতান্ত ভক্তি শ্রদ্ধার আস্পদ হন। দেবী রাবেয়া ভগবানের সৌন্দর্য্যসাগরে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। বসন্তকালে একটী নারী ডাকিয়া বলিলেন, "দেবি, বাহিরে আসিয়া দেখুন প্রকৃতির কি শোভা, সৃষ্টির কি সৌন্দর্য্য হইয়াছে!" রাবেয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া অন্তশ্চক্ষু যোগে প্রকৃতি-পতি স্রষ্টার শোভা দর্শন কর।" রাবেয়াকে দর্শন ও তাঁহার মুখে স্বর্গীয় তত্ত্ব শ্রবণ করিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক ব্যাকুল হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইত। ক্যাথলিক খ্রীষ্ট সম্প দায়ের সাধ্বী কুমারী কেথরাইণ নব যৌবনে কি অলৌকিক দ্বিজ-জীবন লাভ করিয়াছিলেন। কত দুঃসহ উৎপীড়ন ও পরীক্ষার ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন স্বর্গাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। কেথারাইণ পরসেবা-ব্রতে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, নিজে দুঃখী হইয়া পরদুঃখমোচনে তাঁহার অসীম আনন্দ ছিল। অসংযতেন্দ্রিয় কুচরিত্র অগষ্টাইন জননী মণিকা দেবীর পবিত্র জীবনের প্রভাবে খ্রীষ্টীয় সমাজে পরম সাধু হইয়াছিলেন। দেবী মণিকার স্বামী অত্যন্ত পাপাচারী নিষ্ঠুর ছিল। স্বামী কর্ত্তৃক তিনি পুনঃ পুনঃ নিগৃহীত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া ধৈর্য্য ক্ষমার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; পরে নিজের পুণ্য চরিত্রের প্রভাবে স্বামীর জীবন পরিবর্ত্তিত করিয়া পরম সুখী হইয়াছিলেন। পতি পুত্রের জীবনের পরিবর্ত্তন-সাধন দ্বিজরমণী মণিকা দেবীর জগতে অলৌকিক কীর্ত্তি।

এক্ষণ বিদেশস্থ ও ভিন্নজাতীয় দ্বিজ-রমণীর কাহিনী পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশস্থ হিন্দু সমাজের একটী এবং ব্রাহ্মসমাজের একটী দ্বিজরমণীর প্রসঙ্গ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে। হিন্দু দ্বিজ রমণী বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রভাবে পতির জীবনে ধর্ম্মভাব প্রবল হয়। তিনি হরিভক্তিপরায়ণা নিতান্ত ভক্তিমতী ছিলেন, জ্ঞাতি আত্মীয়বর্গের মৃত্যুতে রীতিপূর্ব্বক অশৌচ গ্রহণ করিতেন না। তিনি বলিতেন কাহারও জন্ম বা মৃত্যুতে অশৌচ আবার কি? এক হরিনামে সকল অশৌচের বিলোপ হয়, যে দিন হরিনাম মুখে উচ্চারিত হয় না, সেই দিনই জীবনের প্রকৃত অশৌচ; সেই দিন দেহ মন

অশুচি থাকে; হরিনামে সকল অশুচি কাটিয়া যায়। একদা উক্ত দেবী সন্তানাদি সহ তরঙ্গায়িত ভীষণ নদীবক্ষে ক্ষুদ্র নৌকায় আছেন, এমন সময় বায়ুর প্রবল বেগ হইল, ঝড় আরম্ভ হইল। সন্তান ভয়াকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল, জননী ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া স্থির শান্ত ভাবে রহিলেন, কোন ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন না, ভয়াকুল বালককে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "হরি-স্মৃতিঃ সর্ব্ববিপদ্‌বিনাশিনী।" অর্থাৎ হরিকে স্মরণ করিলে সকল বিপদ্ বিনষ্ট হয়। তিনি স্থিরভাবে নিজে হরিনাম করিতে-ছিলেন, পুত্রকেও সেরূপ করিতে বলিয়া-ছিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় অচিরে বায়ু শান্ত-ভাব ধারণ করিল, কোন বিপদ্ ঘটিল না। অন্য স্ত্রীলোক হইলে ঝড় ও নদীর তরঙ্গ দেখিয়া ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ করিয়া নৌকা-রূঢ় সকলকে অস্থির করিয়া তুলিত। অভ্যাগত ব্রাহ্মণ দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, "আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র কিরূপ?" দ্বিজ-নারী বলিয়াছিলেন, "যেমন কোন নাট-মন্দিরে অনেক ঝাড় লণ্ঠন আছে, কিন্তু আলো নাই, আলোর অভাবে সেই ঝাড় লণ্ঠনের শোভা হইতেছে না, সেইরূপ আমার বড় পুত্রের বুদ্ধি বিনয় সৌজন্যাদি অনেক সদ্গুণ আছে, কিন্তু অন্তরে হরিভক্তিরূপ আলো নাই, সেই জ্যোতির অভাবে সেই সকল সদ্গুণ প্রস্ফুটিত হইতেছে না।" সেই বন্দনীয়া মহিলার কনিষ্ঠ পুত্র বিষয়-ত্যাগী হইয়া প্রচারব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক আমাদের মধ্যে স্থিতি করিতেছেন, ইহার মুখে সুমাতার ভগবদ্‌গতপ্রাণ ভক্তিপ্রধান জীবন বলিতে হইবে। সেই হরিভক্তি-পরায়ণা মহিলা প্রত্যহ ভক্তিনিষ্ঠাসহকারে হরিনাম শ্রবণ মনন এবং ভাগবতগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। পরসেবা আতিথ্য সৎকার তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। সম্ভব হইলে নিজে রন্ধন ও পরিবেশন করিয়া অতিথিদিগকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন, অতিথিসেবার সমুদায় কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতেন। পতি-বিয়ো-গের কিয়ৎকাল পরে তিনি পুত্র কন্যাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহ সম্পত্তি সমুদায় ছাড়িয়া বৃন্দাবনধামে গিয়া বাস করেন। অল্প বয়স্ক বালক বালিকার মায়া তাঁহাকে গৃহে আবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। তিনি বৃন্দাবন তীর্থে দীনভাবে নাম-সাধন পরসেবা ও সাধু সেবায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তিনি কায়স্থ কুলের কন্যা হইয়াও কি দ্বিজ রমণী নহেন? তাঁহা দ্বারা কি সেই কুল উজ্জ্বল ও পবিত্র হয় নাই? আমরা ব্রাহ্মণ কুলের হিংসাদ্বেষ পরায়ণা কলহপ্রিয়া ভোগবিলাসিনী রমণীদিগকে দ্বিজ রমণী বলিতে প্রস্তুত নহি। টাঙ্গাইল অঞ্চলের স্বর্গগতা বিদ্যুল্লতা দেবী কায়স্থ ঘোষ পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাঁহার পতি ওকালতী করেন। বিদ্যুল্লতা যে দিন স্বামীকে অর্থো-পার্জ্জনে অধিকতর ব্যস্ত হইয়া উপাসনার অংশ খর্ব্ব করিতে দেখিয়াছেন, শুনিয়াছি সেই দিন তিনি দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন, ভোজন করেন নাই, পল্যঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া ভূতলশায়ী হইয়াছেন। ঘোষ মহাশয়ের বৃহৎ পরিবার পুত্র কন্যা আত্মীয় কুটুম্বে পূর্ণ,

গৃহিণী বিদ্যালতা স্বহস্তে রন্ধন পরিবেশন করিয়া সকলকে এমন কি দাস দাসীকে পর্য্যন্ত ভোজন করাইয়া নিজে অপরাহ্নে ভোজন করিতেন। বাড়ীর কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত তাঁহার দয়ায় বঞ্চিত হইত না। দুঃখীর দুঃখে তিনি নিরন্তর দুঃখিত থাকিতেন, ক্ষুধার্ত্ত দীন দরিদ্রকে অন্নদানে তাঁহার হস্ত সর্ব্বদা প্রসারিত থাকিত। বল ইহাকে দ্বিজরমণী না বলিয়া কাহাকে বলিব? পুণ্যভূমি ভারতের গৌরব প্রাচীন আর্য্যনারী বরণীয়া দেবী গার্গী মৈত্রেয়ী সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি দ্বিজরমণীদিগের শিরোভূষণ ছিলেন।

দাদামহাশয় ও নাতনী।

সায়ংকালীন কথোপকথনের জন্য সরলা যখন তাহার দাদামহাশয়ের নিকট আসিয়াছিল, তখন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সরলা "Cleanliness is next to godliness" পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পবিত্রতার পরেই" এই প্রবাদ বাক্যটি তুমি কি কিছু বুঝ? সরলা উত্তর করিল, এই কথাটী আমি পড়েছি, কিন্তু এর অর্থ ভাল করে বুঝিতে পারি নাই। দাদামহাশয় বলিলেন, আচ্ছা আমি তোমায় বুঝাইয়া দিতেছি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছেলে মেয়েরা বড় হইলে পবিত্র বা ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পথে চলে সেই ঈশ্বরপরায়ণ। সরলা বলিল, ঈশ্বরের পথ কি তা আমি কেমন করিয়া জানিতে পারিব? উত্তরে, দাদামহাশয় বলিলেন যে, এ বিষয়ে তোমার যে টুকু জ্ঞান আছে সেই অনুসারে চলিতে চেষ্টা কর, তাহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি তো জান যে, ঈশ্বর তোমাকে ভাল বাসেন, তিনি তোমার সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দিয়া থাকেন, তুমি যাহাতে সুখে নিরাপদে থাকিতে পার তাহার জন্য কতই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ সংসারের কথা তোমরা কিছুই বুঝ না। কি পথ কি অপথ কোন্ সঙ্গী ভাল কোন্ সঙ্গী মন্দ, কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়; এবং অন্যান্য নানা বিষয় আছে যাহার সম্বন্ধে তুমি কিছুই জান না, এই জন্য তিনি করুণা করিয়া তোমাকে প্রেমিক ও কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা মাতা এবং গুরুজন দিয়াছেন। তুমি তাঁহাদের উপদেশ ও অনুজ্ঞা পালন করে চলিলে তোমার ঈশ্বরের পথে চলা হইবে, এবং যথাসময়ে তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কি তা তোমায় একটু বলি।

শরীরের চাম্‌ড়া (ত্বক্) উত্তমরূপ পরিষ্কার রাখিবে। পরিষ্কার জল ও সাবান দিয়া শরীরের সমস্ত অংশ উত্তমরূপে ধুইবে; তার পর তোয়ালে কিংবা শুষ্ক গামছা দিয়া মুছিবে; নখ উত্তমরূপে কাটিবে। নখের ময়লা দ্বারা কত যে পীড়া সংক্রামিত হইতে পারে তা কে জানে? এ জন্য পানীয় বা অন্য কোন তরল দ্রব্যে নখ বুড়ান বড় মন্দ। আমাদের ঘর্ম্মনির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার কলুষিত পদার্থ ত্বকের উপর আইসে, তার কতক অংশ গা চুলকাইবার সময় নখে লেগে যায়, নখ বড় থাকিলে তার মূলে থেকে যায়, এজন্য

বড় নখ রাখা ভাল নয়, এবং খাইবার সময় বেশ ভাল করে হাত ধোয়া উচিত। ইংরাজদের কাঁটা চামচে দ্বারা আহার করিবার প্রথাটা মন্দ নয়, কিন্তু আমাদের তো সেরূপ করা সুবিধা নয়। চুল পরিষ্কার রাখিবে, এবং দাঁত ভাল করে মাজিবে। ফটকিরি এবং কর্পূরাদি বস্তু মিশাইয়া বেশ মাজন হয়। টুসব্রশ ও দাঁতন ব্যবহারও ভাল। দাঁত অপরিষ্কার থাকিলে নানাপ্রকার দন্তরোগ জন্মে, তাহাতে দাঁত শীঘ্র শীঘ্র পড়িয়া যায়, এবং স্বাস্থ্যের বিশেষ ব্যাঘাত করে। পানীয় জল পরিষ্কার হওয়া উচিত। যেখানে পরিষ্কার জল সহজে পাওয়া না যায় সেখানে ফিল্টার করিয়া শেষে ফুটাইয়া লওয়া উচিত। সিদ্ধ হইলে জলের নানাপ্রকার দোষ কেটে যায়। দুগ্ধও ভাল করে জ্বাল দেওয়া উচিত, দুগ্ধেও অনেক প্রকার রোগ-বীজাণু থাকিতে পারে।

কেবল শরীর ধৌত এবং পরিষ্কৃত পানীয় ও ভোজ্য দ্রব্য ব্যবহার করিলেই হইবে না। কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখিতে হইবে। অপরিষ্কার কাপড় পরিলে স্নানের উপকারিতা চলিয়া যায়। যে কাপড়গুলি ত্বকের উপরেই ব্যবহৃত হয়, সে গুলি নিত্য ঠাণ্ডা বা উষ্ণ জলে কাচিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া উচিত। অন্যান্য কাপড় রৌদ্রে দিয়া (Brush) করিয়া লওয়া উচিত। রৌদ্রের দ্বারা নানাপ্রকার সংক্রামক রোগের বীজাণু নষ্ট হয়, এখনকার ডাক্তারদের এই মত।

বাসভবন বিশেষতঃ নর্দ্দমাগুলি বেশ পরিষ্কার থাকিবে, রান্নাঘরের ঝুল সর্ব্বদা ঝাড়া হইবে, এবং ঘরটি উত্তমরূপে ধুইতে এবং পরিষ্কার রাখিতে হইবে। রান্না ঘরের দোষে খাদ্য দ্রব্য বিষাক্ত হইয়া যাইতে পারে। বাসভবনে আলোক ও বাতাস গতায়াতের বিলক্ষণ ব্যবস্থা থাকিবে, জল, বাতাস, রৌদ্র, আলোক এই চারিটিই শোধকবস্তু, ইহাদের দ্বারাই আমাদের জীবন রক্ষিত হয়, ইহাদের কোনটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। ইহাদের যথাপরিমাণে যথাবিধি ব্যবহার করিতে হইবে।

জল দ্বারা যেমন বাড়ীর পয়ঃপ্রণালী গুলি পরিষ্কার রাখিতে হয়, সেইরূপ আমাদের শরীরের পয়ঃপ্রণালী গুলি পরিষ্কার রাখিতে হয়, শরীরে সহস্র সহস্র নর্দ্দমা আছে, তাহার প্রত্যেক লোমকূপ এক একটি নর্দ্দমা। ত্বকের নীচে এবং শরীরের মধ্যে যে সমস্ত ময়লা জন্মে তাহা ধৌত করিতে হয়। অঙ্গ-চালনা এবং বায়ু-সেবন দ্বারা এরূপ ধৌত কার্য্য হইয়া থাকে। ঈশ্বরের এমনি কৌশল যে, অঙ্গ-চালনা দ্বারা শরীর হইতে একপ্রকার রস বাহির হয়, এই রসই শরীরের মধ্য হইতে ক্লেদ লইয়া ঘর্ম্ম ও মলমূত্ররূপে বাহির হইয়া যায়, নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া থাকে। অঙ্গ-চালনার সময় নিঃশ্বাস ঘন ঘন উঠে, পড়ে, তাহাতে স্বাস্থ্যের উপকার হয়। অঙ্গচালনা দ্বারা শারীরিক সকল প্রকার যন্ত্রের কার্য্য ভালরূপে হইয়া থাকে। এই জন্য আমি তোমাকে প্রতিদিন মাঠে বেড়াইতে লইয়া যাই। মুক্ত বায়ু-সেবন

করিয়া খোলা স্থানে বেড়ানের অনেক গুণ; লোকে তা জানে, কিন্তু কাজে করে না, এবং মেয়েদের বেড়াতে দেয় না; কিন্তু এরূপ করা বড় গর্হিত এবং ঈশ্বরের আদেশ-লঙ্ঘন। মেয়েরা সুস্থ থাকিলে তবেতো জনসমাজ সুস্থ থাকিবে। তাঁহারাই মানব-মণ্ডলীর পবিত্র প্রস্রবণ। শরীর মন ও প্রাণকে সুস্থ রাখিবার বিশেষ চেষ্টা করা মনুষ্যদের কর্ত্তব্য, কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের পুরুষেরা বড় উদাসীন, সেই জন্য এত প্রকার কষ্ট পাইতেছেন, তবুও চৈতন্য নাই। ঈশ্বর-কৃপায় যথাসময়ে তাঁহারা চৈতন্য লাভ করিবেন, তিনি ভারতরমণীদের দুঃখ শীঘ্র ঘুচাইবেন, এ বিষয়ের লক্ষণ চারি দিকে দেখা যাইতেছে।

সরলা—দাদামহাশয়, এই একটি প্রবাদ বাক্যের মধ্যে এত কথা!

দাদামহাশয়—হাঁ দিদি, অরো কত কথা আছে তার কিছুই বলা হইল না। বলিলেও তুমি বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু আর গোটা কত কথা বলি।

কেবল নিজ নিজ গৃহ পরিষ্কার রাখিলেই হইবে না। গ্রাম নগর এবং উপনগরও পরিষ্কার রাখিতে হইবে। বড় বড় নগর এবং উপনগর পরিষ্কার রাখা বড় সহজ ব্যাপার নয়। এক জন বা দুইজন গৃহস্থের চেষ্টায় এ কার্য্য হইতে পারে না। সমস্ত নগরবাসীর সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। এ জন্য প্রতি নগর বা উপনগরে তাঁহাদের প্রতিনিধি সভা আছে, এই সভার নাম Municipality বা নগররক্ষিণী সভা।

সরলা—দাদামহাশয়, Municipality বিষয়টী ভাল করে বুঝিয়ে দিন।

দাদামহাশয়—Municipality তে কতগুলি সভ্য থাকেন, তাঁহাদের নাম Municipal commissioners. এই সভ্যগণ নগরবাসীর স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। তাঁহারা প্রত্যেক নগরবাসীর নিকট হইতে কিছু কিছু করিয়া টাকা সংগ্রহ করেন। এই টাকার নাম Tax। এই সংগৃহীত অর্থ দ্বারা নগর পরিষ্কার রাখা হয়, এবং যাহাতে অর্থদাতা Tax-payers গণ সুখ স্বাস্থ্য সম্ভোগ করিতে পারেন সে জন্য তাঁহারা বিশেষ যত্নবান্ থাকেন। তাঁহাদিগকে লোকে city father নগরের পিতৃস্থানীয় বলিয়া থাকে। বাস্তবিক তাঁহারা এইরূপ সম্মানের উপযুক্ত। গৃহস্থের গৃহে পিতা যেমন অভিভাবকের কাজ করিয়া থাকেন, ইঁহারাও নগর-সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে সেইরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। নগরের সহৃদয় বিচক্ষণ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই প্রায় কমিশনরপদে নিযুক্ত হন। কখন কখনও দুএকটা ভেলও চলে যায়। কমিশনরগণ কোন প্রকার বেতন গ্রহণ করেন না, কিন্তু নিঃস্বার্থ ভাবে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহাদের নিকট আমাদের সকলের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, এবং যাহাতে তাঁহারা নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা ব্রত পালন করিতে পারেন সে জন্য আমাদের ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা সমুচিত। মানুষমাত্রেই অপূর্ণ, তাহার দোষ ক্রটির অভাব কি? ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ব্যতীত কে আপনার কর্ত্তব্যপালন করিতে পারে। Municipality যথেষ্ট

বেতন দিয়া একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন, ইহার নাম Halth officer স্বাস্থ্যরক্ষক। ইনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং sanitation বিজ্ঞানবিদ্ হইয়া থাকেন।

সরলা ;—sanitation কাহাকে বলে ?

দাদা মহাশয়—যে বিজ্ঞান দ্বারা সমস্ত দেশের স্বাস্থ্য-রক্ষার বিধি ব্যবস্থা শিখিতে পারা যায়, তাহাকে sanitation বা দেশীয় স্বাস্থ্য-রক্ষাবিজ্ঞান বলিয়া থাকে। এই বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে আনুষঙ্গিক অনেক প্রকার বিজ্ঞান ও জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। এজন্য সুশিক্ষিত উচ্চ পদস্থ ডাক্তার ব্যতীত অন্য কেহ sanitation বিজ্ঞানে পারদর্শিতা-লাভ করিতে পারেন না। Health officerরের কতকগুলি সহকারী কর্ম্মচারী থাকেন। সম্ভ্রান্ত Health-Inspecter (স্বাস্থ্যপরিদর্শক) হইতে সামান্য মেথর ধাঙ্গড় Healthofficeরের সহকারী। রাস্তা ঝাঁট দেওয়া, নর্দ্দমা পাইখানা পরিষ্কার করা মেথর ও ধাঙ্গড়ের কাজ। এই কাজ যাহাতে তাহারা সুচারুরূপে করে তাহার পরিদর্শনের জন্য নানা প্রকার ব্যবস্থা আছে। পাইখানা ও নর্দ্দমা পরিষ্কার থাকার উপরে নগরের স্বাস্থ্য এবং নগরবাসীদের জীবন কিয়ৎ পরিমাণে নির্ভর করে। দেখ এত বড় কার্য্য যে মেথর ধাঙ্গড়ের উপর ন্যস্ত আছে, তাহাদিগকে লোকে ঘৃণা করে, কিন্তু তাহারা আমাদের ঘৃণার পাত্র নয় ধন্যবাদের পাত্র।

সরল ও সরলা উভয়ে বলে উঠলো, মেথর ও ধাঙ্গড় যে উপকারী তাহা আগে আমরা জানিতাম না। সে জন্য তাহাদিগকে কত ঘৃণা করিয়াছি। এখন আমাদের বড় কষ্ট হচ্ছে। দাদা মহাশয় বলিলেন, দিদিমণি ও দাদা ভাই, তোমরা যে তোমাদের দোষ জানিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইলে এজন্য আমি বড় আনন্দিত হইলাম। যাহারা কৃত দোষের জন্য অনুতপ্ত হয় তাহাদিগকে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করেন, এবং দোষ হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন।

Municipality একজন Health-officer নিযুক্ত করেই নিশ্চিন্ত হন নাই। তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বেতনে একজন Engineer নিযুক্ত করিতে হয়। পথ ঘাট নর্দ্দমা ইত্যাদি পরিষ্কার রাখিবার জন্য Health officer যে সমস্ত ব্যবস্থা করেন তাহার অধিকাংশই Engineerকে কার্য্যে পরিণত করিতে হয়। Engineerরের অনেক সহকারী কর্ম্মচারী থাকেন। সরলা, তুমি এখন কি কতকটা বুঝিতে পারিলে যে, মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা কত উপকার হয় ? এখন বল দেখি তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হও কি না ? সরলা—দাদা মহাশয়, আমি আগে মিউনিসিপালিটির বিষয় কিছুই জানিতাম না, এখন জেনে তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা খুব হচ্ছে। দাদা মহাশয় বলিলেন, বেশ বলেছ, কিন্তু আমাদের দেশে অনেক লোক আছেন, যাঁহারা কি গভর্ণমেণ্ট কি মিউনিসিপ্যালিটি কিংবা অন্য কোন সেবকমণ্ডলীর দোষ ত্রুটি খুঁত ধরে বেড়ান, এবং সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখেন। তাঁহাদের মুখে কখনও সুখ্যাতির কথা শোনা যায় না। একপ কথা

বড় অন্যায়। তাঁহাদের ত্রুটি আছেইতো, বন্ধুভাবে সম্ভ্রমে সে ত্রুটি দেখাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিকট হইতে যে সকল উপকার আমরা পাইয়া থাকি, সে জন্য আমরা সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ থাকিব, এবং সুযোগ পাইলেই তাঁহাদের প্রশংসা করিব।

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

নোওয়াখালি।

চট্টগ্রাম হইতে কাশীবাবু এবং রাজেশ্বর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগীন্দ্র বাবু আমাদের সঙ্গে নোওয়াখালি যাত্রা করিয়াছিলেন। পরদিন শনিবার হইতে দুই দিন নওয়াখালিতে চট্টগ্রাম ডিভিজনের ইয়ুনিয়ন—ক্ষুদ্র কংগ্রেস। তদুপলক্ষে সেই ট্রেণে চট্টগ্রামের অনেক উকিল মোক্তার যাত্রা করিলেন। চট্টগ্রামের প্রধান উকিল যাত্রামোহন বাবু সেই ইয়ুনিয়ন সভার জন্য সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমরা রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় লাকসাম জংশনে পঁহুছিয়া ষ্টেশনে অবশিষ্ট সমুদায় রাত্রি যাপন করি। প্রত্যূষে নোওয়াখালি যাইবার ট্রেণে আরোহণ করা যায়। কুমিল্লা হইতে আগত ইয়ুনিয়ন সভার ডেলিগেট অনেক গুলি উকিল মোক্তার এই ট্রেণে যাত্রা করিয়াছিলেন। আমরা নোওয়াখালিতে পঁহুছিয়া দেখি ষ্টেশনে মহাভিড়। স্কুলের ছাত্রগণ ভলণ্টিয়ার সাজিয়া এবং অন্য অনেক ভদ্রলোক ইয়ুনিয়নের ডেলিগেটদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিবার জন্য শকটাদি সহ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

নোওয়াখালি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীমান্ বীরেন্দ্র চন্দ্র সেন (B. C. Sen) আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, বিশেষতঃ তাঁহার পত্নী রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর K. G. Gupta এর জ্যেষ্ঠা কন্যা, তিনি আমার প্রিয় নাতনী। আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের আবাসে—বড়লোকের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আতিথ্যগ্রহণ করিব না, পূর্ব্ব হইতেই আমার এরূপ সঙ্কল্প ছিল। তজ্জন্য আমি যে নোওয়াখালি যাইতেছি, এ সংবাদ তাঁহাকে কিছুই জ্ঞাপন করি নাই; তত্রত্য নববিধানসমাজের উপাচার্য্য দীন দরিদ্র বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত চক্রবর্ত্তীর ক্ষুদ্র পর্ণশালায় দুঃখী দরিদ্র ব্রাহ্মদের সঙ্গে ২।৪ দিন বাস করিব স্থির করিয়া রজনী কান্তকেই পত্র লিখিয়াছিলাম। রজনী কান্ত ও অন্য কোন কোন ব্রাহ্মবন্ধু ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এক জন বন্ধু ট্রেণ পঁহুছিবার পূর্ব্বে আমি যে নোওয়াখালি যাইতেছি ও রজনী বাবুর বাসায় থাকিব, ইহা মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তখন মাজিষ্ট্রেট B. C. Sen তাঁহার কুঠীতে উপস্থিত হইবার জন্য ষ্টেশনে গাড়ী ও আরদালি পাঠাইয়া দেন. আমি এই রূপে গোয়ন্দা বন্ধু দ্বারা ধরা পড়িয়া কি করিব ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। কোন কোন বন্ধু বলিলেন, "আপনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের গৃহে গিয়া স্থিতি না করিলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইবেন। রজনী বাবুর ঘর অতি ছোট, তথায় আপ

নার শোওয়া বসার স্থান হইবে না, সে স্থানে অন্যান্য অনেক অসুবিধাও হইবে। ব্রাহ্ম বন্ধুগণ সহ প্রাত্যাহিক উপাসনা আলোচনাদি সেখানে যাইয়া করিতে পারিবেন।” তদনুসারে আমি অগত্যা মাজিষ্ট্রেটের কুঠীতেই গমন করি। আশুতোষ রায় ও কাশী বাবু রজনী বাবুর গৃহে যাইয়া স্থিতি করেন।

শনিবার ও রবিবার নোওয়াখালিতে ইয়ুনিয়ানের মহাব্যাপার ছিল, নগরের প্রায় সমুদায় লোক তাহাতে মত্ত ছিলেন। সভাস্থলের বক্তৃতায় এবং হিপ্ হিপ্ হুররে শব্দে ও করতালির ধ্বনিতে নগর যেন কম্পিত হইয়াছিল। শনিবার দিন আমাদের আর কোন কাজ হইতে পারে নাই। রবিবার সভাভঙ্গের প্রাক্কালে কাশীবাবু বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তিনি ইয়ুনিয়নের লোকদিগকে বিশেষতঃ ভলণ্টিয়ার যুবাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আস্তিক ছিলেন, সকল বিষয়ে তাঁহাদের ধর্ম্মের সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ ছিল। আমরা সেই বংশের লোক হইয়া যেন নাস্তিকতার পরিচয় দান না করি। সকল কার্য্যে আমাদের ভগবানের সঙ্গে যোগ থাকিবে, ভগবান্‌কে মহিমান্বিত করা যেন আমাদের সমুদায় কার্য্যের লক্ষ্য থাকে, তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহাকে ভুলিয়া যেন আমরা কোন কার্য্য না করি; ঈশ্বরবিহীন কার্য্যের কখনও শুভফল হইবে না ইত্যাদি। ভলণ্টিয়ারগণ তাঁহার বক্তৃতায় বিশেষ আহ্লাদিত ও উৎসাহিত হইয়াছিলেন।

বাজারে ও পল্লীতে প্রতিদিন প্রাতে ঊষাকীর্ত্তন হয়। বাজারের একটি ময়রা আশুতোষের ঊষাকীর্ত্তনশ্রবণে মুগ্ধ হইয়া আমাদের দলের বন্ধুদিগকে কিছু মিষ্টান্ন ভোজন করাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। সোমবার দিন আমার বক্তৃতার পর সেই ময়রা রজনী বাবুর আবাসে কতকগুলি টাট্‌কা খাস্তা কচুরী, সন্দেশ ও ছানাবড়া ইত্যাদি উপস্থিত করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্বহস্তে সকলকে পরিবেশন করিয়া দিয়াছিল সেই ময়রার নিবাস কৃষ্ণনগরে, তাহার বিনয় ও ভক্তি দেখিয়া আমরা অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। সে বলিল, “আমি আজ ভক্তসেবা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ইহাতে আমার অর্থের ক্ষতি কিছুই হয় নাই, বরং লাভ হইয়াছে। আজ আমি ২০সের সন্দেশের বয়না পাইয়াছি।”

ইতিমধ্যে এক দিন রজনী বাবু আসন্ন বিপদ্ হইতে ঈশ্বরকৃপায় বড় রক্ষা পাইয়াছিলেন। রাত্রি ৯টার পর তিনি ও আশুতোষ রায় ভোজের নিমন্ত্রণোপলক্ষে অন্যত্র গিয়াছিলেন। কেবল কাশী বাবু নিমন্ত্রিত হইয়াও পীড়াবশতঃ যাইতে পারেন নাই। তিনি গৃহে ছিলেন রজনী বাবুর বাসগৃহের এক প্রকার সংলগ্ন অপর এক জন ভদ্রলোকের গৃহের চালায় অগ্নি সংলগ্ন হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই গৃহ ভস্মীভূত হইয়া যায়। কাশী বাবু ভলণ্টিয়ার যুবাদিগের ও কোন কোন শ্রমজীবী লোকের সাহায্যে বহু পরিশ্রমে রজনী বাবুর গৃহ রক্ষা করেন। সেই অগ্নির উত্তাপে গৃহের অপর পার্শ্বস্থ বৃক্ষাদি

পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়াছিল। ঘর বাড়ী দগ্ধ হইলে গরিব রজনী বাবু সপরিবারের দুঃখ ক্লেশের একশেষ হইত।

নোওয়াখালী হইতে মঙ্গলবার দিন বেলা সাড়ে চারিটার ট্রেণে কুমিল্লাভিমুখে যাত্রা করিব বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছি, এমন সময় ঝড় বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমার এক জন আত্মীয় আসিয়া এই অবস্থায় যাত্রা করিতে অত্যন্ত বাধা দিলেন। আমি সেই দিন ইচ্ছাসত্ত্বে গমনে নিবৃত্ত থাকিতে বাধ্য হইলাম। গৃহকর্ত্রী নাতনী আজ আমার যাওয়া হইবে না, কাল হইবে বলিয়া কুমিল্লায় টেলিগ্রাফ করিলেন। ২৪শে বুধবার যাত্রা করা স্থির হইল। সেই দিনও তদ্রূপ ঝড় বৃষ্টি। ষ্টেশনে যাইবার জন্য ঘোড়ার গাড়ী দ্বারে, যাত্রা করিব এমন সময় নাতনী জিদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি আর এক টেলিগ্রাফ করিতেছি, আজ তোমাকে কিছুতেই যাইতে দিব না। তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ, তোমার শরীর সুস্থ নয়, এই বিষম দুর্দ্দিনে রওয়াণা হইলে নিশ্চয় তোমার অত্যন্ত অসুখ হইবে, লাকশামে উঠা নামা আছে, কুমিল্লার গাড়ীর প্রতীক্ষায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত লাকশাম ষ্টেশনে বসিয়া থাকিতে হইবে।"এই বলিয়া তিনি দ্বার অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া পুনঃ পুনঃ বলিলাম, আমি সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ীতে যাইব, লাকশামে সেকেণ্ড ক্লাসের ওয়েটিং রুমে স্থিতি করিব। এখানকার ব্রাহ্মদিগের নিতান্ত ইচ্ছা ও অনুরোধ যে, এই দুর্দ্দিনে আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে কুমিল্লা পর্য্যন্ত যাই। ভাগ্যক্রমে ইতিমধ্যে কিয়ৎক্ষণ বৃষ্টির বিরাম হইল, তখন নাতনী সেকেণ্ড ক্লাসের ভাড়ার টাকা আমার হস্তে অর্পণ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। আশুতোষ রায়,কাশীবাবু ও শ্রীমান্ যোগীন্দ্র সঙ্গে যাত্রা করিলেন। ষ্টেশনে যাইয়া দেখি সেকেণ্ড ক্লাস ও ফাষ্ট ক্লাসের দুই খানা মাত্র কম্পার্টমেণ্ট, তাহা রিজার্ভ হইয়াছে, ইণ্টেরমেডিয়ট গাড়ী যাত্রিতে পূর্ণ, তৃতীয় শ্রেণীতেই বরাবর গতিবিধি হইয়াছে, বিধাতার ইচ্ছাও তাহাই, আমি তৃতীয় শ্রেণীরই উপযুক্ত, দ্বিতীয় শ্রেণীতে চড়িয়া কেন বড়মানুষী করিব? জল কাদা ভাঙ্গিয়া কয়েক জন বন্ধু ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় দিয়া চলিয়া গেলেন। ট্রেণ কিয়দ্দূর চলিলে পর মূষল ধারায় বৃষ্টি হয়। প্রায় ৮টার সময় লাকশামে পঁহুছিয়া তৃতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে ইতর লোকের জনতার মধ্যে আমরা ৩৷৪ ঘণ্টা বসিয়া থাকি। পরে আসাম মেলট্রেণ প্রাপ্ত হইয়া কুমিল্লাভিমুখে যাত্রা করি। কাশীবাবু ও যোগীন্দ্র আমাদিগকে বিদায় দান করিয়া চট্টগ্রামের গাড়ীর প্রতীক্ষায় ষ্টেশনে বসিয়া রহিলেন। আমরা মধ্য রাত্রিতে কুমিল্লা ষ্টেশনে উপস্থিত হই। আমাদের গাড়ীতে উঠিবার ও তাহা হইতে নামিবার সময় ঘন অন্ধকার ছিল, ভাগ্যক্রমে বৃষ্টি ছিল না, তাহার পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়াছিল।

প্রশস্ত কর্ণফুলী নদীর তীরবর্ত্তী বঙ্গোপসাগরের অদূরস্থ গিরিমালা-পরিবেষ্টিত

চট্টগ্রাম নগর প্রাকৃতিক শোভাসম্পদের জন্য বঙ্গদেশের নগরসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নোওয়াখালি নগর হইতে সাগর অধিক দূর নহে। এই নগরটি ক্ষুদ্র হইলেও পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন, দেখিতে সুন্দর। নগরের রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে বিশাল ঝাউ তরুশ্রেণী শোভা পাইতেছে। বাতবিচালিত ঝাউ তরুশ্রেণী সাগরের ন্যায় অবিরত সোঁ সোঁ শব্দে শব্দায়মান। নোওয়াখালি নগরে কালেক্টরের কুঠীতে স্থিতি করিয়া অনেক সময় আমার মনে হইয়াছে যেন সাগরোপকূলস্থ কক্স বাজারেই বাস করিতেছি। এই দুই জিলা মোসলমানপ্রধান, অধিকাংশ অধিবাসী মোসলমান। এই দুই জিলার লোকের বাঙ্গলা ভাষা পশ্চিম বঙ্গবাসীদিগের অবোধ্য। নোওয়াখালী জিলার অন্তর্গত সন্দীপ ও হাতিয়া এই দুইটি প্রধান দ্বীপ।

স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।

(শ্রীমতী প্রসন্ন তারা গুপ্ত কর্তৃক প্রণীত পারিবারিক জীবন পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।)

শিশু পালন।

২৮৮ পৃষ্ঠার পর।

দাস দাসীর অসতর্কতাতে কাহারো ছেলে জলে ডুবে, কাহারো ছেলে আগুনে পোড়ে, কাহারো ছেলে উচ্চস্থান হইতে নিম্নে পড়িয়া গিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; কাহারো ছেলে ট্রাম গাড়ীর তলে পড়িয়া মরিয়া যায়; এ সকল ঘটনা সচরাচর ঘটিয়া থাকে; শিশুগণ বয়োবৃদ্ধিসহকারে মন্দ কথা ও মন্দ ব্যবহার শিক্ষা করে, বড় হইলে অনেক ছেলের সে সব দোষ সংশোধন করা কঠিন হয়। ছেলেদের কিঞ্চিৎ বুঝিবার শক্তি হইলে আয়া বেয়ারার সংসর্গে যত কম রাখা যায় ততই ভাল। চৌরঙ্গীর ময়দান ও ওয়েলিংটন স্কোয়ার কিংবা গোল দিঘীর পারে যখন আয়া বেয়ারাগণ ছেলে মেয়েদিগকে বেড়াইতে লইয়া যায় তখন তাহাদিগের মজলিস্ দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। শিশুগণ যদৃচ্ছাক্রমে বেড়াইতেছে, আয়া ও বেয়ারাগণ ঠাট্টা তামাসা ও গল্পে মগ্ন, বড় বড় ছেলে, মেয়েরা তাহাই কাণ পাতিয়া শুনিতেছে একাগ্রতার সহিত দেখিতেছে। তাহারা আয়া বেয়ারার অনুকরণ সাধ্য মতে করিতে চেষ্টা করে। রোজ রোজ এ প্রকার রীতি নীতি দেখিলে নিশ্চয় ছেলেদিগের মন্দ অভ্যাস হয়, অতএব এ বিষয়ে পিতামাতার সাবধান হওয়া আবশ্যক। ছোট ছোট ছেলেগুলি বাক্যালাপের সময় বাধা দিলে আয়াগণ তাহাদিগকে কর্কশ বাক্যে শাসন করে, কখন কখন মারিতেও ছাড়ে না। অনেক সময় ছেলেদিগকে ভুলাইবার জন্য মিথ্যা কথা বলে। মিথ্যা কথা শুনিয়া শুনিয়া ছেলেরা সত্য কথার প্রতিও বিশ্বাস করিতে চায় না, এবং মিথ্যা বলা যে কিছু অন্যায় কাজ তাহা একেবারেই বুঝিতে পারে না। অতএব এ সম্বন্ধে দাসদাসীকে শাসন করা অত্যন্ত আবশ্যক। পিতামাতারও এ বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত। একবার ছেলেদিগকে দিব

বলিয়া কোন জিনিষ না দেওয়া কিংবা কোন প্রকার ছল চাতুরী তাহাদের সমক্ষে করা অতীব অন্যায়, তাহা দ্বারা ছেলেদের মন্দ শিক্ষা ও মন্দ অভ্যাস ক্রমেই বাড়ে, এজন্য আমাদের দেশের ছেলেরা প্রায়ই মিথ্যাবাদী ও কপটাচারী হয়। প্রথম হইতে পিতামাতা যদি এ বিষয়ে সতর্ক না হন, ছেলেদের ভাবী অমঙ্গল নিশ্চয়। সুমাতার সহবাসে সুসন্তান হয়। শিশুগণ যত অধিক সময় মাতার সঙ্গে থাকিতে পারে ততই মঙ্গল। আয়া বেয়ারার ও চাকর চাকরাণীর সঙ্গে যাইয়া মন্দ কথা, মন্দ আচরণ শিক্ষা করা অপেক্ষা বায়ু সেবন না করাও ভাল। নিজের বাড়ীতে বেশী জায়গা থাকিলে নিজের ছেলে মেয়ে দিগকে আয়ার সঙ্গে অন্যত্র পাঠান উচিত নয়। অভাব পক্ষে উপর তালার ছাদও বায়ুসেবনের পক্ষে উপযোগী। বর্ত্তমান সময়ে চাকর চাকরাণীগণ সেকালের চাকর চাকরাণী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেকালের দাসী চাকর বহুকাল এক বাড়ীতে থাকিত ও নিতান্ত আপন জনের মত ব্যবহার করিত, সুতরাং তাহাদের উপর একটা ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইত। কিন্তু এখনকার চাকর আজ থাকিলে কাল নাই, তাহাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ বদ্ধমূল হয় না। বেতন পায় কাজ না করিলে নয়, কোন প্রকারে মনিবকে বুঝাইয়া নিজের শরীর বাঁচাইয়া চলে, ইহাদের উপর সংসারের ভার দিলে দুই হাতে চুরী করে। অতএব স্বীয় জীবনসর্ব্বস্ব সন্তানের জীবনের ভার ইহাদের প্রতি সমর্পণ করিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

শিশুদিগের কোন পীড়া উপেক্ষণীয় নহে, পীড়ার আরম্ভ মাত্র ঔষধ ও সাবধানতা চাই। সামান্য সর্দ্দি কাশী হইলেও কিছু নয় বলিয়া তুচ্ছ করা অন্যায়। অল্পপ্রাণ শিশু সামান্য উপেক্ষাতে শীঘ্রই কঠিন রোগ গ্রস্ত হইয়া পড়িতে পারে। এজন্য প্রত্যেক মাতার কিয়ৎ পরিমাণে শিশুচিকিৎসাসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। শিশুদিগের সম্বন্ধে হোমিয়ুপেথী চিকিৎসা অত্যন্ত উপকারী। ইহা খাইতেও বিস্বাদ নহে, তাই ছেলেরা আহ্লাদের সহিত খায়। জননীগণ যদি সে সম্বন্ধে কয়েক খানা বই পড়িয়া ও কিছু দিন সুবিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করেন তাহা হইলে অনেক উপকার হয়। কথায় কথায় ডাক্তার ডাকা যেমন ব্যয় সাপেক্ষ তেমন অসুবিধাজনক। সময় মত চিকিৎসা না হইলে পীড়া শীঘ্রই কঠিন হয়। কোন কোন স্থানে ডাক্তার পাওয়া যায় না, স্থানান্তরে গমন করিতে হইলে এজন্য অনেক বিপদ ঘটে, নিজের অভিজ্ঞতা ও সঙ্গে ঔষধ থাকিলে বিশেষ সাহায্য হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অত্যন্ত উপকারী, ঔষধের মাত্রা ভুলক্রমে একটুকু বেশী পড়িলেও ভয়ের কারণ নাই। ইহা স্ত্রীলোকের বিশেষ শিক্ষণীয়। এজন্য এ দেশে কোন স্কুল হওয়ার আবশ্যক। এই শিক্ষা দ্বারা স্ত্রীজাতি আপনার পরিবার দাস দাসী ও গরীব দুঃখীর অনেক উপকার করিতে পারে। দুঃখের বিষয় এই যে,

আজ পর্য্যন্ত কৃতবিদ্য যুবকদিগের ইহার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, তাই ইহার কোন উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না। ইহা যে নিতান্ত আবশ্যকীয় শিক্ষা তাহা বলা বাহুল্য। প্রাচীনা গৃহিণীগণ হইতে টোটকা ঔষধ কতক শিক্ষা করা যায়, সে গুলিও বেশ উপকারী। কেহ কেহ বলিতে পারেন 'পীড়া হইলে ডাক্তার দেখাইলেই হয়, সেজন্য আবার এত হেঙ্গাম কেন?' কিন্তু এমন সময় উপস্থিত হয় যে, ডাক্তার পাওয়া যায় না, পাইলেও ডাক্তার আসিতে আসিতে মৃত্যু উপস্থিত হয়। এতদ্ভিন্ন কখন কখন এমন স্থানে যাতায়াত করিতে হয় যে, সে সকল স্থানে ডাক্তারের নামও থাকে না। সে সময় নিজের অভিজ্ঞতা থাকিলে অল্প মাত্রা ঔষধে অনেক বিপদ কাটিয়া যায়। মাতার অজ্ঞতা দোষে পূর্ব্বে অনেক শিশু অকালে প্রাণত্যাগ করিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিতা মাতার যত্নে শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যার অনেক হ্রাস হইতেছে। শিক্ষিতা রমণীগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা সন্তান পালনসম্বন্ধে অধিক পারদর্শিতা দেখাইতেছেন। মাতার অজ্ঞতা শিশুদিগের পীড়া ও অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ। সন্তানকে স্নেহ করা যেমন সহজ তাহার উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা তেমন সহজ নহে। সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ ও মঙ্গলেচ্ছা স্বাভাবিক, তদ্দ্বারা সকল মাতাই কোন না কোন প্রকারে সন্তান পালন করিতে পারে। সন্তানকে কেবল খাওয়াইয়া পরাইয়া বড় করিতে পারিলেই মাতার সমুদয় কর্ত্তব্য সাধন হইল, এরূপ মনে করা ভ্রম। সন্তানের বয়োবৃদ্ধিসহকারে মাতার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পায়। সমুদয় কর্ত্তব্য পালন করিতে গেলে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। শিশুর জীবনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতার কার্য্যক্ষেত্র ক্রমে বিস্তৃত হয়। যত প্রকার সৎ শিক্ষা আছে, যত প্রকার সদ্‌গুণ একজনের চরিত্র হইতে অন্যের চরিত্রে সংক্রামিত করা যাইতে পারে, তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালীই ভালবাসা। এই নিঃস্বার্থ ভালবাসা মাতৃজীবনে অদ্বিতীয়। এই অকৃত্রিম বাৎসল্য গুণে মাতা সন্তানের ভাবী জীবনগঠনে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন; মাতার আদেশ, মাতার বাক্য, স্বর্ণাক্ষরে সন্তানের হৃদয়ে মুদ্রিত হয়। কুম্ভকারের হস্তে মৃত্তিকা যেরূপ নানাপ্রকার বাসনে পরিণত হয়, স্বর্ণকারের হস্তে কাঁচা সোণা যে প্রকার সুদৃশ্য অলঙ্কার প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়, মাতৃ হস্তে শিশু-জীবনও সেই প্রকার গঠিত হইতে পারে। কথায় বলে "কাঁচা মাটী যাহা কর তাহাই হয়।" কিন্তু সে বিষয়ে মাতার কার্য্যক্ষমতা ও গড়িবার শক্তি উপযুক্ত রূপ না থাকিলে সকলই বৃথা। মাতা যেমন শিশুকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, শিশুও মাকে আপনা হইতেই ভালবাসে, সে শিক্ষা স্বাভাবিক। মাতা অকৃত্রিম ভালবাসা দ্বারা সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধনে সমর্থ হয়। যেমন মাতৃগর্ভে সন্তান রক্ষিত হয়, মাতৃদুগ্ধে শিশু পালিত হয়, তেমন মাতৃদৃষ্টান্তে সন্তানের চরিত্র

গঠিত হয়। শিশু-জীবনের আদর্শ ও ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে পিতামাতা সংসারে বিরাজ করেন। পিতামাতার সদ্দৃষ্টান্তে যেমন সন্তান সৎ হয় তেমন মন্দ দৃষ্টান্তে সন্তান নষ্ট হয়। শিশুসন্তান স্বভাবতঃই অনুকরণপ্রিয়, তাহাদের সম্মুখে দোষগুণ ভালমন্দ সবই সমান। হিতাহিত বিবেচনা-ভাবে তাহারা সমস্তই অনুকরণ করে। পিতামাতার উপর তাহাদের সম্পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস। তাই তাহারা সর্ব্বাগ্রে পিতামাতার দোষ গুণ গ্রহণ করে। সে জন্য যাহাতে কোন মন্দ কথা তাহাদের কর্ণগোচর না হয়, মন্দ ব্যবহার চক্ষে না দেখে, মন্দ সংসর্গে পতিত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। নিজের আচরণসম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। গল্পচ্ছলে সর্ব্বদা সাধু চরিত্রের দৃষ্টান্ত ও সদাচরণের পুরস্কার-বিষয়ে সন্তানদিগকে উপদেশ দেওয়া উচিত। শিশুর সরলভাব অতি মধুর। শিশুকে বৃদ্ধের ন্যায় কথা বলিতে শুনিলে কাহার না বিরক্তির উদয় হয়। বেশী বড় বড় কথা শিখিয়া জ্যাঠামি করিলে শিশুকে কেহ ভালবাসে না। শিশুর সমস্ত সরল নিঃস্বার্থভাব দেখিলে সকলের মনেই আনন্দ হয়। অকাল পরিপক্কতা শিশু জীবনের কলঙ্কস্বরূপ, যাহাতে শিশু-দিগের এ দোষ না ঘটে সেজন্যও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

অল্পবয়সে অনেক উপদেশ ও বক্তৃতা করিয়া শিশুদিগকে জ্ঞানী করিতে চেষ্টা করা অন্যায়। বয়োবৃদ্ধির সহিত এ সকল জ্ঞান ও ধারণাশক্তি আপনা হইতেই হয়। শিশুকে বৃদ্ধের ধারণাশক্তি শিখাইতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। যেমন অনেক টানিলে রশি ছিঁড়িয়া যায়, তেমন অনেক জোর করিয়া শিশুর ধারণাশক্তি বাড়াইতে গেলে বিপরীত ফল ফলে। এজন্য বয়স ও ক্ষমতা বুঝিয়া তদনুরূপ শিক্ষাই যথার্থ উপযোগী। শিশুর পক্ষে মাতৃসহবাস যেমন আবশ্যক, মাতার পক্ষে শিশু সহবাস তেমন প্রীতিকর। মাতার চরিত্রের সদ্গুণ ও কোমলতা শিশুর ভাবী জীবনগঠনের অঙ্গস্বরূপ। শিশুর জীবনের সদ্গুণ দ্বারাও সময় সময় মাতার শিক্ষা হইয়া থাকে। মাতা যেমন সন্তানের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন তেমন অন্যে পারে না, এজন্য মাতা সকল বিষয়েই সন্তানের প্রধান গুরু। সুমাতা দ্বারা সন্তান সকল প্রকার উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে। কুমাতার দৃষ্টান্ত সন্তানের পক্ষে সাংঘাতিক। শিশুর নিকট মাতৃস্নেহ অপেক্ষা সুমিষ্ট ও প্রীতিকর আর কিছুই নহে। শিশু মাতৃস্নেহে আকৃষ্ট হইয়া মাতার গুণ সকল স্বীয় ইচ্ছায় গ্রহণ করে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে মাতার সহবাস দ্বারা মাতৃচরিত্রের অনুকরণ করিয়া থাকে; তজ্জন্য সরল ও মিষ্ট বাক্যে শিশুর সহিত বাক্যালাপ করা উচিত, তাহারা উৎসুক হইয়া কোন কথা জানিতে চাহিলে বিরক্তি-ভাব প্রকাশ না করিয়া সরল ভাবে তাহার অর্থ শিশুকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, ইহা দ্বারা শিশুদিগের জানিবার ইচ্ছা বৃদ্ধি হয়, এবং ক্রমে ক্রমে শিক্ষা লাভ করে। যে সকল শিশু মাতার সঙ্গে থাকিতে পায় না, তাহাদের মাতার প্রতি তেমন ভালবাসা

হয় না, বড় হইয়া তাহারা সেরূপ মাতৃস্নেহ অনুভব করিতে পারে না। শিশুকাল হইতেই মাতার সঙ্গে এক প্রকার ছাড়া ছাড়া ভাব হয়। কোন কোন মাতা সন্তানগণকে নিজের কাছ থেকে দূরে দূরে রাখিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হয়, শিশু নিকটে আসিলেই বিরক্তি ভাব প্রকাশপূর্ব্বক "যা বেয়ারার কাছে, যা আয়ার কাছে, যা তোর শ্যামা দাদার কাছে যা" ইত্যাদি বাক্য বলিয়া সন্তানকে দূর করিয়া দেয়। ইহা মাতৃভাব ও মাতার আচরণের বিরুদ্ধ। ইহা দ্বারা সন্তানের মন ক্ষুণ্ণ হয়, অনেক জননী ভ্রমেও একবার এ সকল ভাবেন না। তাহাদের আপনার শরীর বাঁচাইয়া চলিতে পারিলেই সকল সুখ পূর্ণ হইল, স্বামীর অর্থের সদ্ব্যয় হইল। এ সকল মাতার দৃষ্টান্ত অতি জঘন্য। কোন কোন মাতা সন্তানের যথার্থ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি করেন না, কেবল সিল্ক শাটীন পরাইতে পারিলেই সন্তুষ্ট হন, সত্য বটে ভদ্রতারক্ষার জন্য সময় সময় ভাল কাপড়ের প্রয়োজন হয়, সেই প্রয়োজন সমাধা হইলে তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা উচিত; কিন্তু জননীর আলস্য ও অমনোযোগ বশতঃ ছেলেরা ভাল কাপড় গুলি নষ্ট করিয়া ফেলে, আবার যখন ভদ্রতা রক্ষার জন্য ভাল কাপড়ের আবশ্যক হয় তখন তাহাদের ময়লা কাপড় পরিয়াই যাইতে হয়। এ প্রকার জননীর দৃষ্টান্তে সন্তানগণ কেবলই বিশৃঙ্খলতা শিক্ষা করে।

পূর্ব্বকালের জননীগণ যেমন অনাবৃত দেহে সন্তানগণকে রাখিতেন বর্ত্তমান সময়ে তাহার বিপরীত দেখা যায়। কেহ কেহ গ্রীষ্মকালেও এক বোঝা কাপড় শিশুর গায়ে চাপাইয়া রাখিতে ভালবাসেন। শীতই হউক আর গ্রীষ্মই হউক সকল সময় সমান ভাবে বস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নহে। শীতকালে অনাবৃত দেহে থাকিলে সহজেই সর্দ্দি কাশী ও জ্বর হয়। গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত কাপড় জুতা মোজা নিয়ত পরিধান দ্বারা ঘর্ম্ম হইয়া শরীরের রক্ত জল হইয়া যায়, তদ্দ্বারা শিশু দুর্ব্বল হয়। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীত গ্রীষ্ম সকল সময় সমভাবে অনেক বস্ত্র ব্যবহার করা কঠিন, এ সম্বন্ধে শীতপ্রধান দেশীয় ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ অনুকরণ মঙ্গলজনক নহে। ঋতুর পরিবর্ত্তনহেতু সময় সময় মন্দ বাতাস বহে তাহাদ্বারা শিশুর অনিষ্ট হইতে পারে, এজন্য একটা লংক্লথের পাতলা কামিজ ও জাঙ্গীয়া সর্ব্বদা ব্যবহার করা উচিত। শীতকালে অবশ্য গরম কাপড় পরিধান করা বিধেয়। শিশুদের বস্ত্র পরিবর্ত্তনের ভার দাস দাসীর উপর ফেলিয়া দেওয়া উচিত নহে কারণ তাহারা এ সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, তাই সর্ব্বদাই বিপরীত কাজ করে; অতএব একার্য্য মাতার নিজেরই সম্পাদন করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চম বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই শিশু-সন্তানের বিদ্যারম্ভ হওয়া উচিত। প্রথমতঃ মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সর্ব্বপ্রথমে মাতৃভাষা না শিখিলে পরে আর তেমন শিক্ষার সুযোগ ঘটে না। কারণ স্কুলে ভর্ত্তি হইলেই কেবল ইংরাজি চর্চ্চা হয়, তখন বাঙ্গালা শিক্ষাবিষয়ে তেমন একটা

যত্ন থাকে না। মাতৃভাষা না জানা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। অতএব যত শীঘ্র সম্ভব সন্তান যাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা লাভ করিয়া ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। বাঙ্গালায় একটুকু প্রবেশ করিতে পারিলে পরে ইংরাজি সঙ্গে সঙ্গে চলিতে পারে। প্রথমেই ইংরাজি আরম্ভ করিলে বাঙ্গালা শিক্ষা আর হয় না। ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলে বাঙ্গলা শিক্ষার একেবারেই সুবিধা হয় না, এই কারণে বাঙ্গালা ভাষা লোপ হওয়ার মধ্যে আসিয়াছে। এই ভাষার বিনাশসাধন অত্যন্ত ক্ষোভের কারণ সন্দেহ নাই, অতএব প্রত্যেক মাতার ইহার পুনরুদ্ধার করা কর্ত্তব্য। কেবল শিশুকালে সন্তানের শিক্ষার ভার মাতার উপর থাকে কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে পুত্রের শিক্ষার ভার পিতার স্বয়ং গ্রহণ করা উচিত। কন্যা-সন্তানকে মাতা সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু উচ্চশিক্ষা দিতে হইলেই পুত্রকন্যা উভয়কেই শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিতে হয়। কেবল শিক্ষকের উপর ভার দিয়া পিতামাতা একেবারে নিশ্চিন্ত থাকিলে সন্তানের উপযুক্ত রকম শিক্ষা হয় না। অনেক পিতাই ইহাকে নিজের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য করেন না। "বিষয় কার্য্য করিয়া অবসর নাই" ইত্যাদি বাক্যে নিজের দোষ কাটাইয়া দেন। ইচ্ছা থাকিলে সময়ের অভাব হয় না; যেরূপেই হউক নিজের কর্ত্তব্যসাধন করিতে হইবে, এরূপ দৃঢ়তা থাকিলে জীবনে অনেক কার্য্য করা যায়। পুত্রের চরিত্র-শোধন ও ভাবী জীবনগঠন পিতারই কার্য্য। পুত্রের বয়স হইলে পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া কঠিন হয়, কোন কোন উদ্ধত-প্রকৃতি পুত্র মাতাকে ভয় করে না, কিন্তু পিতাকে ভয় করে। কুসংসর্গ হইতে সর্ব্বদা সন্তান সন্ততিকে দূরে রাখা উচিত, পাড়ার মন্দ ছেলেদের সহিত মিশিতে দেওয়া অন্যায়, এজন্য চক্ষু লজ্জা পরিত্যাগ করিতে হয়। (ক্রমশঃ)

মহিলাদিগের রচনা।

সমাজে রমণীর প্রকৃত স্থান।

বিগত বৎসর রমণীর অধিকারসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম, আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র যে বিস্তৃত, জগতের উত্থান পতনের উপর রমণীর প্রভাব যে অলক্ষে কার্য্য করিতেছে, তাহা আমরা বুঝিয়াছি। তাই আজ আবার জগতে আমাদের প্রকৃত স্থান কোথায় দেখিতে আসিলাম। শুধু অধিকার পাইয়াই আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। হৃতাধিকার পুন-র্গ্রহণ করিয়া জগতের নিকট কর্ত্তব্যের হিসাব দিতে হইবে। যত দিন জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে অন্ধ থাকি তত দিন সে দায়িত্ব দায় হইতে অব্যাহতি লইতে পারি; কিন্তু যখন চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, জীবন দায়িত্বপূর্ণ—মাথার উপর গুরুভার ভৈরব রবে কর্ত্তব্য কর্ম্মক্ষেত্রে ডাকিতেছে, তখন আর আলস্য নিদ্রার সময় নাই।

সমাজ আমাদের পথ ছাড়িয়া দিয়াছে, আর অবরোধে, অবগুণ্ঠনে, জড়িতপদে,

চিরপরাধীনা রমণী পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিবেন না। আশা হয় চির অন্ধকারে থাকিয়া রমণী আলোকের মর্য্যাদা অধিক বুঝিবেন। যদিও প্রথম আলোকের তীব্রতা নয়নের পীড়াদায়ক, কিন্তু পায়ের শৃঙ্খল খুলিয়া গিয়াছে অগ্রসর হইবার প্রতিবন্ধক নাই; সম্মুখে পথ অতি প্রশস্ত, হৃদয়বান্ রমণী-সুহৃদ অনেক ভাই, আশা আশ্বাস লইয়া দুর্ব্বল চরণ নারীদিগের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন। সাহসে নির্ভর করিয়া রমণী যদি একবার অর্গল খুলিয়া এ প্রশান্ত জগতের বিস্তৃত বক্ষে আসিয়া দাঁড়ান, তরুণ অরুণালোকে ধীরে ধীরে সে সঙ্কোচ হারাইয়া যাইবে। রমণীর কর্ত্তব্য তখন তাহাকে আর অলস হইতে দিবে না। কে কবে কর্ত্তব্য বুঝিয়া রমণীকে অলস হইয়া গৃহে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন? যে কর্ত্তব্যের দায়িত্ব লইয়া রমণী গৃহরাজ্যের রাণী,—স্বামী, সন্তান, পিতা, ভ্রাতার জন্য অকাতর অশ্রান্ত পরিশ্রমে আপনার সুখস্বার্থ ভুলিয়া শরীর-পাত করিতেছেন, পরসেবায় যে রমণী আত্মহারা, আজ সমাজ যখন তাঁহাদের কাছে তাঁহাদের অধিকার ফিরাইয়া দিয়াছে, যখন আলস্য নিদ্রা ভাঙ্গিয়া রমণী দেখিলেন জগতের কত অভাব, কি ব্যাকুল আগ্রহে জগৎ তাঁহাদের মুখ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তখন আর নিদ্রালস্যে রমণী কি গৃহে অবগুণ্ঠনে জড়ভাবে বসিয়া থাকিতে পারিবেন? রমণীর হাতে বল নাই, কিন্তু হৃদয়ে দৃঢ়তা আছে। জগতের কার্য্যসাধনে, পুরুষের বল, নারীর হৃদয় চাই। পুরুষ এখন বুঝিয়াছেন তাঁহাদের উন্নতিতে দেশের একাংশের উন্নতি, রমণীকেও উন্নত হইয়া জগতের কাজে লাগিতে হইবে। আজ আমরা পুরুষের সমকক্ষ হইয়া জগতের প্রকৃত উন্নতির সহায়তা করিতে সমাজে পুরুষের পার্শ্বে স্থান পাইয়াছি।

পিতার শিক্ষা সন্তানকে জগতের বক্ষে টানিয়া বাহির করিতে চাহে, আর জননীর অঞ্চলে কি তাহাকে আজ গৃহকোণে অলসভাবে, শুধু ঘুম পাড়ানি গান আর ঠাকুরমার ছড়া দিয়া ভুলাইয়া রাখিবে? রাজপুত ললনা কেমন করিয়া মন বাঁধিয়া প্রিয়তম, স্বামী ভ্রাতা সন্তানকে অস্ত্র বর্ম্মে সাজাইয়া রণে পাঠাইয়া দিতেন। সে সব অতীত বীরগাথা স্মরণ করিলে আজও পুলকে শরীর রোমাঞ্চিত হয়!

কর্ত্তব্য অতি কঠোর নিষ্ঠুর, তাহার আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে কাহার ক্ষমতা আছে? আমরা আজ কর্ত্তব্যের আহ্বান শুনিতে পাইয়াছি, ধর্ম্মে এবং কর্ম্মে আমাদের পুরুষের সমান অধিকার। জীবন সমানই দায়িত্বপূর্ণ, অথবা অধিকতর দায়িত্ব-পূর্ণ। রমণী সুগৃহিণী হইয়া, প্রিয়জনের সকল অবস্থায় সহায় হইবেন, আবার সমাজের উন্নতির সোপানস্বরূপ হইবেন। পরিবারের কর্ত্রীর শাসন ও কার্য্যপ্রণালী সুশৃঙ্খলপূর্ণ হইবে, সম্মানের আসন চির অচল থাকিবে, অথচ কোমল হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত স্নেহ, প্রীতিবিস্ফারিত আনন, সস্নেহ সম্ভাষণ, মধুর বচন, শ্রান্ত জনের আনন্দবিধায়ক হইয়া প্রতিজনকে আকৃষ্ট

করিবে, সকল হৃদয় সেই শীতল ছায়ায় আসিয়া তৃপ্তিলাভ করিবার জন্য চিরদিন উৎসুক থাকিবে।

পুরুষ গৃহে এবং সমাজে দুই স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতেছেন, রমণী সমাজের সহিত কোনই সংস্রব রাখেন না। পুরুষ রমণীর নিকট সাহায্য পান না, সুতরাং কার্য্য আংশিক ভাবে সম্পন্ন হইতেছে, তাই সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইতেছে না। একটি সমাজকে জীবন্ত করিতে নারীর সাহায্যের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে—শুধু পুরুষেরা উন্নতিলাভ করিলে হইবে না, রমণীদিগকেও তদনুরূপ উন্নত হইতে হইবে। পুরুষ এবং নারীর প্রকৃতিগত বৈষম্য রক্ষা করিয়া নারীকে সর্ব্বাংশে শিক্ষিতা হইতে হইবে। কিন্তু রমণী যেন আপনার স্বভাবসুলভ কোমলতা ত্যাগ করিয়া পুরুষের প্রভাব প্রাপ্ত না হন। স্বাধীন চিন্তা জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা মানসিক উন্নতি সাধন করিতে হইবে। কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া সামান্য বিষয়ে আমোদ সম্ভোগ করিলে মনোবৃত্তিগুলির যথেষ্ট বিকাশ হয় না। গভীর ভাবার্থ জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ করিয়া চিন্তা লতার ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে, সমাজের অভাব বুঝিয়া তাহার মোচনের প্রকৃষ্ট পন্থা ও সদুপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন মত লইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে হইবে, শুধু পরমুখাপেক্ষিনী ও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া হিতাহিত জ্ঞানবিহীনা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধিহীনার মত ব্যবহার আর আমাদের পক্ষে সমুচিত নহে। প্রত্যেকেই আপনার কার্য্যের জন্য বিধাতার নিকট দায়ী। পরিবারের সকলের কুশল কল্যাণ বিধান ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যেমন রমণী হৃদয় চিরদিন ব্যাকুল হইবে, তেমনি সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইবে। দরিদ্র অক্ষমের জন্য আমাদের প্রাণ সমবেদনায় কাঁদিয়া উঠিবে। চিরদিন আমাদের হস্ত তাহাদের সান্ত্বনার জন্য প্রসারিত হউক। চক্ষের জল মুছাইতে অঞ্চল লুটাইয়া পড়ুক। জীবন্ত আগ্রহ লইয়া, ভগবানে অচলা ভক্তি বিশ্বাস রাখিয়া সমাজের দুর্নীতি, কু-সংস্কার কু প্রথা অন্ধ বিশ্বাস বা কোনরূপ অভাব যাহা সমাজের উন্নতির পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহা দূর করিবার জন্য যত্নশীলা হইব। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিব, তাহা জীবনে পালন করিতে ব্রতী হইব। সমাজ আজ লোকাচার, দেশীয় প্রথা ভুলিয়া রমণীর কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতেছে, রমণীর আসন সমাজে শূন্য পড়িয়া আছে। চারি দিকে শুনিতেছি আমরা অলস হইয়া রহিয়াছি, আপনার কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইতেছি না, ধর্ম্মে শিথিলতা ও কর্ম্মে অলসতা এবং বিদেশীয় বিলাসিতার অনুকরণ করিতেছি, কিন্তু তাহাদের কার্য্যকারিতা গ্রহণ করি নাই, ভ্রম প্রমাদে অন্ধ হইয়া আছি, কর্ত্তব্য পালন করিবে কে? জগতের ক্রন্দন শুনিবে কে? সমাজের দুর্দ্দশার অবসান আর কেমন করিয়া হইবে? সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া, ধর্ম্মের মহান্ আদর্শ স্মরণ রাখিয়া, শিক্ষা ও দীক্ষাকে উপযোগী করিয়া জীবনের নিয়োজিত ব্রত উদ্যাপন করিতে আমরা

কবে অগ্রসর হইব? শুধু বাক্যবীর অনেক হইয়াছেন, এখন কর্ম্মবীরের আবশ্যক অধিক। বিদেশীয় ভদ্র পরিচ্ছদ যেন আমাদের লজ্জাশীলতার সহায় হয়, আর বিদেশীয় শিক্ষিতা নারীগণের কর্ত্তব্যপরায়ণতা যেন আমাদের একান্ত অনুসরণীয় হয়। কার্য্যকারিতাকে যেন আমাদের অযথা বিকৃত লজ্জা বাধা না দেয়। আমরা বঙ্গের নারীগণ এখন অসার বিষয় ছাড়িয়া ক্ষণিক ভাবের উত্তেজনা ভুলিয়া শুধু বাক্যে নহে কার্য্যে—সমাজের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হই। গৃহ এবং সমাজে সামঞ্জস্য হইবে। এ যুগের ধর্ম্ম-বিধানোক্ত সমুদায় মানব মিলিয়া এক পরিবারভুক্ত হইবেন, ধরাধামে সেই স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইবে। দেশের ও সমাজের অভিপ্সীত উন্নতি সাধিত হইবে। গৃহে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হইলে চলিবে না, জগতে আমাদেরও কাজ আছে, সমাজের কাছে আমরা দায়ী। যে আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিতেছে আমরা সকল রমণী মিলিয়া জীবনকে তাহার উপযুক্ত করিতে চেষ্টা করিলে সার্থক হইতে পারি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি আমাদের যে কার্য্যসাধনের জন্য ডাকিয়াছেন তাহা সাধন করিবার উপযুক্ত বল বিধান করুন। আজিকার দিনে তাঁহার আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া ভক্তি কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কর্ত্তব্যে অগ্রসর হই।

কলিকাতা। শ্রীমতী ক—।

অসন্তোষিণীর স্বপ্ন।

(স্বর্গগতা দেবী কিশোরমোহিনী কর্ত্তৃক রচিত।)

আমার এক জন প্রতিবাসিনী আছে, তাহাকে সকলে অসন্তোষিণী বলিয়া ডাকে। অন্য নাম আমি কখনও শুনি নাই। সে অনবরত এত আপনা আপনি বকিতে থাকে ও প্রত্যেক বিষয়ে দোষ বাহির করে যে সকলেই তাহাকে ঐ নামে আহ্বান করে। কয়েক দিবস গত হইল আমার গৃহে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভগ্নি তুমি কি স্বপ্নে বিশ্বাস কর? আমি বলিলাম অধিক আস্থা নাই। কিন্তু তুমি ইহা জিজ্ঞাসা করিলে কেন? সে বলিল আমি দুইটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছি তাহাতে কি যে করিব বুঝিতে পারিতেছি না। আচ্ছা তুমি আমায় বল আমি বুঝাইয়া দিব। (কিছু ইতস্ততঃ করিয়া আরম্ভ করিল) ভগ্নী আমি কেমন হতভাগিনী তাহা তুমি জান, সর্ব্বদাই ভাবি যে সকলেই আমা অপেক্ষা কেন এত সৌভাগ্যবতী। সে দিন রাত্রে আমি এই সমস্ত ভাবিতেছিলাম যে আমার প্রতিবাসিনীরা কেমন ধনী, আর আমি কত দরিদ্র, সকলে কেমন অট্টালিকায় বাস করে আর আমি ক্ষুদ্র কুটীরে অবস্থিতি করি। সকলেরই কত সম্পদ বৃদ্ধি হইতেছে, আর আমার যাহা আছে তাহা থাকে না। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আমি নিতান্ত অসুখী, হইয়া শয্যায় গমন করিলাম। আমার সুনিদ্রা না হওয়াতে স্বপ্ন দেখিলাম যে একজন দেবদূত আমার শয্যাপার্শ্বে

দাঁড়াইয়া কহিতেছেন, কন্যা তোমার খেদোক্তি বিধাতা শ্রবণ করিয়া তোমার প্রতি দয়া করিয়াছেন। তিনি তোমার মনোনীত যে কোন প্রতিবাসিনী যাহাকে তোমাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী মনে কর সেই প্রতিবাসিনীর সহিত স্থান পরিবর্ত্তন করিতে দিবেন। কিন্তু তোমাকে প্রত্যেক বিষয়ে তাহার সহিত পরিবর্ত্তিত হইতে হইবে। তাহার যেরূপ গঠন, আকৃতি অভ্যাস, রুচি, পরিবার, বন্ধু তোমারও সেইরূপ হইবে। তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত ঠিক করিতে হইবে এবং সেই সময়ে তুমি তোমার প্রত্যেক প্রতিবাসিনীর হৃদয় দেখিতে পাইবে, এবং দেখিবে যে, তাহার পৃথিবীর সম্পদ কত দূর তাহাকে সুখী করিয়াছে। এই বলিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন। আমি প্রাতে নিদ্রোত্থিত হইয়া স্বপ্নের বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। আমার মনে হইল যে ইহা যথার্থই হইয়াছে, আমি স্বপ্ন বৃত্তান্ত ভুলিতে পারিলাম না। আমার অনিচ্ছাস্বত্বে প্রতিবাসিনীর বিষয়ে চিন্তা আসিতে লাগিল এবং আমি যত ভাবিতে লাগিলাম ততই তাহাদিগকে আমার সম্মুখস্থ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি তাহাদের অন্তর দেখিতে পাইলাম। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলাম যে কাহার সহিত পরিবর্ত্তিত হইবার স্থির করিব। প্রতিবাসিনী 'ক কে' প্রথমে আমার মানস-চক্ষে দৃষ্ট হইল, কারণ সে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। তাহার ধনলাভ হইলে আমি বড় সুখী হই, কিন্তু যখন তাহার স্বামীর বিষয় মনে হইল তখন ভাবিলাম যে কি ভয়ানক পশুস্বভাব, যখন তাহার হৃদয় দেখিলাম অন্তরে কত যন্ত্রণা। যখন দেখিলাম যে পারিবারিক দুঃখ ভুলিবার জন্যই সে সর্ব্বদা গীত বাদ্যে রত থাকে তখন আমি তাহার সহিত পরিবর্ত্তিত হইবার সাধ দূর করিলাম। তাহার সম্পর্কে আমি হিংসা করি না। পরে 'খ' কে ভাবিলাম। কিন্তু তাহার সহিত হতভাগা কদর্য্যস্বভাব পুত্রও স্মরণে আসিল, সে নগরের মধ্যে অসৎ দৃষ্টান্তের চূড়ান্ত; দুর্বৃত্ত পুত্র কোন্ দিন কোন্ ভয়ানক অপরাধে যে প্রাণবধের শাস্তি পাইবে ইহাতে আর সংশয় নাই এবং সেই শোকে তাহার বৃদ্ধ পিতার শুক্লকেশ চিতানলে দগ্ধ হইবে। যখন 'খ' য়ের অন্তর দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম যে বাহ্য যন্ত্রণা ও ভীতিতে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, তখন আমি আমার পুত্রদের স্মরণ করিয়া বিধাতাকে ধন্যবাদ দিলাম এবং ভাবিলাম যদি লক্ষ লক্ষ টাকা পাই অত্রচ 'খ' য়ের পুত্রের সহিত তাহাদের পরিবর্ত্তিত করিতে পারি না। অনন্তর 'গ' কে স্মৃতিতে আনিলাম, তাহার স্বামী ও সন্তানেরা রূপে গুণে অতীব আনন্দজনক, তথাপি তাহাকে সুখী দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই দিন আমি তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম। দেখিলাম তাহার হৃদয়ে এক সর্প কুণ্ডিত হইয়া বাস করিতেছে, এবং সর্ব্বদা দংশন ও আঘাত করিতেছে। এই সর্পকে আমি দুরাকাঙ্খা বলিয়া চিনিলাম। ইহা যাহার হৃদয়ে অবস্থিতি করে তাহাকে তাহার মত থাকিতে দেয় না, কিন্তু আরও লাভ করিতে উত্তেজিত হইয়া

জন্য অনবরত আঘাত করে। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ লক্ষপতি রথচাইল্ডের ধনরাশি লাভের জন্যও সর্পকে হৃদয়ে প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা করি না। চতুর্থ প্রতিবেশিনী 'ঘ' কে তৎপর সম্মুখে দেখিলাম। তুমি জান তাহার স্বামী দুর্ভিক্ষের সময় কেমন ধনী হইয়া উঠিয়াছেন, এবং যে প্রণালীতে তিনি অর্থ উপার্জ্জন করেন তাহার সম্বন্ধে লোকে কাণাকাণি করিয়া থাকে। লোকেরা তাহাকে অতি মান্য করে কিন্তু পশ্চাৎ ফিরিলেই বলে যে দুর্ভিক্ষ নিবারণের অর্থ সকল গবর্ণমেণ্টকে প্রবঞ্চনা করিয়া নিজে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল কারণে 'ঘ'র হৃদয় সর্ব্বদা দুঃখ ঘৃণাতে পরিপূর্ণ, আমি কোন মতেই তাহার সহিত পরিবর্ত্তিত হইতে পারি না। যাহাহউক দীর্ঘ স্বপ্নকে কমাইয়া বলিতেছি যে এইরূপ আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্যবতী প্রতিবেশিনীকে চিন্তা করিলাম, কিন্তু প্রত্যেকের সহিতই এমন কোন বিষয় থাকে যে, তাহাদের ধনের সহিত তুলনায় দুর্ভাগ্যই পরিমাণে অধিক। পরিশেষে পরিমিত অবস্থাপন্ন 'ম' আমার দৃষ্টিপথে আসিল, যাহার সহিত আমি স্থান পরিবর্ত্তনে ইচ্ছুক হইলাম। তাহার একখানি সুন্দর বাড়ী, সুখী পরিবার উপযুক্তরূপ আয়; এক কথায় তাহাকে সকলই ভালবাসে এবং অমায়িক প্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করে। তাহাকে আমার মনোনীত হইল আবার ভাল করিয়া দেখি যে তাহার চক্ষু কি কদর্য্য, এবং নাসিকা মুখের আকৃতিতে বৃহৎ। এত বড় নাসিকা কখনও দেখা যায় না, এবং চক্ষুর দৃষ্টি এত বক্র যে একটুও ভাল লাগে না। আমাকে সকলে এত সুন্দরী বলে আমি কেমন করিয়া তাহার বিকৃত মুখ গ্রহণ করিব? আমি এত বৃহৎ নাসিকার ভারে মস্তকোত্তলন করিব কিরূপে? কিম্বা আমার বন্ধুগণের প্রতি এত বিকৃত দৃষ্টিতে তাকাইব কিরূপে? আবার ভাবিলাম সেই দেবদূত হয়ত এই সমস্ত বিষয় গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিবেন না। এই জন্য আমি তাঁহাকে মিনতি করিয়া সেই রাত্রিতে পুনরায় আমি স্বপ্ন দেখিলাম। পূর্ব্বের মত দেবদূত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার সহিত পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা কি স্থির করিয়াছ?" আমি বলিলাম, "স্থির করিয়াছি, যদি আপনি আমার নাসিকা ও চক্ষু রাখিতে দেন তবে 'ম'র সহিত পরিবর্ত্তিত হই"। না, তাহা হইতে পারিবে না। তাহার ভাগ্যে ইহাই মন্দ, যদি তুমি ভাগ্য লইতে চাও তবে মন্দও সেই সঙ্গে লইতে হইবে। সেই কথা স্মরণ কর—যদি তুমি পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা কর তবে প্রত্যেক বিষয়ে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তুমি ঠিক তাহার মত হইবে এবং সে ঠিক তোমার মত হইবে। "তবে আমি ইহা পারিব না" এই বলিয়া শয্যোপরি উঠিয়া বসিলাম, "কোন মতেই আমি তাহার আকৃতি লইতে পারি না।" দেবদূত বলিলেন, "আর কি কেহ তোমার মনোনীত হয় নাই।" "না আমি সকলকে দেখিয়াছি, আমি যেমন দরিদ্র আছি তেমনি থাকিব তথাপি কাহারও সহিত পরিবর্ত্তিত হইব না।" তবে তুমি যেন

করা পরিত্যাগ করিও” এই বলিয়া দেবদূত অদৃশ্য হইলেন। এই স্বপ্নের বিষয় তুমি কি বল? আমি বলিলাম, এই সমস্ত চিন্তাকর, 'ম'র নাসিকা যেমন দেখিতে পাও সেইরূপ ইহার অর্থও অতি সহজে বুঝিতে পারিবে। তোমার যেরূপ হওয়া উচিত তাহাই স্বপ্নে দেখিয়াছ, আমি আশা করি যে এই বৃত্তান্ত তোমার যথেষ্ট উপকারে আসিবে। পাঠিকা! যদি তোমার অসন্তুষ্ট প্রতিবেশিনী থাকেন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও যে তিনি অন্য কাহারও সহিত পরিবর্ত্তিত হইতে ইচ্ছা করেন কি না। পরিবর্ত্তনের জন্য যদি উপযুক্ত কাহাকেও না পান তবে যেন এই নীচ অভ্যাসকে পরিত্যাগ করিতে যত্নবতী হয়েন।

শোক। *

বুল্ বুল্ ক্ষমা কর; কি নিঠুর হিয়া মম,
এত ব্যথা দিয়াছিগো ছোট প্রাণে তোমা সম।
আমি হরে ছিনু প্রাণ সম স্বাধীনতা তোর,
রেখেছিনু পিঞ্জরেতে এঁটে সেটে দোর।
এত দুখ তোর প্রাণে কেন সবে ভাই,
পালাইয়া গেলে বুঝি প্রাণপাখি তাই।
ক্ষমাকর ভাই, ক্ষমাকর, ক্ষমাকর মোরে,
ফিরে আয় দিব নাক ব্যথা, ছেড়ে দিব তোরে
স্বাধীনভাবে বেড়াস্ ঘুরে যথা সাধ যায়,
ক্ষমাকর বুল বুল আয়, কাছে আয় আয়।
দিয়াছিনু ব্যথা বলে চলে গেছ ভাই,
দিব নাক কভু আর কাছে এস ভাই।
স্বাধীনভাবে বেড়াস্ নেচে ঘুরে মুক্তাকাশে
শুধু ডাকলে পর একটা বার দেখা দিস্ এসে।
আয় পাখি! দিব ছেড়ে যাস্ ইচ্ছা যথা
যাস্ উড়ে যথা তোর আছে পিতা মাতা॥
হরিনাম আকাশে গেয়ে বেড়াস্ ঘুরে,
একটিবার ডাকিলে নাম শুনাস মোরে।
একটিবার আয়রে পাখী, দেখ পরশ কোরে
খাঁচায় বন্ধ রাখি কিম্বা ছেড়ে দিই তোরে॥
আর তোরে পাখী যে রে পাবনাক এ জনমে,
গেছ চলে তুমি হায় কোন অজানিত ধামে।
কিন্তু মোরে একটী শিক্ষা দিয়ে গেছ ভাই,
“ইতর বলে কোন জীবে কষ্ট দিতে নাই।
যত দিন বাঁচি রব একথাটি সার,
চিরদিন যেন থাকে স্মরণে আমার॥

ছোটপাখী ও কুমারী।

(কোন ইংরাজি কবিতার অনুবাদ)

ছোট পাখী ছোট পাখী এস মোর কাছে,
একটি সুন্দর খাচা তোর তরে আছে।
নিত্য পাকা তাজা ফলে তুষিব তোমায়,
আয় পাখী কাছে আয়, আয় আয় আয়।
ধন্যবাদ অয়ি বলে দয়াবতী তোমারে,
(কিন্তু) মোদের কি কাজ বল সুবর্ণ পিঞ্জরে।
ওই যে হোথায় দেখ অশথ পুরাণ,
উহাই মোদের বাসা অতি প্রিয় স্থান॥
ছোট পাখী ভাব দেখি সেই দিন ভয়ঙ্কর,
ঢাকিবে তুষারে পথ ঘাঠ পাদপনিকর।
তখন কোথায় যাবি বল্ দেখি মোরে?
তাই বলি ছোট পাখী এস মোর ক্রোড়ে॥
না বালা ধাইব যথা হবে না শিশিরপাত,
আমি মনসুখে কাটাইব তথা দিবারাত।
শিশির চলিয়া গেলে ফিরিয়া আসিব ফের,
বন্দিভাবে পিঞ্জরেতে কেন যাব কি
দুখ মোদের॥
ছোট পাখী কিন্তু ভাই বলদেখি মোরে,
দুস্তর সাগর পারে কে রক্ষিবে তোরে?
অনন্ত আকাশ মাঝে কে সহায় হবে।
সাথে সাথে রবে সদা পথ দেখাইয়ে॥
না কুমারী ছি! সে কি কথা রক্ষিবেন
জগৎ পিতা,
বায়ুসম স্বাধীনতা তিনিই দেছেন মোদের
ভুল না ভুল না বালা তাঁর মন জনে ওরে॥
একটী গোলাপ এই ফুটিয়াছে হায় [illegible]
অজাত মৃদুল বায়ু পরশে [illegible]

---

* বৈশাখ ও জৈষ্ঠ মাসের মহিলায় যে ক্ষুদ্র বালিকার রচনা প্রকাশিত হইয়াছে এই পদ্য ও তৎপরবর্ত্তী পদ্যটি তাহা কর্ত্তৃক লিখিত

ছুটিয়া ছুটিয়া অই সৌরভ ছড়ায়,
একটি গোলাপ অই ফুটিয়াছে হায় ?
একটী ফুলের অই সৌরভে সবাই
পরিতৃপ্ত, বিমোহিত বালক বৃদ্ধের চিত্ত,
একটী ফুলের তরে মক্ষিদল তাই
ছুটিছে খেলিছে দলে উন্মত্ত সবাই।
একটীর এইরূপ জগতে আদর,
একটী চাঁদের আলো একটী জীবন ভাল
একটী ঈশার হয় চির সমাদর।
একটী জীবনালোকে সমুদায় বিশ্বলোকে
আলোকিত করে কত মানব অন্তর
একটীর হয় এত জগতে আদর।

বাঁকিপুর } আপনার স্নেহের
২৫।৮।০৪ } শ্রীমতী সু—

—০:*:০—

সংবাদ।

আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি যে, শ্রীমতী সরলা দেবীর যত্নে কলিকাতা ৭নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে এবং ৭নং পদ্মপুকুরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নামে পণ্যশালা স্থাপিত হইয়াছে। এই পণ্যশালাতে দেশীয় মহিলাদিগের কৃত শিল্পদ্রব্যাদি বিশেষভাবে রক্ষিত। অন্তঃপুরবাসিনীরা বেলা ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত নিজে যাইয়া বা পরিচারিকা পাঠাইয়া মনোনীত দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারেন। তখন স্ত্রীলোকের হস্তে দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও বিক্রয়ের ভার ন্যস্ত থাকে। এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হইতে দীন দুঃখী স্ত্রীলোকদিগকে সাহায্যদানও করা হয়। কোন স্ত্রী কলে শিলাই কর্ম্ম শিখিতে ইচ্ছু, অথচ তাহার কল ক্রয় করিবার অর্থসম্বল নাই, সে আবেদন করিলে তাহাকে সেই অর্থদানের ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতে পারে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে নানা প্রকার বস্ত্র ও শিল্প দ্রব্যাদি রক্ষিত। পুরুষদিগের জন্য ৬টা হইতে বেলা ১০টা এবং অপরাহ্ণ ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত উক্ত পণ্যশালার দ্বার খোলা থাকে।

নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মহোদ্যমী যুবক প্রচারক গয়া জিলা নিবাসী বলদেব নারায়ণ সিন্দুপ্রদেশের অন্তর্গত হয়দরাবাদ ও করাচি নগরকে বিশেষ প্রচারক্ষেত্র করিয়া কয়েক বৎসর সেদেশে ও কিয়ৎকাল হইল মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত আরব সাগর পশ্চিমোত্তরকূলস্থ মেঙ্গালোর নগরে মহাকার্য্য করিয়াছিলেন। মেঙ্গালোরে দলে দলে স্ত্রী পুরুষ তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি পারস্য রাজ্যের অন্তর্গত বোসায়ের নগরে যাইয়া পারস্য ভাষায় প্রচার করেন, এবং তথা হইতে তুর্কিস্থানের অন্তর্গত বসোরা নগরে যান। [illegible] মাহাত্ম্য প্রচারে তত্রত্য মোসলমান রাজ্যের সকলেই বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বসোরা হইতে তিনি মোসলমান সম্রাটদিগের প্রাচীন রাজধানী বগ্দাদনগরে গিয়াছিলেন। বিগত ২৫শে ভাদ্র শনিবার করাচি হইতে এক বন্ধু তারে নিদারুণ সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, ভাই বলদেব বগ্দাদনগরে ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অবিবাহিত পুরুষ ছিলেন, বিবাহের বিশেষ প্রলোভন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল কিছুতেই বিবাহিত জীবন গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহার অভাবে বিশেষ শোকসন্তপ্ত হইয়াছেন। নববিধান সমাজ এরূপ এক জন উৎসাহী প্রেমিক কর্ম্মঠ নির্ভীক প্রচারক হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কোন ব্রাহ্ম প্রচারক দুর্গম আরব ও পারস্য দেশে যাইয়া মোসলমানমণ্ডলীর মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া সমাদৃত হইতে সক্ষম হন নাই। তিনি একাকী নিঃসঙ্গ ভাবে গিয়াছিলেন। বোধ করি চিকিৎসা সেবা শুশ্রূষা কিছুই হয় নাই, কাহাকে মনের কথাও একটী বলিয়া যাইতে পারেন নাই। মঙ্গলময়ের নিগূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় বুঝা ভার।

সূচী।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২ টাকা মাত্র।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১০ম ভাগ] আশ্বিন, ১৩১১ ; অক্টোবর ১৯০২। [৩য় সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

যে নারী পতিপরায়ণা, পতিতে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন, সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে সতী বলে। কিন্তু আমরা একমাত্র পতিগতপ্রাণা নারীকে সতী বলিতে অক্ষম। পতিতে শ্রদ্ধা, প্রীতি, নিষ্ঠা আছে এমন নারী অজিতেন্দ্রিয়া কলহপ্রিয়া ঈর্ষান্বিতা অনৃতভাষিণী হইতে পারেন, তাঁহাকে কি সতী বলা যায়? যিনি সর্ব্বাঙ্গীণ সদ্ভাবাপন্না, যাঁহার জীবনে ও চরিত্রে শুদ্ধতা প্রস্ফুটিত, তিনিই সতী সাধ্বী। পত্নীনিষ্ঠ পুরুষ মিথ্যাবাদী ক্রোধী লোভী হইলে যেমন সৎপুরুষ ও সাধু সজ্জন শব্দের বাচ্য হয় না, তদ্রূপ অপূর্ণচরিত্রা নারীও কেবল পতিপরায়ণতায় সতীত্বের সম্মানলাভের যোগ্য হইতে পারে না।

তুমি জীবনে উচ্চ নীতি পালন না করিলে তোমার কথা, কার্য্য ও ভাব শুদ্ধ ও সৎ না হইলে কেবল তোমার পতিভক্তিতে তোমাকে সতী বলিতে পারিব না, উহাতে তোমার জীবনে কেবল আংশিক সতীত্ব প্রকাশ পায়।

ভগবদ্ভক্তি ধর্ম্মনিষ্ঠা উচ্চ নীতি ও চরিত্রের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য তোমার পতিপ্রেমের সহিত মিলিত হইলে আমরা তোমাকে দেবী প্রকৃতি সতী বলিয়া নমস্কার করিব। তুমি জীবনে সেই পূর্ণ সতীত্বের পরিচয়দান করিয়া—আদর্শ সতী হইয়া সকলের বরণীয়া হও, ইহাই প্রার্থনীয়।

গৃহলক্ষ্মী।

কোন গৃহস্থের পত্নীবিয়োগ হইলে সাধারণতঃ লোকে তাহার "গৃহশূন্য" হইয়াছে বলিয়া থাকে। সন্তান সন্ততি ও আত্মীয় অন্তরঙ্গে গৃহ পূর্ণ সত্বেও একমাত্র গৃহিণীর বিয়োগে "গৃহশূন্য", এই কথার বিশেষ অর্থ আছে। শাস্ত্রকার বলেন ;—"স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু নাবিশেষোঽস্তি কশ্চনঃ।" অর্থাৎ গৃহে স্ত্রী আর শ্রীতে—লক্ষ্মীতে কোন প্রভেদ নাই। গৃহিণীশূন্য গৃহ শ্রীহীন ; সে গৃহে গৃহলক্ষ্মী গৃহিণীর অভাব,সেই গৃহে শোভা সৌন্দর্য্যের অভাব, তাহা শ্মশানের আকার ধারণ করে। সালঙ্কারা সুসজ্জিতা রূপলাবণ্যবতী গৃহিণী যে গৃহের কর্ত্রীরূপে বিরাজমানা, তিনি আপন সৌন্দর্য্যচ্ছটায় গৃহের শোভা সম্পাদন করেন, সেই গৃহেই লক্ষ্মী বিরাজিতা, আর কান্তিলাবণ্যবিহীনা বসনভূষণপরিশূন্যা ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা গৃহিণী যে গৃহে বাস করেন, সেই গৃহ অলক্ষ্মীর আলয়, তাহার কোন সৌন্দর্য্য নাই, আমরা কি ইহাই মনে করিব ? না কখনই নহে। বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে কোন গৃহিণী গৃহলক্ষ্মী হইতে পারেন না, দৈহিক সৌন্দর্য্য না থাকিলেও যাহার জীবনের সৌন্দর্য্য আছে তিনিই গৃহলক্ষ্মী। সেই গৃহিণীর চরিত্রের পুণ্য প্রভায় পরিবারস্থ সকলের মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল হয়। তিনি নিজে শান্তিময়ী হইয়া পরিবারে শান্তিবিস্তার করেন। তাঁহার ভগবদ্ভক্তি, গুরুজনভক্তি, প্রীতিমধুরভাব,মুখের সুহাস্য,কথার মিষ্টতা সেবাপ্রিয়তা ও কার্য্যদক্ষতাদি গুণে তাঁহার পতি পুত্র কন্যা আত্মীয়স্বজনপ্রভৃতি নিত্য স্বর্গসুখ সম্ভোগ করে। গৃহলক্ষ্মী গৃহিণী নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মে, গৃহকর্ম্মে নিষ্ঠাবতী হইয়া থাকেন। তিনি অলস হইয়া বসিয়া বৃথা গল্প ও পরচর্চা করিয়া কালযাপন করেন না। সকল সৎকার্য্যে তাঁহার উৎসাহ ও অনুরাগ, এবং প্রাণের যোগ, গৃহের শান্তি শৃঙ্খলার প্রতি সর্ব্বদা তাঁহার সুদৃষ্টি। তিনি নিজের চরিত্রের সুদৃষ্টান্তে সন্তানাদিকে চরিত্রবান্ করেন, নিঃস্বার্থ নির্ম্মল প্রীতিপ্রভাবে স্বামীকে চির বশীভূত রাখেন ; তাঁহাদ্বারা অতিথি অভ্যাগত জনেরা আদৃত ও সেবিত হন। তিনি পরসুখে সুখ পরদুঃখে দুঃখ বোধ করেন। তাঁহার পুণ্যপ্রেমপ্রদীপ্তপ্রসন্নমুখমণ্ডল দর্শন করিলে, প্রীতি-মধুর বচন শ্রবণ করিলে সন্তাপিত প্রাণ শান্তিলাভ করে, বিষাদমলিন মুখে প্রসন্নতার জ্যোতি সঞ্চারিত হয়। এই রূপ গৃহলক্ষ্মী স্বীয় জীবন-জ্যোতিতে যে পরিবারকে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই পরিবার ধন্য, সেই পরিবার সুখী পরিবার। ঈদৃশী গৃহলক্ষ্মী— আদর্শ গৃহিণী ভূতলে বন্দনীয়া দেবী। তাঁহার গৃহে দেব দেবীর আবির্ভাব, তাঁহার উপর ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদবর্ষণ অবিরাম হইয়া থাকে।

বস্ত্রালঙ্কারে শোভিতা রূপগর্ব্বিতা গৃহিণী ইতস্ততঃ কোপকষায়িত কুটিল দৃষ্টিতে সগর্ব্বে সকলকে দেখিতেছেন ; দাস দাসী ও সন্তানাদির প্রতি সর্ব্বদা দুর্ব্বাক্যরূপ তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতেছেন, গৃহকর্ম্মে ঔদা-

সীন্য ও পরদুঃখে উপেক্ষা করিয়া থাকেন; আত্মসুখ ও বিলাস আমোদে পূর্ণ অনুরাগ প্রকাশ করেন; নিয়ত মিথ্যা কপটতাকে প্রশ্রয় দেন; নিন্দা কটূক্তিবিষে প্রতিবেশীদিগকে জর্জ্জরিত করেন তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলব্যাবহারে গৃহের সমুদায়ই উচ্ছৃঙ্খল ও অশান্তিপূর্ণ; দ্বেষ হিংসা কলহপ্রিয়তা ও নিষ্ঠুরাচারণে পরিবারস্থ সকলে ত্রাহি ত্রাহি শব্দে দূরে পলায়ন করিতে সমুদ্যত। তুমি কি এরূপ গৃহিণীকে গৃহলক্ষ্মী বলিবে? যে গৃহে এ প্রকার গৃহিণী বিদ্যমান, সেই গৃহে কি কোন সুখ বা সৌন্দর্য্য আছে? সে গৃহ কি পাপতাপের আলয় নয়? তবে গৃহিণীমাত্রই গৃহলক্ষ্মী নহেন। শাস্ত্রকার প্রথমোক্ত সুলক্ষণাক্রান্তা সতী সাধ্বী গৃহিণীকেই গৃহলক্ষ্মী বলিয়াছেন, শেষোক্ত দুরাচারা পাপাশয়া গৃহিণী তাঁহার লক্ষ্য নহে। এইরূপ কুগৃহিণীর অভাবে গৃহশূন্য হওয়া বরং প্রার্থনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক গৃহে গৃহলক্ষ্মী সুগৃহিণীর অভাব, বহু পরিবার কুগৃহিণীর দ্বারা ছিন্নভিন্ন দৃষ্ট হইতেছে।

প্রসিদ্ধ পারস্য কবি শেখ সাদি বলিয়াছেন, "জনেবদ্ দরসরায়ে মর্দ্দেনেকু, হম্ দরিন আলমে দোজখেও।" অর্থাৎ যে সাধু পুরুষ মন্দ স্ত্রীর সঙ্গে গৃহে বাস করেন, এই পৃথিবীতেই তাঁহার নরকযন্ত্রণা ভোগ হয়। কুস্ত্রীর সংসর্গে কিরূপ দুঃখ ক্লেশ ভোগ হয়, কবিবর নিজরচিত পারস্য পুস্তক গোলস্তানে নিজের জীবন কাহিনীতে তাহা এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন;—

"পলায়িত ক্রীতদাস ভাবিয়া আমাকে হলব নগরের কারাগারে বন্দী করা হইয়াছিল। আমি দুশ্চরিত্র বন্দী লোকদিগের সঙ্গে বস্ত্রনির্ম্মাণ ও মৃত্তিকা খননাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমার দুঃখ ক্লেশের একশেষ হইয়াছিল, কারাগারে দস্যু তস্কর প্রভৃতি দুষ্ট দুর্ব্বৃত্ত লোকদিগের সঙ্গে অবস্থিতি করিয়া আমি অন্তরে বড়ই অশান্তি ভোগ করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন আমার একজন পুরাতন বন্ধু বন্দীলোকদিগের সঙ্গে আমাকে দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সাদি, এ কি ব্যাপার!' আমি বলিলাম, কুচরিত্র লোকের সঙ্গে কুসুমোদ্যানে বাস করিলেও নরকবাসতুল্য যন্ত্রণাদায়ক, সাধু সজ্জনের সঙ্গে কারাগারে বাস হইলেও যেন স্বর্গলোকে বাস হয়। আমি কারাগারে এই সকল কুচরিত্র লোকের সঙ্গে দিবারাত্রি বাস করিয়া নরকযন্ত্রণা অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। বন্ধু আমার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি শতমুদ্রা ব্যয় করিয়া আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন, এবং সাদরে সঙ্গে করিয়া নিজ-গৃহে লইয়া আসিলেন। পরে তিনি আপন যুবতী কন্যাকে একশত টাকায় কাবিনে, (দানপত্রের অঙ্গীকারে) আমার পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করিয়া দিলেন। সেই যুবতী অতিশয় অপ্রিয়ভাষিণী ও কলহকারিণী ছিল, সে সর্ব্বদা গাল দিয়া আমাকে বলিত, 'তুইতো ক্রীতদাস, সে দিন আমার বাবা তোকে একশত টাকায় খরিদ করিয়াছে।' এইরূপ

কোপনস্বভাবা কলহ-প্রিয়া অপ্রিয়বাদিনী গৃহিণীলাভে আমার দুঃখের একশেষ হইয়াছিল, বরং কারাগার ভাল ছিল। আমার কারামুক্তিজনিত আনন্দ এইরূপ কুপত্নী-লাভে মহাবিষাদে পরিণত হইয়াছিল। আমি তাহার কথার উত্তরে বলিয়াছিলাম, প্রেয়সি, সত্য বটে তোমার পিতা আমাকে কারাগার হইতে শত মুদ্রা ব্যয়ে মুক্ত করিয়াছেন,কিন্তু আবার শত মুদ্রায় তোমার হস্তে বন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। আমার দশা সেই মেষের দশার ন্যায় ঘটিয়াছে। অরণ্য প্রান্তে একটি মেষকে ব্যাঘ্রে আক্রমণ করিয়াছিল, একজন পথিক তাহা দেখিয়া ব্যাঘ্রকে তাড়াইয়া তাহার আক্রমণ হইতে বিপন্ন মেষটিকে মুক্ত করে,এবং সেই নিরীহ পশুকে গৃহে লইয়া আসিয়া তাহার কণ্ঠে ছুরিকা চালাইতে প্রবৃত্ত হয়। তখন উপায়হীন মেষ কাতর স্বরে বলে, তুমি আমাকে ব্যাঘ্রের নখ দন্তের আক্রমণ হইতে মুক্ত করিয়াছ, এক্ষণ দেখিতেছি, তুমি স্বয়ং ব্যাঘ্র। কল্যাণি, আমার প্রতি তোমার পিতার ব্যবহার সেই পথিকের নির্দ্দোষ মেষের প্রতি ব্যবহারের ন্যায় হইয়াছে। ঋষিপ্রকৃতি কবিবর শেখসাদি যেরূপ গৃহিণী পাইয়াছিলেন, অনেকের ভাগ্যে এরূপ গৃহিণী ঘটিয়া থাকে। কোন কোন গৃহিণী শান্ত শিষ্ট পতিকে জুত ঝেঁটার আঘাতে সম্মানিত করিয়াছেন, ইহা আমরা জানি। গ্রীষ দেশের জগন্মান্য মহাদার্শনিক পণ্ডিত সাধু সক্রেটিসের পত্নী জেন্টপী ছিলেন, তাঁহার অতিশয় রুক্ষপ্রকৃতি ছিল, তিনি সর্ব্বদা কটুক্তি ও কলহ করিতেন, তাহার বিবাদ কলহে গৃহ অশান্তিময় ছিল, তিনি শান্ত সহিষ্ণু স্বামীর উপর হস্তচালনা পর্য্যন্ত করিতেন। একদিন সাধু সক্রেটিস তাঁহার বাক্য-জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন, এমন সময় জেন্টপী সবেগে গৃহের ছাদের উপর উঠিয়া সক্রেটিসের মস্তকে এক হাঁড়ী ময়লা জল ঢালিয়া দেন। সক্রেটিস সেই দুর্গন্ধ ময়লা জলে অভিষিক্ত হইয়া ঈষদ হাস্য করিয়া শান্তভাবে বলিলেন, "যখন এত গর্জ্জন হইয়াছে, তখন বর্ষণ হইবেইতো।" এরূপ গৃহিণীকে গৃহলক্ষ্মী কে বলিতে পারে? অবশ্য এই প্রকার গৃহিণী অলক্ষ্মী ও গৃহ পরিবারের জঞ্জাল। তোমরা সাধ্বী সুগৃহিণী হইয়া চরিত্রের আলোকে গৃহ পরিবারকে সমুজ্জ্বল কর, পরিবারস্থ সকলের মনে শান্তি আনন্দ বিস্তার কর, এবং নির্ম্মল সুখ ভোগ কর, গৃহলক্ষ্মী দেবীরূপে সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রাপ্ত হও; ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

ব্রহ্মবাদিনী ও স্ত্রীপ্রজ্ঞা নারী।

"ব্রহ্মবাদিনী" ও "স্ত্রীপ্রজ্ঞা" এই দুই শ্রেণীতে সাধারণতঃ নারী জাতি বিভক্ত। যে ধর্ম্মানুরাগিণী নারী ভগবৎ-প্রসঙ্গ করিতে ও শুনিতে এবং ভগবদর্চ্চনাতে ও নানা ধর্ম্মকর্ম্মে এবং সাধন ভজনাদিতে অনুরাগ প্রকাশ করেন, তিনি ব্রহ্মবাদিনী। যে স্ত্রীর গৃহকর্ম্মে, রন্ধন পরিবেশনে, আত্মীয় কুটুম্বদিগকে ভোজ্যদানে ও অভ্যাগত লোকদিগের অভ্যর্থনাদিতে, অর্থসঞ্চয়

ও তাহার ব্যবহারে আগ্রহ ও নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, তিনি স্ত্রীপ্রজ্ঞাশ্রেণীর অন্তর্গত। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই ভার্য্যা ছিলেন। এক জনের নাম মৈত্রেয়ী অপরের নাম কাত্যায়নী ছিল। মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী, কাত্যায়নী স্ত্রীপ্রজ্ঞালক্ষণাক্রান্তা নারী ছিলেন। মহর্ষি যোগসাধনার্থ বনপ্রস্থানে সমুদ্যোগী হইয়া আর্য্যা মৈত্রেয়ীকে গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক বিষয় সম্পত্তি সংরক্ষণ ও ভোগ করিতে বলিয়াছিলেন। তাহাতে মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করেন, "যন্নু ম ইয়ম্ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাত কথং তেনামৃতা স্যামিতি।" অর্থাৎ হে ভগবন্, যদি ধনেতে পূর্ণ এই সমগ্র পৃথিবী আমার হয় তবে তাহাদ্বারা কি আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তদুত্তরে বলিলেন, "নেতি—যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং তথৈবতে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেনেতি।" অর্থাৎ ভাগ্যবান্ ধনবান্ লোকদিগের জীবন যেরূপ, তোমার জীবনও সেইরূপ হইবে। ধন দ্বারা অমৃতত্বলাভের আশা নাই। ইহা শুনিয়া ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্। যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।" অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব? এ বিষয়ে আপনি যাহা জানেন তাহাই আমাকে বলুন। পরে আর্য্যা মৈত্রেয়ী স্বামী সহবাসে থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ তপস্যায় যোগ দিলেন, এবং কাত্যায়নী দেবী গৃহবাসিনী হইয়া বিষয় সম্পত্তি ভোগ ও বিতরণে উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

দেবনন্দন যিসু ভ্রমণ ও প্রচার করতঃ অতিশয় শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পল্লীবিশেষের এক গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই গৃহে মেরী ও মার্থানাম্নী দুইটী ভগিনী বাস করিতেছিলেন। মেরী ব্রহ্মবাদিনী ও মার্থা স্ত্রীপ্রজ্ঞা নারী ছিলেন। মেরী দেবাত্মা যিসুকে স্বাগত দেখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন, এবং তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া শ্রদ্ধা ও আগ্রহসহকারে তাঁহার মুখে অমূল্য পরমার্থ তত্ত্ব শ্রবণ করিতে লাগিলেন। মার্থা এ বিষয়ে কিছুই লক্ষ্য না করিয়া যিসুকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইবার জন্য নানাপ্রকার সুরস খাদ্য সামগ্রীর আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন, যাহাতে তাঁহার শ্রান্তি দূর ও পরিতৃপ্ত ভোজন হয় তজ্জন্য প্রাণগত যত্ন করিতে লাগিলেন, এবং ভগ্নী মেরী তাঁহার সঙ্গে রন্ধনাদি কার্য্যে যোগ না দিয়া বসিয়া কেবল তত্ত্ব কথা শুনিতেছেন দেখিয়া বিরক্ত হইলেন, এবং অনুযোগ করিয়া এরূপ বলিলেন, "ভগিনি, প্রভু দয়া করিয়া আমাদের গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, আমাদিগের কত সৌভাগ্য! এ কি তুমি তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল বসিয়া কথা শুনিতেছ, আর আমি পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণ কি এরূপ বসিয়া প্রভুর মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকিবার সময়?" মার্থার এই অনুযোগ বাক্য শুনিয়া শ্রীযিসু বলিলেন, "মেরীর প্রতি আমি বিশেষ সন্তুষ্ট, তিনি

তত্ত্বসুধাপানে অনন্ত জীবনের সম্বল করিয়া আমার প্রতি যথার্থ আদর শ্রদ্ধা ও আমার প্রকৃত সেবা করিতেছেন। শুধু ভোজন পানে কি আমার পরিতোষ হয়?

প্রাচীন শ্রেণীর হিন্দু মহিলাদিগের মধ্যে ব্রহ্মবাদিনীপ্রকৃতিসম্পন্না অনেক মহিলা দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহারা ভগবৎ-পূজা বন্দনা ও ব্রতসাধনাদিতে নিত্য অনুরাগ প্রকাশ করেন, ভাগবত ও মহাভারতাদি শাস্ত্রে ধর্ম্ম কথা—হরিগুণ কীর্ত্তনশ্রবণে তাঁহাদের আনন্দ হয়, ধর্ম্মোদ্দেশ্যে তাঁহারা নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ স্বীকার করিয়া থাকেন, দেবভক্তি সাধুভক্তি তাঁহাদের চরিত্রের অলঙ্কার, তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য সর্ব্ববিধ ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তুত। যে যে বিষয়ে তাঁহাদের অজ্ঞানতা ও ভ্রম কুসংস্কার আছে, আমরা তাহার উল্লেখ করিতে চাহি না। তাঁহাদের জীবন যে,ধর্ম্মভাবাপন্ন বৈরাগ্যমূলক ভক্তিপ্রবণ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হিন্দুসমাজে স্ত্রীপ্রজ্ঞা শ্রেণীর নারী অনেক আছেন। তাঁহারা অভ্যাগত জনের প্রতি আদর অভ্যর্থনায় উৎসাহযুক্ত, আত্মীয় কুটুম্ব দিগকে পরিতৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইতে আগ্রহ করেন, গৃহকার্য্যে ও রন্ধনাদিতে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। শিষ্টাচার, সৌজন্য ভদ্রতায় সংসারে তাঁহাদের অতিশয় খ্যাতি। "বিভর্ত্তায়প্রদানেন কুটুম্বঞ্চৈবনিত্যদা।" এই স্ত্রীপ্রজ্ঞা শ্রেণীর নারী অন্নদান করিয়া নিত্য কুটুম্বদিগকে প্রতিপালন করেন। কিন্তু কেবল ব্রহ্মবাদিনী হইলে বা কেবল স্ত্রীপ্রজ্ঞা-প্রকৃতি লাভ করিলে জীবনের পূর্ণতা হয় না। যে জীবনে উভয় ভাব ও উভয় প্রকৃতির সম্মিলন ও পূর্ণ বিকাশ সেই জীবনই পূর্ণ। যিনি কেবল ভগবানের নামগুণকীর্ত্তনে ও পূজার্চ্চনায় রত, পর প্রীতি ও পরসেবাতে বিমুখ, গৃহকর্ম্মাদিতে অপটু সেই নারীর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পূর্ণ জীবন কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? যে নারী ভগবৎপ্রেমে বঞ্চিত ধর্ম্ম কর্ম্মে ও পূজার্চ্চনায় পরাঙ্মুখ, কেবল সাংসারিক কাজ কর্ম্মে লোকসেবায় লোকরঞ্জনে অনুরক্ত, তাঁহার জীবনের অপূর্ণতা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। উভয় প্রকৃতির মিলনে নারীজীবনের যে কি সৌন্দর্য্য হয় তাহার বর্ণনা হয় না। নব্য নারী-সমাজে ব্রহ্মবাদিনী নারী অত্যন্ত অল্প লক্ষিত হয়, অনুসন্ধান করিয়া বড় পাওয়া যায় না। স্ত্রীপ্রজ্ঞা শ্রেণীর মহিলা অনেক আছেন। কেবল আপনাকে লইয়া ব্যস্ত বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিয়া আত্ম সুখে রত, জগতের প্রতি উদাসীন, অন্তর্দৃষ্টিবিহীন এরূপ নারীই অধিক। ইঁহারা ব্রহ্মবাদিনীও নহেন, স্ত্রীপ্রজ্ঞা শ্রেণীভুক্তও নহেন। ইঁহাদের যে কিরূপ সংজ্ঞা হইবে জানি না। প্রাচীন ও নবীন শ্রেণীর অনেক স্ত্রীপ্রজ্ঞা নারী আত্মীয় বন্ধুদিগকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইতে বিশেষ যত্ন আগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আগ্রহ ও যত্ন এতদূর সীমা অতিক্রম করে যে ভোক্তার ভোজনের ক্ষমতা ও তাহার জীর্ণকারিণী শক্তির প্রতি তাঁহারা একেবারে দৃষ্টি রাখিতে পারেন না। নির্ব্বন্ধ অনুরোধ

সহকারে কতকগুলি কুপথ্য ভোজন করাইয়া তাঁহাকে অজীর্ণ রোগে রুগ্ন ও চিকিৎসাধীন করিলে তাঁহার প্রতি আদর হয় না, অত্যাচার হয়। এরূপ স্নেহ ভালবাসার ফল তাঁহাকে অনেক দিন ভোগ করিতে হইয়া থাকে। এমন উদর পরায়ণ ভোজনবিলাসী লোক আছেন যে, অনুরোধ উপরোধে গুরু ভোজন ও কুপথ্য ভোজনে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত করিলে তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার হয় না, বরং স্নেহ প্রেম প্রকাশ পায়। আমাদের একজন বন্ধু ছিলেন, তিনি নিয়মিত পূর্ণ ভোজনের উপর সোপকরণ ৫০। ০ খানা লুচি অনায়াসে উদরস্থ করিতেন। পূর্ব্বাঞ্চল বিক্রমপুরে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ আছেন যে, তাঁহারা এক হাঁড়ী দধি ৫।৬ সের ক্ষীর উপযুক্ত চিড়ে মুড়কীর সহিত এক যোগে ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উদরের আয়তন যে কত বড় বুঝিয়া উঠা যায় না। কোন স্ত্রীপ্রজ্ঞা মহিলা কোন আত্মীয়কে ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিতেছেন, ইতিমধ্যে ভোক্তা আত্মীয় কোন ব্যঞ্জনের স্বাদ গ্রহণ করিয়া যদি বলেন, এই ব্যঞ্জনটি বেশ সুস্বাদ হইয়াছে, তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণে সেই ব্যঞ্জন তাঁহার ভোজ্যপাত্রে চাপিয়া দেওয়া হয়, এবং তাহা ভক্ষণ করিবার জন্য তিনি বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হন। যেরূপে হউক উহা গলাধঃকরণ না করিলে তাঁহার গত্যন্তর নাই। এ কারণে আমরা ভোজনে বসিয়া গৃহিণীর সাক্ষাতে কোন বিশেষ ব্যঞ্জনের প্রশংসা করিতে সাবধান হই। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভুলক্রমে প্রশংসাসূচক কথা উচ্চারণ করিয়া আমরা অনেক সময় বিপদগ্রস্ত হইয়াছি। স্ত্রীপ্রজ্ঞা শ্রেণীর গৃহিণী ভোজ্যসামগ্রী পরিবেশন করিতে যাইয়া এরূপ করেন, তাহা কতক শোভা পায়, কিন্তু অনেক পুরুষকেও এই শ্রেণী ভুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্প্রতি আমরা উৎসবোপলক্ষে উত্তর বঙ্গের নগরবিশেষে কোন বন্ধু কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। আমরাগাছিনিবাসী আশুতোষ রায় এবং অপর দুইটী যুবা বন্ধু আমাদের সঙ্গে ছিলেন। উৎসবের শেষ দিবস প্রায় বেলা ২টার সময় আমরা ভোজন করিতে বসি। প্রথমতঃ অন্নের সঙ্গে সুকত ডাইল ডালনা প্রভৃতি সাধারণ ও সহজ খাদ্যোপকরণ সকল আমাদের পাত্রে পরিবেশন করা হয়। পরিবেশন পুরুষেরাই করিয়াছিলেন, তাহাতে মহিলাদের কোন যোগ ছিল না। আমরা প্রথমতঃ ভাবিয়াছিলাম যে, ভোজ্যজাতের অধিক আড়ম্বর নাই। আমরা উপস্থিত ডাইল ডালনা প্রভৃতি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি ও এক প্রকার উদর পূর্ণ করি। ইতি মধ্যে ভুনা খিচুড়ী, লুচি, পায়স ও বাজারের বিবিধ মিষ্টান্ন উপস্থিত করা হইল, এ সকল দেখিয়া আমাদের চক্ষুঃস্থির হইল। আমরা পূর্ব্বে এ সকল আয়োজন আছে জানিলে প্রথম হইতে সাবধান হইয়া ভোজন করিতাম। এক্ষণ পূর্ণ ভোজনের পর এ সকল জিনিসকে কোথায় স্থান দান করি। আমাদিগের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বে গৃহস্বামীর ইঙ্গিত মতে তাহা আমাদিগকে পরিবেশন

করিয়া দেওয়া হইল। তাহা ভক্ষণ করিতে হইবে ভাবিয়া আমরা চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। বহু যত্নে, বহু অর্থে ও বহু পরিশ্রমে প্রস্তুত সে সকল খাদ্য-সামগ্রী ভক্ষণে উপেক্ষা করিলে গৃহ-স্বামীর অত্যন্ত মনোতুঃখ হইবে, তাঁহার সম্মানরক্ষা ও দুঃখনিবারণের জন্য নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে কিছু কিছু খাইতে বাধ্য হওয়া গেল। তাহাতে আমাদের অনেক অতিরিক্ত ভোজন হইল। সে দিন বেলা ৩টার সময় সবডিপুটী বাবুর আবাসে যাই বার আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা কয়েকটি বন্ধু সমবেতভাবে সেই গুরু ভোজ-নের অব্যবহিত পরেই সেখানে গেলাম, ভাবিয়াছিলাম, সেস্থানে সংপ্রসঙ্গাদি হইবে। আমরা গিয়া দেখি মহা ব্যাপার! কামানের গোলার মত বড় বড় রসগোল্লা বা ছানা বড়া খাস্তা সিঙ্গাড়া বড় বড় পান্তোয়া প্রভৃতিতে পাত্র পূর্ণ করিয়া এক এক জনের জন্য সজ্জিত করা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সোডাওয়াটার লিমোনেট বরফ ইত্যাদিও আছে। এজন্য সবডিপুটী বাবু বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া তো আমাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, আমরা আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। আসনে বসা গেল, অন্ততঃ কিছু খাইতেই হইবে, না খাইলে ছাড়ে কে? খাইতে বসিয়া দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা মনে হইল, তিনি আচার্য্য কেশব-চন্দ্রের ভবনে ২। ৩ খানা লুচি খাইয়া বলি-য়াছিলেন, "আর আমার উদরে স্থান নাই, কণ্ঠদেশপর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়াছে!" কিন্তু কেহ কেহ মিষ্টান্ন খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তিনি বলিলেন, "আর কিছুই পেটে যাইবে না, তবে এক খানা জিলিপি হইলে খাইতে পারি।" জিলিপি তাঁহার বড় প্রিয় সামগ্রী ছিল। এক জন বন্ধু তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "আপনি বলিতেছেন, আমার পেটে স্থান নাই, কণ্ঠ পর্য্যন্ত পূর্ণ, তবে জিলিপির স্থান কেমন করিয়া হইবে।" তিনি বলিলেন, "ভাই, রাস্তায় লোক জন গাড়ী ঘোড়ার মহা ভীড়, একটি লোক প্রবেশ করিবে সাধ্য নাই, কিন্তু ইতি-মধ্যে লাটসাহেবের গাড়ী আসিলে, সকলেই সরিয়া তাহার জন্য স্থান করিয়া দেয়। জিলিপি লাট সাহেবের গাড়ীর মত, তাহা পেটে প্রবেশ করিবার কালে অপর খাদ্য সামগ্রী সকল সসম্ভ্রমে সরিয়া তাহার জন্য স্থান করিয়া দিবে।" তখন বিবিধ ভোজ্যজাতে পূর্ণ আমাদের উদরের সেরূপ অবস্থা ছিল না যে, বড় বড় রসগোল্লা ছানাবড়া ইত্যাদিকে উক্ত জিলিপির ন্যায় স্থান করিয়া দিবে। রোগের ভয়ে হাকিম বাবুর অর্থ ব্যয় ও আদর যত্নকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া তাঁহার মনে ক্লেশদান করিতে পারা গেল না। মিষ্টান্নাদির অত্যল্প অংশ কোনরূপে গলাধঃকরণ করা গেল। বোধ করি আমা-দের মধ্যে কেবল আশুতোষই সেই সকল মিষ্টান্নের কিঞ্চিৎ সদ্গতি করিয়া গৃহস্বামীর সন্তোষসাধন করিয়াছিলেন। সেই দিনই রাত্রিতে ভোজনান্তে কলিকাতা উদ্দেশ্যে নৌকারোহণে ষ্টীমার ঘাটে যাত্রা করা নির্দ্ধরিত। তত্রত্য প্রসিদ্ধ বৈদ্য চিকিৎসক মহাশয়ের আবাসে আমাদের নৈশিক

ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। রাত্রি দশটার সময় ভোজন করিতে বসা যায়। প্রথমতঃ অন্নের সহিত ডাইল ডালনা ইত্যাদি অল্প কয়েকটি সামান্য উপকরণ পরিবেশিত হয়। তাহা দেখিয়া আমাদের আহ্লাদ হইয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম কবিরাজ মহাশয় বৃথা আড়ম্বর ও অতিরিক্ত আয়োজন করেন নাই, ভোজন সমাপ্ত করিয়া পাত্র পরিত্যাগ করিব, এমন সময়ে দেখি পুঞ্জ পরিমাণে লুচি মিষ্টান্নাদি উপস্থিত। পূর্ব্বে এরূপ ব্যাপার জানিলে সাবধান হওয়া যাইতে পারিত। এক্ষণ চক্ষুঃস্থির, নিরুপায়। বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয় স্বহস্তে মিষ্টান্নাদি পরিবেশন করিতে লাগিলেন, এবং দৃঢ় অনুরোধ করিলেন, ইহা খাইতেই হইবে। "অতি ভোজনং রোগমূলম্ আয়ুঃক্ষয়করম্।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই মহা বাক্য পুস্তকে পড়িয়াছিলাম। তাহা এক্ষনও মনে জাগিতেছে। আমরা নিতান্ত আপত্তি করিলে ও অনিচ্ছা জানাইলে, কবিরাজ মহাশয় এক একটি পরিপাকের বড়ী আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "এই ঔষধ সেবন করিবেন, সমুদায় মিষ্টান্ন জীর্ণ হইয়া যাইবে। তাঁহার দৃঢ়তর অনুরোধে বিষভক্ষণের ন্যায় কিছু কিছু মিষ্টান্ন ভক্ষণ করা গেল। অত কুপথ্যের বিকারে কি এক বিন্দু ঔষধ—ক্ষুদ্র বটিকা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে? ইহাতেই আমাদের অজীর্ণ দোষ জন্মিল। ৩ দিন লঘু পথ্যাদি করিয়া কোনরূপে রোগমুক্ত হওয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয় আশুতোষের সম্মুখে পুঞ্জ পরিমাণ উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন উপস্থিত করিলে তিনিও হার মানিয়া বলিলেন, "আমাকে কলার পাতা দিন আমি ইহা নষ্ট করিব না, পরে ইহার সদ্ব্যবহার করিব।" আশুতোষ মিষ্টান্নগুলি কদলী পত্রে জড়াইয়া পুটুলি বাঁধিয়া সঙ্গে লইলেন। তিনি যত্নপূর্ব্বক তাহা সঙ্গে রাখিয়াছিলেন, জাহাজে বা গাড়ীতে তাহার একটুকও তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে দেখা যায় নাই। তিনি সেই উপাদেয় রসগোল্লাদি নিজে না খাইয়া কলিকাতায় সযত্নে আবাসে লইয়া গিয়া নবপরিণীতা প্রিয়তমা পত্নীকে বা অন্য কোন প্রিয়জনকে সাদরে উপহার দিয়াছিলেন।

উপরি উক্ত ভোজ্যদাতৃগণ পুরুষ হইলেও স্ত্রীপ্রজ্ঞা শ্রেণীর লোক। পাঠিকা, ক্ষমা করিবেন, স্ত্রীপ্রজ্ঞাশ্রেণীর মহিলাদের বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া ঘটনাবশতঃ আমরা সেই শ্রেণীর পুরুষদিগের অনেক কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম, এবং তাহাতেই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। কেন না আমরা তাঁহাদিগের দ্বারা সম্প্রতি বিশেষ ভুক্তভোগী হইয়াছে।

ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া দেহে বল বিধানের জন্য বিধাতা ভোজনের বিধি করিয়াছেন। ক্ষুধার উদ্রেক না হইতে ভোজন, অতিরিক্ত ভোজন বা কুপথ্য ভোজন বিধাতার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কার্য্য। তাহাতে খাদ্য বস্তু দেহে বিষের ন্যায় কার্য্য করে, শোণিত বিকৃত করিয়া নানা রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে, এবং অকাল মৃত্যু সংঘটন করে। এ বিষয়ে অনেক ভোজদাত্রী ও ভোজদাতার জ্ঞানের

বড় অভাব। তাঁহারা নিমন্ত্রিত ব্যক্তির ক্ষুধা ও ইচ্ছার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কতকগুলি রসনাপ্রিয় রোগজনক অসার খাদ্য বস্তু অনুরোধ ও উপরোধে তাঁহাকে খাওয়াইতে পারিলে যেন কৃতার্থ হন, পরে সে মরুক বা বাঁচুক তাহাতে কিছু আইসে যায় না। এরূপ ভোজ্যদানে না অর্থের সদ্ব্যবহার হয়, না কোন পুণ্য হয়। যে সকল লোক ভোজনসাধন করিয়া সিদ্ধপুরুষ হইয়াছেন, প্রচুর কুপথ্য ভোজনেও সহজে যাঁহাদের কিছুই হয় না, সেইরূপ ভোজনবিলাসী ঔদরিক লোকদিগকে, পাঁচ সাত সের লুচি মণ্ডা পায়স পলান্ন ভোজন করাইয়া তাঁহারা আনন্দলাভ করুন, তাহাতে দুঃখ নাই।

দাদামহাশয় ও নাতনী।

সরলা। দাদামশাই, আজ কি বলিবেন বলুন, আপনার কথা শুনে অনেক বিষয় বেশ বুঝিতে পারি।

দাদামহাশয়। গতবারের বিষয় "Cleanliness is next to Godliness" সম্বন্ধে সকল কথা বলা হয় নাই, আজ আরো কিছু বলে শেষ করিব। আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বস্ত্রাদি ব্যস ভবন ও বাসস্থান কিরূপে পরিষ্কার রাখিতে হয়, এবং তাহার ফলে আমাদের সুখ স্বাস্থ্য কিরূপ রক্ষিত হয় তাও বলেছি, কিন্তু মনকে বশ করিতে না পারিলে এবং শুদ্ধ না রাখিতে পারিলে বাহ্য শুচিও রাখা যায় না। মন ও শরীরের পরস্পর বড় যোগ আছে। মন ভাল থাকিলে শরীর ভাল থাকে, শরীর ভাল থাকিলে মন ভাল থাকে।

সরলা। সে কেমন বুঝায়ে বলুন, আমি এটা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

দাদামহাশয়। আচ্ছা দিদি, বলিতে চেষ্টা করি। আচ্ছা বল দেখি গত সপ্তাহে এক দিন তোমার পড়া ভাল করে মুখস্থ হয় নাই কেন?

সরলা। সেদিন আমার সর্দ্দি হয়ে বড় মাথা ধরেছিল, তাই ভাল করে মন দিয়ে পড়িতে পারি নাই।

দাদামহাশয়। বেশ এখনত অনেকটা জানিতে পারিলে শরীর দুর্ব্বল অসুস্থ থাকিলে মনটাও দুর্ব্বল হয়ে যায়। আবার দেখ মনটা ঠিক না থাকিলে শরীরটাও ঠিক থাকে না। তোমার কি মনে আছে, এক দিন তোমার পিসীমা বামুন ঠাকুরের উপর রাগ করে বকাবকি করে ছিলেন, সেজন্য তাহার এত মাথা ধরে ছিল ও বুক দুর দুর করেছিল যে, তিনি সেদিন আমাদের পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিতে পারিলেন না। এরূপ অনেক সময় অনেক লোকের হয়ে থাকে। আমাদের রাম বাবু বড় ভাল লোক, তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সহৃদয়, কিন্তু তাঁহার পুরাতন অজীর্ণ Dyspepsia রোগ আছে, সে জন্য তাঁহার মেজাজটা বড় খিটখিটে হয়ে গেছে; একটুতেই রেগে উঠেন। আর ডাক্তার বাবু বলেন যে, তাঁর মেজাজ অত রুক্ষ বলে ঔষধে তত উপকার হচ্ছে না। দেখ পেটের অসুখ তাঁর রাগের কারণ। আবার রাগ তাঁর পেটের অসুখ না সারিবার

একটা কারণ। দেখিলে শরীর ও মনের কেমন যোগ?

সরলা। হাঁ দাদামহাশয়, অনেকটা বুঝিলাম, কিন্তু এত বড় মুস্কিলের কথা।

দাদামহাশয়। হাঁ দিদিমণি, সচ্চরিত্র হইয়া জীবন কাটান কি সহজ কথা? কিন্তু ঈশ্বর এমনই করুণাময় যে, যে লোক ভাল হতে চেষ্টা করে তিনি স্বয়ং তাহাকে সাহায্য করেন। মানুষের কাছে তিনি কেবল সরল চেষ্টা ও প্রার্থনা চান।

সরলা। আচ্ছা, দাদামহাশয়, বলুন দেখি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে কেমন করে মনের উপকার হয়।

দাদামহাশয়। বেশ প্রশ্ন করেছ, আমি ঐ বিষয় বলিতে যাইতেছিলাম। শরীর ইত্যাদি পরিষ্কার রাখিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়। এই নিয়ম পালন করিয়া চলিলে মনের অনেক প্রকার উপকার হইয়া থাকে।

স্বেচ্ছাচারিতা;—যখন যা ইচ্ছা হয় তাই করা। এই স্বেচ্ছাচারিতা বড় দোষ, এই দোষে কত বালক বালিকা কত নর নারী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদের যখন যাহা ইচ্ছা হবে তাই করিব, এরূপ ঈশ্বরের বিধি নয়। যাহা করা উচিত যাহা করিলে ভাল হয় তাই করিতে হইবে। ঠিক পথ যাতে মানুষ চিনতে পারে সে জন্য ঈশ্বর কত বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভাল মন্দ বুঝিবার জন্য বিবেক বা হিতাহিত জ্ঞান দিয়াছেন, এবং কত প্রকার সামাজিক ব্যবস্থা করেছেন। বালক বালিকা যুবক যুবতীদের সহায়তার জন্য পিতামাতা গুরুজন দিয়াছেন। অল্পবয়স্ক ও অল্পবুদ্ধিদের পক্ষে পিতা মাতা গুরুজনের উপদেশ শুনে চলা উচিত, এবং পিতা মাতা ও গুরুজনদের যথাজ্ঞান যথা সাধ্য সুকোমলমতি বালক বালিকাদিগের সৎপথে চালান উচিত। এই জন্য আমি তোমাকে তোমার পিতা মাতা এবং আমার কথা শুনে চলিতে বলি।

সরলা। আপনাদের উপদেশ শুনিতে আমি সর্ব্বদা চেষ্টা করি, কিন্তু আপনাদের অনেক কথা আমি প্রথমে বুঝিতে পারি না, তাই তত মন লাগে না। আপনার সঙ্গে কথা বার্ত্তা করিলে আপনাদের উপদেশের অনেক বিষয় বেশ বুঝিতে পারি, আর মনেও বেশ লাগে।

দাদামহাশয়। হাঁ তাতো ঠিক, কেবল উপদেশ দিলে কি হবে, বুঝাইয়া দিতে হয়, আর করাইয়া লইতে হয়। দেখ স্বেচ্ছাচারিতা যতই দমন হয় ততই মনের অনেক গুলি ভাল ভাল শক্তি বাড়িতে থাকে। (Will ইচ্ছাশক্তি, যে শক্তি দ্বারা আমরা ভাল কাজ করিতে পারি) তুমি যখন বেশ বড় হবে, আর যখন দর্শন শাস্ত্র পড়িবে তখন বুঝিবে যে ইচ্ছাশক্তির কত প্রভাব। নিয়মিত স্বাস্থ্যের পক্ষে চলিতে গেলে রাগ হিংসা লোভ এবং অন্যান্য অনেক নীচ প্রবৃত্তি দমন করিতে হয়, তাতে মনের বেশ উপকার হয়, ডাক্তারেরা বলেন, আমরা যে পরিমাণে নীচ ভাবের মত দ্বারা চালিত হই সেই পরিমাণে আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, সেই পরিমাণে মনের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

বোধ হয় এখন তুমি ঐ প্রবাদ বাক্য Cleanliness next to Godliness বিষয়টি অনেক বুঝিলে। যাহার শরীর মন এরূপ গঠিত হয় সে সহজেই ঈশ্বর-পরায়ণ এবং ঈশ্বরভক্ত হয়, বাহ্য শুচি ক্রমেই মনশুদ্ধি ও ঈশ্বর পরায়ণতা আনিয়া দেয়।

সরলা। দাদামহাশয়, আপনি এত কথা কোথা থেকে জানেন?

দাদামহাশয়। দিদিমণি, তুমি যখন বড় হবে তখন আমার অপেক্ষা অনেক কথা জানিবে, এবং বলিতে পারিবে। তোমাদের শিক্ষার জন্য এখন যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা হইতেছে আমাদের সময় তার অর্দ্ধেকও ছিল না। তোমরা ঈশ্বরের কৃপাকুমারী হইয়া জন্ম লইয়াছ। তোমাদের অনেক সুবিধা, কিন্তু তোমরা এ সমস্ত সুবিধার যদি অপব্যবহার কর তবে তোমাদের দুর্গতির সীমা পরিসীমা থাকিবে না। Knowlege increaseth demanation জ্ঞানকৃত পাপের অধিক দণ্ড হয়। এ বিষয় তোমাকে কোন দিন ভাল করে বুঝাইয়া দিতে ইচ্ছা রহিল।

কাফ্রি বালিকা।

আমরা বিগত শ্রাবণ মাসে সচিত্র কাফ্রিনারীর বিশেষ বিবরণ পাঠিকাদিগকে উপহার দিয়াছি। এবার কাফ্রিবালিকার মুখচ্ছবি প্রকাশ করিয়া তাহার বিষয় কিছু লিখা যাইতেছে। এই বালিকা পূর্ব্বোক্ত নারীর কন্যা হইতে পারে। সাধারণ ভাবে কাফ্রি ললনাদের বিবরণ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে, অন্য কিছু বিশেষ লিখিবার নাই। তবে বালিকার অলঙ্কারের কথা কিছু লিখা যাইতেছে। কাফ্রি নারীরা ঘোরতর কৃষ্ণাঙ্গী অঙ্গ সৌষ্ঠবশূন্যা হইলেও অলঙ্কারপ্রিয়তায় জগতের অন্য নারীদিগকে পরাজয় করিয়াছে। তাহারা স্বীয় বালিকাদিগকেও পুঞ্জ পুঞ্জ অলঙ্কার পরাইয়া থাকে। বালিকার বক্ষঃস্থল হইতে উত্তমাঙ্গের ছবি মাত্র প্রকাশ করা গেল,

তাহাতে লক্ষ্য করিয়া দেখ কতগুলি হার শোভা বিস্তার করিয়াছে। এই সকল হারের অধিকাংশই বিশেষ বিশেষ সামুদ্রিক জীবের অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। সুবর্ণ বা মণি মুক্তার হার নয়, অন্য কোন মূল্যবান্ ধাতুর মালাও নয়। তাহার অনেক গুলি সামান্য মৃৎ-প্রস্তর কণিকাতে প্রস্তুত। অনেক কাফ্রি নারী স্থূল ওষ্ঠে বৃহৎ ছিদ্র করিয়া বাখারীর নথ পরিয়া থাকে। প্রকলেই কর্ণ যুগলে প্রকাণ্ড ছিদ্র করিয়া স্থূল প্রস্তর বা সীসের শলাকা তাহার ভিতরে পূরিয়া রাখে। পূর্ব্বে যে কাফ্রি নারীর ছবি প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠিকারা তাহাতে দেখিয়া থাকিবেন। সেই অপূর্ব্ব আভরণ পরিধানের জন্য বালি-কাটীর অঙ্গ এক্ষণ পর্য্যন্ত তত ক্ষত বিক্ষত করা হয় নাই। সাধারণতঃ অসভ্য স্ত্রী-লোকেরা উল্কী দ্বারা নিজেদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চিত্রিত করিয়া থাকে। ঘোরতর কৃষ্ণাঙ্গে উল্কী অদৃশ্য হইয়া পড়িবে ভাবিয়া বোধ হয় কাফ্রি নারীদিগকে উল্কীধারণের ক্লেশ বহণ করিতে হয় না। ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অভাব হইলে সভ্যাসভ্য সকল স্ত্রীলোকই কৃত্রিম সৌন্দর্য্যে আপনাদিগকে সুন্দরী করিবার জন্য কত ক্লেশ স্বীকার করে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কত ছিদ্র করিয়া থাকে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।

(শ্রীমতী প্রসন্নতারা গুপ্ত প্রণীত "পারিবারিক জীবন" পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।)

৫২ পৃষ্ঠার পর।

পিতার সহিত পুত্রের স্বভাবের যেমন নিকট সম্বন্ধ, মাতার সহিত কন্যারও তেমন। অতএব পুত্রকন্যার শিক্ষার ভার পিতা মাতার বিভাগ করিয়া লইতে হয়। পিতা যদি পুত্রের শিক্ষাসম্বন্ধে মনোযোগ না করেন আশানুরূপে শিক্ষালাভ পুত্রের পক্ষে অসম্ভব হয়। অতএব এবিষয়ে উদাসীন হওয়া পিতার অন্যায়। মাতা কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা ও অন্যান্য সৎশিক্ষা যথারীতি প্রদান করিবেন বটে, তৎসঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ম্ম শিখাইতে বিস্মৃত হইবেন না। ইহা নারীজীবনের বিশেষ কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য। কন্যাকেও এক সময় স্ত্রী হইতে হইবে, মাতা হইতে হইবে, গৃহিণী হইতে হইবে, সে সময় যেন ঠেকিতে না হয়। সন্তানের বয়োবৃদ্ধিসহকারে মানসিক বৃত্তি সকল সতেজ ও বিকসিত হইলে তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ রোপণ করা কর্ত্তব্য। শিশুকাল হইতেই মনে ধর্ম্মভাব নিহিত ও রক্ষিত হইলে কু অভ্যাস ও কুপ্রবৃত্তি সকল দূরে পলায়ন করে। সেই ধর্ম্মবীজ হৃদয়ের প্রত্যেক গ্রন্থিতে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া পরিশেষে ফল ফুলে সুশোভিত করে, সে দৃশ্য অতি মনোহর। একেই শিশুজীবন পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক, তাহাতে ধর্ম্মভাব পূর্ণ হইলে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বিস্তার করে। শিশুহৃদয়ে ধর্ম্মভাব যেমন সহজে মুদ্রিত হয় বড় হইলে তেমন হয় না। এজন্য যেমন ভাল ভাব সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় মন্দ ভাবও সে প্রকার হয়। শিশুদিগকে আদর যত্নের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে শাসন করাও উচিত, নতুবা কথার অবাধ্য হয়। এজন্য সময়

সময় তাড়না করাও অন্যায় নহে। কিন্তু অনেক মাতা সময় সময় গুরু পাপে লঘুদণ্ড ও লঘু পাপে, গুরুদণ্ড দিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি পরিবারের অন্যের উপর বিরক্ত হন, তাহাদিগকে কিছু বলিতে না পারেন, তবে শরীর মনের ঝাল শিশুর উপর ঢালেন, ইহা অত্যন্ত অন্যায়। শিশুকে শাসন করা কেবল তাহারই মঙ্গলের জন্য, আপনার রোষ-প্রবৃত্তির চরিতার্থসাধনের জন্য নহে। ইহা প্রত্যেক জননীর মনে থাকা আবশ্যক। শিশুর কোমল শরীর; তাহাতে গুরুতর আঘাত কখনও সহ্য হয় না। শিশুর অন্যায় অভ্যাসের দমনার্থেই সময় সময় শাস্তি প্রদান করিতে হয়, মাতার রাগ প্রকাশের জন্য নয়। মাতা না বুঝিয়া শুনিয়া সন্তানকে সর্ব্বদা প্রহার করিলে তাহারা অধিকতর নির্লজ্জ হয়। অতএব কাহারও সাক্ষাতে বিশেষতঃ শিশুর সঙ্গী কোন বালক বালিকার সাক্ষাতে তাহাদিগকে প্রহার করা উচিত নয়, ইহাদ্বারা তাহাদের লজ্জা ভাঙ্গিয়া যায় ও তাহারা পুনঃ২ অন্যায়াচরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। বৃদ্ধের ন্যায় শিশুদিগেরও একটা আত্মগৌরব আছে, তাহা রক্ষিত হওয়া উচিত।

শৈশবকাল হইতে যৌবনে পদার্পণ পর্য্যন্ত, যত দিন তাহারা আত্মরক্ষায় সমর্থ না হয়, ততদিন সন্তানের স্বাস্থ্যবিধান, শিক্ষাদান, চরিত্রগঠন এ সমস্ত গুরুতর দায়িত্ব পিতামাতার স্কন্ধে থাকে।

সন্তান বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানে ধর্ম্মে যথার্থ রূপে উন্নত হইলেই তাহাদের বিবাহ দেওয়া উচিত। অল্প বয়সে বিবাহ হইলে তাহাদের উন্নতির ব্যাঘাত হয়, ইহা প্রত্যেক পিতামাতার জানা উচিত। সন্তানের বিবাহ কেবল পিতামাতার আমোদের জন্য নহে, ইহার উপর সন্তানের ভাবী জীবনের সুখ দুঃখ সমুদয় নির্ভর করে। অতএব বিবাহ তাহাদের নিজের ইচ্ছানুরূপই হওয়া উচিত, কেবল ইহার নির্ব্বাচনে যাহাতে তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে সেজন্য পিতা মাতার সহায়তার প্রয়োজন। সন্তানের অনিচ্ছায় বিবাহ স্থির করা পিতা মাতার যেমন অন্যায়, পিতা মাতার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া বিবাহ করা সন্তানেরও অত্যন্ত অন্যায়। এই জন্য প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই অশান্তি ঘটিতে দেখা যায়।

পূর্ব্বকালে পুত্রের বিবাহ দ্বারা মাতার গৃহ কর্ম্মের সহায়তা হইত, ঘরে বধূ আসিলে গৃহিণীর কার্য্যভার লঘু হইত। বর্ত্তমান সময়ে আর সে আশা নাই। হিন্দু ঘরের ছেলেরাপর্য্যন্ত সামান্য উপার্জ্জনক্ষম হইলেই স্ত্রী লইয়া বিদেশবাসী হয়। অতএব পুত্রের বিবাহ দ্বারা পিতামাতার বিশেষ কোন সুবিধা দেখা যায় না, সুতরাং এজন্য তেমন ব্যাকুলতার কোন কারণ নাই, তাহাদের আপনার সময় ও সুবিধানুসারে একার্য্যসমাপ্য হওয়াই কর্ত্তব্য। কন্যার বিবাহের জন্য পিতামাতাকে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হয়, সৎপাত্রে শিক্ষিতা সচ্চরিত্রা কন্যা সমর্পণ করিতে পারিলেই যথার্থ শান্তি লাভ হয়। পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হওয়া ও কন্যার বিবাহ না দেওয়া

পর্য্যন্ত পিতা মাতার মস্তকের গুরুতর ভারের লাঘব হয় না।

সংসারে সকলের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন করিয়া আপনার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে বিস্মৃত হওয়া গৃহিণীর উচিত নহে। আজীবন পিতামাতাই সন্তানের মঙ্গল সাধন করিবেন, সন্তানের সেরূপ মনে করা অন্যায়। বৃদ্ধকালে সন্তানই বল ভরসা। পিতামাতার যত দিন শরীরে বল থাকে তত দিন কোন ভাবনাই থাকে না, বার্দ্ধক্যে ও পীড়াতে শরীর ক্ষীণ ও জরাজীর্ণ হইলে পিতামাতা সন্তানের সেবা যত্ন প্রত্যাশা করেন। সে সময় সন্তানগণ স্বেচ্ছায় যদি পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা না করে, তবে তাহাদিগকে কৃতঘ্ন বই আর কি বলা যাইতে পারে। সন্তান পিতামাতার স্নেহ ক্রোড়ে আজীবন রক্ষিত হইয়া সুখ ভিন্ন দুঃখের বার্ত্তা জানে না, সন্তানের লালনপালনহেতু মাতার শরীরের রক্ত জল হইয়াছে, অনাহারে অনিদ্রায় কত রজনী কাটিয়াছে, তিনি নিজের মুখের গ্রাস, অঙ্গের বস্ত্র দিয়া সন্তানের অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। সন্তানের মঙ্গল সাধনই পিতামাতার স্বাভাবিক ইচ্ছা; দুঃখ বিপদ হইতে নিজের প্রাণ দিয়াও সন্তানকে রক্ষা করেন, বৃক্ষরূপে শীতল ছায়া দান করেন, শান্তিরূপে গৃহে বিরাজ করেন, মায়ের শরীরের বাতাসে সন্তানের শরীর শীতল হয়, মাতার কোমল সুমিষ্ট স্নেহধারা সন্তানের সমুদয় অভাব পূর্ণ হয়। সংসারে মাতার প্রয়োজন যদি এত অধিক না হইত, তবে মাতৃহীন শিশুর দুঃখে লোক এত দুঃখিত হইত না। মাতার ন্যায় স্নেহ যত্ন অন্য কেহ করিতে পারে না, তাই মাতৃবিয়োগে শিশুর কষ্ট অতি ভয়ঙ্কর। সে জন্যই মাতৃহীন শিশুর প্রতি সাধারণ লোকের এত দয়া ও সহানুভূতি। অতএব বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাদের প্রতি সেবা ও ভক্তি শ্রদ্ধা করা সন্তানের প্রধান কর্ত্তব্য। পিতামাতার প্রতি অবজ্ঞা অশ্রদ্ধা করিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। পিতা মাতা মূর্খ হইলেও তুচ্ছ করা অন্যায়। তাহারা বোকা কিছু বোঝে না ইত্যাদি বাক্য তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার করা অন্যায়। পিতামাতা মূর্খই হউক বা নির্ব্বোধই হউক তাহাদিগকে অপদস্থ করিতে যাওয়া সন্তানের নিজ মূর্খতার পরিচয়মাত্র। পিতামাতার কাছে নম্রভাবে কথা বলা উচিত, উচ্চ ও অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করা কদাচ উচিত নহে। তাঁহাদিগের ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল, রোগে সেবা ও শোকে সান্ত্বনা প্রদান করিবে; পিতামাতা সন্তানের নিকট অধিক কিছু প্রার্থী নহেন, নিতান্ত অভাব হইলে সামান্য গ্রাসাচ্ছাদন, শক্তিহীন হইলে আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন এই মাত্র প্রার্থী। কেহ কেহ বলিতে পারেন ইহা চাকর চাকরাণীর দ্বারাও সম্পন্ন হইতে পারে। শিশুকে পালন করা সময়ে যেমন পিতামাতার দাস দাসীর প্রতি নির্ভর করিলে সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতিও সন্তানের দৃষ্টি না থাকিলে তাঁহাদের উপযুক্তরূপ যত্ন হয় না। [illegible] [illegible] আনিয়া দিল [illegible]

অনেক সময় দেখা যায় অধিক বয়স হইলে বৃদ্ধ ছেলের ন্যায় আবদারে হইয়া উঠে, সে সময় তাহাদের মন বুঝিয়া চলা ভৃত্যের কার্য্য নহে।' এরূপ পিতামাতা যদি কিছু কাল সংসারে বাঁচিয়াও থাকেন তবে তাঁহাদিগকে গলগ্রহ মনে করা অন্যায়। আপন কর্ত্তব্যভার অন্যের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে পিতামাতার নিশ্চয় কষ্ট হইবে, পিতামাতার জন্য যদি নিজের সুখের ত্রুটি ও কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় তাহাও অম্লান বদনে করা উচিত। কোন কোন ছেলে মেয়ে দুর্দ্দান্ত ও দুর্ব্বিনীত হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহারা সর্ব্বদাই আপনার মতকে অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত রাখিতে নিতান্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। ভালই হউক আর মন্দই হউক নিজের জেদ রক্ষা করিতেই হইবে, তাহাদের প্রতিজ্ঞা অটল, তাহারা সর্ব্বদাই পিতামাতার অবাধ্য হয়। পিতামাতা হিত বলিলে অহিত জ্ঞান করে, সামান্য কারণে পিতামাতাকে শত্রু জ্ঞান করে, নিজেকে সকল বিষয়ে উচ্চ ও জ্ঞানী মনে করে। পরনিন্দা ও আত্মপ্রশংসা তাহাদের জীবনের ব্রত হয়, নিজের স্বার্থের সামান্য ত্রুটী হইলে সহ্য করিতে পারে না। এ প্রকার সন্তান সন্ততি জগতে অতি দুর্ভাগ্য, তাহাদের নিজের মনেও সুখ থাকে না, পিতামাতাকেও সুখী হইতে দেয় না। সকল পিতামাতাই সুসন্তান কামনা করে, কিন্তু সকলের ভাগ্যে সমান ঘটে না, তাই সুখ দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সকল অবস্থায়ই যিনি আপনার কার্য্য সকল অম্লান বদনে যত্ন পূর্ব্বক পালন করিতে পারেন তিনিই যথার্থ আদর্শ কন্যা, আদর্শ মাতা ও আদর্শ স্ত্রী এবং আদর্শ গৃহিণী। জগতে কাহারো সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। ঈশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ নিয়ত তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হয়, তিনিই জগতে ধন্য।

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

কুমিল্লা।

নোওয়াখালি হইতে ২৪শে চৈত্র বুধবার রাত্রি ১১টার সময় আমরা কুমিল্লায় উপনীত হই। তত্রত্য ডিপুটী কলেক্টর প্রিয়তম ভাগিনেয় শ্রীমান্ গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত আমাদিগকে লইয়া আসিবার জন্য অশ্ব শকট সহ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিতে নিজের চাপরাসীকে অনুমতি করিয়াছিলেন। আমরা ঝড় বৃষ্টির দিনে মধ্য রাত্রিতে কুমিল্লায় যাইব না ভাবিয়া, বা নিজের সুখনিদ্রার বিঘ্ন জন্মাইতে অনিচ্ছু হইয়া চাপরাসী ষ্টেশনে আগমন করে নাই। ষ্টেশনে পঁহুছিয়া আমরা ভাগ্যক্রমে একখানা ঘোড়ার গাড়ী পাইয়াছিলাম। অন্ধকারাচ্ছন্ন দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে ঝড় বৃষ্টির সময়ে গাড়ী না পাওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। আমরা সেই অশ্বশকটাবলম্বনে প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাগোবিন্দের আবাসে উপনীত হই। ২৭শে প্রাতঃকালে গঙ্গাগোবিন্দের আবাসে পারিবারিক উপাসনা হয়, এবং তাঁহার নিমন্ত্রণানুসারে সায়ংকালে কতিপয় ভদ্র সম্ভ্রান্ত

লোক উপস্থিত হন, তন্মধ্যে সঙ্গীয় কবি চট্টগ্রামনিবাসী ডিঃ মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন এবং তাঁহার ব্যারিষ্টর পুত্র ও অপর কোন কোন বিচারক ছিলেন। আশুতোষ সঙ্গীত করেন, তাঁহার মধুর সঙ্গীতে সকলেই বিশেষ আকৃষ্ট হন। সেই দিনই রাত্রি ১০ টায় ট্রেণে আশুতোষের কলিকাতায় যাত্রা করা প্রয়োজন হইয়াছিল, বাবুরা কিছুতেই তাঁহাকে গানে নিবৃত্ত হইতে দেন না। পরে ট্রেণ পঁহুছিবার সময় সঙ্গীতে নিরস্ত হইতে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে উর্দ্ধশ্বাসে ষ্টেশনে দৌড়িতে হয়।

আশুতোষ চলিয়া গেলেন, আমি সঙ্গিহীন অঙ্গহীন হইলাম। চট্টগ্রামপ্রবাসী সমবিশ্বাসী প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র গুপ্ত কুমিল্লায় আসিয়া আমার সঙ্গে মিলিত হইয়া শিলচর ও অন্য অন্য স্থানে যাইবেন, এরূপ প্রস্তাব ছিল। তিনি কোন কোন কাজের ব্যবস্থা করিয়া সত্বরই কুমিল্লায় চলিয়া আসিবেন, নোওয়াখালি হইতে চট্টগ্রামে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে এরূপ বলিয়াছিলেন। আমি কুমিল্লায় তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম; ইতি মধ্যে তাঁহার পত্র পাইলাম, ঝড়ে তাঁহার ঘর উড়িয়া গিয়াছে, পুত্রটি গুরুতর জ্বর রোগে আক্রান্ত, তিনি ব্যতিব্যস্ত। চট্টগ্রাম হইতে রাজেশ্বর বাবুর পত্রেও জানিলাম যে, সপ্তাহকাল যাবৎ ঝড় বৃষ্টি, গৃহের বাহির হওয়া দুষ্কর হইয়াছে। কক্সবাজারস্থ কন্ট্রাক্টর পত্রে জ্ঞাত হইলাম যে, সেখানে তুমুল ঝড়, কয়েক দিন ডাক বন্ধ ছিল, এই সময়ে ১৭ মাইল সন্দ্বীপপ্রণালী নৌকা যোগে পার হইয়া আমরা সন্দ্বীপে যাইতেছি ভাবিয়া তিনি মহাচিন্তিত। কুমিল্লাতেও ঝড় বৃষ্টির বিরাম ছিল না। আমি কাশীবাবুর আগমনে নিরাশ হইয়া একাকী শিলচরে যাইব, স্থির করিলাম।

সমগ্র কুমিল্লা নগর ত্রিপুরা মহারাজের অধিকারভুক্ত। এ নগর এবং তাঁহার বিস্তীর্ণ ষ্টেট শাসন সংরক্ষণের জন্য এস্থানে একজন দেওয়ান কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। বর্ত্তমান দেওয়ানের নাম শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র বসু, তিনি ঢাকা প্রদেশবাসী একজন ব্রাহ্ম সুদক্ষ লোক। ইতিপূর্ব্বে তিনি ঢাকা নগরে প্রসিদ্ধ প্রধান উকিল ছিলেন। কুমিল্লাতে পরস্পর সন্নিহিত অগণ্য দীঘী পুষ্করিণী, এরূপ কোথাও লক্ষিত হয় না। অনেকে বলেন, নগরবক্ষে ছোট বড় ৪।৫ শত সরোবর বিদ্যমান। অধিকাংশ সরোবরের জল উৎকৃষ্ট। ধর্ম্মসাগর দীর্ঘিকা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং তাহার জল অত্যুৎকৃষ্ট। এ সকল ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব রাজা ও রাণী প্রভৃতির কীর্ত্তি। এ নগর ব্যতীত এ জিলার নানা স্থানে তাঁহাদের কর্তৃক খাত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা বিদ্যমান। অথচ রাজধানী আগরতলায় একটিও উপযুক্ত সরোবর নাই, তথায় একশেষ জলকষ্ট। কুমিল্লা নগর পূর্ব্ব বঙ্গের মধ্যে স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। উৎকৃষ্ট পানীয় জলই উহার প্রধান কারণ। নগরের উত্তর প্রান্তে গুমতী নদী প্রবাহিত, এই নদীর জল অব্যবহার্য্য। নদীটী মালাকৃরূপ অতিশয় বক্রগতিক এই সময়ে এই

স্থানে দক্ষিণ দিক্ হইতে তোপের শব্দের ন্যায় এক প্রকার প্রাকৃতিক শব্দ প্রতিদিন অনেক বার শ্রুত হওয়া যায়। লোকে তাহাকে "বরিশালগণ" বলে। কিন্তু কোথা হইতে কি কারণে এই শব্দ হয় কেহই নির্ণয় করিতে পারে না। এ নগরের অধিকাংশ অধিবাসীর বাসগৃহ পর্ণশালা। এমন কি এ অঞ্চলের সমুদায় নগরে পাকাবাড়ী অতি অল্পই আছে। কুমিল্লা নগর তরু-রাজিতে সমাচ্ছন্ন, সেই সকল তরু নানা বিধ পক্ষীর আশ্রয় স্থান, প্রাতঃসন্ধ্যা মধুর কণ্ঠ বিহঙ্গকাকলীতে কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু এই নগরে ও চট্টগ্রামে মুহুর্মুহু তক্ষকের সমুচ্চ বিকট ধ্বনি অতিশয় বিরক্তিজনক। ইতিমধ্যে ৮ই বৈশাখ বুধবার বেলা একটার পর কুমিল্লায় ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত হয়। এরূপ তুমুল ঝড় এবার কোন দিন হয় নাই। ঝটিকাবেগে যুগযুগান্তের বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষাদি সমূলে উৎপাটিত, ফলবান্ বৃক্ষ সকল প্রায় উৎসন্ন ও ফলশূন্য, অনেক ঘরবাড়ী চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। নগরবাসীরা অতিশয় ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছেন। এই প্রবল ঝড়ের পর প্রকৃতিদেবী কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন। বিধাতার বিচিত্র বিধান!

মহিলাদিগের রচনা।

হাঁসি ও কান্না *।

হাঁসি কান্না এতো দুদিনের তরে,
দুদিনের তরে শুধু আঁখি ঝরে।
দুদিনের তরে হাঁসি উঠে ফুটে,
দুদিনেই কিন্তু সব যায় টুটে।
দুদিনের তরে এভবের মেলা,
দুদিনেই সব টুটে যায় খেলা।
দুদিনের তরে মান অভিমান,
দুদিনেই সব হয় খান খান।
তবে কেন লোকে আমি আমি বলে,
কাটায় জীবন শুধু অবহেলে।
ভেবেত দেখে না কাল ভয়ঙ্কর,
অচিরে মিটাবে জীবন সমর।

চাহি ও চাহিনা।

চাহিনে হতে প্রভু সুখ সম্পদাধিকারী,
চাহিগো শুধু হতে তব চরণভিখারী।
চাহিনে চাহিনে প্রভু যশধন,
চাহি শুধু তব অভয়চরণ।
চাহিনে প্রভু অসার আমোদ প্রমোদ,
চাহি শুধু প্রভু তব সেই রাঙ্গা পদ
চাহিনে চাহিনে বৃহত প্রাসাদে,
তব সঙ্গবিহীন হয়ে আমোদে,—
মাতিয়া থাকিতে শুধুগো প্রভু দয়াময়,
তাহতে পর্ণকুটীর ভাল লইয়া তোমায়।

সোহাগের উপহার। *

১

আজি সেই দিন?
জনম তোমার,
হয়েছিলে যবে,
জননীর কোল,
করে ছিলে আলো,

---

* পূর্ব্ব সংখ্যায় যে বালিকাটীর রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, এই পদ্য ও ইহার পরবর্ত্তী পদ্যটি তাঁহা কর্তৃক বিরচিত।

* ভ্রাতুষ্পুত্র অতুলচন্দ্র মিত্রের জন্ম দিনোপলক্ষে উপহার।

দেখিতে তোমায়,
এসে ছিল সবে।
পুরবাসিগণে,
হয়ে কুতূহল।

২

আজি সেই দিন ?
সেদিনের সুখ
ক্ষণিকের তরে,
ভুলি নাই জাগি
রয়েছে মরমে,
গাইছে পরাণ
সোহাগের ভরে।
মজিয়া শিশুর
বিমল প্রেমে।

৩

আজি সেই দিন ?
অমীয়প্লাবন,
আজিকার দিনে,
হাসিতে হাসিতে
ভাসিনু আবার,
আসিনু ডাকিতে,
করুণবচনে।
এস বাছা কাছে,
এস একবার।

৪

আজি সেই দিন ?
যতন করিয়া,
ধরিয়া বদন,
স্নেহের আঁচলে,
দিব রে মুছিয়া,
মাখাব তোমায়,
সোহাগ চন্দন।
পরাব গলায়,
কুসুম গাঁথিয়া।

৫

আজি সেই দিন ?
জনমের দিন,
করিয়া স্মরণ,
নূতন বরষে
হরষের কাজ,
প্রভাত সমীরে,
উচ্ছ্বাসে জীবন
বাছারে পরাতে,
নূতন এ সাজ।

৬

আজি সেই দিন ?
কি দিয়া আশীষ,
করিব তোমায়,
কি ধন আছে রে
তোমার মতন,
সুধু ভালবাসা
দিতে মন চায়।
এনেছি ধর রে
করিয়া যতন।

৭

আজি সেই দিন ?
গল বস্ত্র হয়ে
আজিকার দিনে
পরমেশ পদে,
হয়ে অবনত,
বাছার মঙ্গল
জীবন মরণে।
চাহিব কাতরে
নীরবে নিয়ত।

৮

আজি সেই দিন ?
তাঁহার করুণা,

করিয়া স্মরণ,
চল যাই শান্তি,
আনন্দ সদনে,
দিয়াছেন তিনি,
অমূল্য রতন।
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে,
লুটাই চরণে।

হরিপাল শ্রীমতী ত —

—

যীশুখ্রীষ্ট।

নমি আমি যীশুখ্রীষ্ট তোমার চরণে
উজ্জ্বল পবিত্র কান্তি
পুণ্য, প্রেম, দয়া শান্তি
বিমল পবিত্র ছটা মাখা ও বদনে।
আজি কেন মনে পড়ে তোমা বার বার
হায় এই মহা দিনে
ত্যজি যত দীন হীনে
গেছ চলে স্বর্গধামে কোলেতে পিতার।
কি শিক্ষা দিলেগো তুমি এসে ভূমণ্ডলে
ধন্য যীশু মহাত্মন
ও অপূর্ব্ব আত্মদান
দেখিয়া স্তম্ভিত চিত্ত মানব সকলে।
কেমন করুণাময় জগতের পতি
তিনিই পিতা সবার
আমরা সন্তান তাঁর
আমাদের পরে তাঁর স্নেহ সদা অতি।
এই জ্ঞান দিলে তুমি মানব সকলে
তোমারি জীবন দিয়া
দিলে দেব বুঝাইয়া
পিতার যথার্থ রূপ পুত্র কারে বলে।
মানবের দশা হেরি ও প্রাণ কাঁদিত
মধুর কোমল ভাবে
দিতে উপদেশ সবে
ফিরাতে পিতারদিকে পাপপূর্ণ চিত।
ভ্রান্তি পরিপূর্ণ পথ পরিত্যাগ করি
বিশ্বাসী সুপুত্র হয়ে
নিজ স্বার্থ তেয়াগিয়ে
হইবে সবার দাস চিন্তা প রহরি।
সকলে চলুক ওই পিতার পথেতে
নির্ব্বোধ মানবগণ
বুঝিল না ও বচন
শুনিয়া তোমার বাক্য জ্বলিল প্রাণেতে।
মিথ্যা ছল করি শেষে বধিল তোমা:
ঘোরতর নির্য্যাতন
বিদ্রূপপূর্ণ বচন
দিইয়া ছলনা ক্ষান্ত পাষাণেরা হায়!
দারুণ যাতনাপূর্ণ ক্রুশে বিদ্ধ করি
নাশিল জীবন তব
আঁধার করিল ভব
নিভিল পবিত্র সূর্য্য চিরদিন ধরি।
কি অতুল পিতৃভক্ত হৃদয় তোমার
পিতৃ আজ্ঞা শিরধার্য্য
সাধিব তাঁহার কার্য্য
যায় যাক্ তুচ্ছ দেহ কার্য্যেতে তাঁহার।
সে ভীষণ অত্যাচারে ও বীর হৃদয়
হ'লনা একটু ক্লান্ত
হ'লনাক কিছু ভ্রান্ত
অটল অচল তুমি সর্ব্বদা নির্ভয়।
বিষম ব্যথায় হায় ঝরিল নয়ন
প্রভুর পানেতে চেয়ে
নীরবে সকলি সয়ে
বলিলে না তবু কিছু কঠোর বচন।
"তোমারি মঙ্গল ইচ্ছা হউক পূরণ"
এই মূল মন্ত্র জপে
প্রাণ মন দিলে সঁপে
জগতের হিত তরে ত্যজিলে জীবন।

যাহারা বধিল তোমা অত কষ্ট দিয়া
নির্দ্দোষ পবিত্র প্রাণ
বধিল দস্যু সমান
অন্তিমে তাদেরি শুভ গেলেগো চাহিয়া।
পরম পিতার কাছে কহিলে কাতরে
ক্ষমা করো এই সবে
জানে না কি করে এবে
বুঝিছে না কত দুর মন্দকার্য্য করে।
এমন অপূর্ব্ব ভাব স্বার্থ ত্যাগছবি
এমন প্রেমের সিন্ধু
অনাথ দীনের বন্ধু
এমন উজ্জ্বলতর পবিত্রতারবি।
আরতো কখন কেহ হেরেনিক চকে
গেল পাপ দূরে সরি
ও পবিত্র ছবি হেরি
আহা কি স্বর্গীয় বল ভরা তব বুকে।
যত স্মরি তব কথা ততই প্রাণেতে
ভকতি তরঙ্গ উঠে
উল্লাসে হৃদয় ছোটে
প্রণত হয়গো মাথা তোমারি পদেতে।
এই ভিক্ষা চাই আজি পরমেশ ঠাঁই
গভীর ভকতি করি
তব পদচিহ্ন ধরি
চিরদিন যেতে পারি আমরা সবাই।

কলিকাতা। শ্রীমতী সু—

——

নাবিক *।

জীবনতরণী এক জীবনপ্রভাতে,
খুজেছিল নাবিকে তাহার
বহু দিন ঘুরি ঘুরি,
সংসারসাগর পরি,
আবর্ত্তে ও ঘূর্ণিবাতে, আঘাতিয়া ঘাতে ঘাতে
মিলাইল নাবিক তাহার।
দিন রাত সুখে দুখে
নাবিক তরণীবুকে,
ঘুরিল সাগর মাঝে, নিশি, দিবা, উষা, সাঁঝে,
কিন্তু কুল পাইল না আর।
কালস্রোত চলে হায়
বর্ষ যুগ গত প্রায়,
তবু না মিলিল কুল,সিন্ধুবারি কুল কুল
বিদ্রূপিয়া কাঁদাল আবার।
দীনা ক্ষীনা তরণীরে
আঘাতিয়া বারে বারে,
দুষ্ট সিন্ধু কাঁদাইল, দিন মাস বর্ষ গেল
তরী কুলে গেলনাক আর।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা
নাবিক পাগল পারা,
আবর্ত্তে বিপন্ন বেশে, ঘুরি সে সাগরদেশে,
গেল আশা কুলে যাইবার।
সহসা, কি এক দিন দুখ কালিমায়,
অগুনেতে স্বগুণ পবন,
বিবেক রূপেতে আসি
কহিল বিশুদ্ধ হাসি,
কে তোমরা করিছ ক্রন্দন ?
নাবিকতরণী কয়, কেগো তুমি মহাশয়,
অভাগা অধম মোরা
ঘুরিয়া হইনু সারা,
দয়া করি আমাদের ঘুচাও বেদন,
কুলে নেও মোদের জীবন।”
কহিলা পবন তবে
কে তোমরা যেন তবে,
হায় কিবা হীন দশা, জ্ঞান বুদ্ধি ভাসা ভাসা
তাই বুঝি এতেক বেদন।

* খন্তরাচ নগরস্থ ডাক্তর শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্তের স্বর্গগত কন্যা নির্ম্মলা সুন্দরী কর্ত্তৃক বিরচিত।

তুমিত নাবিক নও
একা নাহি তরী হও,
ছুজনে তোমরা তরী,নাবিক ভবকাণ্ডারী,
আমি শুধু তরণীর মগুন পবন,
আগুসারি লইব জীবন।
কত দিন দিন যায়
আশায় ও নিরাশায়,
দুই জনে ছুটে যায়, কেহ কূল নাহি পায়,
পুনঃ ভগ্ন তরণীজীবন।
আশাতরী ক্ষীন প্রায়
ঘুর্ণিবাতে যায় যায়,
কূলে নাহি যায় আর, ক্রমে তরী হয় ভার,
উজানেতে (শুধু) ভরসা পবন,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা বার্দ্ধক্য জীবন।
সহসা সে জল স্রোত বিপুল বেগেতে,
অনুকুল হইল আসিয়া।
খর স্রোতে বৈরাগ্যের
লয়ে গেল দূরে ঢের,
কিন্তু মিলিল না কূল খরস্রোতে প্রাণাকুল
খর তর আবর্ত্তে পরিয়া
চাহিতে সময় নাহি,
দিন যায় ত্রাহি ত্রাহি,
যার বেগে ডুবে তরী,কূল কিংবা কার বাড়ী
নাহি দেখে এতেক আসিয়া।
সহসা সে একদিন জলস্রোতে মিলিয়া,
ভক্তিগঙ্গাজল পথে দেখা দিল আসিয়া।
উছলি উছলি জল নাচিল কৌতুকে,
চলিল জীবনতরী কুল অভিমুখে।
সহসা সে কর্ণ পরে ভবকর্ণধার,
দিল দেখা তরী খানি গেল ভব পার।

ঈশ্বরের জন্য সমুদয়।

(স্বর্গগত কিশোরী মোহিনী দেবী
কর্ত্তৃক লিখিত।)

"ভাই তোমাদের জন্য আমি কিছু সংবাদ আনিয়াছি।" এই বলিয়া একটী সুসজ্জিতা সুন্দরী তরুণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, যে গৃহে সে উপস্থিত হইল সেস্থানে অনেক গুলি রমণী বসিয়া আছেন, তাহার নানা সম্পর্কিতা ভগিনীরা সেখানে বসিয়া বাটীর নানা প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। একের পর অন্যে জিজ্ঞাসা করিল "কি সংবাদ আনিয়াছ লাবণ্য?"

"তোমরা তাহা বিশ্বাস করিবে না; নলিনী বালা নাকি ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছে।" অর্দ্ধগম্ভীর, অর্দ্ধ হাস্যযুক্ত ভাবে লাবণ্য উত্তর করিল।

জ্যেষ্ঠা ভগিনী সরোজিনী বলিল, "নলিনীবালা! সে যে ধর্ম্মসম্বন্ধে কত পরিহাস করিত?"

আর একজন বলিল, "সে আধুনিক ফ্যাসনের অনুযায়ী হইয়া সর্ব্বদা চলিত, কেহ নিকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিলে তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করিত না।"

অন্যে বলিল, "তাহার পিতাত একজন প্রকাণ্ড নাস্তিক, তিনি কি বলিবেন?"

লাবণ্য বলিল, "আমি শুনিয়াছি তিনি তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন।"

এই কথোপকথনের পর অনেক ক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। পরিবারের সর্ব্বকনিষ্ঠা বলিয়া উঠিল, আস্তিকেরা যে বলে ধর্ম্মে সত্যতা আছে তাহা এবার আমরা দেখিব। নলিনীদের পরিবারের কোনও শাখায় যে এক ব্যক্তিও ধর্ম্মবিশ্বাস করে ইহা আমার প্রত্যয় হয় না। তাহাকে ভয়ানক পরীক্ষার ভিতর দিয়া যাইতে

হইবে, আমি তাহার মত অবস্থায় পড়িতে চাই না।”

“পরীক্ষা! ছি! ছি! আধুনিক সময়ে তাড়নার মত অবস্থা আর নাই; একটা ধর্ম্মবীর দেখা অতি দুর্লভ!” নলিনীর বাল্যসখী লাবণ্য এই কথা অতি সহজেই বলিল, নলিনীর বিরুদ্ধে তাহার হৃদয়ে অতিরিক্ত ভাব উপস্থিত হইয়াছে, কারণ সে জানিতে পারিয়াছে যে, আর পূর্ব্বের মত সে একা তাহার সহবাস সম্ভোগ করিতে পারিবে না।

ধর্ম্মের জন্য নিগ্রহ সহ্য করে এমন ধর্ম্মবীর আধুনিক সময়েও সুদুর্লভ নয়, ইহা আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই।

অল্পদিন পরেই ভগিনীরা নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। নলিনী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নম্রতা ও সুমিষ্ট হাস্যের সহিত তাহাদিগকে গ্রহণ করিল। তথাপি তাহাকে মলিন বোধ হইল এবং যদিও তাহার সুন্দর আননে পবিত্র ভাব প্রকাশ পাইতেছিল, তথাপি বোধ হইল যে সে যেন কোন দুঃখ ক্লেশে শ্রান্ত হইয়াছে, যদিও সে স্পষ্টতঃ যে নূতন শান্তিলাভ করিয়াছে তাহা প্রকাশ করিল না, কিন্তু তাহার সাক্ষাৎ কারিণীরা স্পষ্ট এবং পরিষ্কাররূপে তাহার পরিচ্ছদে ব্যবহারে এবং মুখে পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল। নলিনীর একজন নাস্তিকের সহিত বিবাহের কথা চলিতেছিল। দেবেন্দ্রনাথ রায় সুরাপান করিতে, অভিনয় দেখিতে, নূতন নূতন আমোদ সম্ভোগ করিতে ভাল বাসিত। রবিবার দিন তাহার আমোদের দিন ছিল, এবং অনেক সময় তাহার অমকাল গৃহ নলিনীর উপস্থিতিতে আরও শোভা বিস্তার করিত। যখন তাহারা একত্র চলিয়া যাইত নলিনীর সৌন্দর্য্যে চতুর্দ্দিক্‌ উজ্জল হইয়া যাইত। দেবেন্দ্রেরও বাহ্যিক আকার অতি চমৎকার, সে বুদ্ধিমান রহস্যে পূর্ণ, যেখানে যাইত সেই খানেই প্রণয়, আদর, প্রশংসা লাভ করিত।

দেবেন্দ্র যখন নলিনীর সম্বন্ধে এই সংবাদ পাইল, মুখমণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। কি? তাহার মনোনীতা বালিকা, যাহাকে তাহার সৌন্দর্য্যপূর্ণ গৃহের সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছে, ধার্ম্মিকা হইয়াছে? এ কোন কাজের কথা নয়, সে যা বিশ্বাস করে না, সে নিজে তাহার তত্ত্ব জানিবে। তাহার বসিবার গৃহ উপাসনা গৃহের জন্য সজ্জিত করিবে না, কোন প্রচারক, আচার্য্যকে তাহার স্ত্রীর সহিত কিংবা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে থাকিবে, ইহা ইচ্ছা করে না। (ক্রমশঃ)

প্রকৃত জীবন।

১। জীবনআকাঙ্ক্ষা মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। জীবনধারণের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহা সংগ্রহ করিতে মানব সর্ব্বদাই ব্যস্ত। মানবের প্রায় সকল কার্য্যেরই মূল এখানে, এই জন্যই যত পরিশ্রম, যত চেষ্টা। জীবনের জন্যই এত আশা, এত আকাঙ্ক্ষা, এত চেষ্টা, এত যত্ন ও এত পরিশ্রম, উদ্যম ইত্যাদি। কিন্তু ইহাই কি জীবনধারণের পক্ষে শেষ হইল? যে জীবন না হইলে আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য সকল সুসম্পন্ন হইতে পারে না, যাহার আকাঙ্ক্ষাতে আমরা কতটুকু চেষ্টা, যত্ন বা পরিশ্রম করিতেছি।

২। জীবনের অর্থ উন্নতি, ঊর্দ্ধদিকে অবিরাম গতি, চারি দিকে অবিশ্রান্ত প্রসারণ এবং চতুর্দ্দিকের বস্তুর সহিত অনন্ত যোগ। কিন্তু এই উন্নতি শুধু শরীরসম্বন্ধে নয়, শুধু পার্থিব ক্ষণস্থায়ী দ্রব্যনিচয়ের সহিত নয়, পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যের অতীত যে মহান অনন্ত পুরুষ, তাঁহার সহিত যে আত্মার অনন্ত যোগ রহিয়াছে, সেই যোগেই, সেই সম্বন্ধেই আত্মার জীবন। বৃক্ষাদি উদ্ভিদ্গণের জীবন যেমন তাপ,

আলোকে, রস ও বাতাসের উপর নির্ভর করে, পশু পক্ষীদের জীবন যেমন তাহাদের আহারের উপর নির্ভর করে, মনুষ্যের জীবন তেমনই, শুধু আহারের উপর নির্ভর না করিয়া জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতার পরম আধার যে সেই প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর, তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

৩। জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর ও রমণীয় পদার্থ নির্ম্মল চরিত্র। বিদ্বান ও ধনবান্ ব্যাক্তি গভীর বিদ্যাবত্তা প্রদর্শন করিয়া ও বহুল অর্থব্যয় করিয়া যে সম্মান ও প্রীতিলাভ করিতে পারেন না, চরিত্রবান্ ব্যক্তিকে লোকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সেইরূপ সম্মান প্রদান করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় না। বাস্তবিক নির্ম্মল চরিত্র ব্যতীত শুধু বিদ্যা অথবা প্রচুর অর্থ থাকিলেই মনুষ্যের প্রকৃত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আন্তরিক বিশ্বাসের পাত্র হওয়া দুরূহ। বিদ্বান্ ব্যক্তিকে জনসমাজে প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে না। ধনবান্ ব্যক্তি কার্য্য বিশেষে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া যশ লাভ করিতে পারেন, কিন্তু আন্তরিক অনুরাগ ও বিশ্বাসের পাত্র হইবার আশা করা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র। সাধুতা, গুরুজনে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সমদর্শিতা, বিনয়, স্বার্থত্যাগ, কর্ত্তব্যানুরাগ প্রভৃতি সদ্গুণ গুলি অভ্যস্ত হইলে চরিত্রের উন্নতি লাভ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক সুখের অধিকারী হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

বালেশ্বর। শ্রীমতী ব্র—।

সংবাদ।

গত ২৪শে আশ্বিন সোমবার হইতে ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয় এক মাসের জন্য শারদীয় অবকাশপ্রাপ্ত।

সম্প্রতি আমাদের রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জিনের পত্নী জরায়ুঘটিত সাঙ্ঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের বড় আশা ছিল না। লর্ড কার্জ্জিন কয়েক মাসের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে ছিলেন। বিদায়ের কাল প্রায় নিঃশেষিত হইলে পর, তিনি ভারতবর্ষে যাত্রা করিতে সমুদ্যত হন, দ্রব্য সামগ্রী ষ্টেশনে প্রেরিত হয়, এমন সময় লেডী কার্জ্জিন অকস্মাৎ গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। তজ্জন্য রাজ-প্রতিনিধি যাত্রায় নিবৃত্ত হন। লেডী কার্জ্জিনের পীড়া এত দূর সাঙ্ঘাতিক হইয়াছিল যে, কয়েক দিন তিনি জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে ছিলেন। নানা স্থানের বহু সুদক্ষ চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। টেলিগ্রাফে তাঁহার পীড়ার সংবাদ পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভাবনা চিন্তায় রাজপ্রতিনিধি শীর্ণ ও মলিন হইয়াছেন। আনন্দের বিষয় এই যে, ঈশ্বরকৃপায় সেই সঙ্কট রোগের অনেক উপশম হইয়াছে। এক্ষণ বিপদের আশঙ্কা নাই।

এই সংবাদটি কম্পোজ হইলে পর গত রবিবার তারের সংবাদে জানা গেল যে, রাজপ্রতিনিধির পত্নীর পীড়া পুনর্ব্বার অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমরা বহু গ্রাহক ও গ্রাহিকার ব্যবহারে অতিশয় দুঃখিত ও আশ্চর্য্যান্বিত। বৎসরান্ত হইয়া তিনমাস অতীত হইল, অনেকেই পূর্ব্ব বৎসরের মূল্য প্রদান করিতেছেন না, পুনঃ পুনঃ পত্র লিখা যাইতেছে, তাঁহারা তাহার উত্তর পর্য্যন্ত প্রদান করেন না। ২।৩ বৎসরের মূল্য অনাদায় রহিয়াছে, এমন গ্রাহকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। পত্রিকার মুদ্রাঙ্কনাদিতে যে কত ব্যয় হয় তাঁহারা কি একবার ভাবেন না? গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের অনুগ্রহ ভিন্ন সেই ব্যয় নির্ব্বাহ করাবিষয়ে উপায়ান্তর নাই। ভরসাকরি তাঁহারা দয়া করিয়া পূর্ব্ববৎসরের ও বর্ত্তমান বৎসরের মূল্য অবিলম্বে পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করিবেন।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

মনোবিজ্ঞান।

মানসিক উন্নতির নিয়ম *।

প্রধানতঃ মনুষ্যের জীবনের ভিতর শক্তির উন্নতি কিরূপে আরম্ভ হয় যে বিষয় গতবারে কিছু কিছু বলা হইয়াছিল, এবারে সেই জ্ঞানশক্তির উন্নতির উপায়ের বিষয় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। কেবল জ্ঞানশক্তির উন্নতি হইলেই যে মনের উন্নতি হয় তাহা নহে। মন একটা খুব প্রশস্ত জিনিষ, কেবল জ্ঞানের উন্নতিতেই মনের উন্নতি নয়, মনের উন্নতি করিতে হইলে যেমন জ্ঞানের উন্নতি চাই, সেইরূপ অপরের সুখ দুঃখ ভালবাসা প্রভৃতি অনুভব করিবার প্রবৃত্তি সকল উন্নত করিতে হইবে; আর ইচ্ছা শক্তি খুব প্রবল হওয়া চাই; ইচ্ছাশক্তি এত প্রবল করা উচিত যে, কোন বিষয়ে ইচ্ছা করিতে করিতে সেই রূপ হইয়া যাওয়া, অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা করিবে ঠিক সেইরূপ হওয়া চাই। এইরূপে ভাব, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি সমস্ত শক্তিগুলি যখন উন্নত হয় তখনই বলা যাইতে পারে যে মন যথার্থ উন্নত হইয়াছে। এক দিক্ থেকে কখনই মনের উন্নতি হয় না। Bacon একজন খুব জ্ঞানী লোক ছিলেন, তিনি এমন সব উপায় স্থির করিয়াছেন যাহা দ্বারা লোকেরা একটীর পর একটী করিয়া জগতের সমস্ত নিয়মাদি দেখিতে পারেন। তাঁর সময় হইতেই বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। তিনি খুব জ্ঞানী ছিলেন বটে, কিন্তু পরের সুখ দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, সেই জন্য আপনার বন্ধুদিগকে নানা রকম কষ্ট দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, কেবল মাত্র এক দিকের উন্নতি হইলেই মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হয় না। শরীরসম্বন্ধেও যেমন যদি কোন একটা অঙ্গের অধিক পরিচালনা করা হয় তাহা হইলে সেইটারই উন্নতি হয় অন্যগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সুতরাং শরীরের কিছুই উন্নতি হয় না, ঠিক এইরূপ মনেরও সমস্ত শক্তিগুলির উন্নতি না হইলে মন উন্নত হইয়াছে বলা যায় না। যদি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকাপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদির শক্তি ঠিক্ পরিমাণে না থাকে তা'হলে জ্ঞানের উন্নতি হইতে পারে না, কারণ এই গুলি জ্ঞানলাভের যন্ত্রস্বরূপ, জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অন্যান্য সমস্ত উপাদান ঠিক্ থাকা চাই। যেমন মানুষ এক চোকে ভাল দেখিতে পায় না, কিন্তু দুই চক্ষু থাকিলে বেশ দেখিতে পায়। এখানে যেমন এক চোকের দেখিবার ক্ষমতাটা আর একটীর উপর নির্ভর করিতেছে, ঠিক সেইরূপ জ্ঞানের উন্নতিও আন্যান্য মানসিক বৃত্তির উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে।

কি কি পর্য্যায়ানুসারে জ্ঞানের উন্নতি আরম্ভ হয় তাহা বলা হইয়াছে, আজ আর একবার তাহা বলিতেছি। প্রথম ইন্দ্রিয়বোধ,—একটী ছোট ছেলে তার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয় গুলিতে যেন প্রাণ রয়েছে, সেই সব ইন্দ্রিয় দ্বারা সে একটু

---

* ১৮২৪ শক ১৬ আশ্বিন বৃহস্পতিবার ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু মোহিতচন্দ্র সেন প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

একটু করে কোন জিনিষের বিষয় উপলব্ধি করিতে লাগিল। তার পর বস্তুজ্ঞান,—একটা জিনিষে কত গুণ আছে, নানা ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সব গুণ উপলব্ধি ক'রে সে বুঝিতে পারে এটা এই বস্তু। যেমন একটী কমলা লেবু; ছোট ছেলে সে প্রথমে হাত দিয়ে ধরে, স্বাদ লয়, তার রং দেখে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তিগুলি এক হ'য়ে ঐ বস্তুর উপর প'ড়লে তার বস্তুজ্ঞান হ'লো। এই রূপে সে একটী একটী করিয়া সব জিনিষ চিনিতে আরম্ভ করিল। তার পর স্মৃতি,—ছোট শিশু একটু বড় হ'লো, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে আরম্ভ করিল। প্রথম এক বেলার কথা আর এক বেলা, তার পর আজকের কথা কালকে; এইরূপে সে ক্রমে ক্রমে মনে রাখ্‌তে শিখ্‌লো; স্মৃতিশক্তির এইরূপে বিকাশ হয়। তার পর কল্পনা,—আর একটু বড় হ'লো তখন কল্পনা আরম্ভ হ'লো; নানা বিষয় যা বাস্তবিক নাই, সেই সব লইয়া ভাবতে লাগ্‌লো। কল্পনার পর চিন্তা,—যখন শিশু বেশ বড় হ'লো তখনই নানা বিষয় চিন্তা আরম্ভ হ'লো। আগে কেবল কতকগুলি কল্পনা করিত, এখন অর্থাৎ যখন সে চিন্তা করিতে শিখিল তখন কোন্ কল্পনাটী ঠিক্ কোন্‌টা ভুল সব চিন্তা করিয়া ঠিক করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপ ক্রমে ক্রমে তার চিন্তার বিকাশ হইল, এবং সেই সঙ্গে মনও উন্নত হইতে লাগিল। প্রধানতঃ এই পাঁচ প্রকার উপায় দ্বারা মানুষের ভিতর জ্ঞানশক্তির উন্নতি আরম্ভ হইল; তার পর ঐ শক্তির উন্নতি আর কি কি মানসিক বৃত্তির উন্নতির উপর নির্ভর করে সে বিষয় আজ দুই একটী কথা বলিব। জ্ঞান শক্তির উন্নতির প্রথম নিয়ম বা উপায় মনোযোগ। মনোযোগ না দিলে কোন জ্ঞানই হয় না। যখন যে বিষয়ে ভাব্‌তে হবে বা দেখ্‌তে হ'বে তাতে খুব মনোযোগ চাই, অন্যমনস্ক থাকিলে কোন জিনিষেরই জ্ঞান লাভ করা যায় না। এমন কি যে জিনিষের বিষয়ে বেশ জ্ঞান আছে তাও কাজে আসে না। এই বিষয়ে একটা গল্প আছে। Lasiney এত অন্যমনস্ক ছিলেন যে, তিনি সময় সময় নিজের নামটাও ভুলে যেতেন। এক দিন হয়ত নিজের বাড়ীর দরজায় এসে Lasiney বাড়ী আছে বলে ডাকাডাকি কচ্ছেন ভিতর হইতে যদি কেউ বলিল, না তিনি বাড়ীতে নাই, তা'হলে অমনি ফিরিয়া যাইতেন। যাহা হউক এটা একটা গল্প এবং খানিকটা অসম্ভবও মনে হ'তে পারে। নিউটনের বিষয়েও ঠিক অমনি একটা গল্প আছে, এবং সেটা খানিকটা সম্ভবও মনে হয়। এক সময় নিউটন তাঁর একজন বন্ধুর বাড়ীতে ছিলেন, বন্ধুর ছোট ছেলেরা মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে খেলা করিত। একদিন তাহারা তাঁকে বিড়ালের জন্য একটি বাক্স প্রস্তুত করিয়া দিতে বলিল। তিনি একটি বাক্স প্রস্তুত করিয়া তাহাতে দুইটী গর্ত্ত করিলেন, একটী বড় আর একটী ছোট। তখন বন্ধু আসিয়া বলিলেন, আপনি এ কি করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, বড়টা দিয়া বড় বিড়ালটা ও ছোটটা দিয়া ছোটটা ঢুকবে মনে ক'রে আমি দুইটি গর্ত্ত করিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, বড়টা দিয়াই দুইটা প্রবেশ করিতেছে; তখন বন্ধু হাসিতে

লাগিলেন। নিউটন অঙ্ক শাস্ত্রে অত পণ্ডিত, কিন্তু অন্যমনস্ক ছিলেন বলিয়া অঙ্কের একটি খুব সামান্য বিষয় ভুল করিলেন। এই রূপ অন্যমনস্ক থাকিলে যে জিনিষে যে জ্ঞান দরকার তাহাই পাওয়া যায় না, সুতরাং নূতন বিষয়ে কিরূপে জ্ঞান হইবে। জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে মনোযোগ চাই; মনের সঙ্গে যোগ দরকার। মনের সঙ্গে যোগ একটা সোজা জিনিষ নয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে সব জিনিষ ভাল লাগে আমরা তাতেই মন দিই। জগতের চারি দিকে কত ভাল জিনিষ আছে সে দিকে দৃষ্টি রাখি না, কেবল যে গুলি প্রিয় হইয়াছে সেই গুলিতেই মন আকর্ষণ করে। অনেক জিনিষ আছে যা বাস্তবিক ভাল, কিন্তু আমরা ভাল বলিয়া বুঝিতে পারি না বলিয়া তাতে মনোনিবেশ করি না। ছোট ছেলেদের ভিতর এটা বুঝিতে পারা যায়। কতকগুলি জিনিষ তাহারা দেখিতে ও গ্রহণ করিতে ভাল বাসে, এবং আর কতকগুলি একেবারে চায় না। তাহারা যে গুলি ভাল বাসে, যদি কেবল সেই গুলিই তাহাদিগকে দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদিগের জ্ঞানের উন্নতি হয় না, যে সকল জিনিষ মনোহারী নয় তাহাতেও মন দিতে হইবে। কেবল যদি প্রিয় সুখকর সহজ বিষয় ভাবি তাহা হইলে মনের ক্ষমতা বাড়ে না। যাহারা ব্যায়াম করে তাহারা যদি প্রতিদিনই এক রকম সহজ সুখকর ব্যায়াম করে, তাহলে শরীর ভাল হয় না; কিন্তু যদি একটু একটু করিয়া কঠিন ব্যায়াম অভ্যাস করে তবে শরীরের উন্নতি হয়। মানুষের মনেরও ঠিক সেই রকম। মন যাহা চায় না সে দিকেও একটু একটু করিয়া মন দিতে হইবে, তাহলে মনোযোগ কি বুঝিতে পারা যাইবে। মনের উপর প্রত্যেকের একটা ক্ষমতা আছে। যেগুলি ভাল জিনিষ প্রথমতঃ তাহা দেখিতে খারাপ হইলেও সে দিকে মনোনিবেশ করা উচিত, তাহার ভিতর যেটুকু ভাল আছে সেই বিষয় লইয়াই ঐ জিনিষটাকে মনোহারী করিয়া লওয়া প্রয়োজন। জ্ঞানের উন্নতির প্রথম উপায় মনোযোগ।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের মনের উন্নতি হয় তেমন দুটী বিষয় জানা চাই, বিয়োগ ও সংযোগ। যখন কোন জ্ঞানলাভ করিতে হইবে তখন একটী বস্তুর সহিত অন্য আর কতটি বস্তুর কতটা মিল বা অমিল সব অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। পৃথিবীর সমস্ত জিনিষের ভিতরেই কতকটা সাদৃশ্য ও কতকটা অসাদৃশ্য আছে। আমাদের মন কি করিবে? বস্তুর মিল অমিল দেখিবে। মন দুইই পারে,—যেমন জগতের সব বিষয়ের মিল অমিল-সম্বন্ধে একটু একটু সামান্য জ্ঞান লইয়া থাকিতে পারে, আবার দুইটী বিপরীত বিষয় হইতে মিলন অন্বেষণ করিতে পারে। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা ছাড়িয়া যদি কেবল সাধারণতঃ জগতের ভিতর যা একটু আধটু মিল অমিল দেখা যায়, তাহা লইয়াই কাহারও মন সন্তুষ্ট থাকিতে চায় তাহার উন্নতির আশা নাই।

গাছ ও জন্তু, প্রথমতঃ দেখিলে এই, দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু

যদি বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক খুব ভাল করিয়া দেখা যায় অর্থাৎ যদি বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া দেখা যায় তাহা হইলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, এদের ভিতর নানা পার্থক্যসত্ত্বেও এদের প্রাণের একটা মিল আছে। জন্তু সচল, গাছ অচল; যদিও ইহা এক স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে পারে না, তবুও ঐ একই নিয়মে বর্দ্ধিত হইতেছে। এই মিলন প্রথম দেখা যায় না, কিন্তু নিগূঢ় ভাবে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। বিজ্ঞান বলেন, জগতে এমন জিনিষ নাই যাহার আর একটীর সহিত কোন না কোন বিষয়ে মিল নাই।

ভগবান্ মনের একটা প্রবৃত্তি দিয়াছেন যে, সে অমিলের ভিতর মিলন অন্বেষণ করে, এটা একটু গূঢ় ভাবে বুঝিতে হইবে। বড় বড় মহাত্মাদিগের জীবনের বিষয় পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যেন তাঁহারা তফাৎ, প্রভেদ অমিল এ সকল সহ্য করিতে পারিতেন না, এই সকলের ভিতরে কোথায় মিল আছে, তাহাই অনুসন্ধান করিতেন। নিউটন যেমন সমুদ্রের জলের সঙ্গে আকাশের চন্দ্র তারকার সম্বন্ধ বাহির করিলেন; সাধারণতঃ দেখিতে তফাৎ মনে হয়, অথচ তিনি দেখিলেন যে নিয়মে জোয়ার ভাঁটা হইতেছে, সেই নিয়মে আকাশে চন্দ্র সূর্য্য চলিতেছে। আবার জীবদিগের ভিতর এই একই আকর্ষণ দেখা যায়। মাছ জলে সাঁতার দিতেছে, পাখীরা আকাশে বেড়াইতেছে, পণ্ডিত দেখিলেন, এই দুই একই নিয়মে কার্য্য করিতেছে। গঠন ইত্যাদির তফাৎ, কিন্তু দুই একই ভাবে চলে। এইরূপ পণ্ডিতেরা ক্রমাগত অমিলের ভিতর হইতে মিলন অন্বেষণ করিতে থাকেন। আমরা দেখিতে পাই, আমাদিগের পূজনীয় আচার্য্যদেব অতিশয় মিলনপ্রয়াসী ছিলেন। তিনি নানা শাস্ত্র নানা ধর্ম্মের ভিতর কোথায় মিল আছে তাহাই খুঁজিতে লাগিলেন, অবশেষে সকলের ভিতর মিলন স্থাপন করিয়া নববিধান প্রচার করিলেন। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা মিলনপ্রয়াসী। আমাদের মনের উন্নতি করিতে হইলে এই মিলনই চাই। নানা বিষয়ে ভাসা ভাসা জ্ঞান পরিস্ফুট করা দরকার, আর সব জিনিসের ভিতর অমিল হইতে মিলন বাহির করিতে হইবে। জ্ঞানের উন্নতি করিতে হইলে প্রথম মনোযোগের ক্ষমতা চাই। যে সব বিষয়ে মন আকর্ষণ করে না, সে সব বিষয়েও মন দেওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ জগতের সমস্ত জিনিসের ভিতর অমিল হইতে মিলন বাহির করা চাই। ছোট ছেলেদের ভিতর দেখিতে হইবে তাহারা দুইটা পৃথক জিনিষের ভিতর কত দূর মিলন দেখিতে পাইয়াছে। এ সব বিষয় তাহাদের নজর লাগিতে দেওয়া উচিত।

মনের উন্নতির তৃতীয় উপায় জগতের ভিতর নিয়ম শৃঙ্খলা বাহির করিবার ক্ষমতা। জগতের প্রত্যেক জিনিষের ভিতর কার্য্য কারণ সম্বন্ধ স্থির করিতে হইবে।

যদি আমাদের প্রবৃত্তির দিক দিয়া দেখি—যেমন এর যখন যাহা ভাল লাগে তাহাই করে,—তখন আমরা সহজে বুঝিতে পারি না যে, জগতে সমস্ত ঘটনা নিয়মের অধী

চলিতেছে, কিন্তু যদি মনোযোগের সহিত দেখি তবে দেখিতে পাই, সমস্তই নিয়মের অধীন। এরূপ অবস্থায় সমস্ত বিষয় মনোযোগের সহিত দেখিবার জন্য উপযুক্ত উপায় চাই। যেমন ঘরে খুব বাতাস আসিতেছে, যদি ঐ বাতাস আসা বন্ধ করিতে হয় তবে আগে জানালা বন্ধ করিতে হইবে, সেই রূপ একটা কিছু করিতে হইলে তাহার উপায় আবশ্যক। ইহাতে জ্ঞান পরিস্ফুট হয়। যেমন যদি এক সময় একখানা ভাল বই পড়িতে ইচ্ছা না করে তাহা হইলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে? তখন মনে করা দরকার উহাতে কি কি গুণ আছে, এবং যিনি এই বই রচনা করিয়াছেন তিনি কিরূপ মহৎ লোক ছিলেন, এই সব বিষয় মনে করা উচিত। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পুস্তক খানি মনোহারী হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক এটা অর্থাৎ জগতের ভিতর শৃঙ্খলা দেখিতে শেখা খুব সহজেই হয় না। তবে ইহা প্রত্যেকের জানা উচিত যে, নিয়ম ছাড়া আর কিছুই নাই। এই জগতে বাস করিলে কত কি দেখা যায়। হয়ত একজন গরীব লোক ইচ্ছা করে যে সে বেশ সুখে থাকে, বেশ ভাল খেতে পায়, কিন্তু তা হয় না। প্রথম এটা দেখিলেই মনে হইতে পারে, কি অনিয়ম! একজন কেমন সুখে বাস করিতেছে, আর এক জনের কত দুঃখ, কিন্তু একটু মনোযোগের সহিত বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই ইহার ভিতর নিয়ম শৃঙ্খলা দেখা যায়। সমস্ত জিনিষের ভিতরেই নিয়ম আছে। জগতের স্রষ্টা যাহা করেন সমস্তই নিয়মে করেন। তাঁহার এই মহানকার্য্যক্ষেত্রের ভিতর একবিন্দু অনিয়ম থাকিতে পারে না।

তাঁহার কার্য্য দেখিয়া নিয়মে কাজ করিতে শেখা উচিত। এই জগতের ভিতর একটা নিয়ম আছে, শৃঙ্খলা আছে, দেখা অতি আবশ্যক। কি থেকে কি হয়, কোন্ জিনিষের কি কারণ, এ সব ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। কার্য্য কারণ-শৃঙ্খলার বিষয় জানা থাকিলে সব বিষয় সহজ হয়ে যায়। আর সেই জ্ঞান হইলে আমরা জগৎসম্বন্ধে যে একটা দাবী দাওয়া করিয়া থাকি তাহা চলিয়া গিয়া মন শান্ত হয়। ভগবানের ইচ্ছা সব নিয়মে শান্তভাবে করে, সুতরাং আমাদেরও ঐ নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখিয়া শেখা উচিত।

মনোবিজ্ঞান।

বস্তুবিজ্ঞান *।

আজ বস্তুবিজ্ঞানবিষয়ে বলিবার কথা আছে, বস্তুবিজ্ঞান মানে বস্তুর বিষয় বিশেষরূপে জানা। বস্তু কি? আমরা যা কিছু দেখি, যার বিষয় চিন্তা করি তাই

* ১২ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু মোহিতচন্দ্র সেন প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

বস্তু। যেমন গাছ, বাগান, বাড়ী, মন প্রভৃতি যখন যেটার বিষয় চিন্তা করি তখন তাহাই চিন্তার বস্তু। বস্তুর বিষয় বলিবার আগে বস্তু কয় প্রকার তাহাই বলিতেছি। সাধারণতঃ সকলেই জানেন বস্তু দুই প্রকার, জড় ও চেতন। জড় মানে যার চৈতন্য নাই, আর চেতন মানে যাহার চৈতন্য আছে।

জড় কি? এবং চেতন কি? এ বিষয় আর একটু সূক্ষ্মরূপে বুঝিতে হইবে। আগে জড় বস্তুরই উদাহরণ দেওয়া যাউক, যেমন গাছ, ইট। এই সমস্ত জড়ের লক্ষণ কি? ইহাদের আকার গঠন আছে, এবং তুলিতে গেলে ভার লাগে, সুতরাং ওজনও আছে। এই আকৃতি সমস্ত জড়ের ভিতরেই আছে। এমন কোন জড় ভা বা যায় না যার কোন গঠন বা আকার নাই। যেমন টেবিল, গাছ, পোকা প্রভৃতি সমস্তই এইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থ। জড় ও আকার দুই ভাগে বিভক্ত, যথা নির্জীব বা স্থাবর এবং সজীব বা জঙ্গম। নির্জীব পদার্থের একটা লক্ষণ স্থাবর, অর্থাৎ যেখানে রাখা যায় সেই খানেই থাকে, আর সজীব পদার্থকে জঙ্গম বলে, জঙ্গম অর্থ যাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে। কেউ কেউ বলতে পারেন একটা বল যদি গড়াইয়া দেওয়া যায় উহা অন্য স্থানে চলিয়া যায়, তবে কেন উহাকে সজীব বলিব না? এর মধ্যে তফাৎ এই, নির্জীব পদার্থের নিজের কোন নড়িবার শক্তি নাই, অন্য শক্তি দ্বারা যদি চালিত না হয় তবে এক তিলও সরিতে পারে না, তার নিজের কোন গতি নাই, তাই নির্জীব বলা হয়। এই নির্জীবতা অর্থাৎ গতিহীনতা উচ্চ জীবনের ভিতরেও দেখা যায়, যেমন কেহ যখন বলেন, আমি কর্ত্তব্য কাজ করি না যতক্ষণ না হুকুম পাই; তখন বলি জড় প্রকৃতি লাভ করিয়াছে। যে জীবন সজীব সে আপনি আপনার কর্ত্তব্য কাজ বুঝিয়া লয়, তাহাকে চালাইবার কারো হুকুম দরকার হয় না। জড় পদার্থের ঐ নিকৃষ্ট ভূমিতে যা দেখিলাম, এ তাহাই। বাস্তবিক নির্জীব জড় আপনি কিছুই করিতে পারে না, উহাই নির্জীবের লক্ষণ। সজীবের লক্ষণ এই, তাহাদের ভিতরে একটা শক্তি আছে যাহা দ্বারা নিজেকে প্রসারিত করিতে পারে, নিজের স্থান হইতে প্রসৃত হইয়া অন্য স্থানে যাইতে পারে। আর এক রকমের পদার্থ যাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না, কিন্তু একস্থানে থাকিয়াই বাড়িতে পারে, যেমন গাছ, লতা তৃণ ইত্যাদি। একটা বীজ তার মধ্যে প্রাণ আছে, সেটা নির্জীব পরমাণুর মত মৃত নয়। বীজ যদি মাটীতে ফেলিয়া রাখা যায়, ক্রমে তাহার ভিতর হইতে দু দিক দিয়া দুটী অঙ্কুর বাহির হইবে। একটা নীচের দিকে মাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া গাছের শিকড় হয়, এবং আর একটা ফুঁড়ে উপরে উঠিয়া ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া বড় হইতে থাকে ও আপনাকে পত্রে পুষ্পে শোভিত করিয়া ক্রমান্বয় আকার পরিবর্ত্তন করে। এই সকল জাতীয় সজীব পদার্থকে উদ্ভিদ বলে। এই যে বড় হইবার এবং আপনাকে নানা প্রকারে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, ইহাই উদ্ভিদের ক্ষমতা। (ক্রমশঃ)

ভ্রম।

গত ভাদ্র মাসের মহিলায় মহিলাদের রচনাতে অসাবধানতাপ্রযুক্ত একটি গুরুতর ভুল হইয়াছে; এক বালিকার পদ্য রচনার সঙ্গে একটী মহিলার রচনা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। সু—স্বাক্ষরিত মহিলার রচনা "একটি গোলাপ ঐ ফুটিয়াছে হায়।" এই হইতে আরম্ভ, এই রচনায় শিরোনাম "একটি" হইবে। এই শিরোনাম ও বালিকার রচনার শেষ ভাগে ড্যাস রুল না থাকাতে দুই রচনা একাকার প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং অর্থের বৈষম্য ঘটিয়াছে। তজ্জন্য আমরা দুঃখিত হইয়াছি। মহিলার রচনার ফর্ম্মা মুদ্রিত হইবার সময় আমরা স্থানান্তরে ছিলাম, প্রুফ সংশোধন করিতে পারি নাই। আমরা কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া মুদ্রিত মহিলা প্রাপ্ত হই। তখন সংশোধনের উপায় ছিল না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

৭ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু,	শিলঘাট	১৲
„ পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত,	যোগনালা	১৲
„ হরিনাথ নিয়োগী,	পিংনা	২৲

৮ম বৎসর।

শ্রীমতী শান্তশীলা,	কাশি	২৲
„ শরৎকুমারী গুপ্ত,	কলিকাতা	২৲
শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কর্ম্মকার,	ময়মনসিংহ	১৲
„ মাধব চন্দ্র ঘটক,	টাঙ্গাইল	১৲
„ অরুণচন্দ্র দাস,	কলিকাতা	২৲
„ ভগবান্ চন্দ্র দাস,	বালেশ্বর	২৲
„ জগচ্চন্দ্র রায়,	মুন্শিগঞ্জ	২৲
„ শ্রীহরিনাথ,	ভিরুগড়	২৲
„ জিতেন্দ্রনাথ বসু,	শিলঘাট	২৲
„ পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত,	যোগনালা	২৲
„ হরিনাথ নিয়োগী,	পিংনা	॥০

৯ম বৎসর।

শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী দেবী,	পিনমানা	২৲
„ নীরদা সুন্দরী দত্ত,	কুমিল্লা	২৲
„ সুরবালা সেন,	বদরপুর	২৲

শ্রীমতী ইচ্ছাময়ী দাস,	ঢাকা	২৲
„ কিরণশশী দাস,	কলিকাতা	১৲
„ কুন্দমালা দেবী,	„	২৲
শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কর্ম্মকার,	ময়মনসিংহ	২
„ হরলাল সাহা,	কলিকাতা	২৲
„ মাধবচন্দ্র ঘটক,	টাঙ্গাইল	১৲
„ হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়,	নারাণগঞ্জ	২৲
„ বরদা প্রসাদ ঘোষ,	চুঁচুড়া	২৲
„ সিদ্ধেশ্বর সরকার,	ভাগলপুর	১৲
„ শশিভূষণ সেন,	ঢাকা	২৲
„ ভগবান্‌চন্দ্র দাস,	বালেশ্বর	১৲
„ জগচ্চন্দ্র রায়,	মুনশিগঞ্জ	২৲
„ শ্রীহরি নাথ,	ডিব্রুগড়	২৲
„ পূর্ণচন্দ্র মজুমদার,	মুর্শিদাবাদ	২৲
„ জিতেন্দ্রনাথ বসু,	শিলাঘাট	২৲
„ মিয়া এনায়েত উল্লা,	হলদিবাড়ী	২৲
„ যাদব চন্দ্র সেন,	কুচবিহার	২৲
„ নিত্যগোপাল রায়,	গাজিপুর	১।০
„ ভূপতিনাথ দাস,	ঢাকা	২৲
„ অরুণচন্দ্র দাস,	কলিকাতা	২৲
„ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,	কলিকাতা	২৲
„ বিহারীকান্ত চন্দ,	ময়মনসিংহ	২৲

১০ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল রায়,	গাজীপুর	২৲
„ নরেন্দ্র নাথ বসু,	কলিকাতা	২৲
„ নীরদরঞ্জন গুহ,	সিরাজগঞ্জ	২৲

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকা প্রতিমাসের সংক্রান্তি দিবসে প্রকাশিত হয়। ডাক মাশুলসহ ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

অনেকে মহিলা পত্রিকা বৎসরাধিক কাল গ্রহণ করিয়া মূল্য দান করেন না, বড় দুঃখের বিষয়। যাঁহারা মূল্যদানে অসমর্থ তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া দেন, অথবা আমাদিগকে তাহা পাঠাইতে নিষেধ লেখেন। তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া প্রাপ্য মূল্য না পাইলে অনেক স্থলে আমরা সেই মূল্যের জন্য ভিঃ পিতে মহিলা পাঠাইয়া থাকি।

সূচী।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১০ম ভাগ] কার্ত্তিক, ১৩১১; নবেম্বর ১৯০৭। [৮র্থ সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

শিক্ষিতা বঙ্গমহিলাদিগের জীবনের দায়িত্ব অধিক। তাঁহারা যে সকল জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা যদি কেবল পুস্তকে বদ্ধ থাকে, জীবনে ও চরিত্রে প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের জ্ঞানোপার্জ্জনে পণ্ডশ্রম ও বৃথা অর্থব্যয় হইয়াছে বলিতে হইবে। লেখা পড়া না শিখিয়া বরং অজ্ঞান মূর্খ থাকাই তাঁহাদের পক্ষে ভাল ছিল।

সাধারণ নারীগণ বিদুষী নারীদিগের জীবনে সদ্দৃষ্টান্ত দর্শন করিতে চাহে। তাঁহারা লেখা পড়া শিখিয়া মূর্খের মত কাজ করিলে সেই দৃষ্টান্তে বঙ্গীয় নারী সমাজের অশেষ অকল্যাণ হয়। নারীসমাজের দুঃখ ও অভাবের শেষ নাই, নারীসমাজসংস্কারের জন্ত শিক্ষিতা মহিলাদিগকে দৃঢ়সঙ্কল্পা হইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। যদি বঙ্গ মহিলাগণ বিদ্যাবতী হইয়া কেবল ভোগ বিলাসে ও আলস্যে জীবন যাপন করেন, বেশভূষা আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকেন, পুতুল সাজিয়া গৃহে বসিয়া কেবল অসার কাব্যোপন্যাসপাঠই তাঁহাদের বিদ্যাচর্চ্চার চরম সীমা হয় তাহা হইলে তাঁহাদের শোচনীয় দুর্গতি বলিতে হইবে। বগি হাকাইয়া সাইকেলে চড়িয়া যথ তথা বেড়াইলে বা অনর্গল ইংরাজি কথা বলিতে ও লিখিতে পারিলে নারীজাতির প্রকৃত উন্নতি হয় না। নীতি ও চরিত্রের উন্নতিই উন্নতি। তদ্ভিন্ন সকলই অসারের অসার।

ধর্ম্মানুরাগ, নীতিনিষ্ঠা, জীবে দয়া, বিনয়, ভক্তি, হিতৈষণা, স্বার্থত্যাগ, পরসেবা শ্রমশীলতা, গৃহকর্ম্মাদিতে নৈপুণ্য, সত্যপরায়ণতা, জলন্ত উৎসাহ এই সকল সদ্গুণ ও দেবভাব শিক্ষিতা মহিলাগণ নিজেদের জীবনে প্রকাশ করিয়া ধন্য হউন, সুখী হউন।

শাক্ত ও বৈষ্ণবপরিবারের মহিলা।

বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ শাক্ত ও বৈষ্ণব, এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। শক্তির—কালী দুর্গার উপাসকগণ শাক্ত, বিষ্ণুর—কৃষ্ণের উপাসক সম্প্রদায় বৈষ্ণব। সাধারণতঃ শাক্ত সম্প্রদায়ের জীবন জ্ঞান-প্রধান, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জীবন ভক্তি-প্রধান। শাক্তদিগের প্রধান তীর্থ কাশী-ধাম, বৈষ্ণবদিগের তীর্থ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-ভূমি বৃন্দাবনধাম। শাক্তগণ মাংসভোজী শুষ্ক কঠোর প্রকৃতি, বৈষ্ণবগণ নিরামিষা-হারী প্রেমার্দ্র কোমল-প্রকৃতি। তবে বৈষ্ণব শ্রেণীর অন্তর্গত অনেকে মৎস্যাদি ভোজন করেন, কিন্তু জীবহত্যা করে ও মাংস ভোজন করে এরূপ লোক তাঁহাদের মধ্যে বিরল। শাক্ত সম্প্রদায়ে মদ্যপান প্রচলিত আছে। পানদোষে সকল শাক্ত পরিবার দূষিত না হউক, অনেক পরিবারে সর্ব্বদা সুরাপানের মহাঘটা দৃষ্ট হয়। আমরা শাক্তপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রতি-পালিত হইয়াছি, আমাদের পরিবারের অন্ত-র্গত কেহ মদ্য পান করিতেন না ও করেন না। কিন্তু মাংসভোজনে বিরত আমরা কোন শাক্ত পুরুষকে দেখি নাই। ইয়ুরোপীয় সভ্য সমাজের শাক্তদিগের ন্যায় অগত্যা কোন হিন্দু শাক্ত নিত্য মাংসভোজী নহেন। দুর্গা কালীর পূজোপলক্ষে পাঁঠা বলি হয়, তাঁহারা সেই বলির মাংস কিয়ৎপরিমাণ প্রসাদ-রূপে সংবৎসরে দুই চারি দিন ভক্ষণ করেন, কখন কখন পায়রার মাংস এবং পূর্ব্বঙ্গের শাক্ত পুরুষগণ কচ্ছপাদি ইতর জীবের কেউটার মাংস ভোজন করিয়া থাকেন। সচরাচর তাঁহারা সক করিয়া সংবৎসরের মধ্যে দুই চারি দিন সেই সকল জীবের মাংসের স্বাদ গ্রহণ করেন। ইয়ুরোপীয় খ্রীষ্টবাদী শাক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত স্ত্রী পুরুষ যেমন নিত্য মাংসভোজনের সঙ্গে মদ্যপানের যোগ করেন, সমদ্য মাংস ভোজন করেন এরূপ হিন্দু শাক্ত অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

বাইবেল গ্রন্থে প্রেরিত মহাত্মা পলের এই রূপ উক্তি নিবদ্ধ আছে;—“মাংস আহার মদ্যপান অথবা অন্য কোন কার্য্য যাহাতে তোমার ভ্রাতার পদস্খলন হয় বা হৃদয়ে আঘাত লাগে, অথবা দৌর্ব্বল্যবৃদ্ধি পায়, এরূপ কিছু না করা শ্রেয়ঃ।” খ্রীষ্টীয় সমাজের স্ত্রী পুরুষেরাই অধিকতর মদ্যপায়ী ও মাংসভোজী। তাঁহাদের অভ্রান্ত পবিত্র বাইবেল শাস্ত্রের এই মহাবাক্য অন্য সাধারণ খ্রীষ্টবাদী দূরে থাকুক, কয় জন পাদ্রী সাহেব মান্য করেন? তাঁহাদের দৃষ্টান্তে যে বঙ্গীয় নব্য সমাজের কত নরনারীর বিষম পদস্খলন হইতেছে, বলিয়া উঠা যায় না। অনেক বঙ্গমহিলা সর্ব্বাগ্রে বিবিদের ভোজনপানেরই অনুকরণ করেন। সভ্য সমাজের খ্রীষ্টবাদিনী মহিলাদিগের জীবনের কত বড় দায়িত্ব! বাইবেল শাস্ত্র তাঁহারা কতটুক মান্য করিয়া থাকেন? তাঁহা-দিগের কুদৃষ্টান্তে এদেশের দুর্ব্বিনীত নারীদিগের যে বিষম অকল্যাণ হইতেছে।

বাঙ্গালা শাক্ত ও বৈষ্ণব পরিবারের মহিলাদিগের বিষয় আমাদের আলোচ্য। এক্ষণ তাহাই বিবৃত হইতেছে। উপরে উক্ত

খিত হইয়াছে যে আমরা শাক্ত পরিবারে লালিত পালিত হইয়াছি। আমরা বাল্য কালে দেখিয়াছি যে, আমাদের মা ভগিনী পিসী মাসী সকলেই শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিতা, তাঁহারা প্রত্যহ শক্তি পূজা করেন; শক্তি-দেবীর স্বামী শিবও তাঁহাদের কর্ত্তৃক পূজিত হন, কিন্তু মুখ্যরূপে নহে। বৎসরান্তে নিয়মিতরূপে আমাদের বাড়ীতে কালীপূজা ও দুর্গাপূজা হইয়াছে। বাড়ীর সকল মহিলাই কালী দুর্গার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, পূজার আয়োজন করিয়া দিয়াছেন, বলিদানের সময়ে আনন্দসহকারে হুলুধ্বনি করিয়াছেন, এবং বলিদর্শনের জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। চারি পা মুচড়িয়া ধরিয়া গলদেশ সবলে টানিয়া নিরীহ নিরুপায় পাঁঠা গুলিকে হাড়িকাঠে চাপিয়া ধরা হইত, ছেত্তা ছেদন করিত, রক্তপ্রবাহে ভূতল রঞ্জিত হইত, দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইতাম, তখন মহোৎসাহে শাঁক কাঁসর ঘণ্টা বাজাইতাম। মহিষবলির দিন আমাদের উৎসাহ ও আনন্দের সীমা ছিল না। মাতৃদেবী দেবীর প্রসাদস্বরূপ পাঁঠার মাংস রাঁধিয়া দিতেন, আমরা খাইয়া কত আনন্দ পাইয়াছি। জীবনের সেই এক দিন ছিল, এক্ষণ অন্যরূপ। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, শাক্ত পরিবারের মহিলা হইয়াও আমাদের মা ভগিনী প্রভৃতি কেহই মাংস ভক্ষণ করিতেন না। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে হাটে বাজারে বড় ২ কমঠের (কেউটার) আমদানী হইত। মা বাজার হইতে কমঠ ক্রয় করিয়া আনাইতেন। উহা এক প্রকার অদ্ভুত চতুষ্পদ জলচর জীব। তাহার বুক ও পিঠের খোলা পাথরের ন্যায় শক্ত; কুঠারের বহু আঘাতে বহু পরিশ্রমে তাহার প্রস্তরবৎ দৃঢ় খোলা দুইটা পৃথক্ করিয়া তাহার অন্ত্রপুঞ্জ বাহির করিতে হয়, সেই অবস্থায়ও সে মুখব্যাদান করিয়া কামড়াইতে চাহে। মেঘনা নদী এই বিচিত্র জীবের প্রধান বাসস্থান, এক একটি কমঠ এত বড় হয় যে, এক জন বলবান্ পুরুষের তাহা বহন করা কষ্টকর হইয়া থাকে। একটী ব্রাহ্মিকা মহিলাকে দেখিয়াছি যে, কয়েকটি বড় বড় কমঠ রেলওয়ে পার্শেলে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কলিকাতায় স্বীয় প্রিয়তম স্বামীর নিকটে উপহারস্বরূপ পাঠাইয়াছেন। মাসাবধিকাল বদ্ধভাবে অনাহারে থাকিলেও এই অদ্ভুত জীবের মৃত্যু হয় না। কেউটা মারা অতিশয় নিষ্ঠুর কার্য্য, পরিবারস্থ মহিলারা উপস্থিত থাকিয়া সেই নির্দ্দয় ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিতেন। কথায় বলে "পাঁঠার হাড়, কেউটার নাড়।" কমঠের নাড় অর্থাৎ আঁতই প্রধান ভক্ষণীয়। কূর্ম্মের অন্ত্রপুঞ্জকে ধৌত পরিষ্কার করিয়া দিলে মেয়েরা তাহা রাঁধিয়া প্রিয়জনদিগকে খাইতে দেন। পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিয়া বাল্যকালে যে কূর্ম্মমাংস ভক্ষণ করি নাই, ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, বরং রুচিপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়াছি, এক্ষণ মনে করিতেও ঘৃণা হয়। কিন্তু এ অঞ্চলের মেয়েরা যে, কীটজাতীয় বিকৃত আকার অদ্ভুত জন্তু কাঁকড়া ভক্ষণ করেন, তাহা আমাদের নিকটে অতিশয় ঘৃণাজনক। শুনিয়াছি, এখানকার এক জন মেছুনী কাঁকড়ার সাড়াশীর মত লম্বা

ঠেঙ্গ ছিঁড়িয়াছিল বলিয়া জীবের প্রতি অত্যাচারনিবারিণী সভা হইতে তাহার ॥০ অর্থদণ্ড হইয়াছিল। কিন্তু আবার এদেশের নিরামিষভোজী দয়াবান্ সাধু লোকেও পরিবারের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাদিগকে রসনাপ্রিয় লাউ কাঁকড়ার ঘণ্ট খাওয়াইবার জন্য বাজার হইতে কাঁকড়া আনিয়া যোগাইয়া থাকেন, আর ঝী চাকর তাহার ঠেঙ্গগুলি ছিঁড়িয়া ফেলে, ইহা দেখিয়া শুনিয়া বড় দুঃখ হয়। কঠিন-প্রাণ কৈ মাগুর মাছগুলির প্রতি মহিলারা যে কি দয়া প্রকাশ করেন বলিয়া উঠা যায় না। জীবিত কৈ মাগুরকে পাথরে ঘসিয়া তাহার ছাল তুলিয়া নানাপ্রকার যন্ত্রণা দানের পর কুচি কুচি করিয়া কাটা হয়। "জীবে দয়া নামে ভক্তি কর জীবনের সার, ওরে মন আমার।" ব্রাহ্মসমাজের এই দয়া-সমুদ্দীপক সঙ্গীত কি তখন মনেপড়ে না? একদা পূর্ব্ব বঙ্গের একটী হিন্দু পরিবারের বধূকে তাহার শাশুড়ী কতকগুলি জীবন্ত কৈ মাছ কুটিতে দেন। বধূ সেই জীবন্ত মাছগুলি কুটিতে কষ্টবোধ করিয়া পুকুরে বিসর্জ্জন করেন। পরে শাশুড়ী ইহা জানিতে পারিয়া বধূকে ভর্ৎসনা করেন। বধূ বলেন "সে গুলি যে জিয়ন্ত মাছ। আমি কেমন করিয়া কুটিব?" বধূ অম্লান বদনে শ্বশ্রূমাতার গালি তিরস্কার সহ্য করেন। আমাদের একজন প্রাচীন বন্ধু পল্লীগ্রাম হইতে নৌকাযোগে নগরে যাইতেছিলেন, নগরস্থ বন্ধুদিগকে উপহার দিবার জন্য কতকগুলি জীবন্ত বড় বড় কৈ মাছ জলপূর্ণ হাঁড়ীতে পূরিয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন। পথে মাছ গুলির জন্য মন বড় কষ্ট হয়, তিনি সমুদায় মাছ জলে বিসর্জ্জন করেন। বাজারহইতে নানাপ্রকার মরা মাছ আনয়ন করিয়া খাওয়া হয়, তাহা তত দুঃখজনক নহে। ঝী চাকরাণী বা গৃহিণী জীবন্ত মাছগুলিকে যেন আলু পটলের মত কোটেন, তাঁহাদের মনে কিছুই লাগে না। কলিকাতার বাজারে ঝিনুক গুগলি বিক্রয় হয়। শুনিয়াছি, এ অঞ্চলের মেয়েরা অবস্থাবিশেষে সে সকল ভক্ষণ করেন। বোধ করি ভদ্র মহিলারা নয়। যাহা হউক কথা অন্য দিকে গড়াইয়া পড়িল। এক্ষণ আমরা প্রকৃত পথে আসিতেছি।

শাক্ত পরিবারের মহিলারা বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধিনী নহেন, তাঁহারা কালী দুর্গাকে যেমন ভক্তি করেন,লক্ষ্মী নারায়ণের প্রতিও সেইরূপ ভক্তিমতী। আমাদের পরিবারে নারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, নিয়োজিত ব্রাহ্মণ নিত্য সেই বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকে। স্বর্গগতা জননীকে তৎপ্রতি অতিশয় ভক্তি প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি। তিনি নিত্য ঠাকুর ঘরের দ্বারে প্রণাম ও নারায়ণের চরণামৃত গ্রহণ করিতেন। মা দুর্গোৎসবে যেমন উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, নারায়ণ দেবের দোলযাত্রায়ও সেইরূপ উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়াছেন। বিষ্ণুর নামান্তর নারায়ণ। শাক্ত পরিবারের সকল মহিলারই শক্তি ও বিষ্ণুর প্রতি এইরূপ নিরপেক্ষ ভাব। আমাদের শক্ত পীড়া হইলে আরোগ্যদানের প্রার্থনায় মা রক্ষাকালী ও দুর্গাকে যেমন পাঁঠা মানত করিতেন, তদ্রূপ জীবহত্যা-

বিরোধী লক্ষ্মী নারায়ণকেও নৈবেদ্যাদি যোগাইতেন, হরির লুট মানত করিতেন। শাক্ত পরিবারের অনেক মহিলা পরসেবা-প্রিয়া ও কোমলপ্রকৃতি। আমাদের জননী নিত্য ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক পূজা করিতেন, ঘোরতর মৃত্যুযন্ত্রণার সময়ও আহ্নিক করিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ রন্ধন পরিবেশন করিয়া পরিবারস্থ সকলকে খাওয়াইয়া পরে নিজে ভোজন করিতেন। রোগীর সেবা করিতে—আপদ বিপদে প্রতিবেশীদিগকে সাহায্য দান করিতে শাক্ত মহিলা দিগকেও যত্নবতী দেখা যায়। তাঁহারা সর্ব্বদা নানা প্রকার ব্রতোপবাস করেন, এবং পর্ব্বোপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া থাকেন। আমাদের জন্মস্থানে—বড় বড় পল্লীগ্রামে অনেক ধনী পরিবারেও বেতনভোগী পাচক পাচিকা নাই। পরিবারস্থ মহিলারা উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে প্রত্যহ দুই বেলা রন্ধন করেন। পাচক পাচিকার প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি পতি পুত্র ও আত্মীয় স্বজন দিগকে খাওয়াইয়া তাঁহারা সুখী হন না, নিজেরাও খাইয়া তৃপ্তি লাভ করেন না। অনেক বড় বড় পারিবারিক ভোজে পাচক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হয় বটে, কিন্তু সেই পাচক কেবল ভাত রাঁধে ও পরিবেশন করিয়া থাকে; সমুদায় ব্যঞ্জন মেয়েরা নিজেদের রুচি অনুসারে রন্ধন করেন। আমাদের দিদীর এক্ষণ বয়ঃক্রম ৮২ বা ৮৩ বৎসর, তাঁহার দেহ কঙ্কাল-মাত্রাবশেষ, তিনিও এক্ষণ ইচ্ছা করিলে রন্ধন পরিবেশন করিয়া ৮।১০ জন লোককে খাওয়াইতে পারেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে হাবড়াতে ছিলেন, তখন এক দিন প্রচারক-বর্গকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, স্বহস্তে নূতন নূতন প্রণালীর ২৫।৩০টি নিরামিষ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া পরিবেশন-পূর্ব্বক তাঁহাদের সকলকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন। আমাদের জন্ম-ভূমিতে তিনি সুপাচিকা বলিয়া প্রসিদ্ধা। জরা বার্দ্ধক্যে আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব্বে যখন তাঁহার দেহে শক্তি ছিল, তখন কোন আত্মীয় প্রতিবেশীর ভবনে ভূর ভোজনের নিমন্ত্রণ হইলেই রন্ধন করিবার জন্য দিদী সাদরে আহূত হইয়াছেন; তিনি উৎসাহ ও আনন্দ সহকারে যাইয়া এই সেবার কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। গৃহকর্ম্মাদিতে তাঁহার এত উৎসাহ যে, এক্ষণও মুহূর্ত্তকাল বৃথা বসিয়া থাকিতে কষ্টবোধ করেন, অনায়াসসাধ্য সংসারের কোন না কোন কাজে লিপ্ত থাকেন। ময়মনসিংহ নগরের জজ আদালতের উকিল স্বর্গগত বাবু যাদবচন্দ্র লাহিড়ী বলিয়াছেন, "দুর্গাপূজার ছুটীর সময়ে আমাদের পরিবারের ন্যূনাধিক এক শত লোকের দুই বেলা রন্ধন ও পরিবেশনের কার্য্য পর্য্যায়ক্রমে বধূগণ উৎসাহপূর্ব্বক করিয়া থাকেন।" শুনিয়াছি, এখানকার অনেক সামান্যাবস্থাপন্ন মহিলা পতি পুত্রাদির জন্য এক বেলা রন্ধন করিতে হইলে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখেন। এরূপও শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, এক বেলা পাচক অনুপস্থিত বা পীড়িত, গৃহিণী রন্ধনশালায় রন্ধন করিতে গিয়াছেন, অগ্নির উত্তাপে ও পরিশ্রমে স্ত্রীর দেহপাত হইল বলিয়া গৃহকর্ত্তা অস্থির

হইয়া আপনার দুর্ভাগ্য মনে করিয়াছেন। এমনও ঘটে যে, আজ বাড়ীতে ১৫।২০ জন আত্মীয় নিমন্ত্রিত, গৃহে চারি পাঁচ জন মহিলা থাকিলেও পান সাজাইয়া উঠিতে পারেন না, গৃহকর্ত্তাকে চতুর্গুণ মূল্যে পানের খিলি খরিদ করিয়া আনিতে হয়। এদেশে আসিয়া ইয়ুরোপীয় মহিলারা কেবল আমোদ প্রমোদ করিয়া দিন যাপন করেন, মোসলমান, বাবুর্চ্চি বা মুচি মেথরশ্রেণীর পাচক কতকগুলি গো বরাহাদির মাংস অর্দ্ধদগ্ধ বা সিদ্ধ করিয়া দেয়, তাহাই তাঁহারা সুরারসসংযোগে আনন্দে ভোজন করেন, অনেক বাঙ্গালা সভ্যতমা মহিলা সেই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত ও সাধারণ শ্রেণীর মহিলারা, স্বয়ং রন্ধন করিয়া থাকেন, গৃহকর্ম্মাদিতে পরিশ্রম করেন। এদেশে আসিলেই তাঁহারা বাবু হন। আমরা পূর্ব্ববঙ্গে কোন ভদ্র শাক্ত পরিবারে দেখিয়াছি যে, গৃহিণী পীড়িতা শয্যাগতা, তাঁহার এক মাত্র ৯।১০ বৎসরের কুমারী কন্যা সুশৃঙ্খলরূপে সংসারের সকল কাজ কর্ম্ম ও মাতার সেবা করিয়াছেন, দুই বেলা রাঁধিয়া বাড়িয়া পরিবারস্থ সকলকে ভোজন করাইয়াছেন। আমরা ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। অসুস্থ শরীরে গৃহকর্ম্মাদিতে মহিলাদের অধিক পরিশ্রম করা সঙ্গত নহে, সুস্থ শরীরেও অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে রোগাক্রান্ত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা, আবার উপযুক্ত পরিশ্রম ও শরীর চালনা না করিলে শরীর অকর্ম্মণ্য ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে, মানসিক স্ফূর্ত্তি বিলুপ্ত হয়। যথাবিধি বিশ্রাম ও শ্রম করিয়া শারীরিক নিয়ম পালন করিতে হইবে।

আমাদের মাতৃদেবী ভক্তিপূর্ব্বক আতিথ্য সৎকার করিতেন। অতিথি সেবায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। হিন্দুশাস্ত্রমতে অতিথিসেবা করা পরম ধর্ম্ম। "সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ" "সর্ব্বদেবময়োঽতিথি।" অর্থাৎ অভ্যাগত জন সর্ব্বত্র গুরু, অতিথি সর্ব্বদেবময়। অনেক শাক্ত ও বৈষ্ণব মহিলা অতিথিকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অন্ন জল ও আশ্রয় দান করেন। বিদেশ হইতে কোন আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া কোন প্রয়োজন বশতঃ বা কুটুম্বিতাসূত্রে কাহারও গৃহে ২। ৪ দিন স্থিতি করেন, ইঁহারা এক প্রকার অতিথি, উল্লিখিত অতিথি এরূপ নহে। দেশান্তরগামী কোন পথিক সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া সায়ংকালে কাহারও গৃহে উপস্থিত হইলেন, আর গৃহী সেই অজ্ঞাত ও অপরিচিত পান্থ জনকে আশ্রয় ও ভোজ্যাজ্য প্রদান করিয়া সুখী ও তৃপ্ত করিলেন। এই আর এক প্রকার অতিথি। পল্লীগ্রামে হিন্দুপরিবারে এই প্রকার অতিথিরই সেবা সৎকার হইয়া থাকে। বড় বড় নগরে বা ইয়ুরোপে প্রায়ই এরূপ আতিথ্য সৎকার হয় না। ক্ষুধার্ত্ত শ্রান্ত পথিক, তুমি হোটেলে যাও, নিজের পয়সায় খাও, তোমর সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা। এখানে থাকিবার স্থান নাই, তুমি ক্ষুৎপিপাসানিবারণার্থ অন্ন জল পাইবে না, বিলাতের এবং এদেশের শহরের

লোক সকল ঈদৃশ মিষ্ট বচনে অতিথির প্রতি আদর প্রদর্শন করেন। স্বর্গগতা মাতৃদেবীর আতিথ্য সৎকারে নিতান্ত নিষ্ঠা ছিল, তাঁহার সেই সেবাব্রত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইবার আশা নাই।

আমরা একবার শ্রীমন্মহর্ষি দেব দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ভোলপুরস্থ পবিত্র সুরম্য আশ্রম শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলাম। তখন মহর্ষির প্রিয়তম পুত্র কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় সপরিবারে সেখানে বাস করিতেছিলেন। সেই সময়ে রবীন্দ্র বাবু স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। গৃহিণীর আতিথ্যসৎকারের ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলাম। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞাত ও অপরিচিত লোক, তিনি ধনী বড় লোকের পুত্রবধূ, তথাপি বধূমাতা স্বয়ং আমাদের জন্য ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়াছিলেন, জল খাবার প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিছুকাল হইল উক্ত গৃহিণী স্বর্গগত হইয়াছেন। শুনিয়াছি, তিনি স্বামীর জন্য প্রত্যহ প্রখর গ্রীষ্মোত্তাপের সময়েও ২।৩টি ব্যঞ্জন স্বয়ং রন্ধন করিতেন। আশ্রমসংক্রান্ত একটি বিদ্যালয় আছে, তাহাতে ২০।২৫টি বালক অধ্যয়ন করে। উক্ত গৃহলক্ষ্মী প্রত্যহ দুই বেলা তাহাদের জল খাবার প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিতেন।

আমরা ইয়ুরোপীয় নরনারীদিগকে শাক্ত শ্রেণীভুক্ত করিয়াছি, তত্রত্য জ্ঞানোন্নত ব্যক্তিমাত্রেই শক্তি স্বীকার করেন, তাঁহারা শক্তির পরোক্ষ উপাসক। হিন্দু শাক্ত ও ইয়ুরোপীয় শাক্তদিগের মধ্যে প্রভেদ এই যে, হিন্দু শাক্তগণ রীতিমত শক্তি দেবীর পূজা করেন, ইয়ুরোপীয় খ্রীষ্টীয় সমাজের শাক্তগণ সেরূপ পূজা করেন না, তাঁহাদের শক্তির প্রতি ভক্তি নাই, তাঁহারা দেবপ্রভাবের অধীনতা স্বীকার করেন না, বিশেষ ভাবে আত্মপ্রভাব পোষণ ও প্রচার করেন। তাঁহারা ভক্তিশূন্য নীরস কঠোরপ্রকৃতি। ইয়ুরোপীয় শাক্ত মহিলাগণ শক্তির পূজার্চ্চনা করেন না বটে, কিন্তু পান ভোজনে ঘোরতর শাক্ত, প্রত্যহ মদ্য মাংস না হইলে চলে না। বাঙ্গালী সভ্য সমাজের অনেক মহিলাও তাঁহাদের প্রকৃতি ও রীতির অবিকল অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত। সেই হিন্দু কুলোদ্ভবা সভ্যা মহিলাদিগের গৃহে নিত্য পশু পক্ষীর বলিদান হয়, সেই বলি দেবী উদ্দেশ্যে নয়, নিজ উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে; তাহা খড়্গের এক আঘাতে বলিদান হয় না, ছুরি চালনা করিয়া ছাগ মেষাদির কণ্ঠনালী ছেদন করা হয়। হিন্দু শাক্তদিগের অভক্ষ্য ও অস্পৃশ্য কুক্কুট ও কুক্কুটাণ্ড তাঁহাদের প্রত্যেক প্রিয় খাদ্য। তাঁহারা ধাড়ি ও ছানা কুক্কুটগুলিকে ভোজন দান করিয়া গৃহে যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করেন, পরে সেই প্রতিপালিত পক্ষীগুলিকে জবাই করাইয়া ভক্ষণ করিয়া থাকেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, হিন্দু সমাজের নিষ্ঠাবতী শাক্ত মহিলারা মাংস ভক্ষণ করেন না। বৎসরের মধ্যে ২।৪ দিন বলিপ্রসাদ রন্ধন করিয়া আত্মীয় স্বজনকে খাওয়াইয়া থাকেন;

কিন্তু নব্য শাক্ত মহিলা আত্মীয় স্বজন সহ প্রত্যহ নিজে পশু পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করেন; বাবুর্চ্চি রাঁধে, স্বয়ং রন্ধন করেন না। কেহ কেহ তৎসঙ্গে কিছু কিছু সুরা রসের যোগ করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ঠাকুর দেবতা ও পূজার্চ্চনা মানেন না, মতে একেশ্বরবাদিনী। শৈশব কাল হইতে বালক বালিকাগণ জননীর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া ঘোরেতর অবিশ্বাসী, শাক্ত হইয়া উঠে।

শাক্ত মহিলাদিগের বিবরণে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অতএব বৈষ্ণব মহিলাদিগের চরিত্র সঙ্ক্ষেপে উল্লেখ করিয়া উপসংহার করা যাইতেছে। বৈষ্ণব পরিবারের মহিলাগণ ভক্তি শাস্ত্র ভাগবত গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করেন, হরি-পূজায় ও হরিনামে ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন, দেবাধিষ্ঠিত জানিয়া প্রতিদিন তুলসীতরুর সেবা করেন, হরিমণ্ডপ দর্শনে প্রণত হন, সাধু বৈষ্ণব দেখিলে তাঁহাদের চরণ বন্দনা করেন, হরিনাম মননে শ্রবণে ও কীর্ত্তনে তাঁহাদের অনেকের হৃদয়ে উচ্ছ্বাস হয়। তাঁহারা নিয়ম পালন ও ব্রতসাধনে উৎসাহ প্রকাশ করেন, পশুবলি দর্শন করেন না, সন্তানাদিকেও সেই নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিতে দেন না। অনেক বৈষ্ণব পরিবারের মহিলারই অতিথিসৎকারে প্রগাঢ় অনুরাগ। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কেহ কেহ দুর্গোৎসব করেন বটে, কিন্তু বলিদান করেন না। পূর্ব্ব বঙ্গস্থ ভদ্র সম্ভ্রান্ত বৈষ্ণব পরিবারের একটি স্বর্গগতা সাধ্বী সতী মহিলার চরিত্রকাহিনী কিছু না কিছু মহিলাতে অনেক বার উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি রন্ধন করিয়া যত্নপূর্ব্বক অতিথি অভ্যাগত লোক দিগকে খাওয়াইতেন, স্বয়ং কুটন কুটিতেন ও মসলা বাটিতেন, অতিথি সেবার জন্য সরোবর হইতে জল বহন করিয়া আনিতেন। বৈষ্ণব পরিবারের মহিলাদিগের ভক্তিপ্রধান জীবন বলিয়া তাঁহারা সচরাচর বিনীত প্রেমার্দ্র কোমলপ্রকৃতি হন, সহজে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন না।

ব্রাহ্ম সমাজও শাক্ত এবং বৈষ্ণব এই দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ শাক্ত ভাবাপন্ন ও বৈষ্ণবভাবাপন্ন স্ত্রী পুরুষ ব্রাহ্মসমাজে লক্ষিত হয়। এক্ষণ শাক্ত ব্রাহ্ম দলই প্রবল। তাঁহারা ঘোরতর মাংসাশী। একদা উত্তর বঙ্গস্থ একজন মাননীয় জমীদারের নিমন্ত্রণানুসারে প্রচারার্থ নববিধানপ্রচারযাত্রিদল তাঁহার বাসস্থানে গিয়াছিলেন। তিনি সকলকে একটি বিশেষ বাসভবনে সাদরে স্থান দান করিয়াছিলেন। ডাল তরকারী ইত্যাদি বিবিধ ভোজ্যজাতের সঙ্গে যাত্রিকদিগের জন্য প্রতিদিন এক একটী পাঁঠা প্রেরিত হইতেছিল, সেই গৃহ প্রাঙ্গণেই ছাগ পশুটির কণ্ঠচ্ছেদন হইতে লাগিল। কয়েক জন নিরামিষভোজী নিরীহ প্রচারক ও অপর ব্রাহ্ম সেই দলভুক্ত ছিলেন। প্রতিদিন গৃহদ্বারে পাঁঠার কণ্ঠচ্ছেদন ও রক্তারক্তি দেখিয়া তাঁহারা অতিশয় কষ্টবোধ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদের চেষ্টাযত্নে সে স্থানে বলিদান রহিত হয়; অন্যত্র বলিদান হইতে থাকে। তখন সেখানকার লোকেরা পরস্পর বলাবলি করিয়াছিল; "ওহে ব্রাহ্ম-

দিগের মধ্যেও শাক্ত বৈষ্ণব আছে।” ব্রাহ্মসমাজে এরূপ অনেক শাক্ত ডাক্তার আছেন যে, কাহারও সামান্য জ্বর বা মাথা ধরিলে সেই রোগীর জন্য গোমাংসের কাথ ও কুক্কুটরস অর্থাৎ ব্রথ ব্যবস্থা করেন; জননী বালক বালিকাদিগকে ভাল ভাত বা দুধ ভাত খাওয়াইতেছেন দেখিলে এই সকল খাওয়াইয়া ছেলে মেয়েদিগকে রোগা করিয়া তোলা হইতেছে বলিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করেন। এক্ষণ অনেক ব্রাহ্মিকা মহিলা অত্যন্ত শাক্ত ভাবাপন্না হইয়া উঠিয়াছেন। মাংসাহারে তাঁহাদের বিলক্ষণ উৎসাহ, নিত্য কুক্কুটাদির মাংস ভোজন না করিলে তাঁহাদিগের দেহরক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। দেহরক্ষার জন্য অগত্যা তাঁহাদিগকে তাহা করিতে হয়। অনেক ব্রাহ্ম নিরামিষভোজী বৈরাগ্যানুরাগী সত্ত্বগুণসম্পন্ন বৈষ্ণবভাবাপন্ন, কিন্তু তাঁহাদের সন্তানগণ ঘোরতর আমিষভোজী বৈরাগ্যবিমুখ রজোগুণান্বিত শাক্তভাবাপন্ন, ব্রাহ্মসমাজে এই এক বিচিত্র ব্যাপার। হিন্দুশাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সচরাচর এরূপ লক্ষিত হয় না। শাক্তের সন্তান শাক্ত, বৈষ্ণবের সন্তান বৈষ্ণবই হয়। এই স্থলে এই কথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, শাক্তদিগের পরমারাধ্যা দেবী কালী দুর্গা যেন সভ্য দেশের মাতৃলা, অত্যন্ত মাংসপ্রিয়া। কালীদেবীর পূজাতে মদেরও প্রয়োজন হয়।

মহিলাদিগের মহর্ষি দর্শন।

কিয়ৎকাল হইল, ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় মহিলা ভক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরমহাশয়কে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এক্ষণ তাঁহার ৮৭ বৎসর বয়ঃক্রম, রোগ ও জরা বার্দ্ধক্যে দেহের কঙ্কালমাত্রাবশেষ। তিনি উত্থানশক্তিহীন, সর্ব্বদা শয্যাগত আছেন; অনুক্ষণ যোগে নিমগ্ন, আত্মা এক প্রকার পরলোকে স্থিতি করিতেছে। তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় থাকিয়াও যেন নাই, শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি বিদায়গ্রহণ করিয়াছে। তিনি উচ্চ শব্দ কখন কখন কিছু শুনিতে পানমাত্র। মহর্ষিদেব নিজ আত্মাতে পরমাত্মার দর্শনে পুলকিত, তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা স্বর্গীয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত। স্থূলবস্তুর দর্শন ও শ্রবণে তাঁহার আর প্রয়োজন কি? ভগবৎপ্রসঙ্গে তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডল প্রফুল্ল কমলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, নয়নযুগল হইতে প্রেমধারা প্রবাহিত হয়। স্বদেশ বিদেশের বহু লোক তাঁহার পাদবন্দনা ও দর্শন করিতে যান, ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্দীপ্ত তাঁহার মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া ও মধুর তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করেন। এক্ষণ চিকিৎসকের নিষেধজন্য সচরাচর সকলে তাঁহার নিকটে যাইতে পারে না।

মহিলাদিগকে উপস্থিত জানিয়া মহর্ষি আনন্দ প্রকাশ ও সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, উৎসাহপূর্ব্বক সুন্দর সুন্দর আধ্যাত্মিক কথা সকল বলিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়াছেন।

মহর্ষি ধর্ম্মে ও ধনৈশ্বর্য্যে এবং সম্মানে

সন্ততিতে অতিশয় ভাগ্যবান্। শুনিয়াছি তাঁহার নিত্য সেবার জন্য তাঁহার পরিবারস্থ কোন মহিলাই বিশেষভাবে নিযুক্ত নন। কেবল একটী কন্যা মহর্ষির রুচি বুঝিয়া ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া দিয়া থাকেন। অধিক বেতনে বহুসঙ্খ্যক সুদক্ষ ভৃত্য দিবারাত্র তাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছে; ২।৩ ঘণ্টার জন্য এক এক জন তাঁহার নিকটে উপস্থিত থাকে। তাহারা তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিয়া সকল কার্য্য করিয়া থাকে। নিশান্তভাগে তিনি বিশেষভাবে উপাসনা করেন, তখন ঠিক সময়ে একজন ভৃত্য উপস্থিত হইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে আসনে বসাইয়া দেয়। কেহ শয্যা ও বস্ত্রাদি সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখে, দুই এক দিন পরেই বস্ত্রাদি ধোপার বাড়ীতে প্রেরিত হয়। কোন ভৃত্য দুগ্ধপানের সময় দুগ্ধ পান করাইয়া যায়, কেহ অন্ন ভোজনের সময় উপস্থিত থাকে। কেহ বা মহর্ষির ইঙ্গিত বুঝিয়া বিশেষ ২ দ্বার জানালার কপাট খোলে বা বন্ধ করে। এইরূপ সমুদায় কাজ ভৃত্যগণ সতর্কতাসহকারে করিয়া থাকে। এই প্রকার ইঙ্গিত বুঝিয়া সত্বর সমুদায় কাজ করা অনেক মহিলার পক্ষে দুষ্কর। তিনি এই জন্যই সুদক্ষ ভৃত্যগণের প্রতি সমুদায় ভার অর্পণ করিয়াছেন। পবিত্র যোগী পুরুষ নিঃশব্দে শয্যায় শায়িত আছেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রভাবে পরিবারস্থ সমুদায় নরনারী নিয়মিত ও শাসিত হইতেছেন। সকলের উপর যেন একটী তেজ ও জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া আছে। মহর্ষি ধন, জীবন ও উপদেশ দ্বারা চিরকাল ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন, অগণ্য নরনারী তাঁহার নিকটে চির ঋণে ঋণী। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের নিকটে কখনও তিনি কোন সেবার প্রত্যাশা করেন নাই, চির উপকৃত ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার সেবা করিতে অক্ষম। আমরা মহর্ষির বর্ত্তমান প্রাত্যহিক জীবনের বিবরণ মহিলা পত্রিকায় বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, উক্ত মহিলাদিগের প্রমুখাৎ তাহা শ্রবণ করিয়া তখন নোট করিয়া রাখি নাই, তাঁহাদের নিকট হইতেও কোন নোট পাই নাই, তাঁহারা সঙ্ক্ষেপে কিছুই লিখিয়া দেন নাই।

রমণীর দয়ায় কার্য্য।

ভিন্ন ভিন্ন দয়াবতী মহিলার দয়ার কার্য্যবিবরণ যাহা লিখা যাইতেছে, তাহার কোন কোনটি স্বতন্ত্র আকারে কোন সময়ে মহিলায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহার পুনরালোচনায় লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই।

ভারতেশ্বরী পুণ্যবতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া দেবী একদা শকটারোহণে রাজপ্রাসাদ হইতে সামান্য ভাবে বহির্গত হইয়াছিলেন। রাজপথে একটি বৃদ্ধ মুটেকে দেখিয়াছিলেন যে, সে মোটের ভারে শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া চলিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া মহারাণীর হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি শকটের গতিরোধ করিয়া বৃদ্ধকে পশ্চাদ্ভাগে মোট রাখিয়া শকটে আরোহণ

করিতে ইঙ্গিত করেন। বৃদ্ধ মুটে বুঝিতে পারে নাই যে, তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া। সে তাঁহার ইঙ্গিতানুসারে কার্য্য করিল। মহারাণী তাহাকে তাহার আবাসের দ্বারে পঁহুছাইয়া দিলেন। বৃদ্ধ, রাণীর করস্পর্শপূর্ব্বক তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া শকট হইতে নামিয়া মোটসহ গৃহে প্রবেশ করিল।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া দেবী অপরাহ্নে প্রাসাদ হইতে বায়ুসেবনার্থ বাহির হইয়াছেন, পথপ্রান্তে এক জন ভারতীয় নারীকে দেখিলেন যে, সে শূন্যপদে দণ্ডায়মান আছে। রাজ্ঞী তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং সে কেন জুতা মজা পরে না জানিতে চাহিলেন। নারী বলিল, "আমার নিবাস হিন্দুস্থানে, আমি একজন সাহেবের আয়া, সেই সাহেবের সঙ্গে হিন্দুস্থান হইতে ইংলণ্ডে আসিয়াছি। আমার অর্থ নাই, তজ্জন্য জুতা মজা ক্রয় করিয়া পরিতে পারিতেছি না।" ইহা শুনিয়া মহারাণী তাহাকে বলিলেন, "এদেশে অত্যন্ত শীত, শূন্য পদে বেড়াইলে তোমার অসুখ হইবে।" এই বলিয়া তিনি জুতা ও মুজা ক্রয় করিয়া পরিবার জন্য কয়েকটী টাকা তাহার হস্তে দান করিলেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া একটি দরিদ্র নারীর অন্তিমকাল উপস্থিত জানিয়া সেই রোগীর কুটীরে প্রবেশ করেন, এবং তাহার শয্যার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক বাইবেল পুস্তকের সান্ত্বনাজনক বাক্য সকল পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হন, এমন সময় একজন পাদ্রী সাহেব উপনীত হন, তিনি মহারাণীকে দুঃখিনী মুমূর্ষু নারীর শয্যা-পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিয়া বিস্ময়-বিহ্বল অন্তরে দাঁড়াইয়া থাকেন। রাজ্ঞী ধর্ম্মযাজক সমাগত দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া বলিলেন, "আপনি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য করুন, আমি এক্ষণ চলিয়া যাই।"

রাজ্ঞী সময়ে সময়ে কোন পল্লীগ্রামবিশেষে যাইয়া বাস করিতেন। তাঁহার প্রাসাদের ইতস্ততঃ অনেক গুলি দুঃখী দুঃখিনীর কুটীর ছিল। তিনি অপরাহ্ণে সেই দুঃখী দরিদ্রদিগের আবাসে যাইয়া তাহাদের সংবাদ লইতেন, এবং তাহাদের সঙ্গে সদালাপ করিতেন, এবং তাহাদিগকে বস্ত্রাদি উপহার দিয়া আসিতেন।

একবার কোন অপরাধে একজন সৈন্যের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তখন ইংলণ্ডে মহারাণীর সম্মতি ভিন্ন কাহারও প্রাণদণ্ড হইতে পারিত না। সুকোমলহৃদয়া দয়াবতী রাজ্ঞী কিছুতেই নিষ্ঠুর প্রাণদণ্ডে সম্মতি দান করিতেন না। যে রাজপুরুষ সৈনিক পুরুষের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞায় সম্মতি গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন, মহারাণী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করেন, "অপরাধী এমন কোন কাজ ভাল করিয়াছে কিনা যাহার জন্য আমি ইহার প্রাণদণ্ড রহিত করিতে পারি?" পরে সে একটি সৎকার্য্য করিয়াছে শুনিয়া রাজ্ঞী তাহার প্রাণদণ্ড রহিত করেন।

১৮৫৭ সালে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজজাতি উত্তেজিত হইয়া মহাহত্যাকাণ্ডে ভারতকে উৎসন্ন করি

বার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন। তখন কোম্পানির হস্তে বিস্তীর্ণ ভারত সাম্রাজ্য-শাসনের ভার অর্পিত ছিল। দয়াবতী রাজ্ঞী মিষ্ঠুর ইংরাজদিগের দুশ্চেষ্টা দেখিয়া ব্যথিত হন। তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভারতসাম্রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণপূর্ব্বক এইরূপ ঘোষণা পত্র প্রচার করেন যে,কোন নিরপরাধী প্রজার প্রতি অত্যাচার হইতে পারিবে না। ভারতবাসী ও ইংলণ্ডবাসী এই দুইয়ের সমানাধিকার, রাজকীয় উচ্চ পদপ্রাপ্তিবিষয়ে বর্ণভেদ জাতিভেদ থাকিবে না। রাজ্ঞীর অনুগ্রহলাভে সকল জাতি তুল্য অধিকারী।

মহারাণীর প্রাসাদের প্রাচীর একজন স্ত্রী চিত্র করিতেছিল, দুই তিনটী রাজকুমারী আমোদ করিয়া তাহার বস্ত্রে রং ঢালিয়া দেয়। মহারাণী ইহা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন, তাহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ও নিজেদের পকেট খরচের টাকা হইতে তাহাকে নূতন পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া দিতে রাজকুমারীদিগকে বাধ্য করেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া দেবীর কন্যা জর্ম্মাণীর মহারাণী সর্ব্বদা দাতব্য চিকিৎসালয়ে যাইয়া রোগীদিগের সেবা ও তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। চিকিৎসালয়ে এক ব্যক্তি গুরুতর রোগে আক্রান্ত ছিল। তাহার পত্নী নিজের একটি শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার নিকটে বিশেষ কথা কহিবার জন্য আসিয়াছিল। তখন ক্রোড়স্থ সন্তানটি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকে। রুগ্ন স্বামী তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে, স্ত্রীর কথা শুনিতে এবং নিজে স্ত্রীর সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছিল না। তখন সম্রাট্ পত্নী উক্ত চিকিৎসালয়ে আসিয়াছিলেন। তিনি দরিদ্র স্ত্রীলোকটির ক্রোড় হইতে রোরুদ্যমান শিশুটিকে নিজের ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া একটু সরিয়া যাইয়া তাহাকে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিবার অবকাশ দান করিলেন। রাজ্ঞী প্রায় এক ঘণ্টাকাল সন্তানটিকে স্বীয় অঙ্কদেশে সযত্নে রাখিয়াছিলেন।

কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বিনী সাধ্বী কুমারী ক্যাথরাইণ সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ছিলেন। তিনি চির কৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া পরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ক্যাথরাইণ যত্নপূর্ব্বক বিশেষ ভাবে রোগীর সেবা করিতেন। তিনি এক দিন একটি রোগীর ক্ষতস্থান ধৌত করিতেছিলেন, ঘা পচিয়া উঠিয়াছিল, তাহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার ঘৃণা হয়। তিনি ক্ষতস্থান প্রক্ষালনে অক্ষম হন। পরক্ষণেই অনুতপ্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমি সেবাব্রতে উপেক্ষা করিয়া ঘোর অপরাধী হইলাম, এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।" ইহা ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দুর্গন্ধ পচা ঘায় নিজের মুখ সংলগ্ন করিয়া চুম্বন করিয়াছিলেন।

অবসরপ্রাপ্ত ডিঃ কলেক্টর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায়ের সহধর্ম্মিণী স্বর্গগতা অঘোর কামিনী দেবী কোন প্রতিবেশী স্ত্রীলোকের দুঃখ ক্লেশের কথা শুনিলে দয়ার আবেগে তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া গিয়া তাহার সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভয়ঙ্কর ওলা

উঠা রোগীর সেবায়, সূতিকাগারে প্রসূতির সেবায় তিনি প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছেন।

পশ্চিমাঞ্চলের আর একটি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী পরিবারের মহিলা দয়ার কার্য্যে অতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করেন। একবার একটি দুঃখিনী স্ত্রী দুরারোগ্য রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হয়। তিনি তাহাকে নিজের গৃহে লইয়া আসিলেন, কোন ঘৃণা না করিয়া প্রায় এক পক্ষ কাল যত্ন পূর্ব্বক তাহার সেবা করেন, তাহার সেবা শুশ্রূষায় সে আরোগ্য লাভ করে।

শৈশব কাল হইতেই পুঁটিয়ার মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর অসাধারণ দয়া ও হৃদয়ের কোমলতা স্ফূর্ত্তি পায়। এক দিন তাঁহার পিতা ভৈরব নাথ সান্ন্যাল কোন অপরাধে একজন প্রজাকে খড়মের কয়েকটি আঘাত লাগাইবার জন্য এক ভৃত্যের প্রতি আদেশ করেন। তখন শরৎসুন্দরীর পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম, তিনি পিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন; এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠেন। এরূপ ভয়ানক ক্রন্দন করিতে থাকেন যে, ভৈরব নাথ কিছুতেই তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সান্ন্যাল মহাশয় মহাবিপাকে পড়িলেন, পরে প্রহারদণ্ডের আজ্ঞা রহিত করিতে বাধ্য হইলেন, তখন কন্যা সান্ত্বনালাভ করিলেন।

আর এক দিন ভৈরব নাথ সান্ন্যাল একজন পাচক ব্রাহ্মণকে কোন অপরাধে ৫৲ দণ্ড করেন। সেই পাচকটির বেতন ৪৲ ছিল, তখন সে দণ্ডের ৫৲ কিছুতেই দিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সেই সময় শরৎসুন্দরী দেবীর ৭।৮ বৎসর বয়ঃক্রম, তিনি ব্রাহ্মণটির দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হন, পিতার অগোচরে টাকা প্রদান করিয়া তাহাকে মুক্ত করেন।

শরৎসুন্দরীর জমীদারীর বার্ষিক আয় প্রায় দুই লক্ষ টাকা। তিনি সুনিয়মে দক্ষতার সহিত জমীদারী শাসন ও পরম দয়া ও বাৎসল্যসহকারে জননীর ন্যায় প্রজাপালন করিতেন। কটূক্তি ও কঠোর ব্যবহার কি তিনি জানিতেন না। গুরুতর অপরাধ দেখিয়াও রাণী কাহাকে কখনও শক্ত কথা কহিতেন না, কাহারও বিত্তচ্ছেদ অন্নচ্ছেদ করিতেন না। প্রীতির শাসনে অপরাধীদিগকে শাসিত ও সংশোধিত করিতেন। কোন কর্ম্মচারী প্রজাকে ক্লেশ দান করিলে, কাহারও প্রতি অত্যাচার করিলে, দুঃখে মহারাণীর হৃদয় বিদীর্ণ হইত, তিনি অবিরল ধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেন, অন্নজল গ্রহণে বিরত হইতেন। অত্যাচারী কর্ম্মচারীর পক্ষে ইহাই বিষম শাস্তি হইত। তাহার দুর্ব্ব্যবহারে মহারাণী কাঁদিতেছেন, আহার বন্ধ করিয়াছেন, ইহা শুনিয়া সে আপন পাপের জন্য অনুতাপসহ ক্ষমা প্রার্থনা-পূর্ব্বক মহারাণীকে সান্ত্বনাদান করিত। শরৎসুন্দরীর এই প্রকার প্রেমের শাসন ছিল। দেশের সমুদায় লোক তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন ও স্বর্গের দেবীস্বরূপ জানিয়া ভক্তি করিত। সকলের দুঃখে তাঁহার প্রাণ আকুল হইত, এমন দিন ছিল না যে, মহারাণী কাঁদেন নাই। অমুকে রোগযন্ত্রণায় অস্থির, মহারাণীর কোমল

প্রাণে আঘাত লাগিল, তিনিও অস্থির হইলেন, দর দর ধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অমুকে পুত্রশোক ভ্রাতৃশোক পাইয়াছে, মহারাণী শোকে কাঁদিলেন। অমুকের গৃহে অন্ন নাই, শিশু বালক বালিকা অনাহারে রহিয়াছে, মহারাণীর চক্ষের জল পড়িল।

কাশীম বাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী দয়ার কার্য্যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উৎসর্গ করিয়াছেন।

নারীর সাহায্যে নগরাধিকার।

সমস্ত পৃথিবীতে আরবা জাতির ন্যায় ইতিহাসলেখক কোন সভ্য জাতি নহে। প্রাচীন আরবীয় পণ্ডিতগণ স্বজাতির সামান্য সামান্য বিষয়েরও ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুগণ পৃথিবীর মধ্যে ইতিহাস-লিপি-বিষয়ে অতিশয় দরিদ্র। আমরা ইতিপূর্ব্বে আরব্য ইতিবৃত্ত পুস্তকবিশেষ অবলম্বন করিয়া রণক্ষেত্রে আরবীয় রমণীদিগের বীর্য্য পরাক্রম প্রকাশের বৃত্তান্ত মহিলায় প্রকাশ করিয়াছি। এবার আরবীয় ইতিহাস পুস্তকবিশেষ অবলম্বনে একটী মিসর দেশীয় রমণীর সাহায্যে আরবীয় সেনানী মাহাবীর খালেদের নগরাধিকার বিবরণ বিবৃত করা যাইতেছে। এই বিবরণটি যদিচ নীতি বিষয়ক নহে, তথাপি বিদেশীয় পুরাকালীন নারীসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাঠিকাদিগের জ্ঞাতব্য বিষয় বোধ করিয়া লিখা গেল।

"এস্লামধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহম্মদের পরলোকযাত্রার পর তাঁহার স্থলবর্ত্তী মদিনাধিপতি নেতৃবর ওমর ফারুকের নেতৃত্বকালে মোহম্মদীয় সেনাগণ পৃথিবীর নানা বিভাগের বহু রাজা মহারাজাকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য এস্লামরাজ্যভুক্ত করিয়াছিল। রোম সাম্রাজ্য অধিকারের পর কয়েক সহস্র পরাক্রান্ত সেনা ওমর এব্নোল্ আসের নেতৃত্বাধীনে যাইয়া মেসর রাজ্য আক্রমণ করে। তথাকার রাজা আরস্তলয়স সংগ্রামে পরাজিত হইয়া এস্কন্দরিয়া নগরে পলায়ন করেন। মোসলমান সেনাগণ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়। অন্যতর বাহিনী পতি বীরবর খালেদ কয়েক শত দুর্জ্জয় যোদ্ধ সহ দম্মরবৃত নগর অধিকার করিতে যান। প্রথমতঃ তাঁহার সহকারী সেনানী ইয়কেন্না বিংশতি জন সাহসী সহচর সহ দূতরূপে উক্ত নগরাধিপতি মর্দমান সাকীর নিকটে প্রেরিত হইয়াছিলেন, মর্দমান সাকী সুযোগ পাইয়া ইয়কেন্নাকে তাঁহার সহচরবর্গ সহ বন্দী করিয়া রাখেন, এবং তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া এস্কন্দরিয়া নগরে নরপাল আরস্তলয়সের নিকটে প্রেরণ করিবার সমুদ্যোগী হন; পরদিন প্রাতঃকালে প্রেরণ করা হইবে স্থির করিয়া তাহাদিগকে প্রাসাদের পার্শ্বে বন্দিশালায় সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দেন। রাত্রিতে রায়ণানাম্নী এক জন পরিচারিকা প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। গভীর নিশাকালে শাসনকর্ত্তা মর্দ্দমান সাকী আপন বন্ধুগণ সহ সুরাপানে মত্ত হইয়া প্রাসাদে অচৈতন্য; এমন সময়ে

রায়ণা ইয়ুকেন্নার নিকটে গুপ্তভাবে যাইয়া বলে, "তোমরা আমাকে মদিনানগরে সযত্নে পাঠাইয়া দিবে এই অঙ্গীকার করিলে, আমি তোমাদিগকে মুক্ত করিতে পারি, এবং এই নগর ও এই দেশ যাহাতে তোমাদের হস্তগত হয়, তাহার উপায় করিয়া দিতে সুক্ষম।" ইয়ুকেন্না বলিলেন, "তুমি কেমন করিয়া আমাদিগের বন্ধন-মুক্ত ও নগর আমাদের হস্তগত হইবার উপায় করিবে?" রায়না বলিল, "দুরাচার মর্দ্দমান সাকী সহচরগণ সহ সুরাপানে বিহ্বল হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, এবং অপর সমুদায় লোক নিদ্রায় অচৈতন্য। প্রাসাদের মূল হইতে ভূমির নিম্নে একটি তলবর্ত্ম নগরের বাহিরে নির্জ্জন সমাধি মন্দির পর্য্যন্ত প্রসারিত আছে। সেই তলবর্ত্মের শেষভাগে একটি গুপ্ত দ্বার রহিয়াছে, অপর লোক তাহা জানে না। আমি সেই পথে যাইয়া সেই দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের হস্তপদের শৃঙ্খল কাটিয়া দিব, তোমরা সেই তলবর্ত্ম যোগে বহির্গত হইয়া তোমাদের সেনাপতিকে সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করিবার জন্য সংবাদ দিবে। মোসলমান বাহিনী আসিয়া নিশাবসান হওয়ার পূর্ব্বেই নগর অধিকার করিতে পারিবে। ইতিমধ্যে তোমরা আমাকে মদিনায় পাঠাইয়া দিবে। আমার প্রিয়তমা ভগিনী মারিয়া মদিনাতে তোমাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের অন্তঃপুরিকা রূপে বাস করিতেছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমি ব্যাকুল।" তখন ইয়ুকেন্না বলিলেন, "তুমি আমাদিগকে মুক্ত করিলে আমরা অবশ্য তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" এই কথা শুনিয়া রায়ণা নিজের সঙ্কল্প সাধনের জন্য গুপ্তভাবে প্রস্থান করিল।

এদিকে ইয়ুকেন্না বিশ জন সহচর সহ বন্দী হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া সেনাপতি খালেদ অতিশয় উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইলেন, কি উপায়ে তাঁহাদিগকে উদ্ধার ও দস্মরবুত নগর হস্তগত করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার প্রেরিত গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, এস্‌কন্দারিয়া হইতে মেসরাধিপতি আরস্তলয়স স্বীয় পুত্রকে সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ মর্দ্দমান সাকির আনুকূল্যার্থ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহারা নগরপ্রান্তে উপস্থিত, কিন্তু এস্‌লাম সৈন্যের ভয়ে সকলেই ভীত, অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতেছে। ইহা শ্রবণমাত্র সেনাপতি খালেদ কতিপয় বীরপুরুষ সঙ্গে করিয়া উক্ত গুপ্তচরের সমভিব্যাহারে শত্রুসেনার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তখন ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর রাত্রি। তিনি নিঃশব্দে গুপ্তভাবে অরাতি সৈন্যের নিকটে যাইয়া দেখেন যে, উক্ত সেনাব্যূহ হইতে একটি যুবা বাহির হইয়া চলিয়া আসিলেন। খালেদ ও তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। যুবক কিয়দ্দূরে একটি মন্দিরের প্রান্তে যাইয়া মৃত্তিকা অপসারণ করিতে লাগিলেন। তখন খালেদ তাঁহাকে বন্দী করিয়া হস্তে কোষমুক্ত করবাল ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি কে? তোমার কি উদ্দেশ্য? সত্য বলিলে তুমি রক্ষা পাইবে, অন্যথা এই মুহূর্ত্তে তোমার শিরশ্ছেদন করিব।"

তখন যুবা কম্পিতকলেবরে বলিলেন,"আমি মহারাজ আরস্তলয়সের পুত্র,তোমরা দম্মরবুত নগর আক্রমণ করিয়াছ, এই সংবাদ পাইয়া পিতা সহস্র সৈন্য সহ নগরাধিপতি মর্দ্দমান সাকার সাহায্যার্থ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি তোমাদের ভয়ে সৈন্যসহ গোপনে নিশাকালে আসিয়াছি। এই স্থানে একটি সুড়ঙ্গ আছে, সুড়ঙ্গ পথে লুক্কায়িত ভাবে, রাজ-প্রতিনিধির প্রাসাদে যাওয়া যায়, আমি সুড়ঙ্গ খুঁজিয়া লইতেছিলাম, ইতি মধ্যে তোমাদের দ্বারা ধৃত হইয়াপড়িলাম।" তখন খালেদ বলিলেন, "ভয় নাই, আমি তোমাকে অভয় দান করিলাম। তুমি আমাদের বিষয় কহাকেও ইঙ্গিতেও প্রকাশ না করিয়া সুড়ঙ্গ পথে আমাদের কয়েক জনকে নগরাভ্যন্তরে লইয়া চল।" এই কথা শুনিয়া যুবা আশ্বস্ত হইলেন, খালেদ ও তাঁহার কতিপয় সহচরকে সঙ্গে করিয়া ভূগর্ভে সুড়ঙ্গের দ্বারের পার্শ্বে আসিয়া পঁহুছিলেন। তখন রায়ণা দ্বারোদ্ঘাটন করিতেছিল, এমন সময় দ্বারের অপর পার্শ্বে কেহ উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া সভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন রাজ কুমার খালেদের ইঙ্গিত ক্রমে ডাকিয়া বলে, "কে তুমি? দ্বার খোল।" রায়ণা কণ্ঠস্বরে রাজ-কুমার উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করে। তৎক্ষণাৎ খালেদ রায়ণাকে বন্দী করেন। রায়ণা বলিল, "আমি আপনাদের কাজেই নিযুক্ত হইয়াছি, আপনি আমাকে কেন বন্দী করিতেছেন? চলুন,আপনার বন্ধুগণ বন্দিভাবে যেখানে আছেন, আমি আপনাকে সেখানে লইয়া যাই।" তখন খালেদ রায়ণার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার সঙ্গে চলিলেন, ইয়ুকেন্না এবং তাঁহার সহচর গণের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া সেই সুড়ঙ্গ পথে সেনা নিবেশে লোক পাঠাইয়া সকলকে সুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তৎক্ষণাৎ কতিপয় দুর্জ্জয় বীর পুরুষ সেই পথে নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। নগর প্রাকারে বেষ্টিত, তাহার ফটক সকল অবরুদ্ধ ছিল। এস্লাম সৈন্যগণ দৌড়িয়া গিয়া ফটক খুলিয়া দিল, তখন সকলে সমস্বরে মহানাদে "আল্লাহো আকবর" বলিয়া নগরকে কাঁপাইয়া তুলিল, শিবির হইতে অবশিষ্ট এস্লাম সৈন্য সেই নিনাদ শ্রবণে বিজয়োল্লাসে নগরে দৌড়িয়া আসিল। মর্দ্দমান সাকি এস্লাম সৈন্যের গগনভেদী জয়ধ্বনিতে জাগিয়া উঠিলেন, মহাবিপদ উপস্থিত, নগর শত্রু হস্তে পতিত দেখিয়া বিকম্পিত হইলেন,এবং চারি দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে নারীর সাহায্যে প্রবল এস্লাম বাহিনী দম্মরবুত নগর অধিকার করিল।

সতী-তেজ।

প্রকৃত সতীত্ব নারীজাতির দেবদুর্লভ অলঙ্কার, জীবনসংগ্রামে ইহা তাঁহাদের অভেদ্য কবচ, পরিবার-মধ্যে ইহা স্বর্গীয় কৌস্তুভমণি, ধর্ম্মজীবনে ইহা অদ্বিতীয় সহায়, জনসমাজে ইহা পবিত্র আদর্শ। সকল দেশের কবিগণ ইহার যশ-কীর্ত্তন করেন, সকল দেশের পণ্ডিতগণ ইহাকে

জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। সতীত্ব জনসমাজের মেরুদণ্ড, সতীত্ব সামাজিক জীবনের একমাত্র ভিত্তি। পুণ্যময় শ্রীহরি নারীর কোমল প্রাণে কি অপূর্ব্ব রত্নই না স্থাপন করিয়াছেন! পৃথিবীর সকল রত্ন ইহার নিকট ধূলিবৎ, পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম ইহার নিকট মলিন বোধ হয়। সতী নারীর দুর্জ্জয় প্রতাপে পৃথিবী কম্পিত, পাষণ্ড দুরাচারগণ ভয়ে অস্থির, পাপ দুর্ম্মতি পরাহত। সতীতেজে সমুদায় পাষণ্ডতা ভস্মীভূত হইয়া যায়। সতী নারী যথার্থ ব্রহ্মকন্যা, সতী তেজ যথার্থ ব্রহ্মতেজ। সতী-হৃদয় ঈশ্বরের অবতরণের স্থান, সতী এই পাপ সংসারে বিশ্বজননীর প্রতিকৃতি।

অতি পূরাকাল হইতে পৃথিবীতে সতীত্বের পূজা চলিয়া আসিতেছে। ভারতের কথা আর কি বলিব? এখানে যেমন সতীত্বের সম্মান জগতের আর কোথাও তেমন আছে কি না জানি না। শিবজায়া দাক্ষায়ণী কি অপরিসীম পতি-প্রেমে পূর্ণ হইয়া পিতা দক্ষের যজ্ঞে পতি-নিন্দা শ্রবণ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন? মার্কেণ্ডেয় চণ্ডীতে বর্ণিতা সতীদেবী কি অতুল বিক্রমে শম্ভু নিশম্ভু প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত অসুরদিগকে বধ করিয়া আপনার সতীত্ব অব্যাহত রাখিলেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি সতীত্বের কি অচিন্তনীয় প্রভাব প্রদর্শন করিলেন। এই সকল দেবকন্যাদিগের জীবন এবং প্রভাব যদি ভারত হইতে পুঁছিয়া ফেলা যায়, ভারত শ্মশানে পরিণত হইবে, আর্য্য পরিবারের যে সুখ, শান্তি, পবিত্রতা দৃষ্ট হয় তাহা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। ইদানীন্তন ভারত মহিলারাও সতীত্বজন্য সামান্য প্রসিদ্ধ নহেন। রাজপুতরমণী সতীত্বরক্ষার জন্য কি ভাবে অম্লান বদনে হাসিতে হাসিতে প্রাণদান করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিই অবগত আছেন। বঙ্গবাসিনী বেহুলার সতীত্বকাহিনী কাহার অবিদিত আছে? ভারতের সতীদাহ প্রথা দূষিত হইলেও ইহার ভিতরে যে পবিত্র সতীত্বের নির্ম্মল স্রোত প্রবাহিত হইত তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? এই সতীত্বের মত রত্ন আর কি আছে? ইহা যে নারী জাতির প্রাণ, রমণীকুলের গৌরব, তাঁহাদের স্বর্গে যাইবার প্রশস্ত পথ।

বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে, মানব-হৃদয়ে যাহাতে এই সতীত্বের আদর বৃদ্ধি হয়, তৎপ্রতি সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। জড়বাদ, বাহ্যশিক্ষা, ধর্ম্মহীনতা, বিকৃত স্বাধীনতা অনেক সময় নারীর কোমল প্রাণকে সতীত্বের সুদৃঢ় দুর্গ হইতে বাহির করিয়া লইয়া স্বেচ্ছাচারের প্রান্তরে বধ করে। অনেক সময় স্বামিগণ পত্নীগণকে এমন পথে লইয়া যান, যাহাতে পত্নীগণের মনে সতীত্বের প্রতি অনুরাগ হ্রাস হয়।

সতীত্ব প্রকৃত বীরত্বপ্রসবিনী। সতীর প্রফুল্ল শুদ্ধ মুখপদ্ম দেখিয়া পাপ পলায়ন করে, সকল দুষ্ট বুদ্ধি পরাজিত হয়।

নারীগণ যেন সর্ব্বপ্রযত্নে এই সতীত্বধন প্রাণে রক্ষা করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা যেন বিশ্বাস করেন, সতীত্ব ব্রহ্মপ্রেম "একই প্রেম হইয়া শতধা, বিরাজয়ে জননী প্রাণে,

সতীর হৃদয়ে করে বসতি।" বৃক্ষাদির বীজ বপন করিয়া তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপাদন করিবার জন্য যেমন নিরন্তর যত্ন করা প্রয়োজন, তেমনি প্রকৃত সতীত্বলাভ-জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। ব্যভিচারচিন্তা পাপ ও মৃত্যু জনিয়া সে চিন্তাকে হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া দিতে হয়। সাধু গ্রন্থপাঠ, সদালাপ, নিত্য উপাসনা, নিবিষ্টচিত্তে সাংসারিক কর্ত্তব্য পালন, সতী নারীর সংসর্গ প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে জীবনকে সর্ব্বদা ধর্ম্মের দিকে অভিমুখীন রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। লঘুতা, চঞ্চলতা, অসৎ-সংসর্গ এবং গ্রাম্যালাপ ধর্ম্মজীবনে মহান-নর্থ উপস্থিত করে। সতী নারীদিগের চরিত্র আলোচনা এবং অধ্যয়ন করা সঙ্গত। যে সকল ভাগ্যবতী মহিলা মা জগজ্জননীর কৃপায় সতীত্ব ধন লাভ ও রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের জনক জননী এবং জন্মভূমি ধন্য, তাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয় কন্যা। মা জগজ্জনী সতী নারীদিগের আদর্শ। মার যথার্থ দাসী যাঁহারা, তাঁহারাই জীবনে সতীত্বধনে ধনী হইতে পারেন।

দুইটী সতীনারীর দৃষ্টান্ত।

১। সম্প্রতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আমেরিকা নিবাসিনী একটী রূপবতী মহিলা আগমন করেন। তাঁহার স্বামী কতকগুলি ঋণ রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। স্বামী একজন গ্রন্থকার ছিলেন। পতিপ্রাণা রমণী স্বামীর ঋণ পরিশোধার্থ তাঁহার কয়েক খানি গ্রন্থ বিক্রয় করিবার জন্য ভারতে আগমন করেন ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের একস্থানে একটী বাঙ্গলায় স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার স্বামীর গ্রন্থক্রয় ও তাঁহার সহিত আলাপাদি করিবার জন্য অনেক সাহেব তাঁহার বাঙ্গলায় আসিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিত। এক দিন কয়েকটী সাহেব তাঁহার সহিত আলাপ করিতে করিতে অসদভিপ্রায়ব্যঞ্জক কুৎসিত ভাবের ইঙ্গিত করিয়া কথা বলে। রমণী তাহাদের পাপ বাক্যে নিরতিশয় ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য প্রকোষ্ঠে চলিয়া যান, এবং তথা হইতে একটি বন্দুক আনিয়া উক্ত দুষ্ট সাহেবদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "পামরগণ, এখনই এস্থান হইতে প্রস্থান কর, ভদ্র মহিলার সঙ্গে কিরূপে কথা কহিতে হয় তাহা তোরা জানিস্ না? এখান হইতে না গেলে আমি এখনই এই বন্দুক দিয়া তোদের গুলি করিব।" সতীর বীরত্ব দেখিয়া সাহেবগুলি ভীত ও লজ্জিত হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। রমণী এইরূপে আপন সম্মান রক্ষা করিলেন। হে ব্রহ্ম-কন্যে, তোমাকে কে বলে অবলা? তুমি যখন সতীত্বের তেজে ভূষিত হও, তখন সুরাসুর তোমার ভয়ে আড়ষ্ট হয়। ধন্য তোমার মাহাত্ম্য!

২। কয়েক বৎসর হইল যখন পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, তখন রাজসাহী নগরে একটী নবশাক জাতীয়া রমণী তাঁহার রুগ্ন উত্থানশক্তি-বিহীন স্বামীর পার্শ্বে বিতল অট্টালিকায় বসিয়া স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিতেছিলেন।

এমন সময়ে ভয়ানক ভূমিকম্প উপস্থিত। বাড়ীর সকলে উক্ত স্ত্রীকে নামিতে বলিয়া নীচে প্রাণ রক্ষার্থ দৌড়িয়া বাহির হইল। পতিপ্রাণা রমণী বলিলেন, "আমার মৃত্যুও ভাল তথাপি আমি স্বামীকে ফেলিয়া কখনই যাইব না।" সেই ভয়ঙ্কর সময়ে সকলেই নিজ নিজ প্রাণরক্ষার্থ ব্যস্ত, তাঁহার স্বামীকে কেহই নামাইল না। স্ত্রী একাকিনী কি করিবেন? তিনি নির্ভয়ে স্বামীর চরণ সেবা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ভূমিকম্পে দালান ধসিয়া পড়িল। সতীনারী পতিসহ সহমৃতা হইলেন। ধন্য দেবী তুমি! যেখানে সীতা ও সাবিত্রী গিয়াছেন, তুমিও সেই স্থানে গমন করিলে। তোমার মত কন্যা পাইয়া বঙ্গদেশ ধন্য হইল। তুমি ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিলে; পতিসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া সতীত্বের মুকুট মস্তকে ধারণপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে স্বর্গধামে চলিয়া গেলে। পরমা সতী মা বিশ্বজননী পতিসহ তোমাকে তাঁহার পুণ্যক্রোড়ে স্থান দান করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

—:*:—

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

কুমিল্লার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে যাইয়া লক্ষ্য ছাড়িয়া অনেক দূর অন্য দিকে যাওয়া গেল। এক্ষণ আমি প্রকৃত পথে উপস্থিত হইতেছি। আমি কুমিল্লা হইতে গত ৩রা বৈশাখ শুক্রবার ৩টার ট্রেণে কাছাড় জিলার সিভিল ষ্টেশন শিলচর নগরে যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করি। গগনমণ্ডল নিবিড় মেঘজালে আচ্ছন্ন, সময়ে সময়ে ঝড় ও ক্ষণে ক্ষণে বারিবর্ষণ হইতেছে, পূর্ব্বদিন প্রিয় ভাগিনেয় বলিলেন, "কাল অমাবস্যা, তুমুল ঝড় হওয়ার সম্ভাবনা, আমার ইচ্ছা হয় না যে, আপনি কাল শিলচরে যাত্রা করেন।" আমি বলিলাম, সেখানে পত্র লিখিয়াছি, যাইতেই হইবে। ট্রেণে ঝড়ে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। কুমিল্লা হইতে আসাম রাজ্যভুক্ত বঙ্গদেশের পূর্ব্বসীমান্ত বরাকনদীর তীরবর্ত্তী শিলচর নগর, সেই জিলা মণিপুর রাজ্যের সঙ্গে সংলগ্ন। কুমিল্লা হইতে ট্রেণ ১৭।১৮ ঘণ্টায় পঁহুছে। সেই দিন অপরাহ্ণে ঝড় বৃষ্টি ছিল না। গঙ্গাগোবিন্দ ইণ্টার ক্লাসের বাবস্থা করিয়া দিয়াছিলেম। দুইটি ষ্টেশনের পর কমলাসাগর ষ্টেশনে পঁহুছিয়া দেখি স্ত্রীপুরুষের মহাজনতা। কমলাসাগর সরোবরবিশেষের নামে ষ্টেশনের নামকরণ হইয়াছে। ট্রেণ হইতেই বৃহৎ কমলাসাগর সরোবর এবং তাহার তীরবর্ত্তী কালীমন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। সেই দিন অমাবস্যা উপলক্ষে মহামেলা হইয়াছিল। ট্রেণে মেলার যাত্রিকদিগের এত ভিড় হইয়াছিল যে, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে তাহাদের স্থান হইয়া উঠিতে ছিল না। ভাগ্যে আমি ইণ্টার ক্লাসে চলিয়াছিলাম, তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে থাকিলে ইতর লোকের চাপাচাপিতে ভয়ানক কষ্ট পাইতে হইত। কমলাসাগরের জলের তুলনা নাই। এই সরোবর হইতে প্রত্যহ পানীয় জল আগর-

তলায় রাজবাড়ীতে নীত হয়। এক খানা মালের গাড়ী জলপূর্ণ কলসে পূর্ণ হইয়াছিল। মেলার রেলের যাত্রিকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ কলস পূর্ণ করিয়া জল সঙ্গে লইয়া চলিয়াছিল। কমলাসাগরের জলে স্নান করিয়া নাকি রোগী রোগমুক্ত হয়। স্নানাবগাহনাদি দ্বারা সেই সরোবরের জল কেহ কলুষিত করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে ত্রিপুরামহারাজের পুলিশ প্রহরী নিযুক্ত আছে। (ক্রমশঃ)

মহিলার রচনা।

কূপমণ্ডূকের হিমালয়দর্শন।

এখন আমরা হিমালয়ে আছি। অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হইল, আমি পর্ব্বত দেখিলাম। পাঠিকাদিগের নিকট হিমালয় নূতন বোধ না হইতে পারে, কিন্তু আমার জন্য ইহা সম্পূর্ণ নূতন। পুস্তকে সাগর, ভূধর, নির্ঝর ইত্যাদির বিষয় পাঠে দর্শনাকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইত—নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতাম, এ সব দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব! বেশী দুঃখ হইত, এই ভাবিয়া যে, সুদূর ইউরোপের লোকেরা আমাদের হিমালয় দেখিয়া যায়; আর আমরাই তাহা দেখিতে পাই না! এত দিনে ঈশ্বর-কৃপায় আমরাও হিমালয় দেখিলাম।

যথা সময় যাত্রা করিয়া শিলিগুড়ি ষ্টেশনে আসিয়া পঁহুছিলাম। শিলিগুড়ি হইতে হিমালয়ান রেল-রোড আরম্ভ হইয়াছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান গাড়ীর অপেক্ষা ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলগাড়ী ছোট। হিমালয় রেলগাড়ী আবার তাহার অপেক্ষাও ছোট। ক্ষুদ্র গাড়ী গুলি খেলেনা গাড়ীর মত বেশ সুন্দর দেখায়। আর গাড়ীগুলি খুব নীচু;—যাত্রিগণ ইচ্ছা করিলে গাড়ী চলিবার সময়ও অনায়াসে উঠিতে নামিতে পারেন।

আমাদের ট্রেণ অনেক আঁকা বাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া ধীরে ধীরে উপর উঠিতে লাগিল—গাড়ীগুলি "কটাটটা— শব্দ করিতে করিতে কখনও দক্ষিণে কখনও উত্তরে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিল! পথের দুই ধারে মনোরম দৃশ্য—কোথাও গভীর নিম্ন ভূমি, কোথাও অতি উচ্চ (steep) চূড়া, কোথাও নিবিড় অরণ্য।

মাঝে মাঝে কয়েকটি Refreshment room এবং ষ্টেশন দেখিলাম। প্রায় সব ষ্টেশনেই ladies' waiting room আছে। ঘরগুলি বেশ furnished, আমাদের সহযাত্রী ইউরোপীয়া ভগ্নীগণ প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনেই এক একবার নামিয়া বিশ্রাম করিয়াছেন। Waiting room এ মুখ ধুইবার পেয়ালাও অনেক—এক সঙ্গে চারিজন হাত মুখ ধুইতে পারে। ভগ্নীরা আর কিছু সঙ্গে রাখুন বা না রাখুন, চিরুণী, ব্রাস, পাউডারত রাখেন। বাঙ্গালীর মেয়েরা এত অল্প সময়ে এমন ঘন ঘন কেশ বিন্যাস করিতে পারে না! যাহা হউক ইউরোপীয়া ভগ্নীদের স্ফূর্ত্তি খুব প্রশংসনীয়। ওয়েটিংরুমে "ভুটিয়ানী" আয়া উপস্থিত থাকে।

ক্রমে আমরা সমুদ্র (sea level)

হইতে তিন হাজার ফীট উচ্চে উঠিয়াছি; এখনও শীত বোধ হয় না, কিন্তু মেঘের ভিতর দিয়া চলিয়াছি! নিম্ন উপত্যকায় নির্ম্মল শ্বেত কুজ্ঝটিকা দেখিয়া সহসা নদী বলিয়া ভ্রম জন্মে। তরু, লতা, ঘাস, পাতা—সকলই মনোহর। এত বড় বড় ঘাস আমি পূর্ব্বে দেখি নাই। হরিৎবর্ণচায়ের ক্ষেত্রগুলি প্রাকৃতিক শোভা আরও শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে! দূর হইতে সারি সারি চারা গুলি বড় সুন্দর বোধ হয়। মাঝে মাঝে মানুষের চলিবার সঙ্কীর্ণ পথ গুলি ধরণীর সীমন্তের ন্যায় দেখায়! নিবিড় শ্যামল বন বসুমতীর ঘন কেশপাশ, আর পথগুলি আঁকা বাকা সিঁথি!!

রেল পথে অনেক গুলি জলপ্রপাত বা নির্ঝর দৃষ্টিগোচর হইল—ইহার সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। কোথা হইতে আসিয়া ভীম-বেগে হিমাদ্রির পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ করিতে করিতে ইহারা কোথায় চলিয়াছে! ইহা-দেরই কোন একটি বিশালকায়া জাহ্নবীর উৎস, একথা সহসা বিশ্বাস হয় কি? একটি বড় ঝরণার নিকট ট্রেণ থামিল, আমরা ভাবিলাম, যাহাতে আমরা প্রাণ ভরিয়া জলপ্রবাহ দেখিতে পাই, সেই জন্য বোধ হয় গাড়ী থামিয়াছে! (বাস্তবিক সে জন্য কিন্তু ট্রেণ থামে নাই—অন্য কারণ ছিল। সেই খানে জল পরিবর্ত্তন করা হইতেছিল।) যে কারণেই ট্রেণ থামুক—আমাদের মনো-রথ পূর্ণ হইল।

এখন আমরা চারি হাজার ফীট উর্দ্ধে উঠিয়াছি; তবু শীত অনুভব করি না, কিন্তু গরমের জ্বালায় যে এত ক্ষণ প্রাণ কণ্ঠাগত ছিল—সে জুলুম হইতে রক্ষা পাইলাম। অল্প অল্প বাতাস মৃদুগতিতে বহিতেছে। এই খানে ৪১২০ ফীট উচ্চে "মহানদী" ষ্টেশন। ষ্টেশনের নামটা খুব ভালমতে পড়িতে পারি নাই; যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় "মহানদীই" নাম। যাহা হউক, যদি ষ্টেশনের নামে ভুল হইয়া থাকে, তাহা আমার দোষ নহে—ষ্টেশন হইতে আমার গাড়ীর দূরত্বের সে দোষ!

অবশেষে কারসিয়ং ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম, এখানকার উচ্চতা ৪৮৬৪ ফীট। ষ্টেশনে অত্যন্ত ভীড় দেখিয়া আমি ladies' waiting room এ একটু বসিলাম। ইউ-রোপীয়া ভগ্নীদের মুখ ধোয়া এবং কেশ-বিন্যাস দেখিলাম। এক জনের সঙ্গে কচি ছেলে ছিল, তিনি আয়াকে ছেলের মুখ ধোয়াইতে হুকুম দিয়া গাড়ীতে উঠিতে গেলেন। আয়ার কি গরজ, যে ছেলের মুখ ধোয়াইবে? সে তাঁহার পরিত্যক্ত তোয়ালে দ্বারা ছেলের মুখ মুছাইয়া অনু-মান দশ সেকেণ্ড দেরী করিয়া গাড়ী অভি-মুখে ছুটিল। চাকরের উপর নির্ভর করিলে ঐরূপ হয়ই। ট্রেণ ছুটিলে ভীড় কম হইল, তখন আমরা ওয়েটিংরুম ছাড়িয়া উঠিলাম।

ষ্টেশন হইতে আমাদের বাসা অধিক দূর নহে, শীঘ্রই আসিয়া পঁহুছিলাম। আমাদের ট্রাঙ্ক কয়টা ভ্রমক্রমে দার্জ্জি-লীঙ্গের ঠিকানায় book করা হইয়াছিল। জিনিষ পত্রের অভাবে বাসায় আসিয়াও (সন্ধ্যার পূর্ব্বে) গৃহসুখ (at home)

অনুভব করিতে পারি নাই! সন্ধ্যার টেণে আমাদের ট্রাঙ্ক গুলি ফিরিয়া আসিল। আমাদের দার্জ্জিলীং যাইবার পূর্ব্বে আমাদের জিনিষ পত্র তথাকার বায়ু সেবন করিয়া চরিতার্থ হইল! পরদিন হইতে আমরা সম্পূর্ণ গৃহসুখে আছি। তাই বলি, কেবল আশ্রয় পাইলে সুখে গৃহে থাকা হয় না, আবশ্যকীয় আসবাব সরঞ্জামও চাই।

এখানে এখনও শীতের বৃদ্ধি হয় নাই, গ্রীষ্মও নাই। এ সময়কে পার্ব্বত্য বসন্ত কাল বলিলে কেমন হয়? সূর্য্যকিরণ প্রখর বোধ হয়। আমাদের আসিবার পর এক দিনমাত্র সামান্য বৃষ্টি হইয়াছিল। বায়ুত খুবই স্বাস্থ্যকর, জল নাকি খুব ভাল নহে। আমরা পানীয় জল ফিলটারে ছাঁকিয়া ব্যবহার করি। জল কিন্তু দেখিতে খুব পরিষ্কার স্বচ্ছ। কূপ নাই, নদী, পুষ্করিণীও নাই—সবে ধন নির্ঝরের জল। ঝরণার সুবিমল সুশীতল জলদর্শনে চক্ষু জুড়ায়, পর্শনে হস্ত জুড়ায়, এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থত শীতল বাতাসে, না, ঘন কুয়াসায় প্রাণ জুড়ায়!!

এখানকার বায়ু পরিষ্কার ও হাল্‌কা। বায়ু এবং মেঘের লুকাচুরি খেলা দেখিতে বেশ চমৎকার! এই মেঘ এ দিকে আছে, ওদিক হইতে বাতাস আসিল,—মেঘ খণ্ডকে তাড়াইয়া লইয়া চলিল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে রবি বায়ু এবং মেঘ লইয়া নূতন সৌন্দর্য্যের রাজ্য রচনা করে! পশ্চিমগগনে পাহাড়ের গায় তরল স্বর্ণ ঢালিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর খণ্ড খণ্ড কুমার মেঘ গুলি সুকোমল অঙ্গে সুবর্ণ মাখিয়া বায়ু-ভরে ইতস্ততঃ ছুটা ছুটি করিতে থাকে! ইহাদের এই তামাসা দেখিতেই আমার সময় অতিবাহিত হয়, আত্মহারা হইয়া থাকি, আমি কোন কাজ করিতে পারি না।

মনে পড়ে একবার "মহিলায়" ঢেকির শাকের কথা পাঠ করিয়াছি। ঢেকি শাককে আমি ক্ষুদ্র গুল্ম বলিয়াই জানিতাম। কেবল ভূতত্ত্ব (Geology) গ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম যে, কারবণিফেরাস যুগে বড় বড় ঢেকিতরু ছিল। এখন সেই ঢেকিতরু স্বচক্ষে দেখিলাম—ভারি আনন্দ হইল! একটা ডাল ভাঙ্গিয়া মাপিলাম ১১ ফীট লম্বা! স্বয়ং তরুবর অনুমান ২০।২৫ ফীট উচ্চ হইবে।

কোন কোন স্থানে খুব নিবিড় বন। সুখের বিষয় বাঘ নাই; তাই নির্ভয়ে বেড়াইতে পারি। আমরা নির্জ্জন বন্য পথেই বেড়াইতে ভাল বাসি। সর্প এবং ছিনে জোঁক আছে। এ পর্য্যন্ত সর্পের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। কেবল দুই তিন বার জোঁকে রক্ত শোষণ করিয়াছে।

এ দেশের স্ত্রীলোকেরা জোঁক দেখিলে ভয় পায় না। আমাদের ভুটীয়া চাকরাণী "ভালু" বলে, "জোঁকে কি ক্ষতি করে? রক্ত শোষণ শেষ হইলে আপনিই চলিয়া যায়।" ভুটীয়ানীরা সাত গজ লম্বা কাপড় ঘাঘরার মত করিয়া পরে, কোমরে এক খণ্ড কাপড় জড়ান থাকে, গায় জ্যাকেট, এবং বিলাতী শাল দ্বারা মাথা ঢাকে, পৃষ্ঠে দুই এক মন বোঝা লইয়া অনায়াসে

প্রস্তর-সঙ্কুল আবুড়া খাবুড়া পথ বহিয়া উচ্চে উঠে; ঐরূপে নীচেও যায়! যে পথ দেখিয়াই আমাদের সাহস 'গায়েব' হয়—সেই পথে উহারা বোঝা লইয়া অবলীলাক্রমে উঠে!

"মহিলা"র সম্পাদক মহাশয় আমাদের সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছিলেন যে, "রমণী জাতি দুর্ব্বল বলিয়া তাঁহাদের নাম অবলা।" জিজ্ঞাসা করি, এই ভুটিয়ানারাও ঐ"অবলা" জাতির অন্তর্গতা না কি? ইহারা উদরান্নের জন্য পুরুষের প্রত্যাশী নহে; সমভাবে উপার্জ্জন করে। বরং অধিকাংশ স্ত্রীলোক-দিগকেই পাথর বহিতে দেখি—পুরুষেরা বেশী বোঝা বহন করে না! অবলারা প্রস্তর বহিয়া লইয়া যায়। "সবলেরা" পথে পাথর বিছাইয়া রাস্তা প্রস্তুত করে, সে কাজে বালক বালিকারাও যোগদান করে। এখানে "সবলেরা" বালক বালিকার দলভুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

ভুটিয়ানারা "পাহাড়নী" বলিয়া আপন পরিচয় দেয়, এবং আমাদিগকে "নীচেকা আদমী" বলে! যেন ইহাদের মতে "নীচেকা আদমী"ই অসভ্য! স্বভাবতঃ ইহারা শ্রমশীলা, কার্য্যপ্রিয়, সাহসী ও সত্যবাদী। কিন্তু "নীচেকা আদমী"র সংস্রবে থাকিয়া ইহারা ক্রমশঃ সদ্‌গুণরাজি হারাইতেছে। বাজারের পয়সা অল্প স্বল্প চুরি করা, দুধে জল মিশান ইত্যাদি দোষ শিখিতেছে। আবার "নীচেকা আদমি"র সঙ্গে বিবাহও হয়! ঐরূপে উহারা অন্যান্য জাতির সহিত মিশিতেছে।

মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত পর্দ্দা রক্ষা করিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করা যায়, একথা অনেকেই বুঝে না। তাই তাহারা বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইতে হইলে মহা বিপদ্ ভাবে। শাস্ত্রে পর্দ্দাসম্বন্ধে যত টুকু কঠোর ব্যবস্থা আছে, প্রচলিত পর্দ্দা প্রথা তদপেক্ষাও কঠোর! যাহা হউক কেবল শাস্ত্র মানিয়া চলিলে অধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। আমার বিবেচনায় প্রকৃত পর্দ্দা সেই রক্ষা করে, যে সমস্ত মানবজাতিকে সহোদর ও সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করে।

আমাদের বাসা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে বড় একটি ঝরণা বহিতেছে; এখান হইতে ঐ দুগ্ধফেননিভ জলের স্রোত দেখা যায়। দিবানিশি তাহার কল্লোল গীতি শুনিয়া ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাস দ্বিগুণ ত্রিগুণ বেগে প্রবাহিত হয়। বলি, প্রাণটাও কেন ঐ নির্ঝরের ন্যায় বহিয়া গিয়া পরমেশ্বরের চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়ে না?

অধিক কি বলিব, আমি পাহাড়ে আসিয়া অত্যন্ত সুখী এবং ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়াছি। সমুদ্রের সামান্য নমুনা, অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর দেখিয়াছি; বাকী ছিল পর্ব্বতের একটু নমুনা দেখা। এখন সে সাধও পূর্ণ হইল।

না, সাধত মিটে নাই যত দেখি, ততই দর্শন-পিপাসা শতগুণ বাড়ে! বিভু কেবল দুইটি চক্ষু দিয়াছেন, তাহা দ্বারা কত দেখিব? প্রভু অনেকগুলি চক্ষু দেন নাই কেন? যত দেখি, যত ভাবি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা নাই।

প্রত্যেকটি উচ্চ শৃঙ্গ, প্রত্যেকটি ঝরণা প্রথমে যেন বলে "আমায় দেখ! আমায় দেখ!" যখন তাহাকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে দেখি, তখন যেন তাহারা ঈষৎ হাস্যে ভ্রূকুটি করিয়া বলে "আমাকে কি দেখ? আমার স্রষ্টাকে স্মরণ কর!" ঠিক কথা। চিত্র দেখিয়া চিত্রকরের নৈপুণ্য বুঝা যায়। নতুবা কেবল নাম শুনিয়া কে কাহাকে চিনে? আমাদের জন্য হিমালয়ের এই পাদদেশটুকু কত বৃহৎ, কত বিস্তৃত—কি মহান্! আর সেই মহাশিল্পীর সৃষ্ট জগতে হিমালয় কত ক্ষুদ্র!—বালুকাকণ বলিলেও বড় বলা হয়!

আমাদের এমন সুন্দর চক্ষু, কর্ণ, মন লইয়া যদি আমরা স্রষ্টার গুণ কীর্ত্তন না ক'রি, তবে কি কৃতঘ্নতা হয় না? মন, মস্তিষ্ক, প্রাণ সব লইয়া উপাসনা করিলে, তবে তৃপ্তি হয়। কেবল্ টীয়াপাখীর মত কণ্ঠস্থ কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিলে (অন্ততঃ আমার মতে) উপাসনা হয় না। তদ্রূপ উপাসনায় প্রাণের আবেগ থাকে কই? ভাবের উচ্ছ্বাস থাকে কই? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যদর্শনকালে মন প্রাণ স্বতঃই সমস্বরে বলিয়া উঠে "ঈশ্বরই প্রশংসার যোগ্য! তিনিই ধন্য!" তখন এসব কথা মুখে উচ্চারণের প্রয়োজনও হয় না।

কূপমণ্ডুকের হিমালয়বর্ণনা আজি এই খানে সমাপ্ত।

খসিয়াং
আশ্বিন। } (Mrs.) R S Hossein

—:*:—

সংবাদ।

শারদীয় দীর্ঘ অবকাশের পর বিগত ১৬ই কার্ত্তিক (১লা নবেম্বর) ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে।

আমাদের রাজপ্রতিনিধির পত্নী লেডী কুর্জ্জন যে, জীবনসংশয় সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, ঈশ্বর-কৃপায় তিনি এক প্রকার রোগমুক্ত হইয়াছেন। মাসাধিক কাল তাঁহাকে অশেষ রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সেবা যত্ন ও সুচিকিৎসায় তিনি মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

উড়িষ্যার বোধরাজের দেওয়ান কটকনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাও মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রেবারায় তাপসমালা পুস্তকে বিবৃত মোসলমান তপস্বীদিগের আধ্যাত্মিক উক্তি সকল উৎকল ভাষায় অনুবাদ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। উক্ত পুস্তকের নাম "প্রসাদ" রাখা হইয়াছে। কটক সাহিত্যাযন্ত্রে ময়ূরভুঞ্জ মহারাজের অর্থসাহায্যে প্রসাদ মুদ্রিত। এই কন্যা উৎকল ভাষায় অনেক পুস্তক রচনা এবং অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ পুস্তক ইঁহা কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়াছে। অচিরেই বোধরাজের যন্ত্রালয়ে তাহা মুদ্রিত হইবার কথা। রেবাদেবী উৎকল-সাহিত্য পত্রিকায় নিয়মিতরূপে গদ্য পদ্য প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। তিনি মহিলারও একজন নিয়মিত প্রবন্ধলেখিকা। পাঠিকাগণ মহিলায় মহিলাদিগের রচনাস্তম্ভে শ্রীমতীর রচিত গভীর ভাবপূর্ণ সুললিত গদ্য পদ্য বাঙ্গলা প্রবন্ধ অনেক বার পড়িয়াছেন। ইঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী নববিধান সমাজের উপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ নবসংহিতা পুস্তক উৎকল ভাষায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রাঙ্কন-পূর্ব্বক উড়িষ্যাদেশের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহা কর্ত্তৃক উৎকল ভাষায় অনুবাদিত আচার্য্যের জীবনবেদ পুস্তক বোধ রাজের যন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে। ইহাকে বলে, স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত সদ্ব্যবহার।

কটকমহিলাসমিতি উড়িষ্যার ভূতপূর্ব্ব কমিশনরের পত্নী শ্রীমতী প্রসন্ন তারা গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। তিনি কটক নগর পরিত্যাগ করিলে পর সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী রেবারায় উহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আলয়েই এ পর্য্যন্ত সমিতির অধিবেশন হইতেছিল। সম্প্রতি শ্রীমতী স্বীয় পিতামাতার সঙ্গে বোধ রাজের রাজধানীতে কিয়ৎকাল স্থিতি করিবেন সঙ্কল্প করিয়া কটক পরিত্যাগ করাতে সমিতির অন্যতর সভ্য তাহার কার্য্য সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত মহিলসমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী প্রসন্ন তারা দেবী দূরদেশে থাকিয়াও তাহার রক্ষা ও উন্নতিকল্পে যথোপযুক্ত সাহায্য করিতেছেন।

——

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

মনোবিজ্ঞান।

বস্তুবিজ্ঞান।

(৩০ পৃষ্ঠার পর।)

বৃদ্ধি প্রাণীদেরও পাইবার ক্ষমতা আছে, তাহারাও বৃদ্ধিশীল ; অধিকন্তু ইহাদের একটা চলিয়া বেড়াইবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে এত মিল যে খুব ছোট ছোট জিনিষ ধরিলে তাহা প্রাণী কি উদ্ভিদ বলা কঠিন। আচ্ছা মনে করুন স্পঞ্জ (Sponge)—এ জিনিষটা কি উদ্ভিদ না প্রাণী? আজ কাল স্পঞ্জটা প্রাণী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। সচরাচর উদ্ভিদ নড়িতে পারে না, এই স্পঞ্জও নড়িতে পারে না, কিন্তু উদ্ভিদের ন্যায় বড় হইতে পারে। তবে কেন ইহাকে উদ্ভিদ না বলিয়া প্রাণী বলা হয়। অনেক প্রাণী আছে, যাহারা চলিতে পারে না, অথচ বাড়িতে পারে, যেমন পুরুভুজ। এই সকল বস্তুতে যখন উদ্ভিদের লক্ষণ দেখা যায়, তবে কেন প্রাণী বলি? আবার সমুদ্রে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ আছে যাহারা চলিয়া বেড়ায়। তবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে প্রভেদ কি? কেহ কেহ বলেন, প্রাণীর স্পর্শজ্ঞান আছে, যেমন কিছু খাবার দিলে খায়, কিন্তু ইহাই যে প্রভেদ তা বলা যায় না ; কারণ এমন উদ্ভিদও আছে যার পাতায় একটা আঠার মত মিষ্ট পদার্থ থাকে, মাছিরা সেই পদার্থ খাইবার জন্য আসিয়া বসে, আর অমনি গাছটা টের পায় ও তাহার পাতা মুড়িয়া ফেলে, এবং ঐ মাছিকে একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া খাইয়া ফেলে। আবার এক রকম গাছ আছে, যার ফল ঘটীর মত, তার উপরে আবার একটা ঢাক্না আছে, এবং সেই ফলের মধ্যে জল থাকে। যখন কোন ক্ষুদ্র জীব তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল খাইতে প্রবেশ করে, অমনি উপরের ঢাক্না বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং কে বলিল যে, এ সব গাছ টের পায় না। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে অনেক বড় বড় পণ্ডিত চেষ্টা করিতেছেন, এ পর্য্যন্ত খুব ঠিক্ বুঝা যায় নাই। তবে আজ কাল ইহাই ঠিক হইয়াছে যে, উদ্ভিদের মুখ বাহিরের দিকে, অর্থাৎ তাহারা শিকড় দিয়ে রস টানে ও বাহিরে তাহাদের শরীরের উপরটাই বাতাস হইতে কার্ব্বোণ টানিয়া লয়। উদ্ভিদেরা বাহিরের দিক্ দিয়ে আপনাদের আহার গ্রহণ করে, কিন্তু প্রাণী আহার করে ভিতরের দিক্ দিয়া। তাহারা মুখ দিয়া আহার সামগ্রী ভিতরে নেয়, সেখানে উদরের ভিতর পাকস্থলীতে সে সব গিয়ে প'ড়ে, পরিপাক হ'য়ে সমস্ত শরীরে বল দেয়। প্রাণীর আহার্য্য সামগ্রী ভিতরেই পরিপাক

হয়। এ বিষয় এত বলিবার মানে এই যে, পদার্থ যত উন্নত হয় ততই তাহাদের মধ্যে অন্তরপ্রকৃতি বলিয়া জিনিষটা বাড়িতে থাকে।

প্রাণী যদিও দেহধারী পদার্থ, কিন্তু তার ভিতরের ক্রিয়াই অধিক; অন্তরের ক্রিয়াই প্রাণীর ক্রিয়া, উক্ত বস্তু চেতন পদার্থ; এই চেতন আন্তরিক ক্রিয়া। চেতন জিনিষটা নিরাকার, কোন আকার বা ওজন নাই, ইহার ভিতর কেবল জ্ঞানের ক্রিয়া লক্ষিত হয়। জ্ঞান ভাব ইচ্ছা মিলিয়া চেতন পদার্থের কার্য্য হয়। যেমন বাহ্যিক ক্রিয়া হইলে সেটা বাইরে বাইরে থাকে, তেমনি জ্ঞানেতে এই চৈতন্যময় পদার্থের লক্ষণ দেখা যায়; আত্মবিজ্ঞানবিষয়ে বলিবার সময় উহা বলা হইবে। এই রূপে জানা গেল যে, জড় তিন প্রকার, নির্জীব, সজীব এবং উদ্ভিদ। এর মধ্যে কতকগুলি সজীব ও প্রাণী জাতীয়, আর কতকগুলি সজীব উদ্ভিদ জাতীয়। এই তিন প্রকার বস্তুর জ্ঞান আমরা কিরূপে লাভ করি, তাহাই দেখা যাউক, অর্থাৎ আমরা কি উপায়ের দ্বারা এই গুলির বিষয় জানিতে পারি।

মানুষের যত প্রকার শক্তি বা ক্ষমতা আছে, তার মধ্যে প্রথম ইন্দ্রিয় জ্ঞান; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কোন বস্তুর বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে ইন্দ্রিয়জ্ঞান বলে।

কোন বস্তুর বিষয় প্রথম জ্ঞান ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা লাভ করা হয়, যেমন কোন একটা জিনিষ আগে দেখি ও স্পর্শ করি, অথবা যদি আবশ্যক হয় স্বাদ লইয়া সে বস্তুর বিষয়ে খানিকটা জ্ঞান লাভ করি। দ্বিতীয় স্মৃতি, তৃতীয় বুদ্ধি। সাধারণতঃ মনে হয়, ইন্দ্রিয়জ্ঞান বস্তুর বিষয় জানার প্রধান উপায়, যেমন চোক দিয়ে দেখা, কাণ দিয়ে শুনা। যখন বস্তু স্থির করা যায়, তখন স্মৃতি ও বুদ্ধির কি দরকার? কিন্তু বাস্তবিক তা নয়, স্মৃতি না থাকিলে কোন বিষয়েরই জ্ঞান লাভ হয় না।

চক্ষু মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়। ঈশা বলিয়াছেন, চক্ষুই মানুষের সেরা জিনিষ। তিনি যে ভাবেই বলুন, বাস্তবিক যদি চক্ষুর হানি হয় তবে মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা কষ্ট হয়। বৃদ্ধাবস্থায় যে, চোকের দৃষ্টি-হীন হয় ইহাই প্রধান কষ্ট। এই দর্শন করিবার ক্ষমতা একটা পরম সৌভাগ্যপ্রদ শক্তি, কিন্তু ইহা দ্বারাও আমরা যে জ্ঞান পাই তাহাও কত অপূর্ণ! খালি চক্ষু দ্বারা দেখিলেই একটা জিনিষের বিষয় পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে না। যেমন সূর্য্য কত বড়, চাঁদ কত বড়, তা চোক দিয়ে টের পাওয়া যায় না; যেমন কাছের জিনিষ বড় দেখায়, দূরে ছোট দেখায়; সুতরাং বাস্তবিক জিনিষটা কত বড় তা চক্ষু দ্বারা কিছু ঠিক করা যায় না। এক খানা নৌকা যখন কাছে থাকে কত বড় দেখায়, সেই খানাই আবার যখন দূরে যায় কত ছোট দেখায়; তাই বলিয়া কি বাস্তবিক নৌকা ছোট? চোক দিয়ে আমরা কেবল নৌকার একটা ছবি দেখিতে পাই। চোক দিয়া যা দেখি তাহা কেবল জিনিষের ছবি মাত্র। এই চোক দ্বারা জিনিষের দূরত্ব ও নিকটত্ব কিছুই বোঝা যায় না, ইহা দ্বারা গতিও জানা যায় না, কেবল চক্রাকার একস্থানে স্থির

কতকগুলি জিনেষের ছবি দেখা যায়। যে চোকের এত প্রশংসা করি তাহা দ্বারাও আমরা একটা জিনিষের বিষয় পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারি না। অন্ধ ব্যক্তি কিরূপে বস্তুর বিষয় জ্ঞান লাভ করে? তাহারা স্পর্শ দ্বারাই সমস্ত বিষয় জানিতে পারে। কোন বস্তুর বিষয় জানিতে হইলে স্পর্শজ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। স্বভাবতই অন্ধদিগের স্পর্শজ্ঞান অধিক, যদি এক জন অন্ধকে ও একজন ভাঁলোককে একটা ঘরে রাখা যায়, এবং তার দরজা যদি ছোট থাকে, তবে দেখা যায়, হয়ত ভাল লোকটিরই ঘরে ঢুকিবার সময় মাথায় দরজার ধাক্কা লাগিবে, কিন্তু ঐ অন্ধটির লাগিবে না। কারণ ওর স্পর্শশক্তি এত প্রবল ও অভ্যস্ত যে, সেখানে যাইবামাত্র আপনা হইতেই মাথা নিচু হইয়া যায়। অন্ধদের জন্য এক প্রকার বই আছে যার অক্ষর একটু উঁচ উঁচ। তাহারা সেই অক্ষরগুলির উপর হাত বুলাইয়া অনায়াসে বই পড়িতে পারে. কিন্তু যাহাদের চক্ষু আছে তাহারা চক্ষু বুজিয়া হাতে স্পর্শ করিয়া কখনই সে সব অক্ষর পড়িতে পারে না, কারণ তাহাদের স্পর্শ অত অভ্যস্ত হয় নাই। বস্তুর বিষয় জ্ঞান লাভ করিতে হইলে স্পর্শশক্তির জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করে, যেমন জল আমরা দেখ্‌লাম; কিন্তু তাতেই সেটা কি তা বুঝ্‌তে পারা যায় না। জল তরল তা কি চোক দিয়ে দেখা যায়? শক্ত, নরম তরল এ সব জ্ঞান স্পর্শ বিনা কিছুতেই হয় না।

শুশ্রূষা *।

গতবারে ঔষধ প্রয়োগপ্রণালী বলা হয়েছে। চোখে ঔষধ দেবার জন্য Eye-dropper ব্যবহার হয়, কেহ কেহ পেন কলম কেটে তার মুখ দিয়ে দেন, কেহ বা পাতলা ন্যাকড়া ভিজিয়ে অস্তে চোখে ফোঁটা দেন। Eyedropperএ দেওয়া সব চেয়ে সুবিধা। একটা কাচের নল, তার একটা দিক মোটা আর একটা দিক্ সরু, আর মোটা দিকের সঙ্গে একটা রবরের নল থাকে, সেই টা জলের মধ্যে নিয়ে ডুবাইলে জল উঠে, তার পর আস্তে আস্তে টিপে চোখে দিতে হয়। অভ্যাস না থাকিলে, হয়ত নলে জলই উঠিবে না, কিংবা জল উঠিলেই হয়ত একেবারে সবটা পড়িয়া যাইতে পারে, সেই জন্য আস্তে আস্তে টেপা দরকার। গলায় ভাপ দেবার জন্যে, এক রকম যন্ত্র ব্যবহার হয়, তাকে Spray ও Steam বলে। ঔষধ মিশ্রিত জলের ভাপ সহজে গিয়ে গলায় লাগে। কেহ বা Flanel গরম জলে ভিজিয়ে তাতে ঔষধ দিয়ে তার তাপ নেন। আরও অনেক প্রকারে লওয়া যাইতে পারে। Ketley তে গরম জল করে, তাতে একটা পেঁপের ডালের নল লাগিয়ে মুখে লইয়া টানিতে হয়, কিংবা কাগজের নলেও হয়, অথবা হুকোর

---

* ১৯০২ শক ৩০শে জুন ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

ভিতর গরম জল দিয়ে তাহা টানলেই হয়। Sprit তে করে দিলে সব চেয়ে ভাল হয়। একটা ছোট পাত্র, তাতে ঔষধ মিশ্রিত জল দিয়ে, তার নীচে Sprit lamp জ্বেলে দিতে হয়, Sprit lamp জ্বালিবার সময় ভাল করে lamp এর চারি দিক পুছে দেওয়া উচিত, যেন ধারে কোথাও Sprit না লেগে থাকে, তাহা হইলে সব জ্বলিয়া উঠিবে। তার পর সেই জলের পাত্রটার মুখ ভাল করে Spring এ আটকিয়ে দিতে হয়, এবং ঐ Spring এর সঙ্গের একটা নল জলের সঙ্গে সংযুক্ত আছে ও তাহার আর একটা মুখ বাহিরে আছে, সেই মুখটার কাছে, একটা ছোট কাচের গ্লাসে জল রাখিতে হয়, এবং তার কাছে একটা বড় নল আছে সেখানে মুখ রেখে ভাপ নেয়। কেবল এই একটা নজর রাখতে হবে যে, জল যেন ফুরিয়ে না যায়, তা হলে ফেটে যাইতে পারে। কিংবা তখনি lamp টা সরিয়া নেওয়া উচিত। ফুটতে আরম্ভ হলেই সোঃ সোঃ শব্দ হয়, তখনই ভাঁপ বেরোয়। ছোট ছেলের গলায় কাশী হলে, ইহা দিলে খুব উপকার হয়। বাস্থে করার জন্য কাচের পিচকারি ব্যবহার করিতে হয়, একটা বড় গামলায় সাবান জল করে, বড়দের জন্য আধ সের, তিন পোয়া, একসের জল নিতে হবে, ছোট দের জন্য এক পোয়া আন্দাজ নিয়ে একটা রবরের লম্বা নল তাতে ডুবিয়ে দিতে হয়। আর সেই নলের একটা দিক শক্ত থাকে, সেইটা মলদ্বারে লাগিয়ে দিতে হয়, অন্য দিক্ জলে ডোবান থাকে। আস্তে আস্তে টিপলে পরেই জল যায়। সেই নলটা যেন জলে ডোবান থাকে, কারণ তা না হলে বাতাস যাবে, বাতাস গেলে অপকার হয়। Duce বলে আর এক রকম যন্ত্র আছে, তাতে করে জল রাখতে হয়, সেটা একটু উঁচুতে দেয়ালে পেরেকে আটকে রাখতে হয়, তার সঙ্গে একটা নল থাকে সেই নলটা দিয়ে পচা ঘা ইত্যাদি ধুইবার খুব সুবিধা হয়, Operation এর সময়ও ইহা খুব কাজে লাগে। পাত্র থেকে জল কিংবা লোসন যেন ফুরিয়ে না যায়।

এত ক্ষণ ঔষধ প্রয়োগ করা বিষয়ে বলা গেল। এখন পথ্য সেবন করান বিষয়ে বলিব। আপনারা Phisiolcgy এর Lecture শুনে আহারের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছেন। ক্ষুধাই আহারের প্রধান কারণ, অর্থাৎ ক্ষুধা পেলে খাওয়াই আমাদের স্বাভাবিক। আর একটি কারণ এই যে, সর্ব্বদা শরীরের ক্ষয় হচ্ছে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে কিঞ্চিৎ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, এই ক্ষতিপূরণের জন্য আহারের দরকার; ৩য় উত্তাপ রক্ষা করিবার জন্য, ৪র্থ শরীরের নূতন পদার্থ নির্ম্মাণের জন্য ও কিছু জমা রাখিবার জন্য যেন প্রয়োজন মত খরচ হইতে পারে। খাদ্য দ্রব্য নানা ভাগে বিভক্ত। সচরাচর ৪ ভাগই করা হয়, প্রথম Albuminum, দ্বিতীয় Carbohidro, তৃতীয় Fat, চতুর্থ জল ও লবণ। ১ম জাতীয় জিনিষ সচারাচর প্রাণীর ভিতরে বেশী পাওয়া যায়। Nitrogen নামক যৌগিক পদার্থ ইহাতে আছে। মাংস এই জাতীয় খাদ্য। ২য় প্রকার যাহাতে Carbon ও Hydroge আছে, Nitrogen নাই। যৌগিক পদার্থ কাহাকে বলে তাহা বোধ হয়

আপনারা জানেন, অর্থাৎ যে গুলির পরস্পরের সঙ্গের কোন যোগ নাই। ইহাতে Oxygen আছে,চাল ময়দা এরারুট, এই জাতীয় খাদ্য,চতুর্থ Fat তৈলাক্ত পদার্থ, যেমন চর্ব্বি ঘৃত। Fat দুই রকমের হয়। জান্তব ও অজান্তব, অর্থাৎ ঘি আর সরিষার তৈল ইত্যাদি যেমন। চতুর্থ জল লবণ, ইহা সাধারণ ভাবেও পাওয়া যায়, অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে মিশ্রিত করিয়াও যথেষ্ট পাই। আমাদের এই চারি প্রকারের খাদ্যই প্রয়োজন, এবং প্রত্যেকটী কত পরিমাণ আমাদের শরীররক্ষার জন্য প্রয়োজন তাহাতে নির্দ্দিষ্ট করা আছে। আপনারা এ বিষয় Phisiology র Lectureএ জানিয়াছেন, অতএব তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। খাদ্য দ্রব্য আহার করার পর মুখে লালা হয়, খাদ্য তাহাতে কতক পরিমাণে পরিপাক হয় ;—Stomach এ গিয়ে খানিক হয়, তারপর Stomach এর আরও নিচে গিয়ে খানিকটা হয়ও তার পর রক্তে পরিণত হয় ও শরীরের চতুর্দ্দিকে চালিত হয়। এ বিষয়েও আপনারা শুনিয়াছেন। শুধু আহার করিলেই হয় না,তাহা পরিপাক করে তাহাকে রক্তে পরিণত করিতে হয় ও সমস্ত শরীরে গমনাগমনের সুবিধা করিতে হয়। সেই আহারে ক্ষুধানিবৃত্তি হয়,উত্তাপ জন্মে,রক্ত নির্ম্মল হয়,ক্ষতিপূরণ হয় ও জমা থাকে। এই প্রকার নিয়মে সহজ অবস্থায় চলে। রুগ্ন অবস্থায় সব খাদ্য উপযুক্ত হয় না। খাদ্যদ্রব্যের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন করিতে হয়। আমরা যাহা সহজ অবস্থায় খাই অসুস্থাবস্থায় তাহা হজম হয় না, সুতরাং সহজে যাহা হজম হয়,তাই খাওয়া উচিত। রুগ্ন হইলে ক্ষুধা কম হয়, এ জন্য পরিমাণে কম দেওয়া উচিত। খুব লঘু পরিমাণে অন্ন, সহজে হজম হয়, সহজে রক্তের সঙ্গে মিশে, অথচ পুষ্টিকর ও উত্তেজক এই প্রকার দ্রব্য রোগীকে আহার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষ রোগে, বিশেষ আহার নিষিদ্ধ ; আবার বিশেষ খাবার নির্দ্দিষ্ট আছে। খাদ্য দ্রব্যের বিশুদ্ধতাসম্বন্ধে জানা দরকার। আমরা সুস্থ শরীরেই যদি খারাপ দ্রব্য ভেজাল জিনিষ খাই, তাহাই হজম হয় না। রোগীকে যদি সেরূপ দ্রব্য আহার করিতে দিই, তাহা হইলে রোগ আরও বাড়ে। তখন যাতে রোগীর খাদ্য বিশেষরূপে শুদ্ধ হয় তাহা আমাদের দেখা উচিত। আর একটি কথা খাদ্য দ্রব্য ঠিকরূপে প্রস্তুত হওয়া দরকার ও উপযুক্ত পরিমাণে ও নিয়মিত সময়ে যাহাতে দেওয়া হয়,সে বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। আহারের শুদ্ধতার বিষয়ে;—প্রথমতঃ কোন দোকান হতে আনা হয়েছে, সেখানে অন্য ভেজাল জিনিষ মিশিতে পারে কিনা দেখা দরকার। যেমন Barley আনিতে হইল, ভাল দোকান থেকে ভাল maker এর জিনিষ আনা উচিত। বিশেষতঃ যখন সংক্রামক রোগ হয়, তখন খাদ্য দ্রব্য আনিতে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। খাবাদের দোকান সব যে রকম ভাবে থাকে, তাতে সহজেই মাছি বসে ও রাস্তার ধূলো লেগে অপকারী হয়। দুধ খারাপ স্থান হইতে আনা উচিত নয়, খারাপ গোয়ালের দুধ খারাপ হয়। দুধের দরুণ অনেক ব্যারাম হয়। আবার যেমন রুগ্ন গরুর দুধ পান করিলে রুগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা, উজজ

এসব বিষয়ে বিশেষ সন্ধান লওয়া দরকার। তার পর দেখা উচিত খাদ্য দ্রব্য কিরূপ ভাবে রাখা উচিত, খাদ্য দ্রব্য যাহা প্রস্তুত হয়, তাহাত আর একেবারেই নিঃশেষিত হইয়া যায় না, অবশিষ্ট থাকে; কিন্তু তাহা আমরা ভাল করিয়া ঢাকা দিয়া রাখি না, আমরা এ বিষয়ে বড় অবহেলা করি। এরকম না ঢাকার দরুণ অনেক রোগের উৎপত্তি হয়। রোগীর দুধ সাগু পরিষ্কার স্থানে ভালরূপে রাখা উচিত। অনেক সময় খাদ্য পাত্রের দোষের জন্য বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমরা হয়ত কোন বাটী গেলাসে একবার খাইয়ে, অমনি না ধুইয়ে রাখিয়া দি, এবং তাতে কত ধুলো পড়ে। ধুলো পড়াতে যে দুধটুকু পাত্রে লাগিয়া থাকে তাহা নষ্ট হইয়া যায়, সেই গেলাসে আবার দুধ খাওয়ান হয়, তাহাতে সব দুধই নষ্ট হয়। এই জন্য রোগীর আহারের পর পাত্রটী ভাল করে ধুয়ে ঢেকে রাখা উচিত। আমরা সচরাচর খাদ্যদ্রব্য সিদ্ধ করে নি, ইহাতে অনেক দোষ কেটে যায়; রোগীকে দিবার সময় উত্তপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। দুধ ভাল করে জাল দিয়ে সব দোষ কেটে যায়। ডাক্তারের বিশেষ আদেশ না থাকিলে, রোগীর খাদ্য সর্ব্বদাই গরম করে দেওয়া ভাল। Stratalyseএ খাদ্যদ্রব্য রাখিলে নষ্ট হয় না, উত্তাপ রাখে বলে নষ্ট হয় না। তেমনি আবার অধিক শীতলতাতেও খাদ্য ঠিক থাকে। মাংসের যুস, Stratalyseএ কিংবা বরফের উপর বসিয়ে রাখলে ঠিক থাকে। বাহিরের বাতাসে কত রোগের কীটাণু আছে বলা যায় না। রোগীকে খাদ্য দিবার সময় বাসন খুব পরিষ্কার, হাত পরিষ্কার ও চামচে পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত। আর রাখিয়া দিতে হইলে ভাল করে ঢাকা উচিত। রোগীর বাসের ঘর, স্থান সব পরিষ্কার রাখা উচিত। তার পর খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা, সম্যক্‌রূপ প্রস্তুতির অভাবে অপকার হয়। আপনারা সকলেই রন্ধন করিতে জানেন, কিন্তু রোগীর জন্য রন্ধন একটু শক্ত ও আলাদা রকমের। রন্ধনকে চারি ভাগে ভাগ করা হয়;—১ম সিদ্ধ, যেমন, Broth করা, মাংসের বা ডালের; ২য় দগ্ধ করা, ইংরাজিতে Roast করা বলে, অর্থাৎ যেমন মাংস পুড়ে নিয়ে উনুনে লোহাতে ভাজা, সিদ্ধ করা জিনিষ পরিপাক করা সবচেয়ে সহজ, দগ্ধ খাদ্য কিয়ৎ গুরুপাক। Broil অর্থাৎ সিদ্ধ করে ভাজা তাহা উপরের দুটীর অপেক্ষাই গুরুপাক। তার পর Baking অর্থাৎ সিদ্ধ না করে শুধু ভাজা, সব চেয়ে গুরুপাক। রোগীকে কখনও Roast করা জিনিষ দেওয়া ভাল নয়। সিদ্ধ করা যেমন আলু সিদ্ধ, অমনি একটু নুন দিয়ে রোগীকে দেওয়া উচিত; তাহা সব চেয়ে লঘুপাক, তার পর দগ্ধ খাদ্যও দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষ বিশেষ খাদ্য প্রস্তুত করিবার বিশেষ বিশেষ প্রণালী আছে। খাদ্য দ্রব্য উত্তমরূপে প্রস্তুত হইলে, তাহা পরিপাক করাও সহজ হয়। রোগীর খাদ্য পরিমাণে যেন ঠিক হয়, আর এই একটী জেনে রাখা দরকার যে, রোগীকে কখনও পেট ভরে খেতে দেওয়া উচিত নয়। একটু একটু ক্ষুধা বোধ যেন থাকে, তাহা হইলে সহজে পরিপাক হয়। এ বিষয়ে ঠিক ডাক্তারের ব্যবস্থানুসারে চলা উচিত। রোগীর

খাদ্য পরিমাণে অল্প করে, বারে বেশী দেওয়া ভাল। ইহাতে হজম ভাল হয়। সচরাচর ৪ঘন্টা অন্তর দেওয়া হয়, কিন্তু খুব কাহিল হইলে, আরও শীঘ্র শীঘ্র দেওয়া দরকার। পথ্য সেবন করনে ছেলেদের চামচে করে খাওয়ান ভাল, তাতে বিপদের সম্ভাবনা কম। Feeding Bottle এ অনেক বিপদ্ অনেকে হয়ত বোতলটী পরিষ্কার করেন নেন না, তাহাতেই আবার খাওয়ান, ইহাতে দুধ নষ্ট হইয়া যায়, এই জন্য খাওয়ানের Bottleটী ধুয়ে রাখা উচিত। অন্ততঃ গরম জলে ভিজিয়ে রাখা দরকার। রোগী যখন উঠতে পারে না তখন, Feeding cupএ করে খাওয়ান খুব সুবিধা, ইহাতে Feeding নলটী অপরিষ্কার হয়, সেইটী পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলা দরকার। অজ্ঞান অবস্থায়, যখন রোগী গিলতে পারছে না, তখন Feeding Tube দিয়ে খাওয়ান হয়। একটা রবারের নল, সেটাতে দুধ সাবু যা হয় দিয়ে, একটা দিবে একেবারে গলার ভিতরে দিতে হয়, আর এক দিক্ একটু উচু করে ধরিতে হয় তাহা হইলে খাদ্য সহজেই গিয়ে গলার ভিতর পড়ে। জিবটা একটা চাম্‌চে দিয়ে পরে রেখে, আর দাঁতের মধ্যে একটা কর্ক দিয়ে আটকে দিতে হয়, দাঁত এসে নলটার উপর না পড়ে। ধনুষ্টঙ্কার রোগে, মুখ দিয়ে খওয়ালে তখনি বমি হয়ে যায়, এজন্য Anima দ্বারা খাওয়ান হয়। সব যন্ত্রগুলি বিশেষরূপে পরিষ্কার রাখা দরকার। রোগী আহার করাইবার জন্য Nurseএর খুব বুদ্ধি দরকার। রোগী প্রায়ই অনিচ্ছার খায়, কারণ খাদ্যত সেরূপ সুস্বাদু হয় না। এ জন্য nurseএর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের খুব দরকার। এক জন, রোগীকে কোন রকমে খাওয়াতে পারেন, আর এক জন পারেন না। সর্ব্বপ্রথম, আমাদের দেখা উচিত রোগী যে অনিচ্ছা প্রকাশ করছে তার কারণ কি ? প্রথমে সেই কারণ দূর করা উচিত। যেমন, মুখ খুব অপরিষ্কার রয়িয়াছে, তখন বাজার সুস্বাদু দ্রব্য হইলেও মুখে ভাল লাগিবে না, তাহা হইলে, অগ্রে গরম জলে মুখ পরিষ্কার ধুয়ে দিয়ে তবে খাইতে দেওয়া উচিত। তার পর দেখা উচিত কোন রকম করে পথ্যে আস্বাদন একটু ভাল করা যায় কি না। কিন্তু রোগী আবার অনেক সময়ে বিনা কারণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তখন জোর করে খাওয়ান দরকার হয়। অনেক সময় হয় কি ডাক্তারের আদেশ মত তিন ঘণ্টা পরের রোগীকে আহারের জন্য জোর করা হয়, তখন হয়ত তার তিন ঘণ্টা পূর্ব্বের খাদ্য হজম হয় নাই, পেট ফাঁপিয়াছে, ইহা না বুঝিয়াই তিন ঘণ্টা পরে খাওয়ান হয়। ইহাতে অত্যন্ত অপকার হয়। এ জন্য Nurseএই খুব বুদ্ধি চাই, সব দিক দেখা চাই। ভয়ানক যন্ত্রণায় ছটফট করছে, তখন খাবার জন্য জোর করা হয়, কিন্তু তখন সে খাইতে পারে না। রোগীকে আহার করাইবার পূর্ব্বে একটা তোয়ালে গলার ও বুকের উপর দিকে কাপড় নষ্ট হয় না।

মূল্যপ্রাপ্তি।

	৮ম বৎসর।	
শ্রীমতী মনোমোহনী বসু,	কলিকাতা	১৲
শ্রীযুক্ত পান্নালাল বসু,	„	২৲
„ মহারাজ দিনাজপুর,	„	২৲
	৯ম বৎসর।	
শ্রীমতী কুমুদিনী সেন,	কলিকাতা	২৲
„ সুদক্ষিণা সেন,	কলিকাতা	২৲
শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শাহা,	কুচবিহার	২৲
„ পান্নালাল বসু,	কলিকাতা	২৲
„ মহারাজ দিনাজপুর,	„	২৲
„ সিদ্ধেশ্বর মিত্র,	অমরপুর	১৲
	১০ম বৎসর।	
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ মল্লিক,	গোবিন্দপুর	২৲

মহিলার নিয়মাবলী।

মহিলা পত্রিকা প্রতিমাসের সংক্রান্তি দিবসে প্রকাশিত হয়। ডাক মাশুলসহ ইহার বার্ষিক মূল্য ২৲ মাত্র। গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ মহিলার মূল্য ও অর্থসম্বন্ধীয় পত্রাদি কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নামে এবং প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকটে ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। প্রাপ্ত প্রবন্ধাদি উপযুক্ত হইলে শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক প্রকাশিত হইবে। কাহারও প্রবন্ধ ফেরত দেওয়া যাইবে না।

অনেকে মহিলা পত্রিকা বৎসরাধিক কাল গ্রহণ করিয়া মূল্য দান করেন না, বড় দুঃখের বিষয়। যাঁহারা মূল্যদানে অসমর্থ তাঁহারা যেন অবিলম্বে পত্রিকা ফেরত পাঠাইয়া দেন, অথবা আমাদিগকে তাহা পাঠাইতে নিষেধ করেন। তাহা হইলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব না। পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়া প্রাপ্য মূল্য না পাইলে অনেক সময়ে আমরা সেই মূল্যের জন্য ভি, পিতে মহিলা পাঠাইয়া থাকি।

---

১০ ভাগ।
৫ম সংখ্যা।
অগ্রহায়ণ
১৩১১।
মহিলা
যত্র নার্য্যস্তু
পূজ্যন্তে
রমন্তে তত্র
দেবতাঃ।
মাসিক
পত্রিকা।

সূচী।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজের

কেশরঞ্জন তৈল।

সাবধান হইবেন !

কেশরঞ্জন তৈলের জাল তৈল বাজারে বিক্রয় হইতেছে।
শিশির প্যাকের উপর আমার নাম ও মুর্ত্তি দেখিয়া লইবেন।
এক শিশির মূল্য ১৲ একটাকা মাত্র। ডাঃ মাঃ ।/০ আনা।

কেশরঞ্জনের বিস্তৃত বিবরণ, দেশ-বিদেশের সহস্র সহস্র গণ্য
মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের প্রশংসাপত্র এবং তিনটী উপন্যাস
সম্বলিত ১৩১১ সালের সচিত্র 'কেশরঞ্জন ডায়েরি'
অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে, বিনা-
মূল্যে দেওয়া যায়।

কেশরঞ্জন

চিরবসন্তময় নন্দনের আনন্দ দান করে।

শুধু গন্ধে নহে,—"কেশরঞ্জন" গুণেও সর্ব্বজনপ্রিয়।

কেশ দীর্ঘ, ঘন, কোমল, কুঞ্চিত ও চিক্কণ করিতে, চিরকালের জন্য কেশ কোকিলকৃষ্ণ রাখিতে এবং মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথার জ্বালা ও হাত-পায়ের জ্বালা নিবারণ করিতে, একমাত্র মহৌষধ

"কেশরঞ্জন।"

রাজা, মহারাজা হাকিম, উকিল, অধ্যাপক, সম্পাদক, শিক্ষক, লেখক, বক্তা, চিন্তাশীল প্রভৃতি সকল ব্যক্তিই কেশরঞ্জনের নিতান্ত পক্ষপাতী।

ভদ্রমহিলাগণ "কেশরঞ্জন" মাখিয়াই কেশের শোভা বর্দ্ধন করেন।

জাপান যুদ্ধের সংবাদ

লইবার জন্য আপনি যেমন উৎসুক-নেত্রে সংবাদ পত্র স্তম্ভসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করেন—বলুন দেখি—আপনার দেহজাত রোগসমূহের প্রকৃত চিকিৎসার উপায় সম্বন্ধে সেরূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন কি না? দারুণ ম্যালেরিয়া ও জ্বরের সময় আসিয়াছে, আপনার দৃষ্টি কেবল কুইনাইনের দিকে। কিন্তু আমাদের আয়ুর্ব্বেদে এমন জ্বরনাশক মহৌষধ আছে, যাহা একবার সেবনে জীবনেও কখন কুইনাইন সেবনের আবশ্যক হয় না। আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয় উপাদানে প্রস্তুত "পঞ্চতিক্ত বটিকা" সেবনে সর্ব্ববিধ জ্বর নির্দ্দোষে আরাম হয়। একবার আরাম হইলে আর পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৵০ আনা।

১৮।১নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটি বাজার, কলিকাতা।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১০ম ভাগ] অগ্রহায়ণ ১৩১১ ; ডিসেম্বর ১৯০৪। [৫ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

এক্ষণ এদেশে ভদ্র মহিলাদিগের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ্চা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। লিখিতে পড়িতে জানেন না, এরূপ নব্য মহিলা বিরল। অনেকে স্কুল কলেজে পড়িয়া সুশিক্ষিতা হইতেছেন। কিন্তু ধর্ম্ম পুস্তকাদিপাঠে ও আলোচনায় তাঁহাদের প্রবৃত্তি ও আগ্রহ বড় দেখা যায় না। ছাত্রী-জীবন অতীত হইলে অনেকে পড়া শুনা কিছুই করেন না, পুস্তক পড়িতে হইলে কাব্যোপন্যাসই পড়েন, তাহাতে জীবনের উন্নতি না হইয়া বরং অবনতি হয়।

প্রাচীনা হিন্দু মহিলাদিগেরপ্রায় সকলেই লেখা পড়া জানেন না। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকাদি পাঠশ্রবণে তাঁহাদের প্রবল আগ্রহ লক্ষিত হয়। আমরা বাল্য কালে প্রতিদিন অপরাহ্নে মা খুড়ীমা প্রভৃতির অনুরোধে রামায়ণ মহাভারতাদি পড়িতাম, তাঁহারা অনেকক্ষণ নিবিষ্টমনে বসিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিতেন। একটী ভক্তিমতী মহিলা স্বয়ং প্রত্যহ ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য বৃদ্ধ বয়সে লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন।

এক্ষণ নব্য মহিলাদের শাস্ত্র-চর্চ্চায় ও শাস্ত্র-পাঠে এরূপ অরুচি ও বিরাগ যে, নানা সুযোগসত্বেও সপ্তাহান্তে এক ঘণ্টা কাল ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ ও আলোচনায় কষ্ট বোধ করেন। ইহাতেই তাঁহাদের মনের গতি কোন্ দিকে স্পষ্ট বুঝা যায়। যাহাতে জীবনের কল্যাণ হয়, নিজের অভাব সকল বুঝিতে পারা যায় এমন কোন গভীর বিষয়ের চর্চ্চাতে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না, দুঃখের বিষয়। সদ্গ্রন্থ পাঠ ও ধর্ম্মালোচনাদিতে বয়োজ্যেষ্ঠাদের উপেক্ষায় ও অবহেলায় বয়ঃকনিষ্ঠ ও সন্তানাদির যে কত অনিষ্ট হয় বলিয়া উঠা যায় না। বালক বালিকারা আর কোন্ দৃষ্টান্তে সুনীতির পথ আশ্রয় করিবে?

নারীজাতিসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উক্তি।

হিন্দু বৌদ্ধ ও মোহম্মদীয় শাস্ত্র প্রভৃতিতে নারীজাতিসম্বন্ধে সংস্কৃত ও আরব্য ভাষায় যে সকল বচন লিপিবদ্ধ আছে, তাহার কতকগুলির অনুবাদ এস্থানে গৃহীত হইল।

হিন্দুশাস্ত্র।

অপমান গৃহছিদ্র গোপন রাখিবার জন্য যাহা বলা হয়, যাহা কিছু ভর্ত্তার গ্লানিকর, তাহা অতি যত্নে গোপন করিবেক।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

স্বামীর ধনে নির্লোভ হইবে, এবং নিয়ত তাঁহার হিতে রত থাকিবে। তাঁহার সন্নিধানে অসন্তোষ, ক্রীড়া ও হাস্ত পরিত্যাগ করিবে। মহানির্ব্বাণ।

পতিব্রতা ভার্য্যা পতিকে ক্রূর দৃষ্টিতে দেখিবে না, কখনও দুর্ব্বাক্য শুনাইবে না, এবং মনেও কখন পতির অপ্রিয় চিন্তা করিবেক না।

মহানির্ব্বাণ।

কন্যা যত দিন পতি-মর্য্যাদা ও পতিসেবা না জানে, এবং ধর্ম্মশাসন অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না। মহানির্ব্বাণ।

যে গুণসম্পন্না নারী শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করেন, মাতাপিতাকে নিত্য ভক্তি করেন, তিনিই তপস্যাচরণ করেন।

অনুশাসন পর্ব্ব।

যে নারী পতির প্রতি অনুরাগ ও তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া আত্মাকে সংযত করত নিত্য দুশ্চর ব্রত-আচরণ করেন, তিনিই পতির ব্রত-ভাগিনী হন।

অনুশাসন।

যে সতী স্ত্রী স্বামীর প্রতি ভক্তি করেন, স্বামীর ব্রতই যাঁহার একমাত্র ব্রত-তাঁহার সেই ভক্তি ও ব্রতই তাঁহার পক্ষে তপস্যা, পুণ্য ও নিত্য স্বর্গ।

অনুশাসন।

যে সাধ্বী স্ত্রী সদাচারা হইয়া দম্পতীধর্ম্মশ্রবণপূর্ব্বক উত্তমরূপে তদ্ধর্ম্ম সাধন করেন, তিনিই ধর্ম্মচারিণী হন।

অনুশাসন।

সদাচারা প্রিয়দর্শনা নারী সন্তুষ্ট চিত্তে দেবতুল্য স্বামীর বশ্যভাবে সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকেন। অনুশাসন।

কঠোর কথা কহিলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিলেও যিনি ভর্ত্তার প্রতি প্রসন্ন-মুখী তিনিই পতিব্রতা।

অনুশাসন।

দরিদ্র রোগী দীন ও পরিশ্রান্ত স্বামীকে পুত্রের ন্যায় যিনি সেবা করেন তিনিই ধর্ম্মাচরণ করেন।

অনুশাসন।

যে নারী প্রীতমনে বিনীতভাবে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট চিত্তে পতির সেবা-শুশ্রূষায় তৎপর, সেই নারীই ধর্ম্মভাগিনী হয়।

অনুশাসন।

যে নারী নিত্য অন্নদান করিয়া কুটুম্বদিগকে প্রতিপালন করেন, পতিতে যেমন স্পৃহা এমন ভোগ ঐশ্বর্য্য সুখ ও কামনার বিষয়ে যাঁহার স্পৃহা নাই, সেই নারীই ধর্ম্মভাগিনী হন। অনুশাসন।

বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্র।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য।

১। স্ত্রীকে সম্মান করিবে।

২। তাঁহার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করিবে।

৩। তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্বস্ত হইবে।

৪। অপর লোক কর্তৃক তিনি সম্মানিত হন, এরূপ কার্য্য করিবে।

৫। তাঁহাকে উপযুক্ত অলঙ্কার ও বস্ত্র প্রদান করিবে।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

১। পরিজনবর্গের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করিবে।

৩। জ্ঞাতিবর্গ ও সম্বন্ধের প্রতি আতিথেয় হইবে।

৩। সুপত্নী হইবে।

৪। মিতব্যয়িনী গৃহিণী হইবে।

৫। নিজের সমুদায় কার্য্যে অধ্যবসায় ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে।

মোহম্মদীয় শাস্ত্র।

অনেকেশ্বরবাদিনী নারী যে পর্য্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন না করে তাহাকে বিবাহ করিও না, এবং অনেকেশ্বরবাদিনী (সৌন্দর্য্যে ও ধনসম্পদদানে) তোমার সন্তোষ উৎপাদন করিলেও তদপেক্ষা নিশ্চয় বিশ্বাসিনী দাসী শ্রেষ্ঠা, এবং যে পর্য্যন্ত বিশ্বাসী না হয় অনেকেশ্বরবাদীকে কন্যা দান করিও না।

কোরাণ, বকর সুরা ২৭ রকু।

"মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন;—"পতিপ্রসন্ন এমন যে নারীর মৃত্যু হয় সে স্বর্গোদ্যানে গমন করে।"

হদিস, বিবাহ প্রকরণ।

প্রশ্ন করা হইয়াছিল, 'কোন্ নারী শ্রেষ্ঠ?' মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছিলেন, 'তিনিই শ্রেষ্ঠ, যিনি দর্শনে স্বামীকে আনন্দিত করেন, স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, নিজ জীবন ও ধন সম্পত্তিতে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেন না, এবং তাঁহার অসন্তোষ হয় এমন কোন কার্য্য করেন না। ঐ।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র।

নারীগণ লজ্জা ও সুশীলতাসহকারে ভদ্র বসনে আপনাদিগকে সুসজ্জিতা করুন, কেশবিন্যাস স্বর্ণ মুক্তা অথবা বহুমূল্য বেশে ভূষিতা না হইয়া সাধ্বী স্ত্রীগণের উপযুক্ত সৎক্রিয়া দ্বারা সুশোভিতা হউন। পলের উক্তি।

ইহুদি ধর্ম্মশাস্ত্র।

পুণ্যবতী নারী স্বামীর শিরোভূষণ, কিন্তু যে স্ত্রী লজ্জিত করে সে তাঁহার অস্থির ক্লেদ।

হিন্দুরমণীর আতিথ্যসংকার।

দুই প্রকার আতিথ্যসংকার হইয়া থাকে। শ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত পরিব্রাজক বহু দূরপর্য্যটনপূর্ব্বক কোন গৃহস্থের দ্বারে আসিয়া বিশ্রাম ও ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রার্থী হয়, গৃহী শ্রদ্ধাসহকারে অন্নদান ও আশ্রয়দান করিয়া তাহার সেবা করেন, এই এক প্রকারের অতিথিসেবা। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,

"অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতিং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।"

অর্থাৎ যে গৃহস্থের গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, সে তাহাকে নিজের দুষ্কৃতি প্রদান করিয়া তাহার পুণ্যগ্রহণপূর্ব্বক চলিয়া যায়।

এই রূপ পরিব্রাজক অতিথিসম্বন্ধে ঈদৃশী উক্তি হইয়াছে। এই প্রকার অতিথি সেবার বিষয় আমরা গত বারে "ব্রহ্মবাদিনী ও স্ত্রীপ্রজ্ঞা নারী" শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি।

কোন ব্যক্তি আত্মীয়তাসূত্রে কোন গৃহস্থের গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হন, গৃহস্থ শ্রদ্ধা ও যত্নপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করেন, ইহা দ্বিতীয় প্রকারের আতিথ্য-সৎকার। বম্বে প্রদেশের কোন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকের গৃহে কোন পরিচিত বা আত্মীয় লোক উপস্থিত হইলে প্রথমে গৃহিণী মিষ্টান্নাদি সামগ্রী সহ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করেন। সে দেশের হিন্দু মহিলারা আমাদের দেশের হিন্দু মহিলা-দিগের ন্যায় পর্দ্দানিশিনী নহেন, তাঁহারা অসঙ্কুচিতভাবে অপর পুরুষকে দেখা দেন, এবং নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করেন। গৃহে কোন অতিথি উপস্থিত হইলে সর্ব্বাগ্রে যদি গৃহিণী তাঁহার অভ্যর্থনা না করেন, তবে সে দেশে অতিথির অবমাননা হয়। একদা আমাদের একটি বাঙ্গালী বন্ধু অভ্যাগতরূপে পুনানগরে এক জন অতি সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহে ভোজন করিতে যাইয়া দেখেন, সেই গৃহে আলিপানা দেওয়া হইয়াছে। গৃহিণী ও তাঁহার কন্যাগণ এক জনের পর এক জন আসিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিয়াছিলেন। উক্ত মহিলারাই যত্নপূর্ব্বক রন্ধন করিয়াছিলেন।

একদা আমাদের একজন প্রচারক বন্ধু রাজশাহী জিলার অন্তর্গত পুঁটিয়া গ্রামে গিয়াছিলেন। সেইগ্রামে স্বর্গগতা মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর বাসস্থান। তাঁহার বহির্ভবনে উক্ত প্রচারক বন্ধুর বক্তৃতা হইয়াছিল। একদিন মহারাণী ৪০।৫০ প্রকার নিরামিষ ব্যঞ্জনাদি উপকরণে তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। পাচক ব্রাহ্মণ রূপার থালা ও বাটীতে অন্ন ব্যঞ্জন পরিবেশন করিবার সময় ২।৩ টি ব্যঞ্জন নির্দ্দেশ করিয়া বন্ধুকে বলিয়াছিলেন এই কয়েকটি ব্যঞ্জন মহারাণী স্বয়ং কুটন কুটিয়া আপনার জন্য রন্ধন করিয়াছেন। এতদপেক্ষা অতিথির প্রতি অধিক আদর আর কি হইতে পারে? এক জন মহামান্যা মহারাণী নিজে কুটন কুটিয়া রন্ধন করিয়া একজন সামান্যাবস্থাপন্ন অভ্যাগতকে খাওয়াইলেন, ইহা সামান্য কথা নহে। ইহাতে অভ্যাগত জনের পক্ষে গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং মহারাণীর হৃদয়ের উচ্চতা উদারতা ও মহত্ত্ব অতিশয় প্রকাশ পাইয়াছে।

কোন সময়ে আমরা পুটিয়া গ্রামে মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী শ্রীসুন্দরী দেবীর আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম। শ্রীসুন্দরী দেবী পিতৃপরিত্যক্ত সমুদায় সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছেন। তাঁহার জমীদারীর উপস্বত্ব ৩০।৩৫ হাজার টাকা। তিনি পিতৃগৃহে বাস করেন, তাঁহার স্বামী কালীরঞ্জন লাহিড়ী মহাশয় বিবাহের পর হইতে শ্বশুরালয়বাসী হইয়া আছেন। লাহিড়ী মহাশয় আমাদের পূর্ব্বপরিচিত লোক সেই পরিচয়সূত্রেই আমরা সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। মধ্যাহ্নিক ভোজনের জন্য তিনি আমাদিগকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া

লইয়া যান। ভোজনের আসনে উপবিষ্ট হইলে নানা প্রকার ব্যঞ্জনোপকরণ ও পিষ্টক পায়স মিষ্টান্নাদি আমাদের সম্মুখে আনিত হয়। গৃহ কর্ত্রীর অল্প বয়স্কা কন্যা পরিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, "সমস্ত ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি আমার পত্নী স্বয়ং প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি স্থূলাঙ্গী হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া লজ্জাবশতঃ সম্মুখে আসিয়া পরিবেশন করিতে পারিলেন না।" আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের প্রতি সেই মহাসম্ভ্রান্ত মহিলার আদর যত্ন দেখিয়া আমরা নিতান্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়াছিলাম।

ময়মনসিংহ নগরের অনতিদুরবর্ত্তী মুক্তাগাছাতে ধনী সম্ভ্রান্ত বহু জমিদার বাস করেন। রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী তন্মধ্যে প্রধান। একদা আমরা তত্রত্য অন্যতর ভূমাধিকারী বাবু কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরীর গৃহে অতিথি হই। চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আমাদেব বিশেষ আলাপ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিল, তখন তিনি স্থানান্তরে ছিলেন, গৃহে তাঁহার পত্নী স্থিতি করিতেছিলেন। ভোজনের সময় দেখি স্বয়ং গৃহিণী অন্ত.পুর হইতে অন্নব্যঞ্জন বহন করিয়া বহিঃপ্রকোষ্ঠে আমাদিগকে পরিবেশন করিতে উপস্থিত। অন্য সময় মুক্তাগাছায় অপর এক জমীদার বাড়ীতে আমরা উপস্থিত হইয়াছিলাম। গৃহস্বামী পরলোক প্রাপ্ত, গৃহিণীর হস্তে সমুদায় সম্পত্তির কর্ত্তৃত্ব, তাঁহার ভ্রাতা সেই গৃহে বাস করিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা বন্ধুতা ছিল। সেই বন্ধুতাসূত্রে আমরা তাঁহার নিকটে গিয়াছিলাম। অপরাহ্নে যাইয়া এক রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম। রাত্রি আহারের জন্য অন্তঃপুর হইতে বহুবিধ ব্যঞ্জনোপকরণ সহ অন্ন অমাদের নিকটে প্রেরিত হয়। তখন জমীদার পত্নীর ভ্রাতা বলিলেন, আমার ভগিনী স্বয়ং এ সকল প্রস্তুত করিয়াছেন কাল একাদশীর উপবাস গিয়াছে, শরীর দুর্ব্বল ছিল বলিয়া ব্যঞ্জনাদির অধিক আয়োজন করিতে পারেন নাই।" আমরা সেই সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের মহিলার আমাদের ন্যায় সামান্য অতিথির প্রতি ঈদৃশ আদর সৌজন্যে যাহার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম।

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত শেরপুরের কোন কোন ভূম্যধিকারী আমাদের বিশেষ আত্মীয় বন্ধু। কিয়ৎকাল হইল আমরা তথায় যাইয়া অন্যতর ভূমাধিকারীর আলয়ে আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলাম, বিদায় হইয়া চলিয়া যাইবার সময় তিনি একটি থালা পূর্ণ মিষ্টান্ন আমাদের নিকটে উপস্থিত করেন, আমরা অসময় বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করি। জমীদার বাবু কয়েক প্রকার মিষ্টান্ন নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, "বাড়ীর মেয়েরা যত্নপূর্ব্বক আপনাদের জন্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন, আপনারা গ্রহণ না করিলে তাঁহাদের মনে কষ্ট হইবে।" সেই সম্ভ্রান্ত মহিলাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমাদিগকে অগত্যা অনিচ্ছার সহিত সেই সকল মিষ্টান্নের স্বাদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। রাত্রিতে আমরা তত্রত্য অন্য একজন

ভূম্যধিকারী বাবুর গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। সেই জমীদার বাবুর সহধর্ম্মিণী মাননীয়া গৃহিণী বিবিধ ব্যঞ্জন মিষ্টান্নাদি উপকরণযুক্ত অন্ন আমাদিগকে স্বয়ং পরিবেশন করিয়া দেন। জমীদার বাবু উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, "আমার পত্নী এ সকল নিজে প্রস্তুত করিয়াছেন। মহিলা পত্রিকায় যে সকল নূতন নূতন আচার ও চাটনী ইত্যাদি প্রস্তুতির প্রণালী সময়ে সময়ে লিখিত হয়, ইনি উক্ত প্রণালী অনুসারে সে সকল প্রস্তুত করিয়া থাকেন।" পরিবেশিত দুই একটি চাটনী লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মহিলা পড়িয়া ইনি ইহা প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছেন।"

এক্ষণ এ প্রদেশের অনেক সামান্যাবস্থাপন্ন পরিবারের গৃহিণীদেরও রন্ধন পরিবেশনাদির সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক নাই। তাঁহারা এ কার্য্যকে নীচ কার্য্য মনে করেন। উড়ে ব্রাহ্মণ বা বাবুর্চির উপর এ কার্য্য সম্পাদনের ভার সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত। আতিথ্য সৎকারে নব্য শ্রেণীর অনেক গৃহিণীরই অত্যন্ত উপেক্ষা অনাদর। অনেক পাচক ব্রাহ্মণ রন্ধনে এরূপ অপটু যে কোন২ সময় তাহাদের প্রস্তুত ডাল ডালনা ইত্যাদি তিক্ত ঔষধের ন্যায় গলাধঃকরণ করিতে হয়, আহার করিতে বসিয়া যেন চক্ষে জল আইসে। গৃহিণী দয়া করিয়া যদি সময়ে সময়ে দুই একটি ব্যঞ্জন রন্ধন করেন, খাইয়া তৃপ্ত হওয়া যায়। অনেক স্থলে সেই দয়া লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, একজন কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত গৃহস্বামীর জন্য পাচক ব্রাহ্মণ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া বহির্ভবনে আনিয়া দিয়া গিয়াছে, বাবুর ভাল খাওয়া হইল কি না গৃহিণী তাহার সংবাদও লন নাই। এমন অবস্থায় গৃহিণী দ্বারা আতিথ্যসৎকার আর কি হইতে পারে?

আমরা ভাল খাইতে চাহি, প্রবাসে কোন বন্ধুর আলয়ে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে বাড়ীর মহিলারা উওমরূপে আহার যোগাইয়া আমাদের সেবা করেন, সেই উদ্দেশ্যে আমরা এ সকল কথা লিখিতেছি ইহা মনে করিয়া অনেকে অতি লোভী, অত্যাচারপ্রিয় বলিয়া আমাদের নিন্দা করিতে পারেন, পারেন কেন মনে হয় নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা জানি, আমরা এ বিষয়ে নির্দ্দোষী। ভাল খাইবার ও ভাল সেবা পাইবার কোন প্রত্যাশা করি না। আমরা নব্যদিগের প্রিয় সামগ্রী মাটন ফাউল ও কালিয়া কোর্ম্মার বিরোধী, মৎস্য মাংস স্পর্শ করি না, খাদ্য দ্রব্যের আড়ম্বর দেখিলে অতিশয় কষ্ট বোধ করি। সামান্য ডাল ডালনা বা আলু ভাতে সিম ভাতে সাত্বিক ভাবে পাইলে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া থাকি। তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে আমাদের কষ্ট হয়। আর উড়ে বা হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের হস্তে প্রস্তুত পাচনের মত বিস্বাদ ব্যঞ্জনের স্বাদ গ্রহণে আমাদের কণ্ঠাগতপ্রাণ হয়। ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদিগের রন্ধনপ্রিয়তা ও আতিথ্যসৎকারানুরাগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এজন্য এস্থলে প্রদর্শন করা হইয়াছে। সামান্যাবস্থাপন্ন মহিলাগণ যাঁহারা

এ বিষয়ে একান্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করেন ও নীচ কার্য্য মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা যেন মনে করিতে পারেন, উহা নীচ কার্য্য নয়, মহৎ কার্য্য, পুণ্য কার্য্য; এ জন্যই আমরা লিখিলাম, নিজে সেবা পাইবার ও ভাল খাইবার জন্য নয়।

রন্ধন-নৈপুণ্য গৃহিণীর একটি প্রধান গুণ, কোমলপ্রকৃতি মহিলাদের পর-সেবা বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট পরম ধর্ম্ম, সে বিষয়ে মহিলাদিগের উপেক্ষা দেখিলে আমাদের মনে বড় ক্লেশ হয়। অনেক পরিবারে এমন পবিত্র কার্য্য উড়ে বামুন ও বাবুর্চ্চি খানসামার এক চেটিয়া হইয়া অপবিত্র হইতেছে, ইহা আমাদের বিশেষ শোকের বিষয়।

শিশুশিক্ষা ও জননী।

শিশুশিক্ষা বলিতে কেহ মদনমোহন তর্কলঙ্কারের শিশুশিক্ষা পুস্তকের পুনরালোচনা মনে করিবেন না। শিশুর শিক্ষা কি প্রণালীতে হওয়া উচিত তাহারই আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষে যেমন শিশুশিক্ষা প্রণালী অবগত হওয়া প্রয়োজন, শিশুর সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শিক্ষক জননীর পক্ষে তাহা অধিকতর পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে যে শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং পাঁচ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত যে শিক্ষা চলিতে থাকে, সে শিক্ষা জননী ভিন্ন আর কেহ বিধান করিতে পারে না, এবং এই শিক্ষাই মনুষ্যের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি সুতরাং জননীর দায়িত্ব অতি গুরুতর। সন্তান প্রসব অপেক্ষা সন্তান পালন ও শিক্ষাদান অতিশয় গুরুতর ও উচ্চতর ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য জননীদের শিক্ষা ও প্রস্তুতির যেরূপ প্রয়োজনীয়তা আছে, দুঃখের বিষয় তাহা সকল জননী সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করেন না, এবং আমাদের দেশের স্ত্রীশিক্ষার ইহা একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ বলিয়াও বিবেচিত হয় না। জননীদিগের এবং শিশুদের কল্যাণাকাঙ্ক্ষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা নিম্নে শিশু শিক্ষার কতিপয় গুরুতর তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শারীর-মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন প্রথম সাত বৎসর পর্য্যন্ত শিশুদের শরীর ও মন যেরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়, ইহার পরে আর সেরূপ হয় না। বালকদের মস্তিষ্কের ওজন এই সময়ে ৪০ আউন্স অর্থাৎ সওয়াসের পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। তৎপর সপ্তম ও চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে কেবল মাত্র ৫ আউন্স অর্থাৎ আড়াই ছটাক মাত্র বৃদ্ধি হয়, এবং চতুর্দ্দশ হইতে বিংশতি বৎসরের মধ্যে আরো কম পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এক বৎসর বয়স হইতে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত শিশুর জ্ঞানস্পৃহা যেমন বলবতী তেমন শিক্ষণীয় এত বিষয় তাহার আয়ত্ত হয় যে বড় হইয়া বিদ্বান্ ও পণ্ডিত বলিয়া যখন লোকপূজ্য হয় তখনও এত অল্প সময়ের মধ্যে তত বিষয় আয়ত্ত করিতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শিশুশিক্ষা

প্রকৃষ্ট সময়ে শিশু মাতৃক্রোড়ে ও গৃহ পরিবারে অবস্থিতি করে। এই সময়কার শিক্ষা যদি সুন্দররূপে ও যথা নিয়মে পরিচালিত না হয় তাহা হইলে, সমুদয় পরবর্ত্তী জীবনে তাহার মন্দ ফল ভোগ করিতে হয়। জননীদের জানিয়া রাখা উচিত যে, ক্রীড়াক্ষেত্র শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। খেলা ধূলার ভিতর দিয়া শিশু জগতের অনেক গভীর তত্ত্ব অবগত হয়। শিশু সাহিত্য ও ব্যাকরন অধ্যয়ন না করিয়াও বিশুদ্ধরূপে কি ভাষা ব্যবহার করে না, বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা নাও শুনিয়া কি অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করে না? এই শিক্ষাত পুঁথি কণ্ঠস্থ করিয়া লাভ হয় না। চক্ষু কর্ণ ও হস্ত পদাদি ব্যবহার করিয়াই ইহা লাভ হয়, এই জন্যই তত্ত্বদর্শী বালিয়ান নামক ইংরেজ গ্রন্থকার বলিয়াছেন, মানবাত্মা নামক প্রসিদ্ধ নগরের পাঁচটি সিংহদ্বার আছে, যথা দর্শনদ্বার, শ্রবণদ্বার, আঘ্রাণদ্বার, আস্বাদনদ্বার ও স্পর্শদ্বার। এই পাঁচটি দ্বার দিয়া জ্ঞানভাব প্রভৃতি সর্ব্বদা এই নগরে যাতায়াত করিতেছে। এই সকল দ্বার খোলা না রাখিলে মানব জ্ঞানলাভে অক্ষম। প্রকৃতি এই বন্দোবস্ত করিয়া শিশুশিক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রণালীর অনুসরণ না করিয়া যদি নিজেদের বুদ্ধি ও সুবিধার অনুসরণ করি, তবে ফল নিশ্চয়ই মন্দ হইবে। শিশু খেলার ভিতর দিয়া এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা নানা শিক্ষা লাভ করে; আমরা যদি তাহাদের খেলা বন্ধ করি, তাহাদের শিক্ষার দ্বারই রুদ্ধ করিয়া ফেলি। অনেক জননী শিশুদের খেলার বন্দোবস্ত কিংবা সাহায্য করার পরিবর্ত্তে খেলা বন্ধ করিয়া দেন, কিংবা তাহাতে ত্যক্ত বিরক্ত হন, কারণ হয়ত তদ্দ্বারা নিজেদের অনেক অসুবিধা ঘটে। তাঁহারা ইচ্ছা করেন শিশুরা গম্ভীর চিন্তাশীল লোকের ন্যায় হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে, এবং জননীদের কোন প্রকার অসুবিধা ঘটাইবে না। কিন্তু তাহারা তাহা মানিবে কেন? শিশুরা তাঁহা অপেক্ষা আর একরূপ উচ্চতর শিক্ষার নিদেশবর্ত্তী, তিনিত তাহাদিগকে বসিয়া থাকিতে দিতে চাহেন না। এখন বেচারিরা করে কি? এক জননীর আদেশ পালন কিরিতে গিয়া আর এক জননীর আদেশ অমান্য করে ও শাস্তি পায়। কিন্তু উপায় নাই। তুমি যদি বুদ্ধিমতী হও, বুঝিয়া সুঝিয়া আদেশ করিবে, নতুবা তোমার আদেশ লঙ্ঘন হইবে। শিশুরা ছুটাছুটি করিবে, কত কি ভাঙ্গিবে ও গড়িবে এই সমস্ত উৎপাতই তোমাকে সহ্য করিতে হইবে, নতুবা তাহাদের শিক্ষার ব্যাঘাত হইবে। বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ও আবিষ্কারকগণ যে এক একটা নূতন তত্ত্ব ও শক্তির আবিষ্কার করেন, কত মাল মশলা খরচ করিতে হয়, কত অর্থব্যয়ে যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করেন, কত ভাঙ্গিয়া গড়েন, তবেত একটা জ্ঞান লাভ হয়, আর শিশুরা কি আপনা হইতে সেই জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে? বস্তু ও তাহার ধর্ম্ম, কঠিন কি কোমল, তরল কি বায়বিক, জলপ্রবণ

কি ধাতুসহ ইত্যাদি গুণ জানা এবং যে সংসারে বাস করিতে হইবে সেই রাজ্যের বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা কি আপন হইতে অর্জ্জিত হইবে? আমরা হাতে খড়ি না দিতেই বিশ্বজননী তাহাদের হাতে খড়ি দিয়া শিক্ষা আরম্ভ করেন। সেই শিক্ষা মুখস্থ বিদ্যা নহে, তাহা হাতে কলমে ধূলো খেলার ভিতর, চঞ্চলতা, অস্থিরতার ভিতর দিয়া আরম্ভ হয়। সুতরাং জননীদের এই বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যে, খেলা ভিন্ন শিশু বাঁচে না, শিশুর শরীর ও মন বিকশিত হয় না, আহারের ন্যায় ইহা অত্যাবশ্যকীয় বস্তু।

আমাদের যেমন ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ঘর থাকে, তেমন ছেলেদের যদি খেলিবারও এক একটা ঘর থাকে, তাহা হইলে তাহারা স্বাধীন ভাবে তথায় খেলিতে পারে; এবং খেলার ঘর কেবল থাকিলে হইল না, খেলার নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেওয়াও আবশ্যক। এই সকল জিনিষ অল্প মূল্যের হইলে ছেলেরা ভাঙ্গিলে বিশেষ ক্ষতিবোধ হইবে না। খেলার সময় শিশুরা কত সময় কাপড় চোপড় ময়লা করিবে, আঘাত পাইবে। কিন্তু তাহা নিবারণ করিতে যাইয়া তাহাদিগের খেলা বন্ধ করিয়া দেওয়া, কিংবা সুসজ্জিত পুতুলের ন্যায় মাটি স্পর্শ করিতে না দিয়া সদা সর্ব্বদা ভৃত্যবাহনে বেড়াইতে পাঠানও সুশিক্ষার অনুকূল নহে। মনুষ্য জীবনে চিরকালই সংগ্রামের ব্যাপার। এই সংগ্রামের দ্বারা সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব উভয়েরই স্ফুরণ হয়। জয় ও পরাজয় উভয়ই শিক্ষার উপাদান। শিশু মাতৃক্রোড়েই এই সংগ্রাম আরম্ভ করে, মাতৃবক্ষে হাত পা ছুড়িয়া, লাথি মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা বাহু শক্তির প্রভাব উপলব্ধি করে, আপনার ক্ষমতা ও অক্ষমতা টের পায়; হাটিতে বসিতে চেষ্টা করিয়া কত বার দাঁড়ায়, কতবার পড়িয়া যায়, কিন্তু এইরূপ সংগ্রাম করিতে করিতে যখন জয়লাভ করে, তখন কত আনন্দ, কত উল্লাস! এই সংগ্রাম সমগ্র জীবনব্যাপী এবং মনুষ্যের জীবনের সকল বিভাগেই প্রযুক্ত। এই সংগ্রামের নিবৃত্তি মৃত্যু। সুতরাং এবংবিধ কার্য্য হইতে শিশুদিগকে বিরত করিয়া শরীর মন ও বুদ্ধিকে খোঁড়া কিংবা নিস্তেজ করা অনুচিত।

শিশু যত বড় হইতে থাকে খেলার ভিতর দিয়া শিক্ষা দানের চেষ্টা করা আবশ্যক। এই প্রণালীর শিক্ষাগুরু জার্ম্মণ দেশীয় সুপণ্ডিত ফ্রোবেল যে নূতন বিধানের উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহা জননীদের শিক্ষার বিষয়। ইহা কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। কিণ্ডার গার্টেন অর্থ শিশুর উদ্যান। ফ্রোবেল সাহেব উদ্যান সংসৃষ্ট কোন এক গৃহে প্রথম এই শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন, বস্তু দর্শন দ্বারা কৌতূহল উদ্দীপিত হইলে তাহার চরিতার্থতা সাধনই ইহার উদ্দেশ্য। পরে শিশুদের জন্য খেলা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে উপযোগী সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষককে খেলার সাথী মনে করিলে যেমন পরম বন্ধু বলিয়া মনে হয়, এবং তাঁহার শিক্ষা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করা হয়,

কঠোর শিক্ষাদাতা গুরু বলিয়া মনে হইলে শিক্ষা তেমন হৃদয়গ্রাহী হয় না। ফ্রোবেল শিশু প্রকৃতি অধ্যয়ন করিতে করিতে যে বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার শিক্ষা প্রণালীর ভিত্তি। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, শিশু যে এত অনুকরণ করে তাহার অর্থ সে যাহা অনুকরণ করে তাহা বুঝিতে চাহে। সে চক্রবৎ ঘূর্ণায়মাণ হয়, কুকুরের ন্যায় শব্দ করে, গাভীর ন্যায় হম্বারব করে, মেষের ন্যায় ভ্যা ভ্যা করে, ইঁদুরের ন্যায় হামাদেয়, পাখীর ন্যায় উড়িতে যায়, বিড়ালের ন্যায় লাফায় এবং কাঠবিড়ালির ন্যায় গাছে চড়ে। অজ্ঞাতসারে সে মনে মনে ভাবে আমি ইহার প্রত্যেকটি হইয়া দেখিব ও বুঝিব,তাহারা কিরূপ। এই জন্য তাঁহার বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষা খেলা। এই খেলার ভিতর দিয়া কত কি গড়া হইতেছে, কত ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর আকৃতি ও স্বভাবের পরিচয় হইতেছে, কত ব্যবসায় বাণিজ্যাদি চতুর্দ্দিকস্থ ব্যাপারের অভিনয় হইতেছে, পদার্থতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব শিক্ষা হইতেছে। সকলই সাধারণ বস্তু ও খেলার ভিতর দিয়া শিক্ষা হইতেছে। এই শিক্ষা গৃহে হইলেই ভাল; কারণ আমাদের দেশে এই প্রণালীর বিদ্যালয় দুর্লভ; সুলভ হইলেও শিক্ষকের অভাব। ইয়ুরোপ আমেরিকায় এই সকল শিক্ষার ভার মহিলাদের উপর। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী জননীর ন্যায় আদর যত্ন করিয়া শিশুদিগকে শিক্ষা দান করেন, অথচ আমরা গৃহে আসল জননীর নিকটই আদর যত্নের ভিতর দিয়া শিক্ষালাভে বঞ্চিত হই। ইহার কারণ জননীদের শিক্ষা ও চিন্তাশীলতার অভাব।

এতক্ষণ আমরা যাহা বলিয়া আসিলাম তাহাতে প্রতিপন্ন হইল চঞ্চলতা ও খেলায় অনুরাগ শিশুস্বভাবের বিশেষত্ব। সুতরাং তাহাদের শিক্ষাদান সময়ে এই কথা মনে রাখিতে হইবে, এই জন্য শিশুদিগকে এক সঙ্গে অধিকক্ষণ পড়িতে দেওয়া অনুচিত। যাঁহাদের গৃহে বেতনভোগী শিক্ষক নিযুক্ত আছে, তাঁহারা অনেক সময় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত শিশুদিগকে শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিয়া ভাবেন শিক্ষার উত্তম বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু এদিকে শিশুরা যে ভাবে, শিক্ষকরূপী ভূত কবে তাহাদের স্কন্ধ হইতে নামিবে আর তাহারা নিষ্কৃতি পাইবে, তাঁহারা সেই খবর রাখেন না। যদি নিজেরা স্বয়ং লেখা পড়ার ভার নিয়া থাকেন, তাহা হইলে অল্পক্ষণ পড়াইয়া ছাড়িয়া দিবেন, কিন্তু যখন পড়াইবেন তখন সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়া পড়াইতে হইবে। অনেকে এক সঙ্গে শিশুকে পড়ান ও গৃহস্থালীর অন্য কার্য্যও করেন, শিশুর মন চঞ্চল হইয়া পড়ে, জননী দৃষ্টি রাখিতে পারেন না, 'পড়' 'পড়' বলিয়া চেঁচাইতে থাকেন, অথচ তাঁহার মন তখন অন্যদিকে। এইরূপে শিশুদের অমনোযোগিতা দোষ উৎপন্ন হয় এবং এই দোষের জন্য শিক্ষক কিংবা শিক্ষয়িত্রীই সম্পূর্ণ দায়ী। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের একত্র মনোযোগ দ্বারা যে শিক্ষা ১৫ মিনিটে সম্পন্ন হইবে,মনোযোগের শিথিলতায় তাহা

আধ ঘণ্টায়ও হইয়া উঠিবে না। আমরা দেখিয়াছি অনেকে অন্য কাজে নিযুক্ত, শিশু সম্মুখে বসিয়া পড়িতেছে, ৫।৭ মিনিট পরেই তাহার মন বিক্ষিপ্ত হইল, আর পড়ায় মনোযোগ নাই, সুতরাং পড়া ভুলিয়া যাইতেছে, শিক্ষক ধমক দিতেছেন, সে আবার পড়া আরম্ভ করিতেছে; কিন্তু তিনি শেলাই কিংবা পুস্তক পাঠে নিমগ্ন। আবার যখন শিশুর ভুল হইতেছে, তাঁহার রাগ হইতেছে, হয়ত উত্তম মধ্যম প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইতেছেন। এইরূপ শিক্ষয়িত্রীর হস্ত হইতে শিশুকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহারা শিশুশিক্ষা নিজের অন্য দশ কাজের মধ্যে এক কাজ বলিয়া উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না, তাঁহারা শিশুর শিক্ষাদানে সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

প্রাপ্ত।

শিশুদিগের দন্তোদ্গম।

যদিও শিশুদিগের দাঁত উঠা মানব জাতীর কেশ ও নখ বৃদ্ধি এবং গোঁপ উঠার ন্যায় স্বাভাবিক ক্রিয়া এবং সহজে ও নির্ব্বিঘ্নে সম্ভাবিত হওয়া উচিত, কোন অবোধগম্য কারণ বশতঃ সভ্য সমাজে অন্যান্য অনেক স্বাভাবিক ক্রিয়ার বিকৃতির ন্যায় ইহাও বিকৃত হইয়া সময়ে সময়ে কঠিন রোগ ও কষ্টের কারণ হইয়া থাকে এই জন্য শিশুদিগের প্রথম দাঁত উঠিবার সময় হইলে বিশেষ সতর্কতার সহিত তাহাদিগকে রক্ষা করা আবশ্যক।

সচরাচর ছয় কিংবা সাত মাস বয়ঃক্রম কালে শিশুদিগের প্রথম দন্তোদ্গম হইয়া থাকে, এবং দুই বৎসরের মধ্যেই সমুদায় দুধের দাঁত বহির্গত হয়। "দুধের দাঁত" উপরে দশটী এবং নীচে দশটী হইয়া থাকে, এবং সাধারণতঃ পর পর নিম্ন লিখিতরূপে বহির্গত হয়।

১। সম্মুখে মধ্যস্থকর্ত্তনকারী দাঁত।
নীচে—ছয়মাস কালে।
উপরে—সাতমাস কালে।

২। সম্মুখে—পার্শ্বস্থ কর্ত্তনকারী দাঁত।
উপরে—নয়মাস কালে।
নীচে—দশমাস কালে।

৩। পার্শ্বে—প্রথম চর্ব্বণকারী দাঁত।
উপরে ও নীচে—বারমাস কালে।

৪। পার্শ্বস্থ কর্ত্তনকারী দাঁতের অব্যবহিত পরে স্থিত, ছেদনকারী দাঁত।
উপরে ও নীচে—আঠার মাস কালে।

৫। পার্শ্বে—দ্বিতীয় চর্ব্বণকারী দাঁত।
উপরে ও নীচে—দুই বৎসর কালে।

সময়ে সময়ে উপরিলিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দেখা যায়, এমন কি কোন কোন শিশু দুই চারিটি দাঁত লইয়াও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, কোন কোন শিশুর বা দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত দন্তোদ্গমন হয় না। বর্ত্তমান লিখক একবার একটি সম্পূর্ণ দন্তহীন চারিবৎসরের শিশুকে দেখিয়াছিলেন। এই শিশুর চারি বৎসর হইতে সাত বৎসরের মধ্যে বিনা ক্লেশে সমুদায় দাঁতই বহির্গত হয়, এবং এই দাঁতই তাহার স্থায়ী দাঁত হয়। ইহার "দুধের দাঁত" একেবারেই হয় নাই।

দাঁত উঠিবার সময়ে প্রায় সকল শিশু-রই ন্যূনাধিক শরীর অসুস্থ হইয়া থাকে। কাহারও কোন কোন দাঁত উঠিবার সময়ে মাত্র অসুখ হয়, কাহারও প্রত্যেকটী দাঁত উঠিবার সময়েই অসুখ হইয়া থাকে। কাহারও সামান্য মাত্র অসুখ হইয়াই কষ্ট শেষ হইয়া যায়, কাহারও বা সামান্য অসুখ ক্রমশঃ পীড়ায় পরিণত হইয়া জীবলীলা সাঙ্গ হয়।

দাঁত উঠিবার সময় উপস্থিত হইলে সচরাচর নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হয়। দন্ত মূলের (মেড়ের) ঈষৎ স্ফীতি এবং কখন কখন বেদনা কখন বা সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ জ্বরভাব কখন বা উদরাময়, কখন জ্বর ও উদরাময় উভয়েই এক সঙ্গে উপস্থিত হয়। অধিকাংশ শিশুরই ইহার অধিক আর কোন কষ্ট হয় না এবং স্ফীত দন্তমূল বিদীর্ণ করিয়া দন্ত বাহির্গত হওয়া মাত্র উপরিলিখিত সমুদায় লক্ষণগুলি তিরোহিত হইয়া যায়। দন্তমূল স্ফীত হইবার পর শীঘ্র দন্ত বহির্গত না হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত আনুষঙ্গিক লক্ষণগুলি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া সামান্য জ্বর কঠিন অবিরাম ও অত্যুত্তাপবিশিষ্ট জ্বরে এবং সামান্য উদরাময় দীর্ঘকালব্যাপী ও যন্ত্রণাদায়ক রক্তামাশয়ে পরিণত হইতে পারে। জ্বরের উত্তাপ অধিক (১০৪।১০৫) হইলে "তড়কা" (Convulsion) উপস্থিত হয়। এই "তড়কা" দেখিতে অতিশয় ভয়ঙ্কর, এবং একবার আরম্ভ হইলে কখন কখন অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। পরিবার মধ্যে কোন শিশুর তড়কা (Convulsion) উপস্থিত হইলে কিছু দিনের জন্য যেন গৃহস্থালী উশৃঙ্খল হইয়া যায়। সকলেই ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে এবং কি করিবে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া ছুটো ছুটী করিতে থাকে। স্ত্রীলোকের রোদনধ্বনি পুরুষের হাঁকা হাঁকি ডাকা ডাকি ও সকলের ছুটোছুটীতে গৃহ কোলাহলময় হইয়া উঠে। সকলের আহার নিদ্রা বন্ধ হয়। এইরূপ ভীষণ রোগের একটু বিশেষ বিবরণ এখানে দেওয়া আবশ্যক। মনে কর শিশুর কয় দিন হইতে একটু একটু জ্বর হইতেছে, দাঁত উঠিবার সময় হইয়াছে, এবং কোন স্থানের মেড়েগুলি একটু একটু ফুলিয়াছে। শিশু কোন অদৃশ্য ও অবোধ্য কারণে মধ্যে মধ্যে কাঁদিতেছে, বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিতেছে এবং একশবারই মুখে হাত দিতেছে। স্তন্য পান করিতে করিতে কখন ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, কখন স্তনাগ্রভাগ দন্তহীন চোয়াল দ্বারা দংশন করিবার চেষ্টা করিতেছে। নিদ্রিতাবস্থায় কখন কখন কাঁদিয়া উঠিতেছে, এবং বারংবার মাথাটী এপাশ ওপাশ করিতেছে, জ্বরের উত্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। অকস্মাৎ শিশুর মুখ বিবর্ণ রক্তহীন ও সাদা হইল, চক্ষু দুটী উপরের দিকে উল্টাইয়া গেল। শিশু সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন, প্রথমে চক্ষের পাতাগুলি কাঁপিতে লাগিল, পরে মুখের সমুদায় মাংসপেশীগুলি দ্রুতবেগে কাঁপিতে ও নানা দিকে নানাভাবে আকর্ষিত হইতে লাগিল। শিশুর মুখের বিকৃত ভঙ্গি দেখিয়া অনেক মাতাকে এই সময়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িতে দেখা

যায়। ক্রমশঃ সমস্ত শরীরটি কঠিন হইয়া গেল হাতের অঙ্গুলীগুলি মুষ্টিবদ্ধ হইল। এই সমুদায় লক্ষণগুলি প্রকাশ হইতে এক মিনিট সময়ও লাগে না। সচরাচর দুই তিন মিনিট এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া পুনর্ব্বার শিশুর দেহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং শিশু সংজ্ঞালাভ করিয়া রোদন করিতে থাকে কিংবা দুর্ব্বল হইলে কিয়ংক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে। এইরূপ তড়কা কখন উপর্য্যুপরি বারংবার হইতে দেখা যায় এবং দুই তিন মিনিটের অধিক কালও স্থায়ী হয়। কখন কখন আক্ষেপ (খিচুনী) শেষ হইয়া গেলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শিশুকে অর্দ্ধসংজ্ঞাহীন ও নির্জীব অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। তড়কা বারংবার ও দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে শেষ শিশুর অর্দ্ধাঙ্গ রোগ হইয়া জন্মের মতন খোঁড়া বা হাবা বা উভয়ই হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ হওয়া নিতান্ত বিরল নহে। লেখক এরূপ অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন। কখন কখন বার কতক উপর্য্যুপরি তড়কা (Convulsion) হইয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যেই শিশুর জীবনলীলা সাঙ্গ হয়। কখন বহুকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন, কিংবা মধ্যে মধ্যে এরূপ হইয়া ক্রমশঃ শিশু দুর্ব্বল হইয়া মারা যায়, কিংবা খোঁড়া বা হাবা হইয়া বাঁচিয়া থাকে। জ্বর অধিক দিন থাকিলে ফুস্‌ফুসের প্রদাহ (Pneumonia) হইতে দেখা যায়। ইহাতে জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে উৎকট কাসি এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হইয়া শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অবস্থাটী উত্তমরূপে মাতা ও গৃহিণীদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া পুনর্ব্বার সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। দন্তোদ্গমনের সময়ে শিশুর নিম্নলিখিত কঠিন পীড়া হইতে দেখা যায়।

১। অবিরাম জ্বর।

২। উদরাময়।

৩। রক্তামাশয়।

৪। তড়কা।

৫। ফুস ফুস প্রদাহ (নিউমনিয়া) বা জ্বর কাসি।

ইহার প্রত্যেকটিই যথাসময়ে এবং উত্তমরূপে চিকিৎসিত না হইলে সাজ্ঘাতিক হইবার সম্ভাবনা।

সামান্যমাত্র অভিজ্ঞতা থাকিলেই মাতা ও গৃহিণীরা আপন আপন সন্তানের এই সমুদায় রোগ নিবারণ কিংবা যাহাতে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি না হয় তাহা করিতে পারেন। নিম্নে তাহার উপায় বলা যাইতেছে।

১। শিশুর দন্তোদ্গমন সময় উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ দুই মাস বয়ঃক্রম হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাহার সম্মুখের উপর ও নীচের মেড়েগুলি মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিতে থাকিবে। মেড়ে যদি দেখিতে ঈষৎ স্ফীত ও হাতে পূর্ব্বাপেক্ষা বা নিকটস্থ মেড়ে অপেক্ষা কঠিন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তবে বুঝিবে যে দাঁত উঠিতেছে। শিশুরা স্বভাবতই এই সময়ে যে কোন দ্রব্য হাতে দেওয়া যায় তাহা মুখে দিয়া চর্ব্বণ করিবার চেষ্টা করে। ইহা প্রকৃতির আশ্চর্য্য ইঙ্গিত, এই জন্য কাষ্ঠের বা রব্বারের

এইরূপ খেলনা তাঁহার হাতে দেওয়া উচিত যাহা চর্ব্বণ বা দংশন করিবার চেষ্টা করিতে করিতে দাঁতের মেড়ে ক্রমশঃ ঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া বিনা কষ্টে বিদীর্ণ হইয়া দন্ত বহির্গত হইতে পারে। নখের পশ্চাদ্ভাগ দ্বারা সময়ে সময়ে ঘর্ষণ করিয়া দিলেও সহজে দন্ত বহির্গত হইতে পারে। কেহ কেহ লবণ বা মিশ্রির দ্বারা ঘর্ষণ করিতে উপদেশ দেন, পূর্ব্বোল্লিখিত উপায় নিষ্ফল হইলে ইহা করা মন্দ নহে। এই সকল সহজ উপায় ব্যর্থ হইলে এবং শিশুর শরীর অসুস্থ হইতেছে দেখিলে অর্থাৎ জ্বর বা পেটের অসুখ উপস্থিত হইলে ডাক্তারের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। ডাক্তারেরা এইরূপ অবস্থায় দাঁতের মেড়ে অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া দিয়া থাকেন, কিন্তু অস্ত্রের দ্বারা কাটিয়া দেওয়াই সকল সময়ে সুবিধাজনক হয় না, অনেক সময়ে পরিষ্কার অস্ত্রের কাটাটী কাটার অব্যবহিত পরেই জুড়িয়া যায়। নখের অগ্রভাগ দ্বারা চিরিয়া দেওয়াই ভাল। নখাগ্রভাগ দ্বারা ভালরূপে চিরিয়া একেবারেই দাঁতের অগ্রভাগটী বহির্গত করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয় কিন্তু শিশুর যদি তাহাতে কষ্ট হয় (কষ্ট অতি সামান্য মাত্র) দুই তিন দিন একটু একটু করিয়া চিরিয়া দিলেও হইতে পারে। ইহা শিশুর মাতা আপনিও করিতে পারেন, যদি তাঁহার সাহস না হয়, পিতা নিশ্চয়ই করিতে পারেন। লেখক অনেক পিতা ও মাতাকে ইহা করিতে শিখাইয়াছেন। এইরূপ উপায়ে দন্ত বহির্গমন সাহায্য করিয়াও যদি দুই তিন দিবসের মধ্যে শিশুর অসুস্থতা নিবারণ না হয় তবে তাহাকে রীতিমতে ডাক্তারের চিকিৎসাধীন করিবে। যে স্থলে শীঘ্র উপযুক্ত চিকিৎসক পাওয়া সম্বন্ধে অসুবিধা আছে সে স্থলে ডাক্তারের আগমন পর্য্যন্ত নিম্নলিখিতরূপ চিকিৎসা হইতে পারে।

জ্বর—এলোপ্যাথিক টিংচর একোনাইট একফোঁটা চার চামচে ৮ চামচে জলে মিশ্রিত করিয়া তাহার এক এক চামচে তিন তিন ঘণ্টান্তর দিবে। কিংবা হোমিওপ্যাথিক একোনাইট ৩ (তৃতীয় ডাইলিউসন) এক ফোঁটা—৪ চামচে জলে মিশ্রিত করিয়া তাহা ঐরূপে দিবে। জ্বরের উত্তাপ অধিক হইলে, (১০৩ কি ততোধিক) কিংবা শিশু অস্থির হইলে মাথা এপাশ ওপাশ করিতে আরম্ভ করিলে মাথায় শীতল জলের পটি দিয় তাহা সর্ব্বদা সিক্ত রাখিবে, এবং হোমিওপ্যাথিক বেলেডোনা (তৃতীয় ডাইলিউসন) এক চতুর্থ ফোঁটা ১৫।২০ মিনিট অন্তর খাইতে দিবে। ইহাতে তড়কা হইবার সম্ভাবনা নিবারিত হইবে। যদি তড়কা উপস্থিত হয় তবে শিশুর পা দুটী গরম জলে রাখিয়া মাথায় ধীরে ধীরে শীতল জল ঢালিবে। শীতল জল যাহাতে গায়ে পতিত না হয় তদ্বিষয়ে সাবধান হইবে, গায়ে সর্দ্দি লাগিলে ফুস ফুসে প্রদাহ হইবার সম্ভাবনা।

পেটের অসুখ। যদি বারংবার স্বাভাবিক বর্ণ বিশিষ্ট পাতলা বাহ্য হয়, বেল শুঁঠো জলে সিদ্ধ করিয়া জলটা খুব লাল হইলে তাহা একটু মধুর দ্বারা মিষ্ট করিয়া চার চামচে এক এক চামচে প্রতি এক বা

দুইবার বাহ্যের পর খাইতে দিবে। শিশু যদি গাভী কিংবা ছাগ দুগ্ধ পানে অভ্যস্ত হইয়া থাকে তবে দুধ জ্বাল দিবার সময়ে তাহাতে বেলশুঁঠো দিয়া জ্বাল দিবে, দুধ ঈষৎ লাল হইলেই বেলশুঁঠোর পরিমাণ ঠিক হইয়াছে মনে করিবে, কিছু অধিক হইলে ক্ষতি হইবে না। যদ্যপি বাহ্য সবুজবর্ণ ও টকগন্ধ বিশিষ্ট হয় তবে হোমিও-প্যাথিক কেমোমিলা ষষ্ঠ ডাইলিউসন, দুই দুই ঘণ্টান্তর দিবে, ছয় মাত্রা ঔষধ দেওয়ার পরও যদি কোনরূপ উপকার দেখা না যায় তবে কেলকেরিয়া করব ষষ্ঠ ডাইলিউসন দুই দুই ঘণ্টান্তর দিবে।

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

শিলচর।

সন্ধ্যার পর মেঘের মহঘটা হইল, এবং ঝড় হইতে লাগিল। শুনিয়াছি ইতিপূর্ব্বে চাঁদপুরে ঝড়ের বেগে ট্রেণ উল্টে পড়ে ছিল। সেদিন তদ্রূপ প্রবল ঝটিকা না হইলেও নিতান্ত দুর্ব্বল নহে। কিয়ৎ-ক্ষণ ঝড় হইয়া গেলে মুষল ধারায় বারি বর্ষণ হয়। সুনিদ্রায় নিশা যাপন করা গেল। প্রাত.কালে গাত্রোত্থান করিয়া দেখি রেলের উভয় পার্শ্বে ভূমি জলমগ্ন। আমি বেলা ৭টার সময় শিলচরে পহু-ছিলাম, ষ্টেশনে এক খানা গাড়ী বা একটি লোক দেখিতে পাইলাম না। অগত্যা একটি মুটের মস্তকে ব্যাগ ইত্যাদি স্থাপন করিয়া ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র সেনের আবা-সাভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলাম। কিয়-দ্দূর গমন করিলে পর সতীশচন্দ্র এবং তত্রত্য ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা আমার উদ্দেশ্যে একটি মুটে সহ ষ্টেশনে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সতীশ চন্দ্রের আবাসে যাওয়া গেল। তাঁহারা বলিলেন, এখানে ১২ দিন যাবৎ ঝড় বৃষ্টি হইতেছে, এই সময়ে কোন বৎসর এরূপ ব্যাপার হয় না। পরে শুনা গেল, তজ্জন্য আসামের ডাক আসিতেছে না। বদরপুর হইতে গোহাটী গমনের রেলপথ ঝড় বৃষ্টিতে অনেক দূর ধসিয়া পড়িয়াছে, রেলগাড়ীর গতি বন্ধ। সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে রেলওয়ের জন্য পর্ব্বত খনন করিয়া একটির পর আর একটি প্রায় ১২। ১৪টি ছোট বড় টনেল (পার্ব্বত্য সুড়ঙ্গ) প্রস্তুত হইয়াছে। বোধ করি কোন কোন টনেল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

সেই দিন ৪ঠা বৈশাখ শনিবার সন্ধ্যার পর সতীশচন্দ্রের আবাসে ২। ৩টি বন্ধু সমাগত হন। বেলা একটার সময় কয়েক জন বালক (স্কুলের ছাত্র) আসিয়া মিলিত হয়, সেই বালকদিগের সভায় কিছু বলিতে হইয়াছিল। একটি বালক পিতৃভক্তি বিষয়ে রচনা পাঠ করিয়াছিল। সেই প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিত হইয়াছিল, ঈশ্বরের স্নেহ অপেক্ষা পিতার স্নেহ অধিক। ইহা যে তাহার বিষম ভ্রম বুঝ ইয়া দেওয়া গেল; এবং ঈশ্বরভক্তি ও পিতৃমাতৃভক্তি বিষয়ে কিছু বলা গিয়াছিল। বেলা তিন-

টার সময় সতীশচন্দ্রের গৃহে পল্লীর ৯।১০টী মহিলা সমবেত হন। সুগৃহিণী সুপত্নী ও সুমাতা-বিষয়ে আলোচনা করা গিয়াছিল। বেলা ৫টার সময় ধর্ম্মগ্রন্থ বিষয়ে বক্তৃতা করার প্রস্তাব ছিল। তখন প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হয়, অনেক ভদ্র সম্ভ্রান্ত লোক বক্তৃতা শ্রবণার্থ আসিতে উদ্যোগী হইয়াও বৃষ্টির জন্য আসিতে পারিলেন না। এই সোমবারই রাত্রি ৮৷৷টার ট্রেণে আমার কুমিল্লায় যাত্রা করা সঙ্কল্প। কোন কোন বন্ধু আরও ২।১ দিন শিলচরে থাকিবার জন্য নিতান্ত অনুরোধ করিলেন। দুঃখের বিষয় আমি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া সেই দুর্দ্দিনে শিলচরে থাকিতে পারিলাম না, যাত্রার জন্যই প্রস্তুত হইলাম। সন্ধ্যার পর ঝড় বৃষ্টি হইতে লাগিল, ষ্টেশনে যাত্রা করার সময় উপস্থিত, এক খানা ঘোড়ার গাড়ী স্থির করা গিয়াছিল তাহা পঁহুছিতে পারিল না। আমি যাত্রায় নিরাশ হইয়া আহারান্তে শয্যা প্রসারণ পূর্ব্বক শয়ন করিবার উদ্যোগী হইলাম, এমন সময় বৃষ্টির বিরাম হইল ও গাড়ী পঁহুছিল, তাড়াতাড়ি যাত্রা করা গেল। সতীশচন্দ্র আমাকে ট্রেণে উঠাইয়া আবাসে ফিরিয়া গেলেন। ট্রেণ না ছাড়িতে ও তাঁহার বাসায় না পঁহুছিতে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সেই ট্রেণ পরদিন বেলা ১১টার সময় কুমিল্লায় পঁহুছান নির্দ্ধারিত। পূর্ব্বাহ্নে ষ্টেশনে কিছু খাবার অনুসন্ধান করা গেল। সেদেশের ষ্টেশনে ফলের মধ্যে লোণা ফল ও বাঁচে কলা এবং ছোট ছোট চাটিম কলা বিক্রয় হয় দেখিতে পাওয়া গেল, তাহা আর পয়সা ব্যয়ে খরিদ করিয়া কে খায়? একটি ষ্টেশনে রৌপ্য-মুদ্রার আকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডা পাইয়া ফেরিওয়ালার মুখে তাহার প্রশংসা শুনিয়া তিন পয়সায় দুইটি মণ্ডা ক্রয় করা গেল। আমি তাহার কিয়দংশ মুখে অর্পণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম, পয়সা তিনটি জলে বিসর্জ্জন করা হইয়াছে। উহার সঙ্গে ছানার কোন সম্পর্ক নাই, উহা বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ। আত্মীয় বন্ধুকে প্রদর্শনের জন্য আমি সেই অদ্ভুত সন্দেশের নমুনা কিছু সঙ্গে করিয়া কুমিল্লায় লইয়া গিয়াছিলাম। এক খানা কচুরি এক পয়সায় কেনা হইয়াছিল, তাহা গলাধঃকরণ করিতে না পারিয়া দূরে নিক্ষেপ করা গিয়াছিল। পরে এক জন মোসলমান ফেরিওয়ালার নিকটে মোটা মোটা চিড়া ও বাতাসা পাইয়া তাহা দুই পয়সায় ক্রয় করিয়া জলযোগ করা গেল। বহু দূর পর্য্যন্ত মুলীবাশের নিবিড় অরণ্যময় অনুন্নত পর্ব্বতশ্রেণীর ভিতর দিয়া দূরব্যাপী চা ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া বাষ্পীয় শকট চলিয়াছিল, বামে দক্ষিণে দৃশ্য অতি মনোহর। যথাসময়ে ট্রেণ কুমিল্লা নগরে পঁহুছিল। গাড়ী পঁহুছিবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে চিড়া ও বাতাসা ভক্ষণে সুনিদ্রা হইয়াছিল। আমি হঠাৎ জাগিয়া দেখি যে, কুমিল্লা ষ্টেশনে পঁহুছিয়াছি, কুমিল্লার যাত্রিক সকল নামিয়া গিয়াছে, প্ল্যাটফরমে একটি লোকও নাই, গাড়ী ছাড়িবার উপক্রম। আমি তখন তাড়াতাড়ি ব্যাগ ও বিছানাসহ নামিয়া পড়িলাম। নিদ্রার অবস্থায় ট্রেণ চলিয়া

গেলে আমাকে কিছু সঙ্কটে পড়িতে হইত। আমার জন্য ঘোড়ার গাড়ী ও লোক প্রেরিত হইয়াছিল, আমাকে না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। ষ্টেশনে একখানা গাড়ীও ছিল না। অগত্যা মস্তকে আতপত্র ধারণপূর্ব্বক একজন মুটে সহ হাটিয়া উর্দ্ধ-শ্বাসে গম্যস্থানে উপস্থিত হওয়া গেল।

আমি শিলচর হইতে কুমিল্লায় ফিরিয়া আসিয়া ১২ই বৈশাখ রবিবার পর্য্যন্ত তথায় স্থিতি করি।

প্রিয় গঙ্গাগোবিন্দ আমার কলিকাতা গমনের জন্য ইণ্টার ক্লাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে মধ্যম শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীতে কোন প্রভেদ নাই। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর একটি কম্পার্টমেণ্টের সম্মুখে কেবল "Inter" এই কথাটী লিখিত। এমন হীনাবস্থাপন্ন ইণ্টার ক্লাস কোথাও দৃষ্ট হয় না। অথচ তজ্জন্য তৃতীয় শ্রেণীর প্রায় দ্বিগুণ ভাড়া দিতে হয়। সুবিধার মধ্যে এই যে, তাহাতে ইতর লোকের ভিড় হয় না। আমি যে গাড়ীতে আরোহণ করিয়াছিলাম, সেই গাড়ীতে আগ্রার যাত্রিক একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক সস্ত্রীক ছিলেন। এক পার্শ্বে এক বেঞ্চে স্ত্রীলোকটি শয়ান ছিলেন, আমাকে অতিশয় সঙ্কুচিত ভাবে থাকিতে হইয়াছিল। আমি যে বেঞ্চ খানায় ছিলাম, তাহার অধিকাংশ উক্ত ভদ্রলোকটি অধিকার করিয়া গভীর নিদ্রা সম্ভোগ করিয়াছিলেন। আমি এক কোণে বসিয়া সমুদায় রাত্রি জাগিয়া তাঁহাদের প্রহরীর কার্য্য করিয়াছিলাম।

এবার পূর্ব্ববঙ্গের অনেকগুলি ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন হইল। এক এক স্থানে একটী বা দুইটী ক্ষুদ্র ব্রাহ্মমণ্ডলী আছে, মণ্ডলীর অধিকাংশ ব্রাহ্মপরিবারে নিত্য ব্রহ্মোপাসনা ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ হয় না বুঝিতে পারা গিয়াছে, কেবল বিষয়ানুরাগ ও বিষয় চর্চ্চা দেখিয়া মন ব্যথিত হইয়াছে। যেমন হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ নাই, বরং বিপরীতাচারী কেবল বিষয়ার্জ্জনা, ভোগবিলাস, পান ভোজন ও আমোদ গল্পে মত্ত। যেরূপ হিন্দু ও খ্রীষ্টানাখ্যাধারী এক এক অদ্ভুত দল এদেশে বৃদ্ধি পাইতেছে, এই অল্পদিনের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট অনেক ব্রাহ্মপরিবার সেই দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইতেছে দেখিলে কি মনে কষ্ট হয় না? ব্রহ্মোপাসনাবিহীন উচ্চ নীতিবিহীন ব্রাহ্মপরিবারের বালক বালিকাগণ ধর্ম্ম ও নীতির সুদৃষ্টান্ত ও সুশিক্ষা কোথায় পায়? তাহারা যে ঘোরতর বিষয়ী বিলাসী দুর্ব্বিনীত নিরীশ্বর হইয়া নিজের ও জগতের অমঙ্গল সাধন করিবে, ব্রাহ্ম পিতামাতা কি তাহা ভাবেন? কেবল বালক বালিকাকে পুঞ্জ পুঞ্জ অর্থব্যয়ে কলেজে উচ্চ শিক্ষা দান ও সাহেব হইবার জন্য বিলাতে প্রেরণ করিলেই কি সন্তানের প্রতি জনক জননীর কর্ত্তব্য পালন হইল? আমরা বিদেশে ২।৪ জন ব্রাহ্মের দৈন্যব্রত স্বার্থত্যাগ দীনসেবা উপাসনানুরাগ ধর্ম্মোৎসাহ এবং বিনয় ভক্তি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

মহিলাদিগের রচনা।

বিমাতা।

লক্ষ্মী তার স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রী তিনটি শিশুসন্তান রাখিয়া লক্ষ্মীর বিবাহের দুই বৎসর পূর্ব্বে মারা যান। বার বৎসরের লক্ষ্মী আসিয়া তিন ছেলের মা হইয়া বসিল।

লক্ষ্মী নিজেই ছেলেমানুষ, সুতরাং ছেলেমেয়েদের যত্ন প্রথম প্রথম বড় করিতে পারিত না। ছেলেমানুষ লক্ষ্মী তাহাদের খেলা দিত, কাপড় পরাইয়া দিত, কাঁদিলে কোলে লইত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিল, সে তাহাদের মাতার স্থান অধিকার ক'রিয়াছে সুতরাং সে তাহাদের মা। যেমন বুঝিল কাজেও তেমনই করিল। মায়ের মত বুকভরা স্নেহ দ্বারা সে তাহাদের লালন পালন করিতে লাগিল।

এখন লক্ষ্মীর নিজেরও দুইটি ছেলে হইয়াছে। সে সপত্নীপুত্রকন্যাদিগের প্রতি এমনই সুমধুর ব্যবহার করিত যে, অপরিচিত লোকে বুঝিতে পারিত না যে এগুলি তার নিজের পেটের ছেলে নয়।

হিংসা রিপুর দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিমাতারা (আমি অবশ্য সকল বিমাতার কথা বলিতেছি না, কারণ আমি অনেক বিমাতার সপত্নীপুত্রদিগের প্রতি কোমল ব্যবহার দেখিয়াছি) সময়ে সময়ে সপত্নীসন্তানদিগের প্রতি এমনই নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন যে তাহা সকলের পক্ষে অসহনীয়। তাহাদিগকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিয়া দুধের বাছাদের অভুক্ত রাখিয়া, তাহাদিগের কোমল দেহে কঠোর হস্ত ব্যবহার করিয়া সুখবোধ করেন। অধিকন্তু ইহাতেও সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ না করিয়া স্নেহময় পিতার হৃদয় সন্তানের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলিয়া তিক্ত করিয়া দেন। নারী সংসারের লক্ষ্মীস্বরূপা, কিন্তু স্থল বিশেষে তিনিই অলক্ষ্মী হইয়া অশান্তি আনয়ন করেন।

"যে মেয়ে সতীনে পড়ে তারে বিধি ভিন্ন গড়ে" ইহা যে সকল স্থলে খাটে না, লক্ষ্মীর সংসার দেখিয়া প্রথমে তাহা বুঝিয়াছিলাম। কারণ দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি যে গুণগুলি থাকিলে স্ত্রীলোককে সর্ব্বগুণসম্পন্না নামে অভিহিত করা যায়, লক্ষ্মীর তাহার প্রায় সব গুণগুলিই ছিল, এবং বিমাতার সকল দোষের প্রধান দোষ যে "হিংসা" তাহা সে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিত।

সুতরাং বিধি তাহাকে অন্য স্ত্রীলোক হইতে যে ভিন্ন করিয়া গড়েন নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেহ লক্ষ্মীর গুণে মুগ্ধ হইয়া প্রশংসা করিলে, সে বলিত "উহাদের মাতা থাকিলে কি তিনি অযত্ন করিতেন, তবে আমি তার স্থান অধিকার করিয়া তাঁর অতি আদরের ধনগুলির অযত্ন করিবার কে?"

বিধাতা সকল বিমাতার হৃদয় এমনই স্নেহময়, এমনই হিংসাদ্বেষবিবর্জ্জিত করিয়া গড়েন না কেন? তাহা হইলে যুগযুগান্তর হইতে বিমাতার যে কলঙ্ক চলিয়া আসিতেছে তাহা মুছিয়া যাইত।

লক্ষ্মী বুঝিয়াছিল আমার সন্তানগুলির দুঃখে যেমন প্রাণ কাঁদে, সুখে যেমন তৃপ্তি

পাই, উহাদের মাতার হৃদয়খানিতেও তেমনি হইত, আর আজ আমি সেই ভাগ্যবতীর স্থান অধিকার করিয়া তাঁহার হৃদয়ের রত্নগুলির অযত্ন করিবার অধিকারী নই।

হায়! হায়!! সকল বিমাতা যদি ইহা বুঝিতেন, তবে কত সোণার সংসার অশান্তির আগুণে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইত না।

লক্ষ্মী! তোমার মত লক্ষ্মীমেয়ে সকল মাতা গর্ভে ধারণ করেন না কেন? তোমার মত মেয়ে যদি ঘরে ঘরে জন্মাইত, তবে পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইত।

রেঙ্গুণ। শ্রীমতী পু—

তুমি কি দেখিছ ?

তুমি কি দেখিছ চেয়ে বিমুগ্ধ নয়নে
প্রকৃতি সৌন্দর্য্যলীলা শান্ত শুভ্রালোকে
জড়ের জীবন্ত ছবি জড়ের মাধুরী?
নিরেট পাষাণ সে'যে সুনীল আকাশে।
ডাকিলে আসে না কাছে, সে'যে নাহি বোঝে
কা'র রূপে তার রূপ আলো করে ধরা?
আমি দেখি চেয়ে,—তোমারি আলোকে তব
স্বচ্ছ হৃদাকাশে—সেই পুণ্য-প্রেম চন্দ্র
যে পুণ্য আলোক হ'তে কোটী সূর্য্য চন্দ্র
তারা নিখিল অবনী বিধৃত কৌশলে।
প্রাণ মাঝে প্রাণরূপী পরম রতন।
তার কভু নাহি ক্ষয় নাহি অমানিশা,
সে থাকে না শত দূরে আকাশের কোলে।
আমি দেখি তাই, তাহাতে তোমারি ছায়া
তোমারি শ্রীমুখ। তোমাতে তাঁহারি ছবি
তাঁহারি আলোক। তুমি দেখ বসে বসে
চির নিশি দিন, মহিমার দীপালোকে
তোমার ভিতরে তাঁর প্রেমময় মুখ।
তাঁহার ভিতরে দেখ নব নব ছন্দে
তোমারি রাগিণী গীতি জীবন-নিকুঞ্জে।

কটক। শ্রীমতী রে—

বনের পাখি *।

বনের পাখি, আয়রে ফিরে,
সোণার খাঁচায় রাখবো তোরে।
হাত বুলাব ধীরে ধীরে।
সোণার অঙ্গে আদর করে।
সকাল হলে— আন্‌বো তুলে,
পাকা পাকা তাজা ফল
ছুটে গিয়ে নদীর তটে
আনব জল সুশীতল।
আদর করে সোণার ঘটে
সাঁজ ফুরালে,— আঁধার জালে
ঘিরবে যখন ধরণী,
সুকোমল শয্যা আনি
তোর লাগি অরে প্রাণ
দিবে পেতে পাখি রাণী
উত্তর—এত সোহাগ আদর স্নেহ
এত যত্ন ভালবাসা প্রীতি
কাজ কি বল বনের পাখি,
বনে বসে গাইগো মনের গীতি,
বনের পাখী বনেই ভাল।

---

* পূর্ব্বে অনেক সংখ্যায় যে বালিকাটীর রচনা প্রকাশিত হইয়াছে এই পদ্যটিও তাহা কর্ত্তৃক রচিত।

নাই প্রয়োজন সোণার খাঁচা
চাইনে আমি ফুলের শয্যা,
চাইনে হতে ভবের রাজা,
মুক্তাকাশ ভাল মোদের
সবুজ ডালেই বাসা
খাঁচায় বন্দী থেকে কারো চাই না ভালবাসা
কচি কচি সবুজ পাতায়
আছে মোদের বাসাবাড়ী,
কি করেগো তোমার কাছে
যাইগো আমি সে সব ছাড়ি
সোণার খাঁচা তার কাছে
কোথায় লাগে ছার
স্বাধীনতা সম সুখ
নাইক ভবে আর।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।*

থালা খানি ভরা, দেখ কত ফুল,
এনেছি সকলে মিলে।
গাঁথি ফুল মালা, অতি কুতূহলে,
পরাব ভায়ের গলে॥

এনেছি চন্দন, ভায়ের ললাটে,
ফোঁটা দিব সবে মিলে।
করিব প্রার্থনা, ভ্রাতার জীবনে,
শুভফল যেন ফলে॥

আমরা দুঃখিনী, ভারত ললনা,
ভ্রাতার ভগিনী হব।
আশা, নিরাশায়, আঁধারে, আলোকে,
সাথে সাথে চলে যাব॥

হতে আগুয়ান, বাধা পাবে ভাই,
চলিবে আঘাত সয়ে।
নির্ভয়ে আমরা, তোমারি পশ্চাতে,
দাঁড়াইব শক্তি হয়ে॥

তোমাদের সুখ, দেখিয়া আমরা,
চলিব সকলে ভাই।
তোমাদের দুঃখে, হয়ে আত্মহারা,
কলঙ্ক ঘুচাতে চাই॥

যাইতে একাকী ভাই এসংসারে,
ব্যথা যদি পাও মনে।
ডেকো বোন ব'লে হইব সঙ্গিনী,
যাইব প্রাণের টানে॥

বোন না জাগিলে, তোমাদের জাগা,
স্বপনে মিশায়ে যাবে।
বোন না শিখিলে, তোমাদের শেখা,
ভস্মে ঘৃতাহুতি হবে॥

জপ, তপ, সেবা, ধর্ম্ম অর্থ ভোগে,
সঙ্গিনী করিয়া নিও।
জীবনে মরণে, পথে কর্ম্মক্ষেত্রে,
সাথে সাথে যেতে দিও।

গান।

ভাই বোনে মিলে, আয়রে সকলে,
গড়িব ভুবন নূতন করে।
হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রেমেতে মিলায়ে,
গড়িব ভুবন নূতন করে॥

---

* এবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসবে বাঁকিপুরস্থ অঘোরপরিবারের ভগ্নীদল হইতে তিনটি ক্ষুদ্র বালিকা কর্ত্তৃক এই পদ্যটি সঙ্গীতাকারে গীত হইয়াছিল।

নব সাজে মোরা, সাজিব আপনি,
সাজাইব দেশ সাজাব ধরণী।
স্নেহ ভালবাসা, দয়া ভক্তি আনি,
গড়িব ভুবন নূতন করে॥

দাও এনে আজি, যার যা শকতি
হৃদয় ভরিয়া আন নব প্রীতি।
পরাণে জ্বালাও, নব আশা বাতি,
গড়িব ভুবন নূতন করে॥

প্রতিজ্ঞার বলে, কি কাজ না হয়,
করি প্রাণপণ লভিব বিজয়।
অনন্ত শকতি, মোদের সহায়,
গড়িব ভুবন নূতন করে॥

খাটিতে এসেছি, খাটিয়া মরিব,
ললাটের ঘাম চরণে ফেলিব।
মরণ দিনেও, আশা না ছাড়িব,
গড়িব ভুবন নূতন করে॥

শারদীয় উপহার।

বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে তারা আরাধনা,
সাজায়েছে মৃত্তিকায় ডাকের গহণা।
শান্ত শুদ্ধমতী সতী যত বঙ্গনারী,
পূজা উপাচার ল'য়ে যায় সারি সারি।
বিল্বপত্রে জবাফুল অর্ঘ সাজাইয়া,
জননীর শ্রীচরণে দিতেছে ঢালিয়া।
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পদে করযোড়ে সবে,
দাঁড়াইল গলবস্ত্র হইয়া নীরবে।
বহিতেছে প্রেম অশ্রু যুগল নয়নে,
গদ গদ ভক্তিভরে লুটিছে চরণে।
জননীর প্রতি কিবা ভক্তি অনুরাগ,
মাগিয়া লইতে সাধ ভক্তিরস ভাগ।
জয় দুর্গা বলে ডাকে সবে একমনে,
দুর্গতিনাশিনী মাকে বসায়ে দালানে।
ত্রিনয়না তারা মাকে আরতি করিছে,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজনেতে গগন ছাহিছে।
ধন্য বঙ্গবাসী সবে ধন্য গো তোমরা,
মাতৃভক্তির ধূমে পূর্ণ ঊর্দ্ধ অধ ধরা॥
মৃণ্ময় প্রতিমা বটে সত্য ইহা নহে,
তথাপি চিন্ময়ী ভক্তি ল'য়ে যাই গেহে।
ভক্তির আদর্শ ল'য়ে পূজিব আমরা,
অনন্ত জীবন পথে যিনি ধ্রুব তারা।
ত্রিনেত্র উজ্জ্বল যাঁর প্রেম পুণ্য জ্ঞান,
তাঁহার সম্মুখে দিব রিপু বলিদান।
মাটি হতে খাটি মাকে বুকে ধয়ে লই,
রাখিয়া হৃদয়পদ্মে দেখে সুখী হই।
প্রেমের প্রতিমা তিনি জীবের জীবন,
কিছুই জানি না তাঁর ভজন পূজন।
তথাপি আকুল প্রাণ পূজিবার তরে,
হেন ধন নাহি মোর কি দিব তাঁহারে।
ফল ফুল জল তাঁরি, তাঁরে কি বা দিব,
আত্মসমর্পণ করি মানসে পূজিব।
আত্মহারা হয়ে তারা, তারা বলে ডাকি,
চিদাকাশে তারা ভরা, তারা মুদে দেখি॥

হরিপাল। শ্রীমতী ত—

ঈশ্বরের জন্ম সমুদয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(স্বর্গগতা কিশোরি মোহিনী দেবী
কর্ত্তৃক লিখিত।)

[৭৯পৃষ্ঠার পর।]

"ইহা এক হাস্যজনক সংবাদ, এই কথা অবশ্য সাধারণ আমোদাকারে কেহ সৃষ্টি

করিয়াছে কি? শশিভূষণ গুপ্ত যিনি স্বাধীনচেতাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন, তাঁহার কন্যা ধর্ম্ম স্বীকার করে? কি আশ্চর্য্য! এমন কৌতুকজনক বিষয় আর নাই।”

ভগিনীদের সাক্ষাৎ করার পরেই দেবেন্দ্র নলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। দেবেন্দ্রের স্থির দৃষ্টিতে তাহার মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিল। কিন্তু কেমন সুমধুর, ধীরভাবে নলিনী তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল, যথার্থই যে স্বরে পূর্ব্ব সুমিষ্ট বাদ্যও পরাজয় হইত, এখন তাহা স্বর্গীয় হইয়াছে। সে স্থানে মনোহারী সৌন্দর্য্য, উচ্চবংশীয় স্থিরতা, সরলতাপূর্ণ নির্দ্দোষ হাস্যযুক্ত কপোল শোভা পাইতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যে যেন কিছু আছে বলিয়া বোধ হয়, যেন কিছু সূক্ষ্মভাব আছে, যাহা দ্বারা দেবেন্দ্রের আশঙ্কায় মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল, কারণ এরূপ ভাব তাহার ছিল না। ইহা কি?

অবশেষে, ধীরে ধীরে দেবেন্দ্র যে সংবাদ পাইয়াছে তাহা উত্থাপন করিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য নলিনীর শরীর কম্পিত হইল, ওষ্ঠাধর বাক্য বলিতে অস্বীকার করিল, কিন্তু এভাব তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল, এবং একটা উজ্জ্বল আলোকছটা তাহার সৌন্দর্য্যপূর্ণ মুখে বিকাশ পাইল। যখন নলিনী উত্তর করিল তখন তাহার চক্ষে অলৌকিক জ্যোতি দেখা দিল, এবং সেই জ্যোতি কপোলদেশে আসিয়া অত্যুজ্জ্বল রাগে দীপ্তিমান্ হইল। সে বলিল, “দেবেন্দ্র-নাথ! এই বিষয়কে অনুগ্রহ করিয়া কৌতুকের কথা মনে করিও না; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! যথার্থই আমি এখন ঈশ্বরবিশ্বাসিনী হইয়াছি।” তাহার যুক্তকর দেবেন্দ্রের হস্তের উপর রক্ষিত হইল “আমি এখন যথার্থ পথে যাইতে চেষ্টা করিতেছি, যদি তুমি থাকিতে—” এইমাত্র শুনিয়াই গর্ব্বিত দেবেন্দ্র একেবারে দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল, তাহার চঞ্চলগতিতে নলিনীর হস্ত পতিত হইয়া গেল, সে নিজের স্বরকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া দ্রুতগতিতে এদিক ওদিক পদচালন করিতে লাগিল; কারণ তাহার মুখে অভিশাপবাক্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ক্রোধে তাহার ললাটদেশে শিরা সকল দেখা দিল, মুখ শ্বেতবর্ণ, কণ্ঠস্বর চঞ্চল, অবশেষে বলিয়া উঠিল—“তুমি কি যথার্থই সেই সমস্ত লোকেদের মধ্যে তোমার ভাগ্যকেও নিক্ষেপ করিতে অভিলাষ করিয়াছ, তুমি কি সমস্তই পরিত্যাগ করিবে? সমস্তই?”

আমি সমস্তই ঈশ্বরের জন্য পরিত্যাগ করিব। অতি কোমল মৃদুস্বরে এবং অতি গভীর চিন্তার সহিত এই কথাগুলি উচ্চারিত হইল।

এক মুহূর্ত্তের জন্য দেবেন্দ্র তাহার বাক্যকে অবরুদ্ধ করিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাহাদের দৃঢ়তায় লৌহের মত বোধ হইল। অবশেষে গভীর উত্তেজিত স্বরে দেবেন্দ্র বলিল, নলিনী—কুমারী নলিনী, এই যদি তুমি মনস্থ করিয়া থাক, এই যদি তোমার অভিপ্রায় থাকে, তবে আমরা অবশ্যই দুই পথে গমন করিব।”

এই কথা অতি তীক্ষ্ণভাবে স্পর্শ করিল, ইহা ভয়ানক পরীক্ষা, কারণ এই তরুণী বালিকা তাহার আত্মাকে দেবেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

উচ্চতর ও পবিত্রতর ভালবাসা তাহার হৃদয়ে উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে সে মনুষ্যকে ভাল বাসিয়াছে, ইহাই তাহার আরাধ্য দেবতা ছিল, এখন চিরদিনের জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া নলিনীর কপোলদেশ বিবর্ণ, এবং চক্ষু জ্যোতিহীন হইল।

দেবেন্দ্র ইহা দেখিল, দেখিয়া তাহার ব্যবহার অনুনয়ের ভাব ধারণ করিল। নলিনীকে কিরূপ স্থান দিবে তাহা দেখাইল, এবং রমণীহৃদয় যাহাতে পরাস্ত হয় এমন সকল যুক্তি দ্বারা তাহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। কিরূপ অনুনয় দ্বারা এবং চাতুর্য্যের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধে সংশয় আনয়ন করিয়া জয়লাভ করিতে হয় তাহা সে বিলক্ষণ জানিত। দেবেন্দ্রের কথোপকথনের শক্তি যথেষ্ট ছিল, এবং চতুরের ধূর্ত্ততার সহিত তাহার প্রত্যেক দৃষ্টি মীমাংসার বিষয়কে সাহায্য করিত। অনেকবার এই নবীনা ব্রহ্মকন্যার নম্রপ্রকৃতি দেবেন্দ্রের যুক্তির নিকট পরাস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কেবল সেই অনন্তজীবনের প্রবাহ হইতে সাহায্য লাভ করিয়া এই সাক্ষাতের শেষে তাহার দৃঢ়তা রক্ষিত হইল। অবশেষে এই প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল যে “যদি তুমি আমার নিকট অবনত হইয়া আমাকে পূজা কর, আমি তোমার এই সমস্ত প্রদান করিব, আমাকে সর্ব্বস্ব দিবে, কি ঈশ্বরকে?” আমি কিংবা ঈশ্বর এই দুইয়ের মধ্যে সম্বন্ধ থাকিবে না। নূতন, স্বর্গীয় বিশ্বাসের বস্ত্রে আবৃতা সেই স্থানে দণ্ডায়মানা নলিনী, স্বর্গের জ্যোতি আত্মায় প্রজ্বলিত, ইহার উজ্জ্বল আলোক তাহার মলিন অবয়বে ক্রীড়া করিতেছে, এইরূপ অবস্থায়, প্রাচীনকালের ধর্ম্মবীরদিগের ন্যায় দৃঢ়তার সহিত বলিল,—“আমি ঈশ্বরের জন্য সমুদয় দিব।”

যদিও দেবেন্দ্রের হৃদয় ক্রোধে এত দূর প্রজ্বলিত হইল যে সে দন্তঘর্ষণ করিতে লাগিল, তথাপি তাহার সম্মুখে যে ক্ষুদ্র দেহলতাটী বিশুদ্ধ শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া দণ্ডায়মানা, তাহার চক্ষু ব্যাকুলতার সহিত ঊর্দ্ধোত্থিত হইয়া রহিয়াছে, আত্মার জ্যোতিতে ললাটদেশ উজ্জ্বল দেখাইতেছে, তাহার ভাব প্রগাঢ় আত্মশাসনের উপর অবস্থিত, কিন্তু এত নম্র ও শান্ত এবং বাধ্যতাপূর্ণ যে দেবেন্দ্রের হৃদয় এক আশ্চর্য্য বিস্ময় ভীতিতে পূর্ণ হইল। কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি শত্রুতা তাহার হৃদয়ে এত প্রবল যে তাহা হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা ছেদন করিল, প্রণয়কে একেবারে পদদলিত করিয়া, এই প্রথম অপরিচিতের ন্যায় প্রণয়শূন্য হৃদয়ে নলিনীর নিকট হইতে প্রস্থান করিল। (ক্রমশঃ)

সংবাদ।

জর্ম্মাণিরাজ্যের রাজধানী বর্লিননগরে আমাদের একটি আত্মীয় যুবা প্রবিষ্ট হইয়া বিজ্ঞানশিক্ষা করিতেছেন। সেই কলেজে তিন শত আধ্যাপক, চারি সহস্র ছাত্র।

ভাবিয়া দেখ বিদ্যালয়টি কত বড়। আমাদের দেশে তিন শত ছাত্র ও তিন চারি জন অধ্যাপক হইলেই বড় কলেজ স্কুল হয়।

আমরা অতিশয় দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি এবং প্রধান শাসনকর্ত্তা মহামতি লর্ড নর্থব্রুক মহোদয় বিগত ২৬শে কার্ত্তিক (১১ই নবেম্বর) লণ্ডন নগরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন অতি উদার ও বিনম্রপ্রকৃতি প্রজারক্ষণশীল রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। তিনি কলুটোলাস্থ আচার্য্যের পৈতৃক ভবনে একবার নিজের কন্যা সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং স্ত্রীবিদ্যালয়ের পারিতোষিকবিতরণকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। রাজপ্রতিনিধিদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম ঢাকা নগরে পদার্পণ করেন; তথাকার স্ত্রীবিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইয়া একটি ছাত্রীর পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি উত্তমরূপে পড়িয়াছ, আমি তোমাকে পুরস্কার দিব। সেই স্ত্রীবিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের প্রতি উক্ত রাজপ্রতিনিধি অতিশয় আদর ও স্নেহপ্রদর্শন করেন। তাঁহার সৌজন্যে সকল লোক মুগ্ধ হইয়াছে। ইংলণ্ডে থাকিয়া তিনি সর্ব্বদা ভারতের হিতাচরণ করিয়াছেন।

বজবজনিবাসী হেমেন্দ্র খাড়া নামক এক যুবকের পত্নী পতির নিকটে পূজার কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্য প্রার্থনা করিয়াছিল, যুবক তাহা প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় উভয়ের বচসা হয়। হেমেন্দ্র পত্নীর কটূক্তিতে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে, একটা গরাদে দ্বারা স্ত্রীর মস্তকে সবলে আঘাত করে, তাহাতে তাহার পূজার কাপড় পরিবার সাধ চিরদিনের জন্য মিটিয়া গিয়াছে, স্বামীর নিষ্ঠুর আঘাতে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইয়াছে। হেমেন্দ্র বিচারাধীন আছে।

ধর্ম্মযাজকদিগের এক মহাসমিতিতে কোন একজন বড় পাদরী বলেন, সুরাপানকে কোন অনিষ্টের হেতু মনে করা একেবারে সত্যের বিপরীত। অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর এমেরিকার একটি কমিটি দ্বারা এসম্বন্ধে যাহা হইতে পারে তাহা হইয়াছে। কমিটী কতগুলি প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া, বড় বড় ডাক্তার, পাদরী, ব্যবহারাজীব, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য যাঁহাদের এসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাদের উত্তর যা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, সপক্ষবিপক্ষের মত দুই দিকেই সমান। ইংলণ্ডের ডাক্তারেরা বলেন যে, কোন বিশেষ পরিমাণে মদ্যপান করিলে অনিষ্ট হয় বলিয়া, স্বল্পমাত্রায় পান করার উপকারিতার বিরুদ্ধে সেই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে মহাদেশীয় ডাক্তাগণ একবাক্য হইয়া বলেন যত অল্প কেন হউক না মদ্যপানে শরীরের কোন উপকার হয় না—অধিক বলিলে এই মাত্র বলা যায় যে, খুব অল্প পরিমাণে পান করিলে শরীরের কোন অপকার হয় না। বিচারক এবং ব্যবহারজীবগণ সুরাপানের বিরুদ্ধ, ব্যবসায়ীদের মধ্যে তুল্যরূপে মতদ্বৈধ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ধর্ম্মযাজকদিগের অধিকাংশ মদ্যব্যবহারের সপক্ষ!—বঙ্গবন্ধু।

"ভিখারিণীর নিবেদন" প্রবন্ধ এবার স্থানাভাবে প্রকাশিত হইল না।

১০ ভাগ।
৬ষ্ঠ সংখ্যা।
পৌষ।
১৩১১।
মহিলা
মাসিক
পত্রিকা।
সূচী।
বিষয়। পৃষ্ঠা।
স্ত্রীনীতিসার ১৪৫
হিন্দুপরিবারে সূতিকাগার ১৪৬
নারীজাতিসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উক্তি ১৪৯
নায়েগরা প্রপাত ১৫১
মহিলাদিগের রচনা—কাঞ্চন জঙ্ঘা ... ১৫৫
" " ভিখারিণীর নিবেদন ১৫৬
" " ঈশ্বরের জন্য সমুদয় ... ১৬০
" " আঁধারে ... ১৬২
" " ধর্ম্মপুত্র ১৬২
পাকপ্রণালী ১৬৭
সংবাদ ১৬৮

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১০ম ভাগ] পৌষ, ১৩১১ ; জানুয়ারি, ১৯০৫। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

প্রাচীন শ্রেণীর নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলাগণ কখনও অতিথি ও ভিক্ষুকদিগকে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দেন না। দান ধর্ম্ম দয়ার কার্য্যে তাঁহাদের হস্ত সর্ব্বদা মুক্ত; নিজেদের ভোগ বিলাসে ইঁহাদের উপেক্ষা। অনেকে অপরকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া নিজে সামান্য ভোজন অল্প ভোজন করেন, অপরকে উত্তম শয্যায় শয়ান করাইয়া নিজে সামান্য শয্যায় নিশাযাপন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনেকে যেন মূর্ত্তিমতী বৈরাগ্য। তাঁহারা মিতাচারিণী হইয়া নিয়মিত সাংসারিক ব্যয়ের অর্থ বাঁচাইয়া ব্রাহ্মণ ভোজন দেবার্চ্চনা ব্রতানুষ্ঠানাদিতে ব্যয় করেন। নিতান্ত দরিদ্র হিন্দু গৃহিণীও কষ্ট স্বীকার করিয়া যথাসাধ্য ধর্ম্মকর্ম্মে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এই জীবনের সদ্দৃষ্টান্তে তাঁহাদের বালক বালিকাগণ শৈশবকাল হইতে অর্থব্যয়ে সুনীতিপরায়ণ হয়।

নব্য শ্রেণীর মহিলাগণ প্রাচীন শ্রেণীর নিষ্ঠাবতী হিন্দু মহিলাদিগের সুনীতির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া চলিলে কত সুখের ব্যাপার হয়। তাঁহারা আপনাদের জুতা মুজ পোমেটম জমকাল ফ্রক জ্যাকেট রুমাল ইত্যাদিতে অর্থব্যয় কিছু খর্ব্ব করিয়া নিজেদের বিশ্বাসানুযায়ী ধর্ম্ম কর্ম্মে ও দয়ার কার্য্যে নিয়মিতরূপে অর্থব্যয় করিলে সকলের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন। আমরা অনেক বার বলিয়াছি, নব্য গৃহিণী অন্য উপায়ে ধর্ম্ম কর্ম্মের জন্য অর্থ বাঁচাইতে না পারিলে সংসার খরচের জন্য টাকা ভাঙ্গাইয়া আনিলে তাহা হইতে দুইটী বা একটী পয়সা এবং প্রতিদিন রন্ধনের সময় এক মুষ্টি তণ্ডুল সদুদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার জন্য যেন রাখিয়া দেন। মাসান্তে সেই সংগৃ-

হীত অর্থ ও তণ্ডুল ধর্ম্মপ্রচারে বা দরিদ্র সেবায় ব্যয় করিতে পারিবেন। ইহা কিছুই কষ্টকর নহে।

আমাদের বিনীত অনুরোধ ও প্রার্থনা যে, নব্য মহিলাগণ দানধর্ম্মে পুণ্য কর্ম্মে জীবনে সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সন্তানদিগের অন্তরে দানধর্ম্মে পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্তি উদ্দীপন করুন ও নিজেরা ধন্য হউন।

হিন্দু পরিবারে সূতিকাগার।

হিন্দু পরিবারের সূতিকাগারকে ভয়ঙ্কর কারাগার বলা যায়। বরংও তদপেক্ষা কারাগার শতগুণ ভাল। কারাগার স্থিত কয়েদীদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সুব্যবস্থা আছে, কয়েদিগণ ভাল ঘরে বাস করিয়া থাকে, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে, পান ভোজনাদি বিষয়ে তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত উত্তম ব্যবস্থা আছে, তাহাদের রোগ হইলে সুচিকিৎসা হয়। হিন্দু পরিবারের সূতিকাগারে কোন সুব্যবস্থা নাই। একটী নব যুবতীকে একটি অতি জঘন্য ক্ষুদ্র গৃহে সন্তান প্রসব করিয়া অতি জঘন্য অবস্থায় মাসাবধি কাল যাপন করিতে হয়। তজ্জন্য অনেকে নিদারুণ ক্লেশে আতুর ঘরেই প্রাণত্যাগ করেন, নব শিশুর জীবন লীলা সমাপ্ত হয়, অনেক প্রসূতি দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া চির জীবন বিষম ক্লেশে যাপন করেন, জীর্ণ শীর্ণ ক্ষীণবল হইয়া যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকেন। সূতিকাগারের অব্যবস্থা ও যত্ন শুশ্রূষার অভাবে সন্তানপ্রসবের পর কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া অনেক প্রসূতির জীবনধারণ কেবল দুঃখ বিড়ম্বনার কারণ হইয়া থাকে। প্রাচীনা হিন্দু নারীদিগের অজ্ঞানতা ও আতুরঘরসম্বন্ধে নানা কুসংস্কার এই দুঃখ দুর্গতির কারণ।

পল্লীগ্রামস্থ সূতিকাগার ও প্রসূতির অবস্থা কিছু বর্ণন করা যাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক ভদ্র পরিবারের সূতিকাগার আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তদাশ্রিত প্রসূতির অবস্থাও জ্ঞাত আছি। একটি অতিশয় নিকৃষ্ট ক্ষুদ্র পর্ণশালায়, বা অন্ধ কূপতুল্য অন্ধকারময় কুঠরীতে প্রসব বেদনা হইবামাত্র প্রসূতিকে প্রবেশ করিতে হয়। তাহার অবস্থিতির জন্য ভূতলে একটি মাদুর বা দরমা প্রসারিত হইয়া থাকে। তাহাতে তাঁহাকে আশ্রয় লইতে হয়। তাহাতে চণ্ডাল বা মুচি কিংবা কৃষক শ্রেণীর এক জন মূর্খ স্ত্রীলোক ধাত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে। সে অনেক সময়ে হিতে বিপরীত করিয়া বসে। তাহার মূর্খতায় ও হঠকারিতায় প্রসূতির প্রাণান্ত ক্লেশ হয়, বা প্রাণের বিয়োগ হয়, এবং নব শিশুর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। প্রসব কালে কোনরূপ সঙ্কট অবস্থা হইলে সেই যমকিঙ্করীস্বরূপ মূর্খ দাই উক্ত সঙ্কটনিবারণে কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারে না বরং সঙ্কট বৃদ্ধি করে।

সন্তান প্রসূত হওয়া মাত্র আতুর ঘরের দ্বার অবরুদ্ধ, বায়ুর গতি সম্পূর্ণ বদ্ধ করা হয়; ঘরের বেড়ায় বা কোণে কোনরূপ ছিদ্র থাকিলে তাহাও রুদ্ধ করিয়া

দেওয়া হয়। প্রসূতির শিয়রে ধুনী জালান হয়, ঘণীভূত ধূমে গৃহ পূর্ণ হইয়া যায়। গ্রীষ্মকাল হইলে সেই আগুনের উত্তাপে ও ধূমে প্রসূতির ক্লেশেরতো সীমা থাকে না। শীত কালেও সেই ক্ষুদ্র আতুর ঘর ভয়ানক উত্তপ্ত হইয়া উঠে। বদ্ধ বায়ুতে বাস ও সেই উত্তাপ জন্য প্রসূতিরা উৎকট শিরঃপীড়া এবং দুরারোগ্য মূর্চ্ছা রোগ ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হন। এই অবস্থায়ও যে সকল প্রসূতি জীবিত থাকেন তাঁহারা প্রায় কঙ্কালমাত্রাবশেষ হইয়া সূতিকাগার হইতে বহির্গত হইয়া থাকেন। সূতিকাগারের দ্বারে একটি কচ্ছপের পৃষ্ঠাস্থি স্থাপন করা হয়, উক্ত গৃহের চারি কোণে বেতক লতার কণ্টকাকীর্ণ অগ্রভাগ স্থাপন এবং গৃহের চারি পার্শ্ব কুমিরা লতার দ্বারা ঘেরিয়া রাখা হয়। কোনরূপ ভূত প্রেত গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রসূতি ও নব শিশুকে আক্রমণ করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে কচ্ছপের পৃষ্ঠাস্থি এবং কণ্টকাকীর্ণ বেতক লতা ইত্যাদির যোগ করা হয়। ভূতেরা নাকি এ সকল দেখিলে ভয় পায়। যে স্ত্রীলোক প্রসূতির সঙ্গে রাত্রি যাপন করিবে সে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে হস্ত পদ অগ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া আতুর ঘরে প্রবেশ করে। রাত্রিকালে সেই গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করার বিধি নাই। কেহ আতুর ঘর হইতে বাহির হইয়া স্নান না করিয়া বাস গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। আতুর ঘর স্পর্শ করিলেও অশুচি হইতে হয়। বিক্রমপুর অঞ্চলে এ বিষয়ে আরও কুৎসিত ও নিষ্ঠুর রীতি। প্রসূতির প্রসবকাল উপস্থিত হইলে বাড়ীর এক প্রান্তে একটি সামান্য কুড়ে ঘর স্থাপন করা হয়, প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে প্রসূতি সেই ঘরে প্রবেশ করেন। উপযুক্ত সময়ে দাইয়ের সাহায্য ব্যতীত তিনি সূতিকাগারে অন্য কাহারও সাহায্য প্রাপ্ত হন না। আত্মীয় স্বজনেরা সেই গৃহে প্রবেশ করিবে কি তাহারা তাহা স্পর্শ করা পাপ মনে করিয়া থাকেন। প্রসূতি একটি দরমা শয্যায় নব প্রসূত শিশুসহ নিঃসহায় অবস্থায় মাসাবধি কাল যাপন করেন। তিনি উপযুক্ত পথ্যের অভাবেও যাহার পর নাই ক্লেশ প্রাপ্ত হন। রোগ হইলে তাঁহার ক্লেশের অন্ত থাকে না। এরূপ ভয়ঙ্কর দুরবস্থায় কেবল ঈশ্বরকৃপায় অনেকের জীবন রক্ষা পায়। নির্দ্ধারিত সময়ে প্রসূতি সূতিকাগার হইতে বাহির হইলে ঘরটি পুড়িয়া ভস্মীভূত করা হয়। সেই গৃহ আর কোনরূপে ব্যবহার্য্য হইতে হইতে পারে না।

কোন কোন পরিবারে গর্ভবতী যুবতীকে হরির নামে রাখা হয়। সন্তান প্রসূত হওয়া মাত্র তিনি নব শিশুসহ সরোবরে বা নদীতে হরির নামে অবগাহন স্নান করিতে বাধ্য হন। এই ব্যাপারে অনেক প্রসূতির বা নবশিশুর সদ্য মৃত্যু ঘটে। একদা আমরা পল্লীগ্রামে ছিলাম, শীত ঋতুর প্রাতঃকালে কুজ্ঝটিকায় চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে এমন সময় আমরা সরোবরের তীরে হরি সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিতে পাইলাম, কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া

সেই দিকে দৌড়িয়া গেলাম; যাইয়া দেখি একটী যুবতী বধূ প্রসূত শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া দীর্ঘিকায় অবতরণপূর্ব্বক অবগাহন স্নান করিল, পরে আর্দ্র বস্ত্রে সেই সঙ্কীর্ত্তনের দলের সঙ্গে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। এরূপ দর্শন করা কি ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই ব্যাপারে প্রসূতি বা শিশুর সদ্য মৃত্যু ঘটিয়াছে এই সংবাদ আমরা পাইয়াছি।

ভুবনবিখ্যাত কেশবচন্দ্র কলুটোলাস্থ তাঁহার পৈতৃক ভবনের নিম্নতলের এক প্রান্তে একটি মাত্র ক্ষুদ্র দ্বার বিশিষ্ট অতি সঙ্কীর্ণ নিকৃষ্ট ক্ষুদ্র কুঠরীতে ৬৬ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মোৎসবের দিন অনেক ব্রাহ্ম তাহা দর্শন করিবার জন্য গিয়া থাকেন। সেই জঘন্য ঘরে দীর্ঘকাল কিরূপে যে বন্দনীয়া জননী নবজাত কুমারসহ বাস করিয়াছিলেন ভ বিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যিশুখ্রীষ্ট পশুশালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাইবেল পুস্তকে এরূপ উল্লিখিত যে, সেই স্থানে স্বর্গীয় দূতগণ সেই নব কুমারকে অভিবাদন করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্ট জননী মেরী মাতা শত্রুভয়ে গুপ্ত ভাবে পশুশালাকে সূতিকাগার করিয়াছিলেন।

এক্ষণ উপযুক্ত চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থায় শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের যত্নে নগরে সূতিকাগারেরর অনেক সংস্কার হইতেছে। অনেক দ্বার জানালা আছে, বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চারিত হয় এরূপ গৃহকেই সচরাচর সূতিগার করা হইয়া থাকে। এমন কি বাড়ীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহকেই সূতিকাগাররূপে মনোনীত করা হইয়া থাকে। গৃহকে উত্তপ্ত রাখিবার জন্য তাহার এক প্রান্তে সামান্য অগ্নি রক্ষা করা হয়। ভদ্র পরিবারেরর বহু মহিলা রীতিমত ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ধাত্রীর কার্য্য করিতেছেন, প্রসব কার্য্যে তাঁহারা সুদক্ষা, নগরে সুশিক্ষিতা ধাত্রীর অভাব নাই। সামান্য অর্থব্যয়েই তাঁহাদিগকে পাওয়া যায়। প্রসূতির গুরুতর সঙ্কট উপস্থিত হইলে সুযোগ্য ডাক্তারের সাহায্যলাভ দুষ্কর হয় না। মূর্খ দাইয়ের দোষে এবং সূতিকাগারের ব্যবস্থায় এবং কুসংস্কারজনিত নানা প্রকার অনিয়মে পল্লী গ্রামে যেরূপ প্রসূতির প্রাণ সংশয় বিপদ বা প্রাণনাশ এবং নবজাত শিশুর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, নগরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাবধানতায় তাঁহাদের পরিবার মধ্যে সে সকল দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে না। উপযুক্ত ব্যবস্থায় অধিকাংশ প্রসূতি ও নব শিশুর জীবন সুরক্ষিত হয়, এবং তাহারা সুস্থ শরীরে যথাসময়ে সূতিকাগার হইতে বহির্গত হইয়া থাকে।

পল্লীগ্রামের প্রসূতিদিগের স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার জন্য সুব্যবস্থার প্রয়োজন। আজ কাল বড় বড় পল্লী গ্রামে শিক্ষিত লোকের অভাব নাই! নগরে শিক্ষিতা ধাত্রীরও বাহুল্য হইয়াছে। শিক্ষিত যুবকগণ আপনাদের স্ত্রী, ভগিনী ও কন্যা প্রভৃতিকে তদ্রূপ সঙ্কট অবস্থায় রক্ষা করিবার জন্য যদি এক একটি প্রধান গ্রামে এক এক জন শিক্ষিতাধাত্রী নিযুক্ত করেন, এবং সূতিকাগারের প্রাচীন ব্যবস্থার প্রতি-

কূলে এবং নূতন প্রণালীর অনুকূলে গ্রাম্য লোকদিগকে কিছু কিছু উপদেশ দেন তাহা হইলে অচিরে শুভফল ফলিতে পারে, অনেকগুলি প্রসূতি নিদারুণ ক্লেশ হইতে মুক্ত হইতে এবং জীবন মৃত্যুর সন্ধি স্থল হইতে জীবন রক্ষা করিতে পারেন। একটি প্রধান গ্রামে একজন উপযুক্ত ধাত্রী নিযুক্ত থাকিলে, সেই গ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী চতুস্পার্শ্বস্থ পল্লীর প্রসূতিগণ প্রসব কালে তাহার সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইবেন না। অবশ্য একজন ধাত্রী নিযুক্ত করিতে কিছু অর্থের প্রয়োজন, উহার উপকারিতা বুঝিয়া গ্রাম্য লোকেরাও চাঁদা দ্বারা সেই অর্থাভাব পূরণ করিতে পারেন। সিন্ধু দেশে অন্তর্গত হায়দরাবাদ অঞ্চলের প্রসূতিগণের প্রতি বাঙ্গালী প্রসূতিদিগের অপেক্ষা অধিকতর অত্যাচার হয়, তথাকার সূতিকাগারের ব্যবস্থা অতিশয় জঘন্য। তাহার সংস্কার ও সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে হায়দরাবাদনিবাসী নারীহিতৈষী ব্রাহ্মযুবা শ্রীমান্ হীরানন্দ সখীরাম এম্ এ রীতিমত চিকিৎসা বিদ্যা ও ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তিনি অচিরে দেহ ত্যাগ করেন, আপনার শিক্ষা ও যত্নচেষ্টার সফলতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। এদেশে কি সেরূপ হীরানন্দ দেখিতে পাইব না?

নারীজাতি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় উক্তি।

দ্বিতীয়।

মোহম্মদীয় শাস্ত্র হদিস।

মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন, সংসারের সমস্ত সম্পৎ, সংসারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ সাধ্বী নারী।

"একজন পুরুষ অপর এক জন পুরুষের সঙ্গে একজন স্ত্রী অপর একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে এক গাত্রাবরণে আচ্ছাদিত হইয়া শয়ন করিবে না।"

—"তোমরা অসম্পর্কিত স্ত্রীলোকের নিকটে গমনে নিবৃত্ত থাকিও।" প্রশ্ন হইয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, স্বামীর স্বগণের পক্ষেও কি এই বিধি?" তিনি বলিয়াছিলেন, "সেরূপ স্বগণের পক্ষেও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।"

মহাপুরুষ মোহম্মদের সহচর মগয়রা নামক ব্যক্তি বলিয়াছেন "আমি একটী নারীকে বিবাহ করিবার প্রার্থী হইয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি কি তাহাকে দেখিয়াছ?" আমি বলিয়াছিলাম, "না দেখি নাই।" তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি তাহাকে দেখিয়া বিবাহ করিও না।"

—যে কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি নারীর সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রথমে দৃষ্টি সঞ্চার করিয়া পরে দৃষ্টি সঙ্কুচিত করেন, এমন হয় না যে, যাহাতে মাধুর্য্যলাভ হয় এরূপ সাধনার নূতনত্ব পরমেশ্বর তাহার সম্বন্ধে বিধান করেন না।

—কোন অকুমারী নারীকে এবং কুমারীকে তাহাদের অভিমত গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত বিবাহের প্রার্থী হইবে না। প্রশ্ন হইয়াছিল, কিরূপে কুমারীর অভিমত গ্রহণ হয়? মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছিলেন, তাহার মৌনাবলম্বনেই হইয়া থাকে।"

—যে জন কোন নারীকে তাহার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে, তাহার সেই বিবাহ অসিদ্ধ, অসিদ্ধ, অসিদ্ধ। * * * * যাহার অভিভাবক নাই রাজা তাহার অবিভাবক।

—যে দাস, স্বীয় প্রভুর অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করে সে ব্যভিচার করিয়া থাকে।

—"যাহার কোন সন্তান হইয়াছে, সে যেন তাহার উত্তম নামে নামকরণ করে, এবং তাহাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দান করে, যখন সেই সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে তখন যেন তাহাকে বিবাহিত করে, যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাহাকে বিবাহ না দেয় এবং সে কুচরিত্র হয় তাহার সেই পাপে পিতা পাপী হইবে, এতদ্ভিন্ন নহে।"

—ইহুদিদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র তওরাতে উল্লিখিত হইয়াছে, যাহার কন্যা দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইয়াছে, সে তাহাকে বিবাহ দেয় নাই এবং সেই কন্যা কলঙ্কিত হইয়াছে, সেই কলঙ্কের ভাগী সেই পিতা হইবেন।

—যে বিবাহবিধানে সাক্ষ্য নাই, উহা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত অঙ্গের ন্যায় ছিন্ন হওয়ার যোগ্য।

—প্রত্যেক বিশুদ্ধহৃদয়ের কার্য্য যদি ঈশ্বরের গুণানুবাদযোগে আরম্ভ না হয়, উহা পরিত্যজ্য। তোমরা এই বিবাহানুষ্ঠানকে জ্ঞাপন করিও এবং তাহা মস্‌জেদে সম্পাদন করিও, তাহাতে বাদ্য বাজিতে দিও।

—আয়শা দেবী একটী আত্মীয়া নারীকে, আন্‌সার কুলোদ্ভব এক পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছিলেন, এমন সময় প্রেরিতপুরুষ মোহম্মদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি তাহাকে নব পতির নিকটে প্রেরণ করিয়াছ? তিনি বলিলেন, হাঁ পাঠাইয়াছি। উক্ত মহাপুরুষ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সঙ্গীত করে এমন লোক কি তাহার সঙ্গে পাঠাইয়াছ? আয়শা বলিলেন, "না, প্রেরণ করি নাই।" মহাপুরুষ বলিলেন, "আন্‌সার এরূপ জাতি যে তাহাদের মধ্যে গজল গান হইয়া থাকে। যদি তোমরা তাহার সঙ্গে এমন লোক প্রেরণ করিতে, যে "আতয় নাকোম্ আতয়নাকোম্ ফহয়না ও হয়াকোম্" এই গজলটি গান করিত, ভাল ছিল।

"এস্‌লামধর্ম্মপ্রচারের পূর্ব্বে স্ত্রীসম্বন্ধে সম্পত্তিসংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এক জন পুরুষ কোন এক নগরে উপস্থিত হইত সে অপরিচিত; যে কাল পর্য্যন্ত সে তথায় অবস্থিতি করিবে মনে করিত, সেই কালের জন্য বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইত। তখন স্ত্রী তাহার জন্য সম্পত্তি রক্ষা করিত, এবং তাহাকে অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিত। যখন উদ্বাহসম্বন্ধীয় কোরাণের আয়তবিশেষ অবতরণ করিল, তখন হইতে সেই কুপ্রথা রহিত হইল।"

আয়শা বলিয়াছেন, আমার নিকটে আন্‌সারবংশীয় একটি কন্যা ছিল, আমি তাহাকে বিবাহিত করিয়াছিলাম। তখন প্রেরিতপুরুষ বলিয়াছিলেন, "তুমি কি সঙ্গীত করিতেছ না? যেহেতু এই আন্‌সারকুল সঙ্গীতপ্রিয়।"

সাদের পুত্র আমের বলিয়াছেন, আমি মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রসিদ্ধ সহচর করজা ও আবু সয়িদের নিকটে বিবাহের নিমন্ত্রণানুসারে গিয়াছিলাম, যাইয়া দেখিলাম কন্যাগণ সঙ্গীত করিতেছে, আমি বলিয়াছিলাম, হে মহাপুরুষের সহচরদ্বয়, তোমাদের নিকটে এ কি ব্যাপার হইতেছে? তাঁহারা বলিলেন, "ইচ্ছা হইলে তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গীত শ্রবণ কর, ইচ্ছা না হইলে চলিয়া যাও," সত্যই বিবাহের আমোদে এ বিষয়ে বিধি আছে।

নায়েগ্‌রা প্রপাত।

মহিলার পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই নায়েগরা জলপ্রপাতের নাম শুনিয়া থাকিবেন; পরন্তু ব্যাপারখানা কি তাহা যে সকলে সম্যক্ বুঝিয়াছেন, এরূপ আশা করা যায় না। প্রথমতঃ সমতল বঙ্গদেশের অধিবাসীরা প্রপাত শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম, যেহেতু অতীব উচ্চনীচ স্থানের অভাববশতঃ প্রাকৃতিক পতনের ভাব তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না। জলপ্রপাত যৌগিক শব্দটী বোধ হয় মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম প্রচলিত করেন; তৎপূর্ব্বে এবম্প্রকার শব্দের ব্যবহার কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র দেশের নৈসর্গিক অবস্থানুসারে ঐ শ্রেণীর শব্দসমূহ ভাষায় স্থান পাইয়া থাকে; তার পর কোম্পানির আমলের পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা তীর্থদর্শনোপলক্ষে কাশী গয়া প্রভৃতি নিকটস্থ স্থানাপেক্ষা বেশী দূরে যাইতে বড় সাহস করিতেন না; সুতরাং ভারতের পার্ব্বতীয় প্রদেশসমূহে যে সকল প্রপাত আছে তাহা দেখিবার অবকাশ কখন পান নাই। এই সকল কারণে ওরূপ শব্দের আবশ্যকতা অনুভূত হয় নাই।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে বহুতর প্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কয়েকটী নায়েগরা অপেক্ষা অনেক উচ্চ—মহারাষ্ট্র-প্রদেশান্তর্গত মহাবালেশ্বরের যেনা-প্রপাত ৮০০ ফুট, ছোটনাগপুর বিভাগে রাঁচির নিকটস্থ হুণ্ডরু-ঘাগ ৪০০ ফুট, দাক্ষিণাত্যে কাবেরী-প্রপাত ৩০০ ফুট, এরূপ আরও দুই চারিটির নাম করা যাইতে পারে—কিন্তু বিস্তৃতিবশতঃ গাম্ভীর্য্য এবং চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্যাবলীর রমণীয়তা জন্য নায়েগরা পৃথিবীর যাবতীয় প্রপাত হইতে বহু উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে; উহার নিকট দাঁড়াইতে পারে এমন একটীও নয়নগোচর হয় না। ইউরোপের অন্তর্গত সুইডেন দেশের টুলহাটান-প্রপাত দেখিয়াছি; অনেক পর্য্যটক উহাকে নায়েগরার নীচেই স্থান দিয়া থাকেন, কিন্তু উহাকে প্রপাত না বলিয়া ৪০০ হাত পরিসরের "রাপিড" শ্রেণী বা নিম্নগামী স্রোত বলিলে ঠিক হয়। নায়েগরা অদ্বিতীয়; সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বিভূতি এখানে যে প্রকার বিশিষ্ট প্রতাপের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে সেরূপ ভূমণ্ডলের মধ্যে আর কোথাও প্রত্যক্ষ করা যায় না। অদ্যাপি কেহ সম্যক্ প্রকারে নায়েগরার মহিমা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়েন নাই। পর্য্যটক-

মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন, নায়েগ্রা কখন কোন পরিদর্শককে বঞ্চিত করে নাই; অর্থাৎ কোন বিশেষ দ্রষ্টব্য কাণ্ড-কারখানা দেখিতে যাইবার অগ্রে সকলেই পূর্ব্বোপার্জ্জিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে মনে মনে তৎসম্বন্ধে একটী ছবি আঁকিয়া যান, এবং অনেকস্থলে বাস্তবিক তদ্রূপ না দেখিতে পাইয়া দর্শককে আপশোষ করিতে হয়—"পোড়া কপাল। এই দেখিতে এত কষ্ট করিয়া আইলাম।" কিন্তু নায়েগ্রা সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত ওরূপ ঘটে নাই, যিনি যতই কেন কল্পনাবলে ভাবিয়া যাউন না প্রত্যক্ষ ব্যাপার তদপেক্ষা অনেক বেশী দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন। বিধাতার শক্তি ও মহিমার প্রাকৃতিক বিকাশের প্রধান দৃশ্য তাঁহাদের দেশে বিরাজিত, এ জন্য আমেরিকানেরা যথার্থই গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ নরনারী দিগ্‌দিগন্তর হইতে আসিয়া এই মহাতীর্থে সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত প্রভাবের পূজা করত শতমুখে নায়েগ্রার প্রশংসা করিয়া যান। তদ্ব্যতীত যাঁহারা নায়েগ্রায় নামিয়া সমস্ত দেখিবার সুবিধা না পান, তাঁহাদের চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জনোদ্দেশে প্রত্যেক ট্রেণ পাঁচ মিনিটের জন্য থামিয়া রেলযাত্রিগণকে একবার নেত্রপাত করিবার অবকাশ দিয়া থাকে। ঘোড়ার গাড়ীতে চৌদ্দমাইল ঘুরিয়া নায়েগ্রা সংক্রান্ত সমস্ত দৃশ্য দেখিতে প্রায় সমস্ত দিন লাগে।

আদিমনিবাসী আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের "ওনায়াকারা" শব্দ হইতে নায়েগ্রা নামের উৎপত্তি, উহার অর্থ—ভীষণশক্তি-সম্পন্ন পয়োবজ্র। তেত্রিশ মাইল দীর্ঘ ও আধ মাইল হইতে তিন মাইল প্রস্থ নায়েগরা নদী সমুদ্রতীর হইতে ৫৭৩ ফুট উচ্চ এরাই নামক হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া তদপেক্ষা ৩২৮ ফুট নিম্নস্থ অণ্টেরিও হ্রদে পড়িতেছে। প্রপাতের পশ্চাতে নদীর পরিসর ৪৭৫০ ফুট, তথায় জলের উপর ৪০ ফুট খাড়া, ১০০০ ফুট প্রস্থ ১৮২ বিঘা ঘন জঙ্গলবিশিষ্ট "ছাগদ্বীপ" বা "গোট-আইলাণ্ড" দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। এই দ্বীপ আমেরিকান কূল হইতে প্রায় ১৪০০ এবং কানাডার তীর হইতে ২৮০০ ফুট ব্যবধান। "কানাডীয়" বা "অশ্বনাল" প্রপাতের খাড়াই ১৫০ ফুট পরিসর; এধার হইতে সোজা ভাবে ওধার পর্য্যন্ত ১৮০০ ফুট; বেড় আধপোয়া। "আমেরিকান" প্রপাত ১৬৪ ফুট উচ্চ, ৬০০ ফুট প্রস্থ। যে গর্ত্তে উহার জল পড়িতেছে, তাহার পরিসর ১০০০ ফুট, পতনশীল জলের চাদর ২০ ফুট পুরু, প্রতি মিনিটে যে জলরাশি নিপতিত হইতেছে, তাহার পরিমাণ এক কোটী আশী লক্ষ ঘন ফুট বা প্রায় সাড়ে চারিকোটী মণ হইবে। আমেরিকানেরা যে হিসাব দেন তাহাতে দুই প্রপাতের জল একত্র করিলে সাড়ে আঠারকোটী ঘন ফুট হয়।

ছাগদ্বীপ-সেতু ও প্রপাতের মধ্যবর্ত্তী স্থলে রাপিড্‌সমূহের স্রোতোবেগ অতীব প্রখর; সুতরাং লম্ফের সময় যে কি ভয়ানক তেজ প্রকাশিত হইতেছে তাহা কল্পনাতীত। সেতুর উপরে দাঁড়াইয়া নীচে

তাকাইলে মনে হয় যেন আমাদিগকেও টানিয়া এখনই ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। উক্ত স্রোতের গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০ মাইল। মধ্যে তিন-বিঘা-ব্যাপ্ত "বাথ-আইলাণ্ড" বা স্নানদ্বীপ, উহার উপরে একটী প্রকাণ্ড কাগজের কল স্রোতঃ-শক্তি দ্বারা পরিচালিত। তার পর ক্ষুদ্র "লুনা দ্বীপ" তদুপরি দাঁড়াইলে বোধ হয় যেন সমস্তটা বাস্তবিকই কাঁপিতেছে। এখান হইতে অল্প দূরে ১৩২ ধাপের সিঁড়ি দ্বারা নামিয়া বর্দ্ধাতীকোট গায়ে "পবন গুহায়" প্রবেশ করিতে হয়, গুহার খাড়াই ১০০, পরিসর ১০০, ও ব্যাস ২০ ফুট; সম্মুখে স্বচ্ছ চাদরের মত প্রপাত ৪০ ফুট ব্যবধান; গুহার ভিতরে যেন সর্ব্বদা ঝড় বহিতেছে, জল ও বায়ুর শব্দ আর কিছু শুনা যায় না; জলের ছিটাতে সুন্দর রামধনু শোভমান। উপরে উঠিয়া নদীর ধারে ধারে ৩০ বিঘা জমি ব্যাপী "প্রস্পেক্ট-পার্কে" যাওয়া যায়; উহার একপ্রান্তে প্রস্পেকৃট পয়েণ্ট" লৌহ রেল দ্বারা রক্ষিত উচ্চস্থান, নীচেই ভীষণ ব্যাপার, অনেকে এখান হইতে ঝম্প দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। প্রপাতের পরেই আবর্ত্ত-র‍্যাপিড সমূহ ও আবর্ত্ত; এই খানে বিখ্যাত সন্তরক কাপ্তেন ওয়েব সাহেব ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই তারিখে অসমসাহিসকতা দেখাইতে গিয়া র‍্যাপিড মধ্যে তনুত্যাগ করেন। এরূপ দুঃসাহসের কার্য্য সে দিন মিসেস্ আনা এডসন টেলর নাম্নী স্ত্রীলোকের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হওয়ায় উক্ত রমণী ঋণমুক্তি হইবার এই অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেন:—একটী পিপার ভিতর আপনাকে বন্ধ করতঃ স্রোতে ছাড়িয়া দিয়া নায়েগ্রা প্রপাতে পতিত হন। এবম্প্রকার তামাসা, দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করা অবলার পক্ষে কম বাহবার কথা নয়! মহিলা কর্ত্তৃক এরূপ ব্যাপার এই প্রথম নয়। কয়েক বৎসর হইল এক ব্যক্তি উক্ত রূপ বিজ্ঞাপন দেয়, এবং ৫০। ৬০ হাজার লোক ব্যাপার দেখিতে উপস্থিত হয়। যথা সময়ে ছাগ-দ্বীপ হইতে পিপা ছুটিয়া প্রপাতে পতনান্তর আবর্ত্তাভিমুখে নানা স্থানের পাথরে ধাক্কা খাইতে খাইতে অবশেষে অণ্টেরিও হ্রদ প্রবেশোন্মুখ শান্ত জলস্রোতে ধরা গেল। তখন উহা খুলিয়া পুরুষের পরিবর্ত্তে এক-জন সংজ্ঞাহীনা রমণীকে উদ্ধার করা হয়। কথা এই যে তাঁহার স্বামী পিপা প্রবেশ করিবার সময়ে অত্যন্ত ভয় পাইয়া কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইলে তিনি তৎপরিবর্ত্তে প্রবৃত্ত হন। দুঃখের বিষয় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উপরিউক্তরূপ পরীক্ষাদি ব্যতীত প্রসিদ্ধ বাজীকর ব্লণ্ডিন ও মেরায়া স্পেল্টেরিণা নাম্নী জনৈক স্পেন দেশীয়া মহিলা উচ্চে টাঙ্গান দড়ার উপর হাঁটিয়া নায়েগরা নদী পার হন; এবং স্যামপ্যাল নামীয় একজন পবন গুহার উপর হইতে দুইবার লম্ফ প্রদান করেন; শেষবারে গতাসু হন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে পিয়ার নামক এক ব্যক্তি প্রচার করেন যে তিনি নূতন সস্পেন্সন ব্রিজ্ বা ঝুলন সেতু হইতে নায়েগ্রা নদীতে ঝম্প প্রদান করিবেন। তাঁহার

কথাতে সকলেই মনে করিল, লোকটার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। অবশেষে ২১শে মে তারিখে বাস্তবিক তিনি উক্ত স্থান হইতে লাফাইয়া পড়েন। লম্ফের পূর্ব্বে একখানি তক্তার শেষভাগে দাঁড়াইয়া যখন তিনি অগণ্য দর্শকবৃন্দের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, সকলেই ভাবিল, তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য, কিন্তু সামান্য দুই একটি চোট ভিন্ন গুরুতর কোন আঘাত প্রাপ্ত [illegible] ফুট উচ্চ হইতে জলে পড়িতে ৪ সেকেণ্ড সময় লাগিয়াছিল। খাড়াভাবে যখন জলে পড়িলেন তখন একটা বড় বন্দুক ছোড়ার মত আওয়াজ হইল।

নায়েগরা কতকাল হইতে আপন প্রতাপে চলিতেছে তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, বর্ত্তমান অবস্থায় অন্ততঃ ৩৫০০০ হাজার বৎসর অবস্থিত। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম শ্বেতাঙ্গ ফাদার হেনেপিন ফ্রান্স কর্ত্তৃক নায়েগরায় প্রেরিত হন, ইনি ক্যাথলিক পাদ্রী ছিলেন। তাঁহার বর্ণনা কিছু অতিরঞ্জিত, কারণ তিনি ঠিক মাপ-জোঁক করিবার অবকাশ পান নাই।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে একজন কাথলিক পাদরী, ফ্রান্সিস্ আবট কতকগুলি পুস্তক ও কয়েকটা বাদ্য যন্ত্র সমভিব্যাহারে আসিয়া নায়েগরা তীরে কুটীর নির্ম্মাণ করত বাস করেন। এই যুবক দুই বৎসরকাল তথায় নায়েগরার মাহাত্ম্য ধ্যান করিতেন এবং দিবসে ও রজনীযোগে প্রপাতের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। অবশেষে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে এক দিবস নায়েগরার পুণ্য সলিলে স্নান করিতে গিয়া ভাসিয়া যান। দশ দিন পরে তাঁহার মৃত দেহ নদীমুখে পাওয়া যায়, এবং তথা হইতে আনীত হইয়া প্রপাতের নিকট সমাহিত হয়।

নায়গরা প্রপাতের তেজ এত ভয়ানক যে সময়ে সময়ে চতুর্দ্দিকস্থ এক মাইলের ভিতরকার গৃহাদির দরজা জানালার কবাট কাঁপিতে থাকে; ১৫ হইতে ২৫ মাইল পর্য্যন্ত শব্দ শুনা যায়, দুই চারিবার ৪৪ মাইল পর্য্যন্ত কানাডায় টরণ্টো নগরে পঁহুছিয়াছিল। অবশ্য বায়ুর গতি ও আকাশের অবস্থার উপর এ সম্বন্ধে তারতম্য নির্ভর করে। এই বিপুল তেজোরাশি বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে, বিজ্ঞানের দ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তি উদ্ভূত হইয়া কল কারখানা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইতেছে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ গণনা দ্বারা জানিয়াছেন যে নায়েগরার তেজে ন্যূনাধিক ৫০ লক্ষ অশ্বশক্তি কার্য্য করিতেছে; বর্ত্তমান সময়ের আবিষ্কৃত যন্ত্রাদির সাহায্যে তাহা হইতে ৪০ লক্ষ অশ্ব-শক্তি অনায়াসে বাহির করিয়া কাজে লাগাইতে পারা যায়। ১ অশ্বশক্তি দ্বারা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব অতিক্রম করত ৪১২ মণ ওজনের জিনিস ১ মিনিটে ১ ফুট তোলা যায়।

প্রপাতের নিকট এক প্রকার শ্বেত প্রস্তর প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে সুন্দর অলঙ্কারাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। আহত

পাথর এবং তাহার তৈয়ারি গহনা আমরা সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

এই প্রবন্ধের কতক কথা ভূপ্রদক্ষিণ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মহিলার পাঠীকাগণমধ্যে যদি দুই এক জনের মনে পর্য্যটন লালসার উদ্রেক হয় লেখা সার্থক হইবে। আমাদের দেশের অনেকেই অধুনা পৃথিবীর নানাস্থান ভ্রমণ করত বিধাতার বিচিত্র লীলা দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিতেছেন, এবং তৎসঙ্গে বিপুল অভিজ্ঞতা লাভে সমর্থ হইয়া চিত্তের প্রসারতা বাড়াইতেছেন, কিন্তু যত দিন না আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা পুরুষদের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগ দিতে পারিতেছেন, তত দিন আমাদের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিতেছে না। উদার গৃহস্বামীর সহিত উদার গৃহিণীর সমাবেশ না হইলে গৃহস্থালী উদার ভাবাপন্ন হইতে পারে না।

মহিলাদিগের রচনা।

কাঞ্চন জঙ্ঘা।

আহা!
কি শান্তির কোলে নীরবে ঘুমাও রাণি!
তুষার অম্বরে ঢাকি মোহন মূরতি খানি।
নাই কি তোমার রাজ্যে জনতার কোলাহল,
গাহে না কি কলকণ্ঠে মুখর বিহগ দল?
নাই কি কুসুম তথা,—অলির ঝঙ্কার নাই?
নির্ব্বিবাদে শিশু হেন নিদ্রিতা রয়েছ তাই!
হিমাদ্রি পর্ব্বত রাজ্যে একচ্ছত্র অধিপতি,
তাঁহার দুহিতা তুমি, গুণে যিনি সরস্বতী।
তোমার কটাক্ষে দেবি! মহা মূর্খ কবি হয়,
বারেক দর্শন পেলে চির মূক কথা কয়!
জাগ্রত প্রহরী সম রাশিকৃত নব ঘন
তব রাজ-অন্তঃপুর ঘিরে থাকে অনুক্ষণ।
জলদ রক্ষক হাতে লয়ে অস্ত্র অন্ধকার
রক্ষিতেছে দিবানিশি ও পুরীর সিংহদ্বার!
হেরিতে তোমারে তাই কত শত ভক্ত এসে
না পেয়ে দর্শন তব ক্ষুণ্ণচিত্তে ফিরে দেশে!
আমিও এসেছি রাণি! তোমারে দেখিব বলে,
মাসাধিক কাল হ'তে আছি তব পদতলে।
কি মনে করিয়া বালা! দিলে মোরে দরশন?
(চাতকীর পক্ষে যেন বিনা মেঘে বরিষণ!)
হেরিয়া তোমায় ওগো! কি হর্ষে ডুবিল মন,
এক মুখে কি প্রকারে করিব তা বরণন!
বিমল অম্বরে এবে একটুকু মেঘ নাই,
যবনিকা খানি যেন উঠিয়া গিয়াছে তাই!
কত ঘুমাইবে দেবি! চেয়ে দেখ আঁখি খুলে
উষা শীর্ষে আরক্তিম অঞ্চল নিতেছে তুলে;
পূরবে বালার্ক হের, (আ মরি কি চমৎকার!)
প্রেরিছে তোমায় রাণি! স্বর্ণকর উপহার!
এখন জাগিলে, দেখি, হাসিছ মধুর হাসি,
মাখিতেছ বর অঙ্গে কনক-কিরণ-রাশি!
পরি ঐ হেম-ছটা, কি সাজে সাজিলে বালা!
মুক্তানিভ শুক্লাম্বরে তরল সুবর্ণ ঢালা!!
হেরি সে অপূর্ব্ব কান্তি মুগ্ধ হ'ল চরাচর,
বলিহারি যাই আহা! কি বা রূপ মনোহর!
শ্যামল ভূধর-শিরে কাঞ্চন মুকুট তুমি,
ধন্য হয় বসুমতী ও চারুচরণ চুমি!
তোমার স্রষ্টারে আমি করি শত নমস্কার,
তোমা হেন গিরিকাব্য অতুল রচনা যাঁর।
ধন্য সেই মহাশিল্পী, করি তাঁরে পরণাম,
যাঁহার কৃপায় মম পূর্ণ হ'ল মনস্কাম।

(Mrs) R. S. Hossein.

ভিখারিণীর নিবেদন।

স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের জন্য আজ কাল দেশ বিদেশে অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ভিক্টোরিয়া মহিলা-বিদ্যালয় ঐ একই উদ্দেশ্য কিন্তু ভিন্ন উপায়ে সম্পাদনকরিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প। উপায়টী যে বিবাহিতা হিন্দু রমণীদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেকেই স্বীকার করেন যে কতগুলি পুস্তক পাঠ করিলেই শিক্ষা হয় না, কিন্তু যিনি গৃহে ও বাহিরে অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ কর্ত্তব্য কার্য্য সকল সুশৃঙ্খলার সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, তিনিই বাস্তবিক শিক্ষিত। আমরা দুর্ব্বল মানব, সংসার পথে চলিতে চলিতে অনেক বাধা, বিঘ্ন, সন্দেহ, ভ্রান্তির ভিতর পড়িয়া দিশাহারা হই, তখন সাধু জ্ঞানীদিগের উপদেশ ও তদভাবে তাঁহাদিগের লিখিত উপদেশপূর্ণ পুস্তক সকল আমাদিগের পথপ্রদর্শকস্বরূপ হয়। আধুনিক হিন্দু প্রথানুসারে বালিকাদিগকে অতি অল্প বয়সে উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে হয়। বিবাহের পূর্ব্বে যাহা কিছু পড়িতে ও লিখিতে শিখে তাহা কেবল মাত্র শিক্ষার সূত্রপাতস্বরূপ বলা যাইতে পারে। বালিকাদিগকে সাধারণতঃ বিবাহের পরই সংসারের নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, অতএব ইচ্ছা করিলেও সময়াভাবে পুস্তকাদি পাঠ করিয়া যে জ্ঞান লাভ করিবে তাহার সুযোগ হয় না। এই অভাবপূরণের জন্য কয়েক জন শিক্ষিত সুবক্তা কর্ত্তৃক ঐ বিদ্যালয়ে সপ্তাহে কয়েক দিন করিয়া সহজ ভাষায় স্ত্রীলোকদিগের সংসারধর্ম্মপালনোপযোগী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় এবং দেশ বিদেশের ইতিহাস ও সাধু সাধ্বীদিগের জীবনী বিবৃত হয়। ইহা অপেক্ষা সহজ উপায়ে শিক্ষা দান করা বোধ হয় আর হইতে পারে না। আমাদিগের পক্ষে আর একটী সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যাহাদিগের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে তাহারা বিনা অর্থব্যয়ে বক্তৃতা শুনিবার জন্য বিদ্যালয়ের গাড়ীতে বাড়ী হইতে আসিতে ও যাইতে পারেন। এইরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াতে ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদিগের সহৃদয়তার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। মহিলাগণ এত সুবিধা সত্ত্বেও বক্তৃতা শুনিতে উদাসীন বলিয়া কেহ কেহ অনুযোগ করেন শুনিতে পাওয়া যায়। এরূপ উদাসীনতার কারণ অনেকেই নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। তাহা না পারিবারই কথা। অনেক স্ত্রীলোকই অবস্থার সামান্য বিভিন্নতা বশতঃ পরস্পরের দুঃখ কষ্ট অভাব বুঝিতে পারে না। পুরুষ জাতি যে স্ত্রীলোকের অভাব বুঝিবেন না তাহা আর বিচিত্র কি!

যে সকল রমণীর প্রতি লক্ষ্মী সুপ্রসন্না, তাঁহাদিগের পারিবারিক কর্ত্তব্য এবং মানসিক অবস্থাসম্বন্ধে জানা আমার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই, অতএব তাঁহাদিগের বিষয় বলিতে আমি সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ।

এক সময়ে আমি বিদ্যালয়ের একজন অত্যন্ত উৎসাহী ছাত্রী ছিলাম, কিন্তু কি

কারণে যে সে উৎসাহ চলিয়া যাইতেছে তাহাই নিবেদন করিবার জন্য আপনাদিগের শ্রীচরণে উপস্থিত হইতেছি, আমার খুব বিশ্বাস হয়, আমা সম দুঃখিনী যাঁহারা তাঁহারাও এই কারণে ক্রমশঃ উদাসীন হইতেছেন।

আমাদিগের দেশে বহুকালের রীতি অনুসারে পুরুষগণ পরিবার প্রতিপালনের উপযুক্ত হউন বা না হউন স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া বিবাহ করিয়া সংসারী হন। অনেকেই শিক্ষা সমাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন না। যাঁহারা এমন ভাবে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন যে নিজে উপার্জ্জন না করিলেও পরিবার ভরণপোষণের কোনরূপ অসুবিধা বা বিঘ্ন হইবে না তাঁহারা সৌভাগ্যবান্। কিন্তু যাঁহাদিগের অদৃষ্টে প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই স্ত্রী পরিজনের ভরণপোষণের ভার স্কন্ধে আসিয়া পড়ে তাঁহাদিগেরই ভীষণ পরীক্ষা। কোন স্থানে সামান্য বেতনে কোন চাকরী পাইলে নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে করেন এবং আশু উপকারও হয় বটে, কিন্তু যখন পরিবার বৃদ্ধি হইতে থাকে অথচ আয় আর বাড়ে না, তখন পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তায় ক্রমশঃ চেষ্টা, উৎসাহ এবং তাহার সহিত সর্ব্ববিধ উন্নতির আশা একবারেই চলিয়া যায়। সাধের সংসার অর্থাভাবে অন্নাভাবে স্বাস্থ্যহীন ও শ্রীহীন হয়। (বিধাতার ইচ্ছায় আমি এই পরিবারভুক্তা)।

আমরা স্ত্রীলোক, নিজেদের শারীরিক সহস্র প্রকার কষ্ট ও অসুবিধা অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারি, কিন্তু প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনের দুঃখ কষ্ট হৃদয়ে শেল সম বিদ্ধ হয়। যখন তাঁহাদের স্ফূর্ত্তিহীন মুখ, পরিশ্রান্ত, রুগ্নদেহ এবং ক্ষুব্ধ মন দেখি, বুক ফাটিয়া যায় জীবনে বীতরাগ হয়। এমন অবস্থায় কোন প্রকার শিক্ষাই আমাদিগের মনকে আকর্ষণ করিতে পারে না। বিশেষতঃ আমার মনে এই একটী দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়াছে যে, মহিলাবিদ্যালয় এখন যে নিয়মে শিক্ষা দিতেছেন তাহা আমাদিগের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক নহে, বরং আরও অশান্তি প্রাণে জাগরিত হয়।

আমরা হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সকল পরিত্যাগ করিতেছি বলিয়া আমাদিগকে নিন্দা করিয়া থাকেন এবং প্রাচীনা হিন্দু রমণীদিগের আচার ব্যবহার এবং কার্য্যপ্রণালী উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিতে বলেন। সম্ভবতঃ উপদেষ্টাগণ তাঁহাদিগের পরিবার পরিজনকে কোন বিষয়ে অভাব ভোগ করিতে দেন না, তথাপি বাটীস্থ রমণীগণ যদি প্রাচীনাদিগের মত কর্ম্মিষ্ঠা, স্নেহশীলা এবং পরোপকারিণী না হন, তবে বলিতে পারেন, কিন্তু আমাদিগেরও কি সেই অবস্থা? প্রাচীন কালে শুনিতে পাই ধনী হইতে সামান্য শ্রমজীবী পর্য্যন্ত সকলেরই গোলায় সংবৎসর অল্পাধিক পরিমাণে ধান এবং অন্যান্য শস্য সঞ্চিত থাকিত, প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে শাক শবজীর বাগান এবং পুষ্করণীতে মাছের অভাব থাকিত না। কেবল মাত্র পরিশ্রম করিয়া খাওয়াইয়া, অতিথি সৎকার করিয়া নিজেকে সুখী মনে করিতে পারিতেন। এখন সময়ের সহিত কত পরিবর্ত্তন দেখা

যাইতেছে। সামান্য মোটা চাউল বাজারে ৪। ৫৲ টাকা মনের কমে পাওয়া যায় না। ভদ্র গৃহস্থের সংসারে বার মাস ত্রিশ দিন দুর্ভিক্ষ। অতি কষ্টে পরিবারস্থ সকলকে উদরপূর্ণ করিয়া অন্ন দিতে যাইলে তাহার উপর একটী ব্যতীত দুইটী ব্যঞ্জন দেওয়াকে মহাসৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতে হয়। এমন অবস্থায় গৃহস্থরমণীরা কি রন্ধন করিবেন, কিই বা পরিবেশন করিবেন এবং কোথা হইতে অতিথিসৎকার প্রভৃতি পুণ্য কার্য্য দ্বারা নিজের ইহ পরকালের গতি করিতে পারিবেন ?

আজ কালকার দিনে অল্প ভাড়ায় পরিবারের আশ্রয় স্থান স্বরূপ দুই একটী ঘর পাওয়া দুঃসাধ্য, সে ঘরে আলোক বায়ু চলাচলের পথ আছে কিনা এ সকল বিষয় অনুসন্ধান করা বাহুল্য মাত্র। তাহার উপর যদি সেই গৃহের কেহ রুগ্ন হন চিকিৎসক, ঔষধ এবং পথ্যের ব্যবস্থা করিতে গৃহকর্ত্তাকে কিরূপ বিপন্ন হইতে হয় অনেকেই তাহা অনুমান করিতে পারেন না। তখন যদি কেহ আসিয়া আমাদিগকে উপদেশ দেন, রোগীরশয্যা দিনে এত বার করিয়া পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, এই পাত্রে ঔষধ বা পথ্য না দিয়া এইরূপ পাত্রে দাও, তখন কি মনে হয় না যে লোকটী আমাদিগকে বিদ্রূপ করিতেছেন। সেই জন্যই বলিতেছিলাম এ শিক্ষায় আমাদিগের প্রাণে অতৃপ্তি অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দেয়। মনে হয় যদি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ইষ্টানিষ্ট জ্ঞান না থাকিত তাহা হইলে হয়ত এ সকল দুঃখ যন্ত্রণা পারিবারিক নিত্য নৈমিত্তিক অবশ্যম্ভাবী ঘটনা বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম।

যাহাই বলি না কেন, অজ্ঞতাবশতঃ মনকে প্রবোধ দেওয়ায় মনের কথঞ্চিৎ শান্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের স্বাস্থ্যভঙ্গ এবং মনোকষ্ট দূর হইবে না। সেই জন্য নারীহিতৈষী মহাশয়দিগের নিকট এই ভিক্ষা করিতে ছিলাম, তাঁহারা কি অনুগ্রহ এবং চেষ্টা করিলে, আমাদিগের দ্বারা দরিদ্র পরিবারের কোন প্রকার সাহায্য হইতে পারে না ?

যদিও সংসারের নিয়ম যে পুরুষ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জন এবং জীবনধারণোপযোগী আবশ্যক দ্রব্যাদির সংগ্রহ করিবে এবং স্ত্রীলোক গৃহে থাকিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবহার ও রক্ষা করিবে। কিন্তু অবস্থা বিশেষে ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি পুরুষ পরিবার ভরণপোষণের উপযুক্ত অর্থোপার্জ্জন না করিতে পারে, স্ত্রীলোকরা কি কাজ করিবার নাই বলিয়া নিষ্কর্ম্মা ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে ? পাশ্চাত্যদেশে দেখিতে পাওয়া যায়, সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পুরুষগণ যদি যথেষ্ট উপার্জ্জন করিতে সক্ষম না হন, স্ত্রীলোকেরা নিঃসঙ্কোচে নানা প্রকার কার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন দ্বারা পরিবারের সাহায্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। বঙ্গদেশীয় ভদ্রনামধারী পুরুষগণ যাহাদিগকে নীচজাতি বা ছোটলোক বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাদিগের সমাজেও নারীজন্ম সার্থক, কেন না আবশ্যক হইলে পরিবারপ্রতিপালনের জন্য

শারীরিক পরিশ্রম করিয়া টাকা আনিতে নারী লজ্জিত বা আলস্য বোধ করে না। শুনিতে পাই কোন কোন বঙ্গদেশীয়া কুমারী এবং বিধবা বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা পাইয়া শিক্ষয়িত্রী, চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারিণী এবং ধাত্রীর কার্য্য করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছেন। আমরাই কি শুধু ভাত ও ডাল সিদ্ধ করিয়া এবং দুই একটা সামান্য কার্য্য করিয়া আমাদিগের কর্ত্তব্যের সমাপ্তি হইল ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিব?

আমি স্বীকার করি, গৃহস্থ রমণীদিগের এমন কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে যাহা তাঁহাদিগের একাদিক্রমে অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত বাহিরে থাকিলে সম্পন্ন করিবার পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা এবং গৃহের বিশৃঙ্খলা হয়। সেই জন্য ইদানীংকার বঙ্গরমণীগণ যে সকল কার্য্য দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছেন তাহা আমাদিগের উপযোগী বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু এমন কতকগুলি অর্থকরী বিদ্যা আছে যাহা শিক্ষা করিলে গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া অবসর পাইলে সংসারে কোথায় কি হইতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও সে কাজগুলি করিতে পারে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিদ্যা চেষ্টা ও যত্ন সহকারে অল্পকাল শিক্ষা করিলেই আয়ত্ত করিতে পারি এবং কতকগুলি বিষয় শিক্ষা করা সময়সাপেক্ষ।

ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয় যদি যে বিদ্যাগুলি অল্প সময়ে শিক্ষা সম্ভব এমন কয়েকটী বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া আমাদিগের সাহায্য করেন তাহা হইলে হয়তো অনেক দরিদ্রপরিবারের অন্নচিন্তা কিয়ৎপরিমাণে লাঘব হইতে পারে। শুনিয়াছি নিম্নলিখিত কয়েকটী কার্য্য অল্প ব্যয়ে অল্প সময়ে শিক্ষা করা যাইতে পারে,—ঘর সাজাইবার জন্য এণ্টিম্যাকেসার, টেবিলক্লথ, রুমাল, ফুটষ্টুল ইত্যাদি। এগুলি বুনিয়া বা শিলাই করিয়া প্রস্তুত হইতে পারে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম এই সামান্য জিনিসগুলি বেশ অধিকমূল্যে বাজারে বিক্রয় হয়। পুঁথি বা reed এর তৈয়ারী পরদারও বিশেষ আদর আছে। কাগজ অথবা কাগজ দ্বারা ফুল ফল তৈয়ার করা, ছবির ফ্রেম তৈয়ার করা, বই বাঁধান, ঘড়ি মেরামত, ধাতুর জিনিস গিল্টি করা, ইলেক্‌ট্রোপ্লেটীং করা ও রং করা, ছাপ দিয়া পাড় তোলা, ফটোগ্রাফী ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনীয়। এবারকার বোম্বাই সহরে শিল্পপ্রদর্শনীতে নারীবিভাগে যে যে জিনিষ দেখান হইবে তাহার তালিকা কিছু পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, একটু মনোযোগ সহকারে তাহা পাঠ করিলে আমাদিগের পক্ষে কোন্ কোনটী শিখা সম্ভব তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। যেমন এক দিকে গরিবদিগের অর্থাভাব বাড়িতেছে তেমনি অপর দিকে ধনীদিগের সৌখীন দ্রব্যের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি হইতেছে। আমি যে যে বিষয় শিক্ষার কথা উল্লেখ করিলাম তাহা দ্বারা ধনীদিগের ব্যবহার্য্য দ্রব্য যোগাইয়া আমাদিগের অর্থাভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর হইতে পারে। ধনিগণ তাঁহাদিগের মনোমত দ্রব্যের জন্য অনেক

সময়ে যে বেশ মুক্তহস্ত হন তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

এখনকার শিক্ষার দ্বারা আমরা হাতের কাছে সকল জিনিষগুলি পাইলে তাহার কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহাই শিখিতেছি, কিন্তু শেষোক্ত বিদ্যা দ্বারা জিনিষগুলি কি করিয়া পাওয়া যাইতে পারে তাহারও জ্ঞান হইবে। অতএব অভাব দ্বারা আমাদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হেতু মনের যে অবনতি তাহাও কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হইতে পারে।

অর্থাভাব অনাটন আমাদিগেরই যে অনিষ্ট করিতেছে তাহা নহে, আমাদিগের সন্তানদিগের ভবিষ্যতে উন্নতির পক্ষে বিশেষ অন্তরায় আনিতেছে। শারীরিক দুর্ব্বলতা বশতঃ মনের সাহস থাকে না, কোন বিষয় শিখিতে চাহিলে অর্থাভাবে সম্ভবপর হয় না, ক্রমশঃ ইচ্ছা উৎসাহ চলিয়া যায়, পরমুখাপেক্ষী হওয়াতে মনের স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার শক্তি থাকে না। আমাদিগের অদৃষ্টে যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছে, কিন্তু এই নির্দ্দোষী শিশুদিগের দুর্দ্দশা দেখিলে আরও কষ্ট হয়।

আমি আমার পত্র আরম্ভ করিয়াছিলাম অর্থাভাবের কথা দিয়া শেষ করিলাম কি করিয়া আমাদিগের অর্থাভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইতে পারে তাহার প্রস্তাব করিয়া, ইহাতে হয়তো অনেকে আমাকে অত্যন্ত অর্থলোভী মনে করিতে পারেন, কিন্তু সর্ব্বদর্শী ভগবান্ জানেন আমার জীবনের এমন উদ্দেশ্য নয় যে টাকা দিয়া "ছিনি মিনি" খেলিয়া দিন কাটাই। আমি কেবল এই টুকু চাই যে অন্নাভাব দূর হইয়া সকলের সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন দেখিয়া জীবনে যে আরও কয়েকটী মহৎ উদ্দেশ্য আছে তাহা সম্পন্ন করি।

একটী দুঃখিনী মহিলা।

ঈশ্বরের জন্য সমুদয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(স্বর্গগতা কিশোরিমোহিনী দেবী কর্ত্তৃক লিখিত।)

[৯৪৩পৃষ্ঠার পর।]

সম্বন্ধ ভঙ্গ হইল, কিন্তু ইহাতে যে কত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে কে বলিতে পারে? এই নলিনীর প্রথম পরীক্ষা, ক্রমে দ্বিতীয় পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল, এই আঘাত তাহার হৃদয়ে বেগের সহিত আসিয়া লাগিল। তাহার পিতা তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি নলিনীর জন্য গর্ব্বিত ছিলেন, নলিনী তাঁহার ঐশ্বর্য্যপূর্ণ গৃহের উজ্জ্বলতম রত্ন; সে পরমাসুন্দরী; তাঁহার অসারত্বকে সন্তুষ্ট করিত, নলিনী বুদ্ধিমতী, শশীভূষণবাবু কৃপণের লোভের মত তাহার প্রশংসা শ্রবণ করিতেন। কারণ সে তাঁহার—তাঁহারই এক অংশ তাঁহারই নিকট আছে। তিনি তাহাকে বসিবার গৃহে আহ্বান করিয়া সমস্ত ঘটনার বিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, তিনি তাহার সম্বন্ধে এরূপ জনশ্রুতি শুনিয়াছেন, যে তাহার আশ্চর্য্যজনক এবং অপ্রীতিকর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে যেন উদাসিনীর ন্যায় নিস্তেজ ভাবে দিন কাটায়,

ইহার কারণ কি? নলিনীর পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বিষম পরীক্ষাস্থল হইল, সম্মুখে কর্কশ, অবিশ্বাসী আনন, কঠিন রেখাতে পূর্ণ ঈশ্বরের প্রমাণ গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু সেই পাপীর বন্ধু যিনি তিনি তাহার নিকটে, নলিনী শান্ত, নম্রভাবে, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ অন্তরে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি দীক্ষিত হইতে অভিলাষ করিয়াছ? "পিতা আমি ইচ্ছা করিয়াছি,"—আশার একটী কিরণ রেখা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল, সে তাঁহার সম্মতির প্রত ক্ষা করে নাই, কিন্তু এই গুরুতর বিষয়ে অনুমতি দিতে যে অসম্মত হইবেন ইহা মনে ভাবে নাই। "তুমি জান তোমার পিসিমা তাঁহার বাড়ীতে কিছু দিন থাকিবার জন্য অনেক দিবসাবধি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।" "তাহা আমি জানি," কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল। তুমি এখন সেখানে যাইতে পার। যদি তুমি এই অসঙ্গত মতকে পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে পদতলে দলিত না কর তবে আমি তোমাকে আমার সহিত থাকিতে দিতে ইচ্ছা করি না। পূর্ব্বের মত হও, তোমার বিলাসের অভাব, ভালবাসার অভাব কিছুই থাকিবে না; কিন্তু যদি এই কদর্য্যমত পোষণ কর এখন হইতে আমি নামে মাত্র তোমার পিতা।" যদিও তাহার হৃদয় ভগ্ন হইল তথাপি পূর্ব্বের মত "ঈশ্বর" বলিয়া নীরব রহিল।

নলিনী পরিত্রাতার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিল, কিন্তু ক্রমশঃ তাহার গতি ধীর, অবয়ব ক্ষীণ, চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট, কপোলদেশ বিবর্ণ হইতে লাগিল। যন্ত্রণা এত অধিক হইয়াছিল, যে তাহার মত শরীর আর অসহ্য দুঃখের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না।, দ্রুতগতিতে সে মৃত্যুর উপত্যকার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, কিন্তু ইহা তাহার নিকট তিমিরাচ্ছন্ন নয়। যাহা দ্বারা সে অন্তরে গভীর বেদনা পাইয়াছিল সে নলিনীর শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া ক্ষমা প্রর্থনা করিল। ক্ষমা প্রার্থনা করিতে কি অধিক বিলম্ব হইয়াছে? তাহার নিজের পরিত্রাণের পক্ষে বিলম্ব হয় নাই কারণ সেই গম্ভীর সময়ে তাহার জীবনের পাপ সকল স্পষ্টরূপে চক্ষের সমক্ষে প্রকাশ পাইল এবং এবং নলিনী মৃত্যু শয্যায়, ঈশ্বরকে হৃদয় সমর্পণ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল। তাহার গর্ব্বিত, নাস্তিক পিতাও ক্ষীণাতনয়ার মৃত্যুজয় বিস্ময় ও ভীতির সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এরূপ মৃত্যুর দৃশ্য দেখিতেও অতি অল্প লোকেই অধিকার পায়। নলিনী সমস্তই সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর চরণে উৎসর্গ করিয়াছে; এবং মৃত্যু কালে দেবীর মত স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত দেখিয়াছে। তাহার আনন পরীর মত, তাহার ভাষা কেবলই আনন্দ, তাহার গৃহ স্বর্গদ্বারের ন্যায়। সে পবিত্র ধীরগতিতে স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছিল এখন আর জগতের পাপান্ধকার সহ্য করিতে না পারিয়া পিতার পুণ্যময় নিকেতনে গমন করিল। মৃত্যুকালে নলিনী গান করিতে বলিলে সকলে গাইল "অনন্ত কাল সাগরে জীবন হইল

লীন।" এক মাত্র পবিত্র ঈশ্বর নাম উচ্চারণ করিয়া নলিনী অনন্তকালের মত পৃথিবী হইতে পলায়ন করিল। আমরা কয়জন নলিনীর মত পৃথিবীর অতি দুর্লভ আদর স্নেহ পরিত্যাগ করিতে পারি, কয় জন ঈশ্বরকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি?

আঁধারে।

বিষাদ আঁধার আজি ঘিরেছে জীবন
ব্যথিত হৃদয়,
শান্তির আলোক জ্বালি প্রাণে এস তুমি
পূর্ণানন্দ ময়!
আনন্দে,—আনন্দময়! মহানন্দে যথা
নাচি উঠে বুক,
এ আঁধারে,—সে আনন্দ, সেই মুখ তব
জাগিয়া উঠুক।
আঁধারে আকুল হৃদি যে অশ্রু ঢালিবে
বিষাদের তানে,
হাসির মুকুতা রূপে ঝরিয়া পড়ুক
চাহি তোমা পানে।
তুমি যারে বিশ্বরাজ! দয়া স্নেহ দিয়ে
রেখেছ চরণে,
সে তার প্রাণের আশা রেখে দে'ছে তব
অভয় শরণে।
তোমা পানে চাহি প্রভু! কাঁদিবে হৃদয়
যাহারে চাহিয়া,
আমি জানি নিজ হাতে দিবে গো আমারে
তাহারে আনিয়া।

শ্রী রৈ—

ধর্ম্মপুত্র *।

(আলোক ও ছায়া প্রণেতৃ কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

(খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান গির্জ্জা অর্থাৎ ধর্ম্মমন্দিরে সম্পন্ন হয়। সেই সময়ে শিশুকে খ্রীষ্টের নামে অভিষেক করা হয়। ইহাকে chistening বলে। এই অনুষ্ঠানে অন্ততঃ একজন পুরুষ ও একজন রমণী শিশুর ধর্ম্মপিতা ও ধর্ম্মমাতা রূপে উপস্থিত থাকেন। ইহারা শিশুর ধর্ম্মজীবন গঠনের ভার গ্রহণ করেন।)

এক কৃষকের একটি পুত্র জন্মিল। কৃষকের বড় আনন্দ। সে এক প্রতিবেশীর নিকট যাইয়া বলিল,—"আমার ছেলের তুমি ধর্ম্ম বাপ হও।"—সে সম্মত হইল না। কেহ গরিবের ছেলের ধর্ম্ম পিতা হইতে চাহে না। কৃষক আর এক প্রতিবেশীর নিকট গেল, সেও অস্বীকার করিল। ক্রমে কৃষক একটি একটি করিয়া গ্রামের সকলের কাছে গেল, কেহই তাহার পুত্রের ধর্ম্মপিতা হইতে সম্মত হইল না। সে তখন গ্রামান্তরে চলিল। পথে এক অপরিচিত ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সে ব্যক্তি থামিলেন এবং তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "বন্ধুহে, সুপ্রভাত। পরমেশ্বর তোমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন?"

কৃষক বলিল "ভগবান আমাকে একটি সন্তান দিয়াছেন, আমার যৌবনে সে আমার নয়নের আনন্দ, আমার বার্দ্ধক্যে আমার

---

* একটী মহিলা কর্ত্তৃক ইংরাজি হইতে অনুবাদিত।

চিত্তের আরাম হ'বে, আমার মৃত্যুর পর আত্মার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিবে—কিন্তু আমি দরিদ্র বলিয়া আমার স্বগ্রামে কেহ তাহার ধর্ম্মপিতা হইতে চাহে না। তাই গ্রামান্তরে চলিয়াছি, যদি কাহাকেও আমার পুত্রের ধর্ম্মপিতা পাই।" অপরিচিত ব্যক্তি কহিলেন—"আমি তোমার পুত্রের ধর্ম্মপিতা হইব।"

কৃষক আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিল। পরে বলিল "এখন ধর্ম্মমাতা কাহাকে করি?"

অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, "আচ্ছা, দোকানদারের কন্যাকে ধর্ম্মমাতা হইতে অনুরোধ কর। সহরে যাও, চকের ভিতরে একটা পাথরের বাড়ীতে অনেক গুলি দোকান দেখিবে, দরজায় গিয়া সওদাগরকে বল যে তিনি তাঁহার কন্যাকে তোমার পুত্রের ধর্ম্মমাতা হইতে অনুমতি দান করুন।"

তোমার সন্তানের নাম করণ কবে?

"কাল সকাল বেলা।"

আচ্ছা, পরমেশ্বর তোমার সহায় হউন।

"কাল সকালে আমার কন্যা যাইবেন।"

পরদিন ধর্ম্মমাতা, ধর্ম্মপিতা উভয়েই আসিলেন, পুত্রের অভিষেক ও নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। অনুষ্ঠান শেষ হইবামাত্র ধর্ম্মপিতা চলিয়া গেলেন। তিনি কে, কেহ জানিতে পারিল না। অতঃপর কেহ তাকে আর দেখে নাই।

শিশু দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া তাহার পিতা মাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিল। সে যেমন সবল, তেমন পরিশ্রমী, যেমন বুদ্ধিমান্ তেমনি মধুরপ্রকৃতি। ক্রমে তাহার বয়স যখন দশ বৎসর হইল, তখন তাহার পিতামাতা তাহাকে লেখা পড়া শিখিবার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন। অন্য ছেলেরা যাহা পাঁচ বৎসরে শিখে এই বালক তাহা এক বৎসরে শিখিতে লাগিল। অল্প কালের মধ্যেই সেই স্কুলে যাহা কিছু শিখিবার তাহা তাহার আয়ত্ত হইল।

ইষ্টার পর্ব্ব (Easter) আসিতেছে। দেখিয়া বালক তাহার ধর্ম্মমাতাকে তদুপলক্ষে অভিবাদন করিতে চলিল, তথা হইতে বাড়ী ফিরিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা', 'বাবা' "আমার ধর্ম্ম পিতা কোথায় থাকেন? আমি তাহাকে অভিবাদন করিয়া আসিতে চাই।" তাহার পিতা বলিলেন, "বৎস, তোমার ধর্ম্মপিতা কোথায় থাকেন আমরা জানি না। এজন্য আমরাও মনে কষ্ট বোধ করি। তোমার নামকরণের পরে আর তাঁহার দেখা পাই নাই, তিনি কোথায় আছেন, এবং জীবিত আছেন কি না, তাহাও জানি না।

বালক পিতা মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিল 'মা' 'বাবা' আমি ধর্ম্মপিতার অনুসন্ধানে যাইব, তোমরা আমাকে অনুমতি দাও। আমি তাঁহাকে খুজিয়া লইয়া আমার পুণ্যাহ সম্ভাষণ (প্রণাম) জানাইয়া আসিব" পিতা মাতা অনুমতি দিলেন, বালক ধর্ম্মপিতার অনুসন্ধানে বহির্গত হইল।

বালক গৃহ ছাড়িয়া পথ চলিতে লাগিল। অর্দ্ধেক দিন হাঁটিয়া চলিয়াছে এমন সময় এক অপরিচিত ব্যক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। অপরিচিত ব্যক্তি তাহাকে

যথারীতি প্রিয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, বৎস, ভগবান্ তোমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন ?

বালক বলিল,"ইষ্টার পর্ব্বোপলক্ষে আমার ধর্ম্মমাতাকে অভিবাদন করিতে গিয়াছিলাম, বাড়ী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম আমার ধর্ম্মপিতা কোথায় ? তাঁহারা বলিলেন, বৎস, তোমার ধর্ম্মপিতা কোথায় থাকেন আমরা জানি না, তোমার নামকরণ করিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন, তৎপর আর তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই, তিনি জীবিত আছেন কি না তাহাও জানি না।" তাঁহাকে দেখিতে আমার ইচ্ছা হইল, আমি এখন তাঁহারই সন্ধানে চলিয়াছি।

অপরিচিত বলিলেন, "আমিই তোমার ধর্ম্মপিতা। বালক আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। পরে বলিল, ধর্ম্মপিতা ! আপনি কোথায় যাইতেছেন ? যদি আমাদের গ্রামের দিকে হয়, তবে আমার সহিত আসুন, আপনাকে আমাদের বাড়ী লইয়া যাইব, আর যদি নিজ বাড়ীর দিকে হয়, চলুন আমি আপনার সঙ্গে যাই। ধর্ম্মপিতা বলিলেন, "তোমার সঙ্গে তোমার বাড়ী যাইবার আমার অবসর নাই। গ্রামের মধ্যে আমার একটু কাজ আছে। কিন্তু কাল আমি বাড়ী থাকিব, কাল তুমি আমার নিকট আসিও।

"আপনাকে কিরূপে পাইব ?"

সূর্য্যোদয়ের দিক লক্ষ্য করিয়া সোজা চলিয়া আসিও। চলিতে চলিতে একটা জঙ্গলে আসিয়া পড়িবে, জঙ্গলের মধ্যে একটা আবাদ জমী দেখিবে, এই পরিষ্কৃত স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিবে, ও সেখানে কি ঘটে লক্ষ্য করিবে। যখন বন অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া আসিবে তখন একটী উদ্যান দেখিতে পাইবে, সেই উদ্যান মধ্যে একটী প্রাচীন গৃহ দেখিবে তাহার সোণার ছাদ। সেই আমার বাড়ী। ফটক পর্য্যন্ত যাইও আমি স্বয়ং আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইব। এই বলিয়া ধর্ম্মপিতা বালকের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

ধর্ম্মপিতার নির্দ্দেশ অনুসারে বালক চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে একটা জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িল, ক্রমে আবাদ জমীতে পঁহুছিল, সেই আবাদ জমীর মধ্যস্থানে একটা প্রকাণ্ড পাইন বৃক্ষ (দেবদারু বৃক্ষ) দেখিল। তাহার একটা শাখাতে একটা বড় দড়ী বাঁধা রহিয়াছে এবং সেই দড়ীতে প্রকাণ্ড ভারি এক খণ্ড তক কাষ্ঠ ঝুলিতেছে। কাষ্ঠ খণ্ডের নিম্নে একটা পাত্রে মধু রহিয়াছে। বালক ভাবিতেছে উপরে ভারি কাঠ ঝুলিতেছে, নীচে মধুর পাত্র ইহার অর্থ কি ? এমন সময়ে বনের মধ্যে কিসের শব্দ শুনা গেল, চাহিয়া দেখে কতকগুলি ভল্লুক আসিতেছে। প্রথমে একটা ভল্লুকী, পরে এক বৎসর বয়স্ক এক ভল্লুক এবং পশ্চাতে আর তিনটি ক্ষুদ্রতর শাবক। ভল্লুকী বাতাস শুকিতে শুকিতে সোজাসুজি মধু পাত্রের দিকে চলিল, শাবকগণ তাহার পশ্চাৎ আসিল। সে মধুপাত্রে মাথা গুঁজিয়া দিয়া শাবকদিগকে আহ্বান করিল। শাবকেরা দৌড়িয়া গিয়া মধু খাইতে লাগিল। যে কাঠ খানা ঝুলিতে-

ছিল একটু সরিয়া গিয়া ফিরিয়া আসিল এবং শাবক দিগকে আঘাত করিল। ভল্লুকী ইহা দেখিয়া থাবাদিয়া কাঠ জোরে ঠেলিয়া দিল কাঠ খানা অনেক দূর পিছাইয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া শাবকগুলিকে আঘাত করিল, কাহারো পিঠে, কাহারো মস্তকে লাগিল তাহারা চিৎকার করিয়া লাফাইয়া চলিল। ভল্লুকী গর্জ্জন করিতে লাগিল, দুই হাতে কাঠ খানা মাথার উপর উচ্চ করিয়া ধরিয়া খুব জোরে ঠেলিয়া দিল। কাঠ খানা অনেক উচ্চে ছুটিয়া চলিল। এক বৎসরের ভল্লুকবৎস্য আবার মধুপাত্রে মুখ পুরিয়া দিয়া চপ্ চপ্ করিয়া মধু খাইতে লাগিল, পশ্চাৎ হইতে অন্য শাবক গুলিও মুখ বাড়াইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা কাছে আসিতে না আসিতে প্রবল বেগে কাষ্ঠখণ্ড ফিরিয়া আসিয়া প্রথম শাবকের মস্তকে এমন আঘাত করিল যে সে তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারাইল। ভল্লুকী পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ভীষণ শব্দে গর্জ্জন করিয়া উঠিল কাঠ খানা ধরিয়া তাহার শরীরের সমস্ত বল দিয়া উহা দূরে ঠেলিয়া দিল। কাঠ খানা উর্দ্ধে ছুটিয়া চলিল, যে শাখার সহিত উহা রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ ছিল, সে শাখা অতিক্রম করিয়া গেল, ও এত উচ্চে উঠিল, যে বন্ধনরজ্জু শিথিল হইয়া গেল। ভল্লুকী এ দিকে বাচ্ছাগুলি লইয়া আবার মধুপাত্রের নিকটস্থ হইল। কাষ্ঠ খণ্ড যত উপরে উঠিতেছিল ততই তাহার বেগ বাড়িতেছিল, হঠাৎ সেটা থামিয়া গেল এবং পরক্ষণেই দ্রুতবেগে ভল্লুকীর দিকে ছুটিয়া আসিয়া তাহার মস্তকে ভয়ঙ্কর আঘাত করিল, ভল্লুকী গড়াইয়া পড়িয়া পা দাপাইতে দাপাইতে মরিয়া গেল। ছানাগুলি পলায়ন করিল।

বালক ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে সে একটি প্রকাণ্ড উদ্যানের নিকট উপস্থিত হইল। উদ্যানের মধ্যে দেখে এক প্রকাণ্ড রাজ প্রাসাদ তাহার ছাদ স্বর্ণনির্ম্মিত। পুরীর দ্বারে ধর্ম্মপিতা সহাস্য মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি স্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক ধর্ম্মপুত্রকে উদ্যান মধ্যে লইয়া গেলেন। সে উদ্যানে কত সুন্দর কত প্রীতিজনক বস্তু, সে কোন দিন স্বপ্নেও এমন দেখে নাই।

ধর্ম্মপিতা বালককে প্রাসাদ মধ্যে লইয়া গেলেন। উহা উদ্যান হইতে আরও চমৎকার। তিনি বালককে প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠে লইয়া চলিলেন। প্রত্যেকটি পূর্ব্বোটি অপেক্ষা আরও মনোহর। এইরূপে যাইতে যাইতে অবশেষে উভয়ে একটি রুদ্ধ দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মপিতা বলিলেন, তুমি এই দরজা দেখিতেছ? ইহাতে তালা চাবি নাই, কেবল একটা মোহরের ছাপ অঙ্কিত আছে। দরজাটা খোলা কিন্তু আমি তোমাকে এই দরজা পার হইয়া ভিতর যাইতে নিষেধ করিতেছি। এই পুরীতে বাস কর, যথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বিচরণ কর, যত প্রকার সুখ ভোগের দ্রব্য আছে তাহা আস্বাদন কর, কিন্তু আমার এই একটি আদেশ পালন করিবে, কদাপি এই দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ

করিবে না। আর যদি বা কর, তবে বনের মধ্যে যাহা দেখিয়াছ তাহা স্মরণ রাখিবে।”

ধর্ম্মপিতা এই বলিয়া, অন্তর্হিত হইলেন। ধর্ম্মপুত্র একাকী নূতন জীবন আরম্ভ কবিল। তাহার এত সুখ শান্তি যে সেই অপূর্ব্ব পুরিতে তাহার ত্রিশ বৎসর তিন ঘণ্টার মত কাটিয়া গেল। তাহার মনে হইল না সে এত কাল আসিয়াছে। ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গেলে পর একদিন সে রুদ্ধ দ্বারের নিকট আসিয়া ভাবিল, “আমার ধর্ম্মপিতা আমাকে এই ঘরে কেন প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, আমি একবার গিয়া দেখিমা কেন ওখানে কি আছে?” সে দরজায় ঠেলা দিল, অমনি মোহরের ছাপ খুলিয়া পড়িল এবং দরজা খুলিয়া গেল। ধর্ম্মের পুত্র ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, এ পর্য্যন্ত যতগুলি ঘর দেখিয়াছে সর্ব্বাপেক্ষা এই খানি বৃহত্তর ও সুন্দরতর। গৃহের মধ্যস্থানে স্বর্ণসিংহাসন। ধর্ম্মের পুত্র ঘরের মধ্যে পাইচারি করিতে লাগিল, ক্রমে সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং সিড়ী দিয়া একবার সিংহাসনে উঠিয়া বসিল। বসিয়া দেখিল সম্মুখে এক রাজদণ্ড সেটা তুলিয়া হাতে লইল। যাই সে রাজদণ্ড হাতে লইল, অমনি গৃহের চারিদিকের প্রাচীর সরিয়া পড়িল। ধর্ম্মের পুত্র চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, সমস্ত পৃথিবী তাহার দৃষ্টিপথে উপস্থিত। মনুষ্যজগতে কে কোথায় কি করিতেছে সকলই দেখিতে পাইল। সম্মুখে চাহিয়া দেখিল বিস্তৃত সমুদ্র, তাহাতে জাহাজ চলিতেছে, দক্ষিণে চাহিল দেখিল ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন জাতীয় সব লোক, বামে সব খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোক, কিন্তু তন্মধ্যে রুসিয়ার লোক নাই। পশ্চাতে চাহিয়া দেখে রুষিয়ার লোক রহিয়াছে। মনে মনে বলিল, এখন দেখি আমার জাতীয় লোকেরা কি করিতেছে, আর এবার ফশল ভাল হইল কি না।

ধর্ম্মের পুত্র নিজের ক্ষেত্রের দিকে চাহিল, দেখিল শস্য আঁটি বাঁধিয়া রাখিয়াছে। কত শস্য হইয়াছে নির্ণয় করিবার জন্য সে আঁটি গুণিতে লাগিল, এমন সময়ে দেখে একখানা গাড়ী ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া যাইতেছে, তাহাতে এক জন কৃষক বসিয়া আছে। সে ভাবিল তাহার পিতা রাত্রে শস্য বাটীতে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন—কিন্তু একটু ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়াই লোকটিকে চিনিয়া ফেলিল। লোকটা রেসিন কুদ্রাসক—শস্য চুরি করিতে আসিয়াছে। রেসিন শস্যের আঁটি গুলি ছুড়িয়া ছুড়িয়া আপনার গাড়ীতে ফেলিতে লাগিল। দেখিয়া ধর্ম্মের পুত্রের ক্রোধ হইল, চীৎকার করিয়া বলিল, বাবা তোমার শস্য চুরি হইতেছে।”

বাড়ীতে তাহার পিতা শয়নগৃহে জাগিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “আমি স্বপ্নে দেখিতেছিলাম আমার শস্য চুরি যাইতেছে, আমি গিয়া দেখিয়া আসি।” তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া ক্ষেত্রের দিকে ছুটিলেন। ক্ষেত্রে গিয়া রেসিনকে দেখিলেন এবং অন্যান্য কৃষকদিগকে ডাকিয়া তাহাদের

সাহায্যে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং বিলক্ষণ প্রহার করিলেন, পরে তাহাকে জেলে পাঠাইলেন।

* * *

ধর্ম্মের পুত্র নিজ জননীর দিকে দেখিল, জননী কুটীরে নিদ্রা যাইতেছেন। এক তস্কর কুটীরে প্রবেশ করিয়া সিন্দুক ভাঙ্গিতেছে। মাতা চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দস্যু মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল এবং কুঠার তুলিয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইল। ধর্ম্মের পুত্র আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিল না, নিমেষের মধ্যে আপনার হস্তস্থিত রাজদণ্ড দস্যুর দিকে নিক্ষেপ করিল, উহা তাহার ললাটে গিয়া লাগিল, সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

যে মুহূর্ত্তে ধর্ম্মপুত্র দস্যুকে বধ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই গৃহের প্রাচীরগুলি আবার আসিয়া যথাস্থানে দণ্ডায়মান হইল, গৃহখানি পূর্ব্বের মত হইল। দরজা খুলিয়া ধর্ম্মের পিতা ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং পুত্রের নিকট আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া দিলেন, বলিলেন :—তুমি আমার আদেশ অবহেলা করিয়াছ; তোমার প্রথম দুষ্কর্ম্ম তুমি দরজা খুলিয়াছ, তোমার দ্বিতীয় দুষ্কর্ম্ম তুমি আমার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আমার রাজদণ্ড নিজহস্তে লইয়াছ, তোমার তৃতীয় দুষ্কর্ম্ম তুমি সংসারে অমঙ্গল বাড়াইয়াছ। তুমি যদি আর অর্দ্ধঘণ্টা এই সিংহাসনে থাকিতে তবে পৃথিবীর অর্দ্ধেক মানুষের সর্ব্বনাশের কারণ হইতে।"

ধর্ম্মেরপিতা পুত্রকে আবার সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং তাহার হস্তে রাজদণ্ড দিলেন। গৃহের চতুঃপ্রাচীর পুনরায় সরিয়া পড়িল এবং সমস্ত জগৎ দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইল।

ধর্ম্মেরপিতা বলিলেন, "এখন দেখ, তোমার পিতার কি করিয়াছ। রেসিন দুই বৎসর কারাগারে থাকিয়া অনেক দুষ্কর্ম্ম শিখিয়াছে ও নিতান্ত পাষণ্ড হইয়া আসিয়াছে। দেখ সে তোমার পিতার দুইটী ঘোড়া চুরি করিয়াছে এবং এখন তোমার পিতার কুটীরে আগুণ লাগাইতে যাইতেছে। তোমার পিতার এই উপকার তুমি করিয়াছ।

ধর্ম্মপুত্র দেখিল তাহার পিতার গৃহ দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু তখনই ধর্ম্মপিতা সে দৃশ্য গোপন করিয়া তাহাকে অন্যদিকে চাহিতে বলিলেন।

"দেখ এই এক বৎসর হইল, তোমার ধর্ম্মমাতার স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধোগতি হইয়াছে, তোমার ধর্ম্মমাতা দুঃখের তাড়নায় সুরাপান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেখ তোমার ধর্ম্মমাতার কি দশা করিয়াছ।"

(ক্রমশঃ)

পাকপ্রণালী।*

লাউয়ের পোড়া পিঠা।

উড়িষ্যার গড়জাত অঞ্চলে এই পিঠা

* একটী মহারাষ্ট্রীয় কন্যা কর্ত্তৃক লিখিত।

প্রস্তুত হয়। দুইটী মাঝারি ধরণের লাউ হলে, এক সের আতপ চাউল ও একসের গুড়ের প্রয়োজন। চাউল গুলি জলে ভিজাইয়া দিবে। এদিকে লাউয়ের খোসা ছাড়াইয়া বীচি ফেলিয়া খণ্ড খণ্ড করে কুটে ধুয়ে জল দিয়ে উত্তম রূপ সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে নামাইয়া জল হইতে লাউ খণ্ড গুলি ছাঁকিয়া লইবে। চাউল গুলিও জল হইতে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এখন লাউ ও চাউল উত্তমরূপে বাটিয়া তাহাতে গুড় মিশাইয়া লইবে। তৎপর চ্যাটাল কড়া, তৈ কিংবা মাটীর বড় সরার উপর কলাপাতা দিয়া তাহার উপর একটু ঘিয়ের হাত বুলাইয়া দিয়া তিন আঙ্গুল কিংবা চারি আঙ্গুল পুরু করে পূর্ব্বোক্ত লাউ চাউল বাটা দিয়া তাহার উপর দিয়ে হাত বুলান কলাপাতা দিয়া কেবল জলন্ত অঙ্গার বিশিষ্টউনেনের উপর রাখিয়া উপরিস্থিত কলাপাতার উপরও জলন্ত অঙ্গার দিবে। এরূপে তিন চারি ঘণ্টার পর উহা উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে খাইবার উপযুক্ত হইবে। যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা গুড়ের পরিবর্ত্তে চিনি ব্যবহার করিতে পারেন।

সংবাদ।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে, ঢাকা নগরস্থ ওয়ারি পল্লীতে একটি পারিবারিক সমাজসংস্থাপিত হইয়াছে সপ্তাহে দুইবার তাহার অধিবেশন হয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকারা মিলিত হইয়া প্রার্থনাদি করেন এবং কি কি উপায়ে পারিবারিক উন্নতি হইতে পারে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে তাহার অধিবেশন হইয়া থাকে।

চট্টগ্রাম নগরে একটি ভগিনীসমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে। পক্ষান্তে এক এক জন ব্রাহ্মের গৃহে তাহার অধিবেশন হয়। ব্রাহ্ম পরিবারের ১৫। ১৬ জন মহিলা এই ভগিনীসমাজের সভ্য। তাহাতে প্রার্থনা, পাঠ সদালোচনা হইয়া থাকে।

আমরা শুনিয়াছি যে, পুরাকালীন অনেক আর্য্য ঋষি বায়ু ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছেন, গাজীপুরের "পওহারী" বাবাজী বায়ু ভক্ষণ করিতেন। পবন আহার করেন বলিয়া তাঁহার নাম পওহারী হইয়াছিল। ভুজঙ্গকুল বায়ু ভক্ষণে অনেক কাল জীবিত থাকে। কিন্তু পশু বায়ু ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে ইতি পূর্ব্বে কখনও শ্রবণ করি নাই। চট্টগ্রামের সন্নিহিত বঙ্গোপসাগরের বক্ষে কুতুবদিয়া দ্বীপ বিদ্যমান। তথায় অনেক সময় গোগ্রাসে তৃণাদি কিছুই থাকে না। তখন তত্রত্য গৃহস্থদিগের গরু সাগরকূলে যাইয়া যেদিক হইতে বায়ু স্রোত বহিতেছে সেই দিকে মুখব্যাদান করিয়া স্থিতি করে। অনেক দিন তৃণাদি কিছুই ভক্ষণ না করিয়া এইরূপে বায়ু ভক্ষণ করিয়া গরু সকল জীবিত থাকে।

সূচী।

মাসিক পত্রিকা।

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।"

১০ম ভাগ] মাঘ, ১৩১১; ফেব্রুয়ারি, ১৯০৫। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

স্ত্রীনিতীসার।

গৃহবিলেপন, গৃহে ঝাঁট দিয়া জঞ্জাল-মুক্ত করা, মসলা বাটা, বাসন ধোওয়া, রন্ধন পরিবেশনাদি করা ইত্যাদিকে অনেক গৃহিণী ছোট কাজ মনে করেন, নিতান্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত তাহা সম্পাদন করিয়া থাকেন। কোন্ কাজ ছোট ও কোন্ কাজ বড় তাহা মনের উচ্চ নীচ অবস্থার উপর নির্ভর করে। যদি তুমি গৃহে স্বাস্থ্য, শুদ্ধতা ও সৌন্দর্য্য-রক্ষার জন্য ভগবানের ইঙ্গিতে ঝাঁট দিয়া গৃহকে জঞ্জালমুক্ত কর, পরিবারস্থ লোক-দিগকে সুখী ও তৃপ্ত করিবার জন্য রন্ধনপরি-বেশনাদি কর, তাহা হইলে, তোমার এই সকল কার্য্য অতি উচ্চ কর্ম্মে, উচ্চ ধর্ম্ম কর্ম্মে পরিণত হইবে; ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তুমি প্রভূত আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে; যশ মান কামনায় লক্ষ টাকা দানাপেক্ষা ঈশ্বরের নিকটে তোমার এই কার্য্যের মূল্য অধিক হইবে। তুমি ভগবানের ইঙ্গিত বুঝিয়া সমস্ত গৃহকর্ম্ম সম্পাদন কর, কাজ করিবার সময় তাঁহার নৈকট্য অনুভব করিতে থাক, এবং তাঁহার নিকটে বল ভিক্ষা কর, তুমি অত্যন্ত ধন্য হইবে।

গৃহকর্ম্মাদিসম্পাদনে শারীরিক ও মানসিক চালনা হয়, তাহাতে শরীর মনের স্ফূর্ত্তি ও স্বাস্থ্য লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা গৃহকর্ম্মে কোনরূপ পরিশ্রম না করিয়া কেবল চেয়ারে বসিয়া দাস দাসীকে হুকুম করেন, সেরূপ গৃহকর্ত্রীগণ সেই শারীরিক মানসিক স্ফূর্ত্তি ও উন্নতিলাভে বঞ্চিত থাকেন। প্রকৃত গৃহিণী শ্রমশীলা ও গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা হন; তিনিই গৃহ-লক্ষ্মী নামে বাচ্য হইয়া থাকেন।

সামান্যাবস্থাপন্না গৃহিণীর কাজ না করিয়া উপায়ান্তর নাই। বিধাতার আদেশ যে যিনি কাজ করিবেন গৃহের কোন কাজকে তিনি ছোট মনে করিবেন না, সকল কাজ শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে সম্পাদন করিবেন।

পুরুষ ও রমণীর কার্য্য ও কীর্ত্তি।

কার্য্য ও কীর্ত্তি নানা প্রকার। নানা প্রকৃতি এবং গুণ ও শক্তিসম্পন্ন লোকের দ্বারা জগতে নানা প্রকার কার্য্য ও কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। সুদৃঢ়মস্তিষ্ক উৎসাহ-বীর্য্যসম্পন্ন পুরুষ দ্বারা অনেক অসম সাহসিকতার কার্য্য, নানা গূঢ় তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া, সংগ্রামে বিস্ময়কর বীরত্ব এবং চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি সকল পৃথিবীতে হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা প্রায় কোন নারী দ্বারা হয় নাই ও হইতেছে না। প্রেমার্দ্র হৃদয়-কোমল প্রকৃতি রমণী দ্বারা বিস্তৃত ভাবে প্রেমের কার্য্য ও প্রেমের কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতি, তাঁহাদের জীবনের কার্য্যও ভিন্ন—কঠিন ও কোমল ভাবাপন্ন। বিপুল সাহস ও শক্তিসম্পন্ন চিন্তাশীল পুরুষের কার্য্য নারীর দুঃসাধ্য, এবং প্রেম-বিগলিতা কোমলহৃদয়া কোমলাঙ্গী বিশেষ বিশেষ রমণীর কার্য্য সাধারণতঃ পুরুষ কখনও সম্পাদন করিতে সমর্থ নহে।

মহাসাহসী নাবিকবর কলম্বস অকূল সাগরের উত্তাল তরঙ্গ ও ভীষণ বিপজ্-ঝটিকাকে উপেক্ষা করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আমেরিকা মহাদ্বীপ আবিষ্কার করেন, তিনি এই মহাকার্য্য সাধন করিয়া জগতে অতুলকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। পরম বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নিউটন লোক-তাড়না ও নানা বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া মাধ্যাকর্ষণশক্তির কার্য্য ও সুপণ্ডিত গ্যালিলিও দুঃসহনিপীড়ন সহ্য করিয়া পৃথিবীর গতিশক্তির ক্রিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই অক্ষয় কীর্ত্তি-স্থাপনে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আত্ম-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মহাত্মা সক্রেটিসের এবং ভারত ও ইয়ুরোপের সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীশঙ্কর, মিল, স্পেন্সার প্রভৃতির কার্য্য ও কীর্ত্তি কি সামান্য? কবিকুলগুরু কালিদাস ভবভূতি সেক্‌স্‌পিয়র মিল্‌টন ওনসরী ক্লেরহুসী প্রভৃতি কাব্য জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। এডিসন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত-গণ নব নব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীকে নূতন শ্রী সম্পদ দান করিয়াছেন। ভীমার্জ্জুন আলেক্‌জেণ্ডার নেপোলিয়ান প্রভৃতি ভুবনবিজয়ী বীরপুরুষ-দিগের বীরত্বের ক্রিয়া এক্ষণও লোকে বিস্ময়ের সহিত স্মরণ করে। বুদ্ধদেব মুসা ঈসা মোহম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অদ্ভুত ও অলৌকিক কার্য্য পৃথিবীতে সম্পাদন করিয়াছেন, মানব জীবনে তাঁহাদের কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইয়া আছে।

রমণীর হৃদয়ের কার্য্য: স্বর্গগতা ভারতেশ্বরী চিরস্মরণীয়া মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া দেবী মুমূর্ষু দরিদ্র নারীর পর্ণকুটীরে সামান্য বেশে যাইয়া তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা করিয়াছেন, দীন দুঃখী লোকদিগের পল্লীতে যাইয়া তাহাদের সংবাদ লইয়াছেন, অভাব বুঝিয়া তাহাদিগকে অর্থ ও বস্ত্রাদি দান করিয়াছেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গগতা প্রিয়তমা কন্যা জর্ম্মণ-সম্রাটের পত্নী সাধারণ চিকিৎসালয়ে যাইয়া সাধারণ রোগীদিগের সে

শুশ্রূষা করিতেন। সাধ্বী কুমারী ক্যাথারাইণ নবযৌবনে সমুদায় সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া দুশ্চিকিৎস্য কত রোগাক্রান্ত রোগী দিগের সেবায় চিরজীবনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কত শত শত সাধ্বী খ্রীষ্টীয়-রমণী দয়ার আবেগে দুঃখব্রত গ্রহণ-পূর্ব্বক দেশ দেশান্তরে দীন দুঃখী রোগী ও অজ্ঞান মূর্খ লোকদিগের দারিদ্র্য দুঃখ ও অজ্ঞানতামোচনে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছেন। কত দয়াবতী রমণী ভীষণ রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ঔষধ পথ্যাদি-দানে আহত সৈন্যদিগকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতরমণীকুলের শিরোরত্ন সতী সীতা দেবী প্রগাঢ় পতিপ্রেম বশতঃ চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য দুখিনী সন্ন্যা-সিনীর বেশে বনবাসিনী হইয়াছিলেন। আখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে, যে পতি-পরায়ণা মহাসতী সাবিত্রী দেবী অলৌকিক কার্য্য করিয়া মৃত পতিকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। দীনজননী স্বর্গগতা মহারাণী শরৎসুন্দরীর প্রজা-বাৎসল্য, মহারাণী স্বর্ণ-ময়ী দেবীর দয়ার কার্য্য এদেশে সকলের স্মৃতিপটে চিরমুদ্রিত রহিয়াছে। কত স্থানে কত সাধ্বী রমণী প্রবল প্রেমের আবেগে পরসেবায় স্বীয় সুখস্বাস্থ্যে জলাঞ্জলি দিয়া-ছেন। সাধারণতঃ ইঁহাদের হৃদয়ের কার্য্য ও কীর্ত্তি, পুরুষদিগের মস্তিষ্কের কার্য্য ও কীর্ত্তি। তবে মস্তিষ্কের পরিচয় দান করিয়াছেন এরূপ দুই এক জন লীলা-বতী খনা ছিলেন, এখনও আছেন, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। আবার হৃদয়ের আবেগে পুণ্যশ্লোক ফাদার ডামিয়েন সকল দুঃখ ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক দুর্গম দ্বীপে প্রবাসী হইয়া বহুক্লেশে রোগীদিগের সেবা করিয়া-ছিলেন, তথায় সেই ভীষণ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া অশেষ কষ্ট যাতনায় প্রাণ দিয়াছিলেন। ধর্ম্মানুরাগ-বশতঃ অনেক রমণী অতুল পার্থিব কীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন। গয়া তীর্থে প্রতিষ্ঠিত বহু লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে নির্ম্মিত দেবী অহল্যা বাইয়ের রমণীয় বিষ্ণু-মন্দির এ দেশে সামান্য কীর্ত্তি নহে? অনেক জনহিতৈষিণী মনীষী মহিলা হৃদয়ের কোমল ভাব, দয়া ও সহানুভূতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া দুঃখীর দুঃখ মোচনার্থ গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে বহু নরনারীর অশেষ কল্যাণ বিপন্ন জনের বিপদুদ্ধার হইয়াছে। আমেরিকাবাসিনী কোন কোন পরদুঃখকাতরা সহৃদয়া মহিলা স্বীয় লেখনীর প্রভাবে জনসাধারণের হৃদয়কে দয়ার্দ্র ও সমুত্তেজিত করিয়া পাপদাসত্বপ্রথার উন্মূলনে সহায়তা করি-য়াছিলেন। আর্য্য মহিলাগণ জগতের কল্যাণার্থ বিশেষ বিশেষ কীর্ত্তি স্থাপন ও কার্য্য করিয়া ধন্য হউন, ইহা আমাদের প্রার্থনা।

রন্ধন-প্রণালীবিষয়ে দুই একটী কথা।

চট্টগ্রাম-নিবাসিগণ সমধিক লঙ্কাপ্রিয়, সাধারণতঃ এ দেশের সকলে এরূপ দুর্নাম করিয়া থাকে। আমরা চট্টগ্রামস্থ কয়েকটি ভদ্র পরিবারে ভোজন করিয়া সেই দুর্নাম

অমূলক বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কেন না সেই সকল পরিবারের মহিলাদিগের প্রস্তুত ডাইল ডালনা ইত্যাদিতে মৃদু ঝাল অনুভব করিয়াছি, কখনও কোন ব্যঞ্জনের লঙ্কার তীব্রতায় আমাদের মুখ জ্বালা করে নাই, জ্বালা-নিবৃত্তির জন্য আমাদিগকে কোন প্রতিবিধান করিতে হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা ভাবিয়াছিলাম, চট্টগ্রামের ভদ্র পরিবারে কখনও অধিক লঙ্কার ব্যবহার হয় না; জেলে চাসা প্রভৃতি সামান্য শ্রেণীর লোকেরাই অতিরিক্ত লঙ্কা-প্রিয়। সকল দেশের নিম্ন শ্রেণীর শ্রমজীবী লোকেরাই অধিক ঝাল খায়, তজ্জন্য কেবল চট্টগ্রাম দোষী নহে। এ অঞ্চলের ভদ্র পরিবারের ন্যায় চট্টগ্রামের ভদ্র পরিবারেও ব্যঞ্জনাদিতে লঙ্কার মৃদুঝাল হইয়া থাকে। কিন্তু এবার আমাদের সেই সংস্কার অমূলক হইয়াছে। সম্প্রতি আমরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে যাইয়া তত্রত্য একজন ডাক্তর বাবুর আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম; প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন যে, আমাদের পরিবারে মরিচ হুকৃতনি বা (মরিচ হুকৃত) প্রিয় খাদ্যরূপে প্রচলিত। তাহা প্রস্তুতির প্রণালী এই :—লঙ্কা মরিচ উত্তমরূপে বাটিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লবণ সংযোগে কিয়ৎক্ষণ জ্বালে চড়াইয়া রাখিলেই উহা প্রস্তুত হয়। এই হুকৃতনী-রূপ অন্নোপকরণের সাহায্যে প্রচুর অন্ন ভোজন করা যায়। পাঠিকা, সকল দেশেই আদা ব্যঞ্জন সুকৃত সম্পূর্ণ লঙ্কাসম্পর্ক শূন্য ঈষৎ তিক্ত দ্রব্যমিশ্রিত আলুবেগুণপটলাদি তরকারিযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য! নিরবচ্ছিন্ন লঙ্কায় সুকৃত প্রস্তুত হয়, তাহা চট্টগ্রামের ভদ্র পরিবারের প্রিয় খাদ্য! তাঁহারা এই বিষজীর্ণ করেন কিরূপে! পেট জ্বলে যায় না কি? তবে অভ্যাসে বিষেরও বিষত্ব থাকে না। আমরা এই সুকৃত মিশ্রিত এক গ্রাস অন্ন ভক্ষণ করিলে নিশ্চয় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিব আমরা আমাদের পরিবারস্থ মহিলাদিগকে এই মরিচ হুকৃতনীর বিষয় জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিলাম, আমাদের উপাধ্যায় মহাশয় সুকৃত-প্রিয় তাঁহারা যেন এই অপূর্ব্ব মরিচ সুকৃত প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে একবার খাইতে দেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত দয়া করা হইবে। ডাক্তর বাবু আর একটি উপাদেয় অন্নোপকরণের কথা বলিয়াছিলেন, উহা মরিচ চাট্নি। তাহা প্রস্তুতির প্রণালী এই :—দগ্ধ লঙ্কা মরিচ চটকাইয়া পলাণ্ডু ও লসুন সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া তাহার সঙ্গে তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিলেই মরিচ চাটনি প্রস্তুত হয়। এই মরিচ চাটনী নাকি তাঁহাদের অতিশয় মুখপ্রিয় হইয়া থাকে। এই সকল উপাদেয় সামগ্রীর আস্বাদ আমরা কখনও প্রাপ্ত হই নাই, চট্টগ্রামের অনেক ভদ্র পরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিয়াছি, কোথাও মরিচ হুকৃত ও মরিচ চাটনী খাইতে পাই নাই। মহিলাগণ তাহা খাইতে না দিয়া আমাদের প্রতি দয়াই করিয়াছেন, মরিচহুকৃত ও মরিচচাট্নীর স্বাদ গ্রহণ করিতে এ অঞ্চলের পাঠিকাদিগের কাহারও কি ইচ্ছা হয়?

কিছু দিন হইল আমরা শ্রীহট্ট ও

কুমিল্লা জিলার অন্তর্গত দুইটী পল্লীতে দুইটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। তত্রত্য মেয়েদের প্রস্তুত নানা প্রকার নূতন নূতন ব্যঞ্জনোপকরণের স্বাদ গ্রহণ করিয়া আমরা অত্যন্ত সুখী ও তৃপ্ত হইয়াছি। অনেক ব্যঞ্জন এমন সুরস ছিল যে, তদ্রূপ অন্যত্র প্রায় কোথাও আমরা রসনায় স্পর্শ করি নাই। তবে দোষের বিষয় এই যে, ব্যঞ্জনের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল, কোন্‌টা খাইব কোন্‌টা খাইব না ভাবিয়া আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কুমিল্লা ও শ্রীহট্ট জিলার পল্লীবাসিনী মহিলাগণ এ অঞ্চলের সভ্যতাগর্ব্বিত মহিলাগণ অপেক্ষা রন্ধন পটুতায় বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এ অঞ্চলের মহিলারা বেতনভোগী পাচকপাচিকার হস্তে এই পবিত্র কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া ক্রমে এই সদ্গুণ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। উক্ত দুই জিলার পল্লীবাসিনীদিগের অনেকে দেশীয় নানাবিধ শিল্প কর্ম্মে আশ্চর্য্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাহার কতকগুলি আমরা উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ের মহিলাদিগকে প্রদর্শন করিবার জন্য সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। বিগত ১৮ই মাঘ ৩০। ৪০জন মহিলার নিকটে "এবারকার ভ্রমণবৃত্তান্ত" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল, তখন মহিলাদিগকে সেই সকল শিল্প দ্রব্য প্রদর্শন করা গিয়াছিল। এ অঞ্চলের মহিলাগণ বিলাতী শিল্পের একান্ত পক্ষপাতিনী হওয়ায় এবং দেশীয় শিল্পকর্ম্মকে উপেক্ষা করায় এ দেশের প্রাচীন শিল্প এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে শ্রীহট্ট ও কুমিল্লা অঞ্চলের মহিলাগণ সেই শিল্পের রক্ষা ও উন্নতি সাধন করিতেছেন, তাঁহাদের হস্তরচিত শিল্প কর্ম্মের নমুনা আনয়ন করিয়াছি বটে, কিন্তু ব্যঞ্জনাদির নমুনা আনয়নের কোন সুযোগ হয় নাই। আমরা স্বয়ং আস্বাদন করিয়া আসিয়া মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দান করিতেছি যে, রন্ধনপটুতায় শ্রীহট্ট ও কুমিল্লার নিকটে রাজধানী কলিকাতা পরাস্ত হইয়াছে। অগ্নিবৎ ভীষণ মরিচ হুকৃত ও মরিচচাটনীযোগে প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়া মুখপ্রিয় সুস্বাদু ব্যঞ্জনোপকরণে সমাপ্ত করা গেল।

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

কুতুবদিয়া দ্বীপ।

বিগত ১৬ই পৌষ শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ৮৷০ টার সময়ে অর্ণব পোতারোহণে চট্টগ্রাম হইতে আমরা কুতুবদিয়া দ্বীপে যাত্রা করি। চট্টগ্রামস্থ নববিধান সমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ শান্তিপদ আমাদের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। কুতুবদিয়া চট্টগ্রাম নগরের অনতিদূরে বঙ্গোপসাগরের বক্ষঃস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, এই দ্বীপ চট্টগ্রাম জিলার সবডিভিজন কক্স বাজারের অন্তর্গত। এই দ্বীপের পরিমাণ ফল ৪৫ বর্গ মাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ১০৬০০, তন্মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী মোসলমান; নাপিত তেলী প্রভৃতি অল্পসংখ্যক হিন্দু অধিবাসী আছে। এই দ্বীপ গবর্ণমেণ্টের

খাস তহসিলের অন্তর্গত। এই স্থানে সাগর কূলে খাস তহসিলদারের কাচারী, দাতব্য চিকিৎসালয় ও আউট পোষ্ট এবং পোষ্টাফিস ইত্যাদি বিদ্যমান। দ্বীপের পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তে Light House (দীপঘর)। আমরা বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় কুতবদিয়াতে উপস্থিত হই। তত্রত্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার শ্রীমান্ দীন বন্ধু দাস আমরা যে সেই দিন জাহাজে তথায় পঁহুছিব, পূর্ব্বেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য চেলানের ঘাটে লোক পাঠাইয়াছিলেন। তখন ভাটা পড়িয়াছিল, জল সরিয়া যাওয়াতে বহুদুর পর্য্যন্ত চেলানের কূল কর্দ্দমময় ছিল। জাহাজ হইতে ক্ষুদ্র নৌকায় অবতরণ করা যায়। জাহাজের সারঙ্গ নৌকার মাঝিকে এইরূপ অনুমতি করে যে,পাঁকের উপর দিয়া নৌকা টানিয়া লইয়া গিয়া শুষ্ক জমীতে বাবুদিগকে নামাইয়া দিবে, তাঁহাদিগকে যেন কাদা মাড়াইতে না হয়, এরূপ করিবে। মাঝি বক্‌শিশ পাইবার লোভে তাহাই করিয়াছিল। আমরা ডাক্তার দীনবন্ধুর প্রেরিত লোকের সঙ্গে ডাক্তার খানার অভিমুখে যাত্রা করি। পদব্রজে দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নীলনিভ নীরনিধির কূলে উক্ত ডাক্তার বাবুর আবাসে উপস্থিত হই। গৃহদ্বারের সম্মুখেই বীচিমালা-বিক্ষোভিত বিশালবক্ষঃ বারিধি গর্জ্জন ও আস্ফালন করিতেছে দেখিয়া এবং সুখস্পর্শ সামুদ্রিক শীতল সমীরণ, সংস্পর্শ করিয়া গতক্লম হই ও অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করি। আমরা আহার করিয়া আসি নাই জানিতে পারিয়া দীনবন্ধু অন্ন প্রস্তুত করিয়া দেন। এই দ্বীপে প্রচুর ধান্য জন্মে, অন্য কোন শস্য প্রায় কিছুই জন্মে না। নাসিকাবিনিঃসৃত শ্লেষ্মাপুঞ্জসদৃশ সামুদ্রিক লটিয়া মৎস্যই এই দ্বীপবাসীদিগের একমাত্র অন্নোপকরণ। আমরা নিরামিষভোজী,মসুর ডাইল মাত্র উপকরণে চারি বেলা ভোজন করিয়াছি; দীনবন্ধু একবিন্দু দুগ্ধ বা কোনরূপ তরকারি কিংবা অন্যবিধ ডাইল সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এক দিন তাঁহার নিজের গাছের পেপের ডালনা দ্বিতীয় ব্যঞ্জন হইয়াছিল। আমাদের সহযাত্রী শান্তিপদ আমিষভোজী, লটিয়া মাছের বিশেষ ভক্ত, তিনি এক দিন প্রচুর লটিয়া মাছ খাইতে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। অনেক বাঙ্গালি বাবু এই দ্বীপে সাগরকূলে স্বাস্থ্যনিবাসস্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। কেন না এখানকার জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর। কিন্তু আহারে বিশেষ বৈরাগ্যাবলম্বনব্যতীত এই স্থানে বাস করা অসম্ভব। এই কুতুবদিয়া দ্বীপের সাগরকূল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের আধার, ধর্ম্মসাধকদিগের সাধনপক্ষে বিশেষ অনুকূল। পুরাকালে কুতুবোদ্দিননামক একজন মোসলমান সাধক এই দ্বীপে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নামানুসারে ইহার কুতুবদিয়া নাম হইয়াছে।

আমরা পরদিন (১৭ই পৌষ) প্রত্যুষে দীপগৃহাভিমুখে যাত্রা করি। ডাক্তার খানা হইতে Light House চারি মাইল দূরে, এই দ্বীপে যানবাহনের অভাব, পদ-

ক্রমে আমাদেরও শান্তিপদকে সাগরতীরবর্ত্তী বর্ম্ম অবলম্বনে যাইতে হয়। এই লাইট হাউস সপ্ততল, ইহা ১৮৪৭ সালে স্থাপিত হইয়াছে, ইহার উচ্চতা ১৩৭ ফুট। শান্তিপদ এই দীপ ঘরের চূড়ায় আরোহণ করিয়া চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা এক তালা পর্য্যন্ত উঠিয়াই নামিয়া আসি। শ্রুত হওয়া গিয়াছে যে, অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে ১৬ মাইল দূর হইতে ইহার সমুজ্জ্বল দীপ দর্শনপূর্ব্বক লক্ষ্য স্থির করিয়া পোতবাহকগণ ভীষণ সমুদ্রে পোত চালনা করিয়া থাকে। আমরা Light House হইতে বেলা ১০টার মধ্যে ডাক্তার খানায় প্রত্যাগত হই, কিয়ৎক্ষণ শ্রান্তিদূর করিয়া সাগরজলে অবগাহন স্নানানন্তর ভজন ও ভোজন করিয়া বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করি। অপরাহ্ণে ডাক্তার দীনবন্ধুর বিজ্ঞাপনানুসারে স্কুলগৃহে একটি সভা হয়। ২৫। ৩০ জন মোসলমান এবং খাস তহসিলের আমলা প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ করা যায়। উক্ত দ্বীপনিবাসী কাজি আনওয়ার-আলিনামক বৃদ্ধ মোসলমান উর্দ্দু ভাষায় আমার নিকটে ধর্ম্মবিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে উর্দ্দু ভাষায় পরে বাঙ্গলা ভাষায় একঘণ্টা কাল কথোপকথন হয়। ১৮ই পৌষ সোমবার অপরাহ্ণে চট্টগ্রামে ফিরিয়া যাইবার জাহাজ কুতুবদিয়া প্রণালীর ঘাটে পঁহুছিবে, উর্দ্ধশ্বাসে ঘাটে যাওয়া যায়। কক্সবাজার হইতে জাহাজ পঁহুছিতে প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইল। জাহাজ-ঘাটে প্রশস্ত চড়ায় লটিয়া মাছ ও চূণ চিঙ্গড়ী ইত্যাদি রৌদ্রে শুষ্ক করা হইতেছিল। সেই সকল মাছের দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল, আমাদের যেন অন্নপ্রাসনের অন্ন পর্য্যন্ত উদর হইতে নির্গত হইয়া পড়িতেছিল। আমি কোথায় পলায়ন করিব ভাবিতেছিলাম। এই সকল সামগ্রী চট্টগ্রামবাসীদিগের প্রিয় খাদ্য। এদেশের অনেকে কড়াইয়ের ডাইলের ভক্ত, কড়াইয়ের ডাইল পাইলে যেমন দ্বিগুণ অন্ন উদরস্থ করিতে পারেন, তদ্রূপ চট্টগ্রামের অনেক লোক অন্নের সঙ্গে কিঞ্চিৎ লটিয়া হুংনীর (দুর্গন্ধ শুষ্ক লটিয়া মাছের) যোগ করিতে পারিলে একজনেই দুইজনের ভাত উদরে স্থান দান করিতে পারেন। লটিয়া মৎস্যে অনেক ফস্ফরাস্ আছে বলিয়া সাহেববিবিগণ ইহা পছন্দ করিয়া থাকেন। শুনা গিয়াছে শুষ্ক চূণ চিঙ্গড়ী-পুঞ্জ কক্সবাজার ও আকিয়াব অঞ্চলে প্রেরিত হয়। মগেরা তাহাদ্বারা নপ্পি নামক তাহাদের উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করে। সেই নপ্পির ব্যবসায়ে এক এক জনে সহস্র সহস্র মুদ্রা লাভ করিয়া থাকে। একই মনুষ্যজাতির মধ্যে দেবভোগ্য বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভোজন প্রচলিত আছে, আবার পৈশাচিক ভোজন ও রাক্ষসী ভোজনও বাহুল্যরূপে প্রচলিত। লোকের কিরূপ রুচি, প্রকৃতি ও চরিত্র আহারে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

আমরা বেলা ৩ টার পরে জাহাজে আরোহণ করি। স্বর্গগত রায় বাহাদুর রামশঙ্কর সেন মহাশয়ের পৌত্র, ব্যারিষ্টার

গিরিজাশঙ্কর সেনের পুত্র চট্টগ্রামের ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু প্রফুল্লশঙ্কর সেন সপরিবারে কুতুবদিয়াতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। এই জাহাজেই তিনি চট্টগ্রামে ফিরিয়া যান। আমরা রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় চট্টগ্রামে উপনীত হই। রাজেশ্বর বাবুর অন্যতর পুত্র আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য অশ্বশকট সহ ঘাটে উপস্থিত ছিলেন, আমরা গৃহে যাইয়া ভোজন ও বিশ্রাম করি। পরদিন ১৩ই পৌষ মঙ্গলবার সায়ংকালে চট্টগ্রামস্থ প্রিয় ভ্রাতা কাশীচন্দ্র গুপ্তকে সঙ্গে করিয়া সন্দীপ দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করা যায়।

বঙ্গোপসাগরের বক্ষস্থলস্থিত দ্বীপপুঞ্জ এবং উক্ত সাগরের সন্নিহিত পল্লীসমূহ সময়ে সময়ে ভয়ঙ্কররূপে বিপদাপন্ন হইয়াছে। এক এক সময়ে এই সাগর ভীষণাকার ধারণ করিয়া দ্বীপনিবাসী এবং সন্নিহিত পল্লী-নিবাসীদিগকে গৃহ অট্টালিকা ও বৃক্ষলতাদি সহ গ্রাস করিয়াছে। সাগরের সেই ভয়ঙ্কর প্রকোপে অতি অল্প লোকেই প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছে ; ১২৮৩সনের ১৬ই কার্ত্তিকের ঝড়ে বঙ্গোপসাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া চট্টগ্রাম ও নওয়াখালি এবং বরিশাল জিলার অন্তর্গত বহু দ্বীপ ও বহু জনপদ গ্রাস করিয়াছিল, তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। কুতুবদিয়া ও মহিষখালি প্রভৃতি দ্বীপের এবং সন্নিহিত জনপদের প্রায় চল্লিশ সহস্র লোক মারা যায়। বহু স্থানের কোন চিহ্নই ছিল না। ১৩০৪ সালের ঝটিকায় বঙ্গোপসাগর উচ্ছ্বসিত হইয়া কুতুবদিয়া সন্দীপ বাঁশখালি উজান টাঙ্গ শোণাদিয়া মাতার বাড়ী গোরখঘাটা প্রভৃতি দ্বীপ উপদ্বীপ সকল গ্রাস করে, তাহাতে ন্যূনাধিক ২৫ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। সাগরের সেই ভীষণ আক্রমণ হইতে যাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহারাও অন্ন বস্ত্রাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। চট্টগ্রামস্থ বদান্য ধনী নিত্যানন্দ বাবু অকাতরে তণ্ডুল বিতরণ করিয়া সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই সময় সন্দীপে শ্রীযুক্ত ৰী রায় মহাশয় মুনসেফের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার দয়া ও চেষ্টা যত্নে সেই দ্বীপের বহু লোকের প্রাণ রক্ষা পাইয়াছিল। আজও উক্ত দ্বীপনিবাসিগণ কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা স্মরণ করিয়া থাকে। কুতুবদিয়াপ্রভৃতি দ্বীপের বিপন্ন লোকদিগের প্রাণরক্ষার্থ চট্টগ্রামে পাঁচ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৩ সহস্র মুদ্রা সদয়হৃদয় ভ্রাতৃবর কাশীচন্দ্র গুপ্তের হস্তে ন্যস্ত হয়। তিনি ক্ষুদ্রনৌকাযোগে বড় বড় সাগর শাখা অতিক্রমপূর্ব্বক কুতুবদিয়া প্রভৃতি দ্বীপে যাইয়া উপযুক্ত পাত্রে তণ্ডুল বস্ত্র এবং পয়সা বিতরণ করিয়াছিলেন, পরে অর্থের অকুলন হওয়াতে বাঁশখালি হইতে প্রায় ১৫০ দেড় শত অন্ন বস্ত্রহীন স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা সঙ্গে করিয়া চট্টগ্রামে লইয়া আসিয়াছিলেন। কাশীবাবু তাহাদিগকে চারি মাস কাল মিয়ুনিসিপালিটীর কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া নিজে নানা উপায়ে তাহাদের আহার যোগান; তাহারা প্রত্যহ পরিশ্রম

করিয়া যে দুই চারি আনা উপার্জ্জন করিত, তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখেন। তিনি চারি মাসান্তে সেই অর্থে গরু নাঙ্গল ইত্যাদি ক্রয়পূর্ব্বক স্বস্থানে যাইয়া কৃষি-কর্ম্মাদি করিবার জন্য তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেন। উজানটাঙ্গ দ্বীপে ৩ টি পরিবারের বসতি ছিল। কাশী বাবু সে স্থানে যাইয়া কোন লোকের বা ঘর বাড়ীর কিংবা বৃক্ষাদির চিহ্নও প্রাপ্ত হন নাই, সাগরের জলোচ্ছ্বাস সমুদায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। কেবল একটি কুকুরকে তিনি জীবিতাবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাকে নৌকায় তুলিয়া নগরে লইয়া আসিয়াছিলেন। কুতুবদিয়া দ্বীপে মহিষখালি-নিবাসী বাবু মহেশচন্দ্র শীলনামক একজন ওভারসিয়ারের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, গত ৮ই অগ্রহায়ণ রাসপূর্ণিমার ঝড়ে শোণাদিয়াদ্বীপের সন্নিহিত সাগরে ৪।৫ শত জেলে মারা গিয়াছে। তাহারা সাগরে জাল ফেলিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ মাছ ধরিয়া আনিয়া শোণাদিয়া দ্বীপে শুষ্ক করিত, সেই শুষ্ক মাছ নানা স্থানে বিক্রয় হইত। সকল স্থানে তাহারাই শুষ্ক মাছ যোগাইত। সেই সকল জেলে নির্ম্মূল হওয়াতে চট্টগ্রামে লটিয়া হুংনির এক প্রকার দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে। ওভারসিয়ার বাবু অতিশয় দুঃখ প্রকাশে বলিলেন, "লটিয়া মাছেই আমরা জীবন রক্ষা করিয়া থাকি, চারি পাঁচ শত জেলের মৃত্যুজন্য তাহার অভাব হওয়াতে আমরা বড়ই কষ্টে পড়িয়াছি।" গঙ্গোপসাগরের ন্যায় ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কারী গ্রামজনপদের উচ্ছেদসাধক কোন সাগর নাই। এই সাগরে পুনঃ পুনঃ প্রলয় ঝটিকা হয়। ঝটিকার সঙ্গে তাল বৃক্ষ পরিমাণ সাগরের জলরাশি স্ফীত হইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে, এবং মহাবেগে গ্রাম নগর প্লাবিত করিয়া লোকজন গৃহ সম্পত্তি ভাসাইয়া লইয়া যায়। এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে এরূপ বিপৎসঙ্কুলস্থানে পুনর্ব্বার মানুষ যাইয়া বসতি করে কেন? "জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" লোকে জন্ম ভূমির মমতা ও প্রচুর শস্য-সম্পত্তিপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করিতে পারে না, এই জন্য।

এবার চট্টগ্রাম নগরে যাইয়া বিশেষ কারণে অনেক দিন স্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। চট্টগ্রামের বিশেষ বৃত্তান্ত পূর্ব্বতন ভ্রমণবৃত্তান্তস্থলে বিবৃত হইয়াছে। এবার একটী কথার উল্লেখ করিয়া উপসংহার করা যাইতেছে।

এই নগরে আবদুল করিম নামক একজন ধার্ম্মিক সওদাগর বাস করেন, বাণিজ্য-ব্যবসায়ে তাঁহার বিপুল ধন সম্পত্তি হইয়াছিল। পুত্রদিগের অমিতাচারে বাণিজ্যে ক্ষতি ও সম্পত্তি নষ্ট হয়। ১০।১২ হাজার টাকা ছিল, তিনি তাহাদ্বারা একটি সাধারণ ভজনালয় (মস্‌জেদ) নির্ম্মাণ করেন, স্বীয় অমিতাচারী পুত্রদিগকে কিছুই প্রদান করেন না। ৮।১০ টাকা আয় হয় এমন একটি সামান্য দোকান নিজে চালাইয়া থাকেন, অতি সামান্য ভাবে সাত্ত্বিকরূপে জীবন যাপন করেন। তিনি এক ব্যক্তিকে মাসিক ৫ টাকা দিয়া থাকেন, সে তাঁহাকে দুই বেলা অন্ন প্রস্তুত করিয়া

দেয়। মোসলমানেরা ভজনালয়নির্ম্মাণে মুক্তহস্ত, অনেকে তজ্জন্য অকাতরে নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়া থাকেন। একটি ব্রহ্ম-মন্দিরনির্ম্মাণে ব্রাহ্মগণ কয় টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করেন, এবং কয় দিনের তাগাদার পর কয় বৎসর পরে কয় টাকা পরিশোধ করেন? অপিচ কয়টাকা কেবল স্বাক্ষরেই পরিণত থাকে?

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পৃথিবীর সাধু সাধ্বী, ভক্ত বিশ্বাসী, সাধক এবং ধার্ম্মিকদিগের জীবন পরম পবিত্র ভাগবত। ইহা হরিলীলার মধুর ভাণ্ড, সংসারসমুদ্রে আলোকস্তম্ভ, ধর্ম্মজীবনে বিশেষ সহায়। এইরূপ পবিত্র জীবনের পুণ্যকাহিনা শ্রবণ করিলে ঈশ্বরে ভক্তির সঞ্চার হয়, সংসারাসক্তি নিবৃত্ত হয়, পরিত্রাণের পথ সুগম হয় তাই আজ আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা আমাদের পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ঊননবতিবৎসর যিনি ভারতের পবিত্র আকাশে শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রকাশিত থাকিয়া বিগত ৬ই মাঘ স্বর্গগমন করিলেন, তাঁহার পবিত্র জীবনের কথা অল্পাধিক পরিমাণে অধিকাংশ বঙ্গবাসী নরনারী অবগত আছেন। ইনি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সুবিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হঁহারই পিতা স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর একজন প্রসিদ্ধ জমিদার ধনী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। ভারতের বর্ত্তমান যুগের অদ্বিতীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এবং সমাজসংস্কারক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সহিত ইনি বন্ধুতা-সূত্রে বদ্ধ ছিলেন। বালক দেবেন্দ্রনাথকে মহামতি রামমোহন বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন; দেবেন্দ্রনাথ রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কে জানিত এই ধনী সন্তান পরবর্ত্তী সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিবেন? কে জানিত ইনি ধন মান ঐশ্বর্য্য ও সুখ-ভোগের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মার্থে জীবন মন প্রাণ উৎসর্গ করিবেন? কিন্তু ভুভার হারী মঙ্গলময় শ্রীহরির লীলা অতি দুরবগাহ্য। কি সূত্রে তিনি কাহার জীবন তাঁহার দিকে আকর্ষণ করেন কেহই বুঝিতে পারে না। সকল দেশেই ধনী সন্তানগণ বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত হন, এবং অধিকাংশ স্থলেই পাপ প্রলোভনের হস্তে পতিত হইয়া কলঙ্কিত জীবন লইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া থাকেন। কিন্তু বিধাতা অতি উচ্চ উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতামহী দেবী ইঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পিতামহী যখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত অবস্থায় গঙ্গাতীরে নীত হন, তখন দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পূর্ণিমার রজনীতে শ্মশান-ক্ষেত্রে মৃতকল্প পিতামহী দেবীর দেহের অনতিদূরে দেবেন্দ্রনাথ এক খানা সামান্য মাদুরে বসিয়া আছেন, হৃদয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত।

মহর্ষির রুগ্নাবস্থা।

এমন সময়ে হঠাৎ দেবেন্দ্র নাথ ব্রহ্মদর্শন-জনিত ভূমানন্দ হৃদয়ে লাভ করিলেন। হৃদয় জ্যোতির্ম্ময় হইল, প্রাণ মন অতুলানন্দে পুলকিত হইল, কিছু কাল পরে তাঁহার সেই আনন্দ অন্তর্হিত হয়। তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সে আনন্দ আর প্রাণে ফিরিয়া আসিল না। মহর্ষি বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন, ঘোর বৈরাগ্যের ছায়া তাঁহার হৃদয়ে পতিত হইল। ইহার পর হইতে তিনি ব্যাকুল প্রাণে ধর্ম্মান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। নানা প্রকার ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করিলেন, কিছুতেই প্রাণ শান্তি লাভ করিতে পারে নাই, এমন সময় ছাদের উপর রজনীতে বিস্তৃত নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, অগণ্য নক্ষত্ররাজি আকাশের কোলে শোভা পাইতেছিল, তখন তাঁহার অন্তরে প্রশ্ন আসিল, এরূপ অগণ্য নক্ষত্ররাজি কি পরিমিত দেবতা সৃষ্টি করিতে পারেন? যিনি এই বিশাল বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই অসীম এবং অনন্ত। সেই নভোমণ্ডলদর্শনে তাঁহার পরিমিত দেবতার প্রতি, পৌত্তলিকতার প্রতি বিশ্বাস একেবারে বিদূরিত হইল। অন্য এক দিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে উপনিষদের এক খানি ছিন্ন পত্র প্রাপ্ত হন। বেদের অন্তঃ ভাগকে বেদান্ত বা উপনিষদ্ বলে। ইহা অনন্ত ব্রহ্মবিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। ছিন্নপত্র খানি পাইয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন আচার্য্য শ্রীমদ্ রামচন্দ্রবিদ্যাবাগীশের নিকট লইয়া গেলেন, এবং তাহার অর্থ বুঝিয়া কৃতার্থ হইলেন। ঈশ্বরের কৃপায় ঘটনা-পরম্পরাযোগে মহর্ষি বুঝিতে পারিলেন যে, একমাত্র সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানময় অনন্ত ব্রহ্মই জীবের একমাত্র উপাস্য এবং তাঁহার উপাসনাতেই মনুষ্যের মুক্তি ও উন্নতি। এই হইতে তিনি দেব দেবীর উপাসনা হইতে সম্যক্ বিরত হইলেন। গৃহে যখন দুর্গোৎসবাদি পৌত্তলিক অনুষ্ঠান হইত, তখন তিনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নৌকা যোগে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতেন। ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে এই ভাব সমুদিত হইল যে, অন্য লোকে দুর্গোৎসবের সময় পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, আমরা কেন ব্রহ্মোপাসনা করিব না। এই ভাব হইতে তিনি ভ্রাতৃগণ সহ সম্মিলিত হইয়া এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনার নিমিত্ত তত্ত্ববোধিনী সভা-স্থাপন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচার করিলেন, এবং কিছু দিন পরে ভ্রাতৃগণ সহ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। ইহার কিছু কাল পরে দুইটী গুরুতর পরীক্ষা তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইল। পরীক্ষা ভিন্ন জীবন খাটি হয় না, স্বর্ণ যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হয়, মনুষ্যজীবন তেমনি পরীক্ষার অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ হয়। ইতিমধ্যে মহর্ষির পিতৃদেব পরলোকে গমন করেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলেই মহর্ষিকে বলিলেন, তোমার পিতা মহৎ ব্যক্তি, এখন ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধে কোন গোলযোগ করিও না। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে ধীর ভাবে

বলিলেন,আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, আমি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে পারিব না। এদিকে অল্পবয়স্ক যুবক, এখনও সংসারে প্রবিষ্ট হন নাই, আত্মীয় স্বজনের তাড়না, তাঁহার সহিত সহানুভূতি করে এমন লোক অল্প, সেই দুঃসময়ে এক মাত্র ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া অতুল সাহস সহকারে তিনি আপনার বিশ্বাসানুসারে অপৌত্তলিক ভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। তাঁহার জীবনে বিবেকের জয়, ধর্ম্মের জয় ঘোষিত হইল।

তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর বৃহৎ সংসারের সমগ্র ভার যুবক দেবেন্দ্র নাথের মস্তকে পতিত হইল। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বৃহৎ জমিদারীর অধিকারী হইয়াও বহু টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়া পরলোকগামী হন। তাঁহার সম্পত্তি ঋণ-জালে জড়িত হইয়া পড়ে। ঋণ-দায়ে স্বীয় সম্পত্তি বিনষ্ট না হয় এজন্য দ্বারকা নাথ কৌশলাবলম্বনে অধিকাংশ সম্পত্তি ট্রষ্টীর হস্তে অর্পণ করিয়া যান। তাঁহার এমন অনেক ঋণ ছিল যাহার উপযুক্ত নিদর্শনপত্রও উত্তমর্ণদিগের হস্তে ছিল না। ঋণ-ভারাক্রান্ত ষ্টেট মহর্ষির হস্তে আসিল। উত্তমর্ণগণ (মহাজনগণ) ঋণের জন্য নালিশ করিল। অনেক ঋণ এমন ছিল যে, অস্বীকার করিলে মহাজনগণের ঋণ প্রমাণ করিবার সাধ্য ছিল না। কেহ কেহ মহর্ষিকেই সাক্ষী মান্য করিল। মহর্ষি অম্লানচিত্তে সত্য কথা বলিলেন, এবং টাকা ডিক্রী হইল। মহাজনগণ সমবেত হইয়া ঋণ আদায়ের পরামর্শ করিতে লাগিল, তখন সত্যপরায়ণ মহর্ষি বলিলেন, যদি আমার অন্যান্য সম্পত্তি দ্বারা ঋণ পরিশোধিত না হয়, আমি আমার ট্রাষ্ট সম্পত্তি মহাজনগণের হস্তে অর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি। এই কথা শুনিয়া পরিবারমধ্যে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। ট্রাষ্ট সম্পত্তি গেলে এই বৃহৎ পরিবার ছারখার হইবে, সকলকে পথের ভিকারী হইতে হইবে। কিন্তু সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প মহর্ষি কিছুতেই বিচলিত কি সত্যভ্রষ্ট হইলেন না। ভগবান্ সাধুমহাজনদিগের একমাত্র সম্বল; গতিনাথ শ্রীহরি গতিহীনের গতি। মহর্ষির সাধু ব্যবহারে উত্তমর্ণদিগের হৃদয়ে সহানুভূতি ও দয়ার সঞ্চার হইল। তাঁহারা অনেকে ঋণের কতকাংশ মাপ করিয়া টাকা লইতে সম্মত হইল, এবং টাকা শোধের নিমিত্ত কিছু দিনের জন্য মহর্ষির পরিবারের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক সমস্ত ষ্টেটের ভার মহাজনগণ গ্রহণ করিল। মহর্ষির গাড়ী ঘোড়া বিক্রয় এবং বিলাসভোগাদি হ্রাস করিয়া সামান্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ন্যায় দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভগবানের কৃপায় ঋণ পরিশোধিত হইয়া ষ্টেট তাঁহার হস্তে আগত হইল। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর কোন এক দাতব্য কার্য্যে এক লক্ষ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, মহর্ষি সেই টাকা পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া সম্পূর্ণরূপে পিতৃঋণ পরিশোধ করিলেন, এবং ক্রমে যেমন এক দিকে ধর্ম্মোন্নতি তেমনি অন্য দিকে ষ্টেটের উন্নতি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্ম কৃপায় তাঁহার সম্বন্ধে

সংসার ও ধর্ম্ম উভয়ই নিষ্কণ্টক হইল। সত্য যাঁহার ব্রত ঈশ্বর তাঁহার সহায়, এই সত্য মহর্ষির জীবনে প্রতিপন্ন হইল।

প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় সত্যপরায়ণতা এবং ব্রহ্মজ্ঞান এই দুইটী তাঁহাদের জীবনের বিশেষত্ব ও অলঙ্কার ছিল। সত্যকাম জাবালের উপাখ্যান যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা একথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিবেন। প্রাচীন মহর্ষিদিগের মধ্যে কেহ গৃহস্থ ছিলেন, কেহ বা সন্ন্যাসী ছিলেন। গৃহস্থের ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার নাই, একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা আর্য্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ নহেন। আমরা দেবেন্দ্রনাথের জীবনে সত্যপরায়ণতাএবং ব্রহ্মজ্ঞান আশ্চর্য্যরূপ দেখিতে পাই; এই জন্যই সমস্ত ভারত একবাক্যে তাঁহাকে দেবদুর্লভ মহর্ষি উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে যে উপদেশ আছে:—

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

তাহা মহর্ষির জীবনে সম্যক্ সার্থক হইল। ইহা কি ভারতের কম সৌভাগ্য? যে আর্য্য ঋষিভাব ভারতে বিলুপ্ত হইয়াছিল ভগবানের কৃপায় মহর্ষির জীবনে তাহা পুনরাগত হইল, ভারত পুনরায় ঋষিজীবন দেখিয়া আশান্বিত হইল; ইহা কি কম আনন্দের বিষয়? আমরা এজন্য মঙ্গলময় ঈশ্বরকে উর্দ্ধবাহু হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করি।

মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় সাংসারিক বিপৎ পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মহর্ষি সমগ্র বঙ্গদেশে ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশ্যে প্রাণ মন ঢালিয়া দিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিলেন, এবং অতুল সম্পত্তির বহু পরিমাণ আয় ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের জন্য ব্যয় করিতে লাগিলেন। তিনি যখন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দান করেন, তখন ব্রাহ্মসমাজ মৃতকল্প। কেবল মাত্র মহাত্মা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন ও একটি মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ অন্য একটি কক্ষে বেদ পাঠ করেন। যেখানে বেদ পঠিত হইত, তথায় ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও যাইবার অধিকার ছিল না। মহর্ষি দেখিলেন ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মবিরুদ্ধ, ব্রাহ্মধর্ম্মে সকল জাতির সমান অধিকার, সেখানে বৈষম্য কেন হইবে? এজন্য বেদপাঠ তিনি উঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস কি, ব্রাহ্মগণ কিরূপ আচরণ করিবেন, কিরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিবেন, কিছুই স্থির ছিল না। ইনি উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্র মন্থন এবং আন্তরিক প্রেরণানুসারে সে সকল স্থির করিয়া মণ্ডলীকে একটি সুন্দর অবয়ব প্রদান করিলেন। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হয়, এবং সমাজে লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য বহুচেষ্টা ও অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মগণ মহর্ষির সাধু অনুষ্ঠানের সহায় ছিলেন। মহর্ষি সমাজের সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন, এবং তাঁহার ব্যয়েই স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত মহোদয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিতেন। মহর্ষির কি

অদম্য প্রচারোৎসাহ হইয়াছিল। তিনি বজরা যোগে স্থানে স্থানে গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিতেন। তাঁহার সাধু চেষ্টায় তৎকালীন বর্দ্ধমানাধিপ এবং কৃষ্ণনগরের মহারাজ ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হন, এবং বর্দ্ধমান নগরে বর্দ্ধমানের মহারাজ একটি ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন করেন।

মহর্ষির ধর্ম্মপিপাসু হৃদয় বাহিরে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ক্ষান্ত থাকিত না। "ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরস পান" এই তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। তাহা আত্মস্থ করিতে তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। তিনি গায়ত্রী মন্ত্র সাধন করিতেন, উপনিষদের প্রাণপ্রদ বাক্যার্থে মনোনিয়োগ এবং হাফেজের গজল পাঠ ও অনুধ্যান করিতেন, ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা ও গান করিতেন। নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রাণারাম পরব্রহ্মকে দর্শনপূর্ব্বক মুগ্ধ হইতেন। কখন ব্রহ্মগুণ গানে কখনও যোগধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। এই ভাবে আত্মোন্নতি সাধন এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি কল্পে পরিশ্রম করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্তও ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল ভিত্তি কি তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। বেদের প্রতি মহর্ষির অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি মনে করিতেন বেদই ব্রাহ্মদিগের অভ্রান্ত শাস্ত্র, কিন্তু মহর্ষি সমগ্রবেদ অধ্যয়ন করেন নাই। বঙ্গদেশে তৎকালে বেদের চর্চ্চা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল। কোন গ্রন্থের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না হইয়া তাহার প্রতি আস্থা স্থাপন নিতান্ত অবিধেয়। এই জন্য মহর্ষি কাশীধামে চারি জন পণ্ডিতকে বেদাধ্যায়নজন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বেদ শিক্ষান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহর্ষি এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট বেদের ব্যাখ্যা করিলেন। মহর্ষি দেখিলেন, বেদ কখনও অভ্রান্ত হইতে পারে না। ইহাতে সত্যের সহিত অনেক ভ্রম কুসংস্কার জড়িত আছে। তখন বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকৃত হইল। তৎপর ব্রাহ্মসমাজকে যথেচ্ছাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মহর্ষি উপনিষ ও অন্যান্য হিন্দু শাস্ত্র হইতে "ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ" নামে একখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রচার করিলেন। মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনাকালে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যান সকল ধর্ম্মার্থীর অতি প্রিয় সামগ্রী। যিনি ইহা পাঠ করেন তাঁহারই হৃদয় শুদ্ধ হয়।

যোগ ধ্যান মহর্ষির অতি প্রিয় ছিল। সংসারে কোন প্রকার সাধনে বিঘ্ন দেখিলেই তিনি নিরাপদে ব্রহ্মসাধনোদ্দেশ্যে পর্ব্বতে চলিয়া যাইতেন, এবং কখন কখন অতি দীর্ঘকাল পর্ব্বতে বাস করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে প্রথমে যাঁহারা তাঁহার সঙ্গী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শুষ্ক জ্ঞানী ছিলেন। তর্ক বিতর্ক ও শুষ্ক জ্ঞানালোচনা দ্বারা সত্য নির্দ্ধারণ করা তাঁহাদের অভ্যাস ছিল। অনেক সময় তাঁহারা ঈশ্বর মঙ্গলময় কি না তাহা অধিকাংশের মতের দ্বারা স্থির করিতে প্রয়াস পাইতেন। জন্মবিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ দেবেন্দ্রনাথের প্রাণ

ইহাতে তৃপ্ত হইবে কেন, তিনি বিরক্ত হইয়া সুদূর পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। পর্ব্বত-বাস কালে নদীর দৃষ্টান্ত তাঁহার হৃদয়কে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিল। নদী নির্জ্জন নিভৃত পর্ব্বত-গুহায় জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা জনপদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়। তাহার প্রবল প্রবাহে কত দেশ কত স্থান শস্য-শালিনী হয়, পার্শ্বস্থ স্থানে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হয়। নদী সমুদ্রকে লাভ করিতে গিয়া জগতের কেমন সেবা করে। মনুষ্য-জীবনও তেমনি। ইহাকেও ব্রহ্মজলধিতে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে হইবে, কিন্তু যতদিন জীবন-নদী প্রবাহিত হয়, তত দিন জগতের কল্যাণ সাধন করা ইহার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন। প্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্মের এই আদেশবাণী শ্রবণ করিয়া মহর্ষি পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গৃহে আসিয়া দেখিলেন যুবক কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রকে পাইয়া মহর্ষি আনন্দ ও উৎসাহে বিহ্বল হইলেন। ধর্ম্মানুরাগী পরমোৎসাহী কেশবকে মহর্ষি পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন, এবং কেশবচন্দ্রও মহর্ষিকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। যুবক ও প্রৌঢ়ের মিলন অপূর্ব্ব ফল প্রসব করিতে লাগিল। মহর্ষি কেশবের অপূর্ব্ব বিশ্বাস পূর্ণ জীবন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং অচিরে ঈশ্বরের আদেশে তাঁহাকে ব্রহ্মানন্দ উপাধি প্রদান করত ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে বরণ করিলেন। পিতা পুত্র উভয়ে এক প্রাণ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গঙ্গা ও যমুনা প্রয়াগে সম্মিলিত হওয়ায় যেমন প্রবল স্রোতস্বতী উৎপন্ন হইয়াছে, তেমনি দুইটী ধর্ম্ম জীবন মিলিত হওয়ায় ব্রাহ্মসমাজে একটী মহাশক্তি উৎপন্ন হইল; ব্রাহ্মধর্ম্মের সৌরভে দিগ্ দিগন্তর পূর্ণ হইল, নানা জাতীয় লোক ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং সমস্ত পৃথিবী সতৃষ্ণনয়নে ব্রাহ্মসমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। বিধাতার ইচ্ছায় এবং ক্রমোন্নতির অপরিহার্য্য নিয়মে পিতা পুত্রে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল, এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্বতন্ত্র ভাবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। সমাজ পৃথক্ হইল বটে, কিন্তু কেশবচন্দ্রের হৃদয় মহর্ষি হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই, চির দিন তিনি তাঁহার ধর্ম্মপিতাকে প্রাণের গভীরতম কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন, এবং মহর্ষিও তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

এই বিচ্ছেদের পর মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের ভার অনেক পরিমাণে অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করিয়া অধিকাংশ সময় যোগ ধ্যান সাধন ভজনে ক্ষেপণ করিতেছিলেন। সাধন-পথে তাঁহার জীবন দিন দিন উন্নত হইতে লাগিল। ঈশ্বরকে দর্শন জীবনের অন্ন পান হইয়া দাঁড়াইল, তাঁহার প্রাণ নিয়ত ব্রহ্মজলধিতে নিমগ্ন থাকিত। তিনি ইহকালে আছেন কি পরলোকে স্থিতি করিতেছেন ইহা বুঝা যাইত না। ব্রহ্মতত্ত্ব

ও পরলোকতত্ব সম্বন্ধে কত সুগভীর কথা অজস্র তাঁহার মুখারবিন্দ হইতে নির্গত হইত। তিনি যেন জীবন্মুক্তাবস্থায় স্থিতি করিতেন। কিন্তু এ অবস্থাতেও মহর্ষি স্বীয় প্রিয়তম ব্রাহ্ম সমাজকে বিস্মৃত হইতেন না। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশ বিদেশে প্রচারিত হয়, ব্রাহ্মগণ এক ব্রহ্মের নামে ভ্রাতৃ ভাবে সম্মিলিত হন, ইহা তাঁহার প্রাণের বাসনা ছিল। প্রতি বর্ষে মাঘোৎসবের সময় তাঁহার গৃহে ব্রাহ্মদিগের সম্মিলন হইত, সকল সমাজের ব্রাহ্মগণ তথায় গিয়া একত্র উপাসনা করিতেন। সাধন ও ব্রাহ্মসম্মিলনজন্য তিনি বোলপুরনামক স্থানে বহুব্যয়ে শান্তি-নিকেতন স্থাপন করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্ম-সমাজের কল্যাণের জন্য বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন।

পরিবারের ধর্ম্মোন্নতিবিধানের জন্যও মহর্ষির যত্ন ছিল। তাঁহার পরিবার বঙ্গদেশের মধ্যে নানা বিষয়ে একটি সমুন্নত পরিবার। তাঁহার পুত্র কন্যা প্রভৃতি প্রায় সকলেই সুমার্জ্জিতজ্ঞানসম্পন্ন এবং সাহিত্য চর্চ্চায় বিশেষ মনোযোগী।

বার্দ্ধক্যবশতঃ মহর্ষির স্বাস্থ্য দিন দিন ভগ্ন হইতেছিল। বায়ু ও স্থান পরিবর্ত্তন ও সুচিকিৎসানিবন্ধন অনেক বার তিনি উৎকট ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ণ বধির ও চক্ষু দৃষ্টি-শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এবং চিকিৎসকগণ বলেন, তাঁহার অন্তিম কাল অতি নিকটে। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আত্মীয় স্বজন এবং ব্রাহ্মগণ একত্র হন। বিগত ৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহর ১-৫৫ মিনিটের সময় সজ্ঞান অবস্থায় ব্রহ্মগত-প্রাণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বর্গলোকে বিশ্বজননীর কোমল ক্রোড়ে স্থান লাভ করিলেন। নশ্বর দেহ পৃথিবীর অগ্নিতে দগ্ধ হইল, ধূলিতে পরিণত হইল, কিন্তু, অমরাত্মা অমরধামে প্রস্থান করিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে সমগ্র ভারতবর্ষ শোকার্ত্ত হইয়াছে, কিন্তু স্বর্গলোকে ব্রহ্মধামে কি অতুল আনন্দোৎসব উপস্থিত। ধন্য লীলাময় শ্রীহরি, যিনি কলিকাতার বিষয় কোলাহলের মধ্যে এই পবিত্র ঋষি-জীবন সৃজন করিয়া জগতে অপূর্ব্ব লীলা বিধান করিলেন, পৃথিবীকে ধ্যান ও যোগের পথ প্রদর্শন করিলেন। ধন্য এই ঋষির পূর্ব্ব পুরুষগণ, ধন্য বঙ্গ দেশ, ধন্য পৃথিবী। মঙ্গলময় ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন আমরা সকলে এই ঋষি-জীবন লাভ করিয়া যেন ব্রহ্মশ্রবণ মননে কৃতার্থ হই। ভারতে আবার ঋষি ভাব ফিরিয়া আসুক, আবার এখানে সত্যযুগের আবির্ভাব হউক। সর্ব্বত্র ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক।

পুস্তকপ্রাপ্তি।

"শিখের বলিদান";—এই পুস্তক সঞ্জীবনী পত্রিকাসম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্রের কুমারী কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র বি, এ, কর্ত্তৃক বিরচিত পুস্তক খানা উত্তম কাগজে উত্তম অক্ষরে রয়েল ১৬ পেইজি ত্রিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই পুস্তকে তেগ বাহাদুর, ফতেসিংহ

জরওয়ার সিংহ, মণি সিংহ, হাকিকত ও তরু সিংহ এবং স্থবেগ সিংহ এই সাত জন শিখ ধর্ম্মবীরের দিল্লির সম্রাট্ আওরঙ্গজেব ও পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন মোসলমান শাসন-কর্ত্তার নিদারুণ নিপীড়নে আত্ম-বলিদানের বিবরণ বিবৃত। পার্থিব জীবনকে তুচ্ছ করিয়া নানা প্রকার অপমান ও ক্লেশ যন্ত্রণা স্বীকারপূর্ব্বক এই কয় জন ধর্ম্মবীর প্রাণদানে ধর্ম্মবিশ্বাসকে যেরূপ গৌরবান্বিত করিয়াছেন, এদেশে এই রূপ জলন্ত দৃষ্টান্ত দুর্লভ। ইঁহারা বাস্তবিক ভারতে অমরকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। রচয়িত্রী কল্যাণীয়া কুমুদিনী অল্প বয়সে প্রবীণের ন্যায় উক্ত কয়েক জন ধর্ম্মবীরের জীবনদান-কাহিনী লিখিয়াছেন। আমরা তাহা পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছি। পুস্তকের শেষ ভাগের কিয়দংশ এ স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

"শিখ জাতির ধর্ম্মরক্ষার্থ জীবনবিসর্জ্জনের অপূর্ব্ব কাহিনী ভারতের অতীত ইতিহাসের গৌরবের বস্তু। পঞ্চনদের তীরে শিখগণ এক সময়ে যে জীবন্ত বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভারতভূমি ধন্য হইয়াছে। ধর্ম্মের অপূর্ব্ব বলে বলী হইয়া তাঁহারা অসীম ক্ষমতাশালী নরপতিদিগকে সামান্য তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা ধর্ম্মের তেজ ও জ্যোতিতে পরিপূর্ণ ছিলেন। যাঁহারা জগতের অধীশ্বরের পূজা করেন, তাঁহারা পৃথিবীর অধিপতির ভয়ে কখনও বিশ্বাসকে ত্যাগ করিতে পারেন না।"

মহিলাদিগের রচনা।

প্রবাসী রবিণ * ও তাহার জন্ম ভূমি। †

রবিণ। সীমান্ত প্রদেশ হ'তে সীমান্তের পথে
যাইতে হইল দেখা স্বদেশের সাথে।
ভাবিয়া মায়ের মুখ উথলি উঠিল বুক,—
চলিলাম নত শিরে না দেখিনু চেয়ে।

জননী কহিল তবে সম্মুখীন হয়ে :—

(স্বদেশের উক্তি।)

"রবিণ! নীরব কেন এত দিন ধরি?
গাও রে বিহগ, গান প্রাণ মুগ্ধ করি।

* * * *

বারেক স্বদেশ পানে চাহ অনুরাগে,
বিদায় সঙ্গীত গাও বসন্তের রাগে!"

(রবিণের উত্তর।)

জননি! করুণ স্বরে কেন ডাক আর
"অনুরাগে, নিজপানে চাহ একবার?"
ও কথা আবার প্রাণে, অতীতের স্মৃতি আনে
পরাণ গলিয়া চোখে বহে শত ধার!
কি বলিব পোড়া মুখে, বলি কিন্তু বড় দুখে,
চাহিতে তোমার পানে পারি না যে আর!
এখন হয়েছ তুমি, তস্করের লীলা-ভূমি,
আমাদের বাস-যোগ্য নহ তুমি আর।
পামর পাতকী সব, এবে অধিবাসী তব,
হৃদয় বিদরে হেরি দুর্গতি তোমার।
কোথা তব ধর্ম্মনীতি, কোথায় সে শান্তি প্রীতি?
এবে তুমি জনয়িত্রী মায়া ছলনার।
কেন মা! করুণ স্বরে ডাকিলে আবার?

* রবিণ (Robin) পক্ষিবিশেষ।

† ভাগলপুরস্থ সম্ভ্রান্ত মোসলমান পরিবারের মহিলা আর্ এস্ হোসেন কর্ত্তৃক বিরচিত।

বড় জ্বালা পেয়ে মাতঃ! বিদেশে এসেছি,
বড় দুঃখে জননী গো! তোমারে ত্যজেছি!
সেই স্নেহ-পূর্ণ তোর, বিজন অরণ্য ঘোর,
তেমন মধুর স্থান কোথা কি দেখেছি?
কি যে সুখ ছিল তায় বলিতে পারি না হায়!
ওই মাতৃকোলে বসে স্বরগ ভুলেছি।
পেয়ে ঐ মাতৃ বুক ভুলেছি বেদনা দুখ,
কুটীরে থাকিয়া মাগো! প্রাসাদ ভেবেছি।
জনম ভূমিরে হায়! সহজে কি ছাড়া যায়?
স্বর্গাধিক গরীয়সী তোমারে জেনেছি।
পাষাণে বাঁধিয়া মন, সেই রম্য তপোবন,
তোমার স্নেহের কোল, তবু যে ত্যজেছি?

* * * *

বড় জ্বালা পেয়ে মাগো! বিদেশে এসেছি!
সেই লতা পাতা ঘেরা ছোট নীড় খান,
চারি দিকে বিভীষণ শ্যাম অরণ্যানী;
খল, দস্যু ও তস্কর শার্দ্দুলাদি নিশাচর,
নানারূপে নিপীড়ন করিত। জননি!
সেই যে নিঠুর রাতে প্রাণ টুকু নিয়ে হাতে
অনিদ্রায় জাগিতাম সারাটি রজনী
অবশেষে যে সময় নিতান্ত অসহ্য হয়,
তখন আসিনু ছাড়ি তোর বুক খানি,
সেই লতা পাতা ঘেরা স্নেহ নীড় খানি।
"রবিণ নীরব কেন এত দিন ধরি?"
কি গান গাহিব মাতঃ! প্রাণ মুগ্ধ করি?
সে কোমল ক্ষুদ্র প্রাণে সংসারের বিষবাণে,
শত ছিদ্র হইয়াছে—তাই জ্বলে মরি!
এবে দেখি সমুদয় অনল গরলময়,
সুখের সঙ্গীত তাই গিয়াছি বিস্মরি!
সে দিনের সুধাকরে আজি হলাহল ঝরে;
যে সৌন্দর্য্য দেখিতাম আগে আঁখি ভরি,
সে সৌন্দর্য্য নাই তবে কি হইল? বুঝি তবে,
বিগত শৈশব সব লয়ে গেছে হরি।
এখন পরাণ যেন হয়েছে মরু ভূ হেন,
দুঃখের সঙ্গীত গায় হৃদি দীর্ণ করি!
শুনি সে করুণ গীতি মনে কি পাইবে প্রীতি,
হইবে কি সুখী মাতঃ! আপনা পাসরি?
রবিণ নীরব তাই এত দিন ধরি!
যাও মাতঃ! চলি, আর পথ রোধিওনা,
নীরবে সরিয়া যাও, কথা কহিওনা!
করুণা মমতারাশি আবার উঠিবে ভাসি,
কাজ কি?—নিবানো বহ্নি আর জ্বালিওনা!
বলিয়ে স্নেহের কথা মরমে দিওনা ব্যথা,
নিদ্রিত স্মৃতিরে মম জাগায়ে দিও না!
ত্যজি দীর্ঘশ্বাস আর মুখ পানে বার বার,
করুণ নয়নে মাগো! পুন চাহিও না!
যাও মা! নীরবে চলি, পথ রোধিও না!

প্রবাসের পত্র।

জানি না আপনি আমার এই পত্র পাঠ করিয়া কি মনে করিবেন, কিন্তু আশা করি এরূপ লেখায় যদি দোষ ঘটিয়া থাকে, দয়া করে মার্জ্জনা করিবেন। অনেকে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া পাঠক পাঠিকার মনে যেরূপ আনন্দ উৎসাহ প্রদান করেন, আমি জানি আমার প্রবাসের পত্র কাহা-কেও সেরূপ আনন্দ উৎসাহ দিতে পারিবে না, কিন্তু আপনি ইহাকে সস্নেহে সাদরে গ্রহণ করিবেন, এই আশায় পত্র খানি লিখিলাম।

এবার যখন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া সবলপুরাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য বগে মেলে উঠিয়া বসিলাম, এবং বাষ্পীয় শকট বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিল

কলিকাতা ক্রমে দূর হইতে সুদূর হইতে লাগিল, তখনকার মনের কথা বলি। ট্রেণে উঠে বসেই বিদায়ের সময়কার আত্মীয় স্বজন দিগের কাহারও গম্ভীর প্রশান্ত, কাহারও বা অশ্রুভরা মুখ স্মৃতি পটে উদিত হইল। তখন ক্রমে ক্রমে ইহ পরলোক-বাসী সকল আত্মীয় স্বজনের স্নেহের মুখচ্ছবি স্মৃতি-পথে উদিত হইয়া প্রাণে বিমলানন্দ ও শান্তি দান করিল। এই আনন্দ, শান্তির মধ্যে প্রিয়জনের প্রিয় মুখ স্মরণ করিতে করিতে শোক দুঃখের কথা মনে আসিল।

আত্মীয় স্বজন যখন শরীরের সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া পরলোকে গমন করেন, তখন হৃদয়ে শোকের উদ্রেক হয়, ইহা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক এই জন্য বলি যে, ভগবান্ যাহা বিধান করেন, তাহা স্বাভাবিক। তবে কেন মানব-সন্তান শোকে দুঃখে অবসন্ন ও অধৈর্য্য হইয়া পড়ে? যেই এ কথা মনে আসিল অমনি মনের প্রকৃত ও বিকৃত অবস্থা কি এই প্রশ্ন উঠিল। ভগবান্ মানবসন্তানকে যে প্রেম পুণ্যের সম্বল দিয়ে তাঁর জগতে প্রেরণ করেন, সেই জীবন, সেই মনই প্রকৃত অবস্থা, এবং সেই সম্বলজ্ঞানলাভের ক্রমিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে উন্নতি লাভ করিবে ইহাই তাঁর অভিপ্রায়। তাঁর অভিপ্রায় অবহেলা করিয়া জীবনের মূলধন হারাইলেই মানবের বিকৃত অবস্থা লাভ হয়। মানুষ যে পরিমাণে স্বার্থ মোহ মায়ার বশীভূত হইয়া পড়ে, সেই পরিমাণে শোক দুঃখে অবসন্ন ও অধীর হইয়া থাকে। প্রভু গো! কবে তোমার অভিপ্রায়, তোমার ইঙ্গিত আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে সক্ষম হইব? কবে সুখের দিনে তোমার আনন্দময় প্রেম মুখ দর্শন করিয়া যে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হয়, শোকে দুঃখে অন্ধকারের মধ্যে ঠিক সেই ভাবে তোমার প্রেমমুখ জাগিয়া উঠিবে? এমন দিন কি জীবনে আসিবে? এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যা হইল। শারীরিক অসুস্থতার জন্য প্রায় সমস্ত রাত্রি এই রূপ নানা কথার চিন্তায় অতিবাহিত হইল।

সম্বলপুরে পৌঁছিয়াই সেখানকার একটী নূতন জিনিষ টাঙ্গানামক গাড়ী দেখিলাম। টাঙ্গা দেখিতে অনেকটা টম্‌টমের মত, উপরে টপ দেওয়া, দুই দিক খোলা। অধিকাংশ গাড়ীতে গরু, কচিৎ দু একখানি গাড়ীতে ছোট ছোট ঘোড়া ব্যবহার করিতে দেখিলাম। পাহাড়ে জায়গায় এইরূপ গাড়ী সুবিধাজনক বলিয়াই অন্য গাড়ী এখানে ব্যবহৃত হয় না। সম্বলপুরের রাস্তা ঘাটের ৩।৪ চারিটী নাম যাহা আমি শুনিলাম তাহা ইংরাজি নামের মত।

প্রথম দিন বেড়াইতে গিয়া মহানদীর একটি ঘাটের নাম শুনিলাম ভিক্টোরিয়া ঘাট। এই ঘাটের উপর রাস্তাটীর এক পার্শ্বে মহানদী অপর পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী; মাঝখানে পথ, দুই ধারে জল; বেশ সুন্দর দেখায়। বর্ষাকালে সম্ভবতঃ এই দৃশ্যটি দেখিতে আরও সুন্দর দেখায়; কারণ মহানদী তখন জলে ভরা থাকে। ভিক্টোরিয়া ঘাটের উপর একটী গোলা-

কার উচ্চ মণ্ডপের মত প্রস্তুত করা হইয়াছে, ইহার উপর উঠিবার জন্য সিঁড়ি আছে।

তার পর 'বুড়া রাজার মন্দির' দেখিতে গিয়াছিলাম। নামটা শুনে মনে হয়েছিল একটা কিছু দেখ্‌বার জিনিষ। এই মন্দির একটি ছোট পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার উপর উঠিবার জন্য রীতিমত সিঁড়ি প্রস্তুত করা হইয়াছে। ছেলে মেয়েদের কয়টা সিঁড়ি গুন্‌তে বললাম, তারা বল্লে ২১২টা সিঁড়ি। জানি না, ইহার কিছু কম বেশীও হইতে পারে। আমরা কষ্ট স্বীকার করে উপরে গিয়ে কেবল একটি ক্ষুদ্র শিব-মন্দির দেখিলাম। ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীর গিয়ে ৩।৪ মিনিটের জন্য বসিলাম। বেশী ক্ষণ বসিতে পারিলাম না, সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, বাঘেরও যে ভয় ছিল না এমন নয়। আমরা কেবল তিন জন মহিলা ছিলাম, সঙ্গে তিন চার্‌টী ছেলে মেয়ে ছিল। যে টুকু বসেছিলাম, দূরে নিম্নভূমির শ্যামল প্রান্তরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, ভূমির বন্ধু'তা আর উপলব্ধি হয় না, কেবল সমতল প্রদেশ। তখন মনে হয়েছিল মানুষের মনও ঠিক এইরূপ। মন যত উন্নত এবং উদার হয়, ততই মহৎ জ্ঞান, ততই 'তুমি আমি' রূপ বন্ধুরতা দূর হয়, নীচ ভাব সকল দূর হয়ে যায়।

এক দিন Brook Rood নামক রাস্তায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এই পথে খানিকটা হেঁটে গিয়েছিলাম, পথের দুই ধার যেমন নির্জ্জন, তেমনি মনোহর। সর্ব্বদা কোলাহলময়ী নগরীতে থাকিয়া এইরূপ স্থানে কিয়ৎক্ষণ থাকিলে প্রকৃতির স্থির গম্ভীর দৃশ্য সংসারাসক্ত হৃদয়কে ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার দিকে টানিয়া লইয়া যায়।

আর একটি কাজ দেখে আমার মনে খুব আনন্দ হইয়াছে। আমাদের ওদিকে পরিচিত দের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা শুনা হয়। সম্বলপুরে যে কয়টী ভদ্র মহিলা আছেন সর্ব্বদা নিতান্তই আপনার লোকের মত তাঁহাদের যাওয়া আসা ও সদ্ভাব আছে। কোথাও বেড়াইতে যাইতে হইলে কয়েকটী মিলিয়া এক সঙ্গে যান। খুব কাছে মহানদী, এক দিন সকাল বেলা নদীতে স্নান করিতে যাওয়ার কথা হইল। খবর দেওয়া মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে তিনটী ভগিনী আসিয়া উপস্থিত। দেখে কত আনন্দ হ'ল তা বল্‌তে পারি না, অথচ তাঁদের প্রত্যেকের সংসার ও সন্তানগণ আছে।

আর বেশী লিখে আপনাকে বিরক্ত করিব না। তার পর জল-পথে নৌকায় পাঁচ দিন ছিলাম। মহানদীর স্থানে স্থানে 'বিষম' আছে। বাস্তবিক এই স্থান গুলির আবার নাম আছে। বিষদপুরী, বাহারি সুথা, হলদি গণ্ডি ইত্যাদি। বিষম স্থানে নৌকা ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা। কারণ এই সকল বিষম স্থানে মহানদীর গর্ভ ছোট বড় পাথর সকলে পূর্ণ, এমন কি এক এক স্থানে ছোট ছোট পাহাড় আছে বলিলে হয়। এই সকল স্থানে চারি দিক্ হইতে প্রস্তর হইতে অন্য প্রস্তর খণ্ডে জলসমূহ গড়াইয়া পড়িতেছে।

বলিয়া শব্দ হইতেছে। রাত্রিতে দূর হইতে সমুদ্র-গর্জ্জনের মত শোনা যায়। বিষমের উপর দিয়ে যখন নৌকা বেয়ে নিয়ে যায়, এক এক স্থানে মনে ভয় হয়, বুঝি এই খানে নৌকা ভেঙ্গে যাবে। এই সকল পাথরের উপর স্থানে স্থানে কত লিলি ফুলের গাছ দেখলাম; বড় বড় সাদা সাদা ফুল ফুটে রয়েছে! আরও নানা প্রকার ছোট ছোট গাছ আছে। ভাবিলাম, আমাদের জীবন তরণীও এই ভাবে ভবসমুদ্র মাঝারে চলিয়াছে। আমরা যদি লক্ষ্য স্থির না রাখি, তরণী যদি সম্পূর্ণ-রূপে কর্ণধারের আশ্রয়ীভূত না হয়, তবে লক্ষ্য-হীন জীবন ভব-সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে। প্রকৃতির লীলার সঙ্গে জীবনের যোগ দেখিতে পাইলাম। যে দিকে চাই প্রকৃতি গুরু হয়ে নিজের সুন্দর ছবি দেখাইয়া আমাদের জীবনকে তার মত সুন্দর, তার মত পবিত্র, তার মত নিয়মিত হইতে বলিতেছে। কবে আমরা প্রকৃতির শিষ্য হব? কবে আমরা প্রকৃতির মত সুন্দর, পবিত্র, নিয়মিত হব? ইহা ভাবিতে ভাবিতে এই গানটা মনে পড়িল। "কবে ফুলের মত হব, তুই হবি মা লতা পাতা আমি তাতেই ফুটে রব।"

আপনার

বোধ। স্নেহের মা—রে।

ধর্ম্মপুত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ধর্ম্মপিতা ক্রমে এই দৃশ্য অন্তরাল করিয়া ধর্ম্মপুত্রকে তাহার নিজ কুটীর দেখাইলেন। সে তাহার মাতাকে দেখিল। তিনি স্বকৃত পাপের কথা স্মরণ করিয়া ক্রন্দন ও অনুতাপ করিতেছেন, বলিতে-ছেন, "যদি আমি দস্যুহস্তে মরিতাম, তাহা হইলেই ভাল হইত, আমাকে এত পাপ করিতে হইত না।"

ধর্ম্মপিতা বলিলেন—"তোমার মাতার এই করিয়াছ।"

ধর্ম্মপিতা এ দৃশ্যও আবার লুকাইয়া ফেলিলেন, এবং নিম্নে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। ধর্ম্মপুত্র দেখিল, সেই চোর; দুই জন কারারক্ষী তাহাকে কারাগারের সম্মুখে আনিয়াছে। ধর্ম্মপিতা বলিলেন, "এই লোকটা নয়জন মনুষ্য হত্যা করিয়াছে, উহাকে নিজপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, কিন্তু তুমি উহাকে হত্যা করিয়া উহার পাপের ভার নিজের স্কন্ধে লইয়াছ। এখন এই পাপের জন্য তুমি দায়ী হইলে। এই দেখ নিজের কি দশা করিয়াছ। ভল্লুকী একবার কাষ্ঠখণ্ড ঠেলিয়া দিয়া ক্ষুদ্র শাবক-দিগকে ব্যথা দিয়াছে, দ্বিতীয় বার উহাকে ঠেলা দিয়া একবৎসরের শাবককে মারিয়া ফেলিয়াছে; তৃতীয় বার উহাকে ঠেলা দিয়া নিজে মরিয়াছে। তুমিও তাহাই করিয়াছ। আমি তোমাকে ত্রিশ বৎসর সময় দিতেছি, সংসারে যাও, দস্যুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, যদি না কর তাহা হইলে নরকে যাইতে হইবে।"

ধর্ম্মের পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কিরূপে তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব?" ধর্ম্মের পিতা বলিলেন,—"তুমি যে পরিমাণ অমঙ্গল পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছ যখন

সেই পরিমাণ অমঙ্গল দূর করিতে পারিবে, তখন দস্যুর পাপের ও তোমার নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

"আমি কিরূপে সংসারের অমঙ্গল দূর করিব?"

ধর্ম্মপিতা বলিলেন—"সূর্য্যোদয়ের দিক্ লক্ষ্য করিয়া সোজা চলিয়া যাও, একটা জলপূর্ণ মাঠে আসিয়া পড়িবে। লোকেরা কি করিতেছে দেখিবে, এবং তুমি যাহা জান তাহাদিগকে বলিবে। আরও অগ্রসর হইবে, এবং যাহা সম্মুখে উপস্থিত হয় লক্ষ্য করিয়া দেখিবে। চতুর্থ দিনে তুমি একটা বনের মধ্যে আসিয়া পড়িবে। সেই বনে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর দেখিবে, সেই কুটিরে এক বৃদ্ধ বাস করেন। তোমার জীবনে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তৎসমুদয় তাঁহাকে বলিবে, তিনি তোমাকে শিক্ষা দিবেন। যখন তাঁহার উপদেশমত কাজ করা হইবে, তখন তোমার নিজের ও দস্যুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।" এই বলিয়া ধর্ম্মপিতা ধর্ম্মপুত্রকে পুরী হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

ধর্ম্মপুত্র পথ চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে ভাবিল, আমি কিরূপে সংসারের অমঙ্গল দমন করিব? মানুষ দুষ্ট লোকদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া কিংবা নির্ব্বাসনদণ্ড দিয়া কিংবা প্রাণদণ্ড দিয়া অধর্ম্মের বিনাশ-সাধন করে। আমি কিরূপে নিজের স্কন্ধে পরের পাপ-ভার না লইয়া অধর্ম্মের সংহার করিব? ভাবিয়া কিছুই স্থির হইল না। সে চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে এক ক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া পড়িল। ক্ষেত্রে ঘন হইয়া ভাল শস্য ফলিয়াছে, কর্ত্তনের সময় উপস্থিত প্রায়। ধর্ম্মের পুত্র দেখিল, একটি ক্ষুদ্র গাভী (বকনা বাছুর) শস্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাকে দেখিবা মাত্র কৃষকেরা ঘোড়ায় চড়িয়া এদিক হইতে ওদিক্ তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। এক দিকে তাড়া খাইয়া সে যেমন বিপরীত দিক্ দিয়া বাহির হইতে যাইতেছে অমনি সে দিক্ হইতে এক জন ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছে দেখিয়া আবার ভয় পাইয়া শস্যমধ্যে দৌড়িয়া আসিতেছে, আবার সকলে মিলিয়া তাহার পশ্চাতে ছুটিতেছে ও তাহাকে ছুটাইতেছে। রাস্তায় একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, আর বলিতেছে "হায়! হায়! সকলে মিলিয়া আমার গাভীটাকে মারিয়া ফেলিবে।"

ধর্ম্মের পুত্র কৃষকদিগকে বলিল, "ভাই সকল, তোমরা এরূপ করিতেছ কেন? সকলে শস্য-ক্ষেত্র ছাড়িয়া চলিয়া যাও, স্ত্রীলোকটি নিজে আসিয়া তাহার গাভীকে ডাকিয়া লইয়া যাউক।"

লোকগুলি তাহার কথা মত সরিয়া গেল। স্ত্রীলোকটি ক্ষেত্রের বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহার গাভীকে নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। গাভী কাণ খাড়া করিয়া মন দিয়া শুনিল, এবং গলা চিনিতে পারিয়া দৌড়িয়া গিয়া তাহার দুই পায়ের মাঝে মুখ গুঁজিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি গাভীর আদরে পড়িয়া যাইবার মত হইল। কৃষকেরা সন্তুষ্ট হইল, গাভীও সন্তুষ্ট হইল। ধর্ম্মের

পুত্র পথ চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, "আমি এখন বুঝিতেছি অমঙ্গলের দ্বারা অমঙ্গল কেবল বর্দ্ধিতই হয়। মানুষ যত অন্যায়ের শাস্তি দেয়, ততই অন্যায় বাড়িয়া যায়। অমঙ্গলের দ্বারা অমঙ্গলের নিবারণ হয় না। কিন্তু কি উপায়ে যে অমঙ্গলের বিনাশ করিতে হয় তাহা তো বুঝিতে পারিতেছি না। গাভীটী তাহার প্রভুর ডাক শুনিয়া আসিয়াছে তাই রক্ষা, কিন্তু যদি না আসিত তবে কি করিয়া তাহাকে বাহির করা যাইত।" ধর্ম্মের পুত্র অনেক ভাবিল, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না, কেবল পথ চলিতে লাগিল।

সে যাইতে যাইতে এক গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইল। গ্রাম খানি প্রায় অতিক্রম করিয়া গিয়া শেষ কুটীর খানিতে সে রাত্রির জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করিল। কুটীর বাসিনী রমণী তাহাকে আশ্রয় দিল। সেই কুটীরে আর কেহ ছিল না, একলা স্ত্রীলোক গৃহ-মার্জ্জন কার্য্যে ব্যস্ত ছিল। ধর্ম্মের পুত্র গৃহে প্রবেশ করিয়া চুল্লীর পার্শ্বে শুইয়া স্ত্রীলোকের কার্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

স্ত্রীলোকটী প্রথমেই ঘরের মেজে ঘসিয়া টেবিল ঘসিতে আরম্ভ করিল; টেবিল যখন পরিষ্কার হইল, এক খানি ময়লা তোয়ালে দিয়া মুছিল। সে একবার এক রকম করিয়া মুছিল, দেখিল ময়লা থাকিয়া গিয়াছে; আবার আর এক রকম করিয়া মুছিল, এক স্থানের কতকটা ময়লা উঠিয়া গেল, কিন্তু আবার আর এক স্থানে ময়লা ও দাগ রহিয়া গেল। আবার এক দিক্ হইতে আর এক দিক ঘসিল কিন্তু ময়লা তোয়ালে দিয়া মুছিবামাত্র স্থানে স্থানে ময়লা লাগিয়া যাইতে লাগিল। এক দিকে মুছে আর এক দিক লাগে। ধর্ম্ম-পুত্র দেখিয়া বলিল—"মা ঠাকুরাণী কি করিতেছ?" (ক্রমশঃ।)

সংবাদ।

বিগত পৌষ মাসের "ভবতারিণীর নিবেদন" যে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রতি ভিক্টোরিয়া মহিলবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ মনোযোগবিধান করেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

রুস ও জাপানের ভীষণ যুদ্ধের বিবরণ মহিলার পাঠিকাগণ সকলেই অবগত হইয়া থাকিবেন। ছয় মাসেরও অধিক কাল ব্যাপিয়া এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে উভয়পক্ষের লক্ষাধিক সৈন্য হতাহত হইয়াছে। এই প্রকার দীর্ঘকালব্যাপী ভয়ানক সংগ্রাম কখনও হইয়াছে শুনা যায় না। পৃথিবীর মধ্যে রুসসম্রাটের মহাপ্রতাপ, তাঁহার ন্যায় প্রবল সৈন্যবল কোন সম্রাটের নাই। সকলেই রুসকে ভয় করিয়াছে। স্বেচ্ছাচারী পররাজ্যলোলুপ গর্ব্বিত রুস বিধাতার কৌশলে আজ ক্ষুদ্র জাপানের দ্বারা লাঞ্ছিত ও পরাস্ত। রুসের বিশেষ আশ্রয়ভূমি পোর্ট-আর্থারের ভীম দুর্গ মহাসংগ্রামের পর জাপান-বাহিনী অধিকার করিয়াছে। মাসাধিকাল হইল উক্ত দুর্গাধ্যক্ষ রুসসেনাপতি নিরুপায় হইয়া জাপানসৈন্যাধ্যক্ষের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। জাপানের জয় ও

রুসের গর্ব্বচূর্ণ ও পরাজয়ে সকলেই বিশেষ আনন্দিত। রুসসম্রাটের স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারজন্য রুস সাম্রাজ্যে মহাবিপ্লব ঘটিয়াছে। শ্রমজীবী প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। রুসসম্রাট্ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন; এবং রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গ পরি-পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বিপুল সৈন্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত এত বড় প্রবল দুর্দান্ত রাজার এইরূপ গর্ব্বচূর্ণ বিধাতার বিচিত্র লীলা বলিতে হইবে। স্থলযুদ্ধে ও জলযুদ্ধে উভয় যুদ্ধেই রুস জাপান কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়াছে। জাপান শৌর্য্য বীর্য্যে, বিজ্ঞান সভ্যতায়, সুনীতি সদাচারে সমুদায় সভ্যদেশকে পরাজয় করিয়াছে। জাপানে আজ মহা বিজয়োল্লাস ও উৎসব। জাপান-রাজ্য এসিয়ার অন্তর্গত, জাপানের জয়ে ইযুরোপের উপর এসিয়ার জয় বলিতে হইবে। কিন্তু যুদ্ধের এক্ষণও বিরাম হয় নাই।

গত পৌষ মাসে "পাকপ্রণালী" শীর্ষক লাউয়ের পোড়া পিঠা প্রস্তুত করা বিষয়ে আমাদের একটী কন্যা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে কিছু ভুল হইয়াছিল। তিনি সেই ভুল সংশোধন করিয়া এই রূপ লিখিয়াছেন, "লাউ চাউল বাটিয়া গুড় মিশ্রত করিয়া প্রথমে আলে চড়াইয়া খুন্তি দিয়া নাড়িতে২ যখন সিদ্ধ হইয়া ঢেলা ঢেলা হইবে, তখন শেষোক্তরূপ পোড়াইবার নিয়মে পোড়াইবে।"

মহিলার ১০ম বৎসরের ছয় মাস অতীত হইল, এক্ষণ গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের নিকটে মূল্য প্রার্থনা করা অসময়োচিত নহে। অতিশয় অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলের নিকট হইতে মূল্য পাওয়া যায় নাই। অনেকের নিকটে পূর্ব্ব ২।৩ বৎসরের মূল্য প্রাপ্য। ভরসাকরি তাঁহারা অবিলম্বে মূল্য পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। প্রাপ্ত মূল্য দ্বারা আমাদিগকে মুদ্রাঙ্কন ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করিতে হয় রেঙ্গুণ হইতে মহিলার গ্রাহিকা একটী কন্যা লিখিয়াছেন। "এখানে আসিয়াই আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলাম, এবং তাহাতে লিখিয়াছিলাম যে, এই মাসের মহিলা ভি, পি, যোগে পাঠাইয়া গেল বৎসরের মূল্য আমার নিকটে যাহা প্রাপ্য আছে আদায় করিয়া লইবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনারা তাহা করেন নাই। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী মাসের মহিলা ভি, পি, যোগে পাঠাইয়া মূল্য আদায় করিয়া বাধিত করিবেন।" এই কন্যাটী মহিলার বৎসরারম্ভমাত্র অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া থাকেন। গত ৯ম বৎসরারম্ভমাত্র তিনি মূল্য সেইরূপ দিয়াছেন, ইঁহার নিকটে কিছুই প্রাপ্য নাই। কেবল বর্ত্তমান দশম বৎসরের পাওনা। ইনি তাহা পাঠাইবারজন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; এ পর্য্যন্ত ভি, পি, করি নাই বলিয়া দুঃখিত হইয়াছেন। এ দিকে অনেক গ্রাহক গ্রাহিকা আছেন যে, আত্মীয় ও পরিচিত ভাবিয়া তাঁহাদের নিকটে মহিলা পাঠান যায়,তাঁহারা তাহা ফেরত না পাঠাইয়া গ্রহণ করেন, পাঠাইতে নিষেধও লিখেন না। মূল্যের জন্য দশ খানা পত্র লিখিলেও মূল্য পাঠাইবেন কি পত্রের উত্তর-পর্য্যন্ত প্রদান করেন না। ২।৩ বৎসর পর নিরুপায় হইয়া ভি, পি, করা যায়, তাঁহারা ভি, পি, ফেরত পাঠাইয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন। অনেক গ্রাহক গ্রাহিকার অবজ্ঞা ও এই সামান্য বিষয়ে অর্থ সম্বন্ধীয় এরূপ অনীতি দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া থাকি।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

শুশ্রূষা।*

গতবারে রোগীর প্রতি কর্ত্তব্য। দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ রোগীর সাধারণ বন্দোবস্ত, দ্বিতীয়তঃ গৃহের বন্দোবস্ত। বিছানা, ঔষধ, খাদ্য, মলমূত্র, স্নানাদি, আইসব্যাগ এই সকলের বন্দোবস্ত বিষয় বলা হইয়াছে। আজ রোগীর অবস্থা-পরিবর্ত্তনের কথা বলা হইবে। এই বিষয়ে নর্সের (শুশ্রূষাকারীর) বিশেষ দৃষ্টি আবশ্যক। কারণ চিকিৎসক দিনের মধ্যে একবার কিংবা দুই বার আসেন, আসিলেও অল্প সময় থাকেন, সুতরাং রোগীর সকল অবস্থা দেখিতে পান না। এজন্য এ সমুদায় নর্সের উপর নির্ভর করে। নরস্ যদি দৃষ্টি না রাখেন চিকিৎসা ভাল হয় না।

প্রথমতঃ সমস্ত দিন রোগী কিরূপ ভাবে কাটায়, নর্সের লক্ষ্য রাখা উচিত। এক জন কাস রোগী শুয়ে থাকৃতে পারে না, একবার বসে, একবার শোয়, নর্স যদি ইহা লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসককে জ্ঞাপন করেন, চিকিৎসক বুঝিতে পারেন, রোগীর যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছে। তাহা হইলে চিকিৎসক তদনুরূপ ঔষধ দেবেন। ঔষধ প্রয়োগের পর নর্স লক্ষ্য করবেন, ঔষধ কাজ করিতেছে কি না। হাঁপানি কম হইলে রোগী শুতে পারে, এই পরিবর্ত্তন দেখে ভিতরের অবস্থা জানা যায়। রোগী নড়লে ঘর্ষণে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, ঘর্ষণ না হলে মাংসপেশী নড়ে না, চেপে শুয়ে থাকে। ডাক্তার এসে দেখলেন রোগী বা ধার চেপে শুয়ে আছে। তার সন্দেহ হতে পারে। সুতরাং পরিবর্ত্তনে রোগের অবস্থা জানা যায়।

অন্যান্য পরিবর্ত্তনে অনেক রোগের অবস্থা জানা যায়। আকার দেখেও জানা যায়। তার পর চর্ম্মের অবস্থার পরিবর্ত্তন। এ বিষয়ে নর্সেরও দৃষ্টি রাখা দরকার। জ্বর যখন হয়, শরীর উত্তপ্ত হয় ও খসখসে হয়; যখন কমতে থাকে ঘাম হয়। কোন কোন ব্যারামে এবং বাতজ্বরে ঘর্ম্ম নির্গত হয়েও উত্তাপ কমে না। ম্যালেরিয়া জ্বরে গা গরম থাকে, ছেড়ে গেলে পর প্রচুর ঘাম হয়। ঘাম হয়ে গাত্রচর্ম্ম খসখসে হয়। আর পর শরীরের উত্তাপ। হাতদিয়ে যদিও শরীরের উত্তাপ জানা যায়, তবুও

---

* ১২০৩শক ১৪ই জুলাই ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

ভ্রম হতে পারে। থার্ম্মোমিটারে শরীরের উত্তাপ জানা যায়। কতক গুলি পাত্রে জল গরম করে, একটীতে হাত দিয়ে তার চেয়ে গরম জলে হাত দিলে গরম বোধ হয় না। রোগীর শরীরের উত্তাপের কখন কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় সে বিষয়ে নর্সের বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কোন কোন জ্বরে শরীরে ইরপ্‌শন বেরোয়, এ বিষয়ে নয়নের দৃষ্টি রাখা উচিত, এ গুলির উপর রোগীর রোগনির্ণয় নির্ভর করে। জ্বর হওয়ার প্রায় তিন দিনের পর হাম হয়। ইরপ্‌শনসম্বন্ধে কোন্‌টী শক্ত শিক্ষার দরকার। হামেতে সর্দ্দি কাশী হয়, জ্বর হয়, গা জ্বালা করে। জ্বরের প্রায় ৫।৬ দিন পর বসন্ত বেরোয়, চামড়া লাল হয়। বসন্ত ছোট ছোট আছে, বড় রকম আছে। বসন্তের নাম স্মলপক্স, চিকেন পক্স। চিকেন পক্স জলভরা, আর স্মলপক্স জল ভরা নয়, লাল হয়, সে গুলিতে পূঁজ হয়, খসখসে হয়। কোন কোনটি লাল হয়, হলদে হয়। এ বিষয়ে কি রকম হচ্চে নর্সের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বিশেষতঃ প্লেগের ফোঁড়া আগে লাল হয়।

রোগী অনেক দিন যদি কঠিন শয্যায় শোয়, তাহলে ঘা হয়। চাপ থাকলে তাহাতে ক্ষত বাড়তে থাকে। এ সকল বিষয়ে নর্সই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসককে জ্ঞাপন করিবেন। কারণ তিনি অনবরত কাছে থাকেন, রোগীর সমুদয় জানতে পারেন।

চক্ষুসম্বন্ধেও নর্সের দৃষ্টি রাখা দরকার। যন্ত্রণাসম্বন্ধে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে লিপিবদ্ধ করা উচিত। নানা প্রকার রোগে নানা প্রকার যন্ত্রণা হয়। বাতে-রিউমেটিজে। হাঁটু, কোমর এবং অন্যান্য স্থানে বেদনা হয়। এ রকম কোথায় কি, নর্স লক্ষ্য রেখে যখন চিকিৎসক আসেন, তখন জানাইলে রোগীর রোগ-নির্ণয় সহজ হয়।

এক এক জায়গায় খেঁচনী নানা ভাবে হয়। সে গুলি বিশেষ ভাবে কোন্ রকম কখন হচ্চে দৃষ্টি রাখা দরকার। তার পর কম্পন। কোন্ কোন্ জ্বরে কম্পন হয় নর্সের জেনে রাখা উচিত। অনেক সময় পেটের ভিতর ফোঁড়া হয়ে কম্পন হয়ে জ্বর আসে। কোন কোন স্থলে কম্পনের সঙ্গে সঙ্গে কন্‌ভল্‌জন ফিট হয়। কখন কখন সমস্ত মাংসপেশী শক্ত হয়ে কোঁকড়াতে থাকে। ইহাকে ধনুষ্টঙ্কার বলে। ইহাতে রোগী ধনুকের মত বেঁকে যায়। কন্‌ভল্‌শন দুই ভাগে বিভক্ত। টিটানসে সমস্ত মাংসপেশী শক্ত হয়, এ সমুদায় নর্সের লক্ষ্য করা উচিৎ।

তার পর রোগীর নিদ্রার পরিবর্ত্তন ঘটে কি না। ঘুমে চেঁচিয়ে উঠে কি না, বকে কি না লিখে রাখতে হয়। অ্যজ্‌মা, হার্টডিজিজে হাঁপিয়ে যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে নিদ্রাভঙ্গ হয়। এ সমস্তগুলি নর্সের দৃষ্টি রেখে চিকিৎসককে জ্ঞাপন করা বিশেষ দরকার। কিংবা মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে কি না লক্ষ্য করা উচিত।

তৎপরে নিশ্বাস, কোন কোন ব্যারামে নিঃশ্বাস জোরে পড়ে। সচরাচর এক মিনিটে তের চোদ্দবার নিঃশ্বাস পড়ে। ব্যারামে বৃদ্ধি বা হ্রাস হয়। নিঃশ্বাস দেখতে হইলে

ঘড়ি নিয়ে বুকে বা পেটে হাত দিয়ে দেখলে হয়, গুণতে এক মিনিটে কতবার মাংস-পেশী নড়ে। যখন ইহা প্রয়োজন হবে নর্সের করতে হবে, কিংবা তাড়াতাড়ি ফুসফুসের ভিতর হাওয়া ঘুরছে কি না জানিতে হইবে।

নাড়ীর গতির কিরূপ নর্সের দেখা দরকার। বেশী রকম ব্যারামে নর্সের বিশেষ লক্ষ্য দরকার। নাড়ী মিনিটে ৭৪।৭৫ বার চলে। সেটার বৃদ্ধি না হ্রাস হয়েছে জানা দরকার। অনেক সময় নাড়ী ক্ষীণ হয়, খুঁজে পাওয়া শক্ত। ভয়ের কারণ হলে নর্স চিকিৎসককে ডাকতে পারেন। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এবং নাড়ীর গতিসম্বন্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যখন নিঃশ্বাস গুণতে হয়, তখনি নাড়ী গুণতে হয়। রোগীর কাশীর সম্বন্ধে কি পরিবর্তন, অর্থাৎ অনবরত কাশীর গয়ার উঠছে কি না কি রকম কাশী কত ক্ষণ স্থায়ী হয়, ফিটের মত হয় কি না, হয়ত থুক্ থুক্ হয়ে কফ উঠে এবং কতক্ষণ অন্তর হয়, এ সমস্ত গুলি চিকিৎসককে জানান দরকার। শুধু প্রাতঃকালে কফ হয়, রাত্রিতে হয় না, কোন কোন কাশীতে রাত্রিতে হয়। কফসম্বন্ধে—কফেতে পাতলা কিংবা গুরু হল্দে ফেনা ও দুর্গন্ধ রক্ত আছে কি না রক্ত এবং কফ আলাদা কি না, এই সব দেখে রোগ নির্ণয় করা যায়।

ক্ষুধার সম্বন্ধে পরিবর্তন। নর্স পথ্য দেন, তিনি তাহা বুঝতে পারেন। ক্ষুধা না থাক্‌লে রুচিবিষয়ে লক্ষ্য দরকার। বমি হলদে, কি লাল, বা সবুজ জলের মত কিংবা যা খেয়েছেন সেগুলি কি রকম, কখন কতক্ষণ বমির ভাব থাকে, নর্সের দৃষ্টি রাখা দরকার।

মল মূত্রের সম্বন্ধে দৃষ্টি : মল কি কঠিন রকম দুর্গন্ধ আছে কি না, কৃমি আছে কি না লিখে রাখা দরকার। প্রস্রাবসম্বন্ধে—কি পরিমাণ এবং জ্বালা আছে কি না আটকে যায় কি না অন্যান্য যা পরিবর্তন ঘটে লিপিবদ্ধ করা দরকার।

থর্ম্মোমিটারের ব্যবহার এখন প্রায় সকলেই শিখেছেন। নীচে সরুভাগে পারা থাকে। নলের ভিতরে যে সরুছিদ্র আছে তাহা দিয়া পারা উত্তাপে আয়তনে বাড়িয়া উপরে উঠে। শরীরের তাপের ভিন্নতা আছে, সুতরাং আয়তনে পারার উপরে উঠায় কম ও বেশি হয়। উত্তাপের পরিমাণ কত তাহা বুঝিবার জন্য নলের গায়ে কতকগুলি মার্ক আছে, সেই মার্ক অনুসারে উত্তাপ কত তাহার পরিমাণ হয়। ২১২ মার্কে জল ফোটে। ৩২ মার্কে জল জমাট বান্ধিয়া বরফ হয়। জল ফোটে আর বরফ হইয়া জমাট বান্ধা একটি ষ্টাণ্ডার্ড অর্থাৎ উত্তাপ পরিমাপক। থর্ম্মামেটরে এই ষ্টাণ্ডার্ড অত নয়, উহা ৯৫ হইতে ১১ পর্য্যন্ত মাত্র থাকে। ....

———

মাডম্ গায়ন

আমাদের এদেশে যেমন অনেক সাধ্বী স্ত্রীলোক জন্মেছেন, সেরকম যে অন্য দেশেও অনেক জন্মেছেন আমাদের তা মনে হয় না। আমাদের দেশে যে সব ভাল মেয়ে হয়েছেন, সে অনেক বছর আগে। এজন্য ইহাদের বিষয়ে খুব নিশ্চয়তা নাই। সীতা যে ছিলেন, তা ঠিক করে বলা যায় না, অনেকেতো রামায়ণকে একেবারে অমূলক বলেন। কিন্তু খ্রীষ্টজগতে অধিক সাধ্বী নারী জন্মেছেন, তার আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ তাঁরা আধুনিক, তাঁদের বিষয়ে পরিষ্কার সব লেখা আছে। আজ যাঁর কথা বলিব, ইহার বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই, ইনি ৩০০ বছর আগে জন্মেছিলেন। যেমন শ্রীচৈতন্য ৫০০ বছর আগে জন্মেছিলেন, তাঁর বিষয় আমরা বৈষ্ণবদের গ্রন্থে সব জানিতে পারি ও সন্দেহ করিতে পারি না। ইউরোপে ফরাসীদেশ আছে, এখানে অনেক সাধু সাধ্বী জন্মগ্রহণ করেছেন। Imitation of Christ বলে একখানা বই আছে, তার লেখকও এই দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্বে যে Agathaএর বিষয়ে বলিয়াছিলাম, তিনি Italyএর দক্ষিণে জন্মগ্রহণ করেন। সীতাকে যেমন পরীক্ষার আগুন ফেলা হয়েছিল, এবং তাহাতে তিনি খাঁটি হয়ে বাহির হন, তেমনি Agatha ভগবদ্ভক্তির গুণে সকল পরীক্ষাকে জয় করেন। ইনি বড়মানুষের মেয়ে ছিলেন, সংসার করলেন না, সন্ন্যাসীদের মত ছিলেন। এবং ইহার জীবন যে খুব খাঁটী ছিল, তাহা পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে। তখন Christian হইলেই তাকে ও রকম কষ্ট দিয়ে মারা হত। যদি কেহ বলেন, সে সময়ের কথা কি বিশ্বাস করা যায়? যদি তাহা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাহা হইলে আধুনিক সাধ্বীদের বিষয় বলা যাইতে পারে। আধুনিক সময়েও এই খ্রীষ্টজগতে অনেক সাধুসাধ্বী জন্মেছেন। Madam Givan ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে জন্মেন, তাঁর খুব বড়মানুষের ঘরে জন্ম হয়, অর্থাৎ মাবাপ খুব বড়লোক ছিলেন। ছেলেবেলা হইতে মনে ধর্ম্মভাব হয়। তাঁর মনে হয় Love of God এ বস্তুটা কি? যখন তার বার বছর বয়স তখন Francisএর লেখা বই পড়েন Madam cal আর এক জন সাধ্বী স্ত্রীলোকের বইও পড়েন, এঁদের বইয়ের কথার সঙ্গে তাঁর মনের ভাব মিলে যায়। Francis যাঁর কথা এর আগে বলা হইয়াছে তাঁর লিখিত Love of God বইখানা পড়েন, এবং তিনি যে মেয়ে পুরুষদের সব চিঠি লিখতেন তাহাও অনেক পড়েন। কিন্তু সে সময় যে Francisএর সব বই ছাপা হয়েছিল তাহা মনে হয় না। Francisএর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভগবানকে ভালবাসা, তাঁকে জীবন উৎসর্গ করা ও তাঁকে কেবল তাঁর জন্যই ভালবাসা। যখন তাঁর ১২ বৎসর বয়স তখন তিনি Paris এ (ফ্রান্সের রাজ-

* ১৯০২ শক ৪ঠা আগষ্ট ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত প্রমথলাল সেন প্রদত্ত বক্তৃতার মূলক।

ধানীতে) আসেন। আমাদের কলিকাতা যেমন বড় সহর উহা তেমনি বড় সহর, অনেক বড় বড় লোক থাকেন, বড় বড় বাড়ী আছে, সর্ব্বদাই খুব গোলমাল। Pari এ তাঁর রূপগুণের কথা চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল ও অনেক লোক আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে দেখতে আসত। ১৬বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় ও তাঁর Gayon নাম তাঁর বিবাহের পরেই হয়। বিবাহের পরথেকে তাঁর জীবনে খুব বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হয়। তাঁহার খুব মুস্কিলে পড়িতে হইল, কারণ স্বামীর সঙ্গে তিনি একপ্রাণ হইতে পারিলেন না। তাঁর জীবনের যে উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর স্বামীর সে উদ্দেশ্য ছিল না। এজন্য বিয়ের পর অনেক ভুগতে হয়। এই রূপ বিবাহের পর অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, কিন্তু প্রায় ৬ বছর পরে অর্থাৎ ২১ বছর বয়সে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন, একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করেন। তিনি বলিয়াছেন যে কয়বছর বিবাহিত ছিলেন, অধিক কষ্ট নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহা মানসিক, কিন্তু ইহার পর আরও অনেক রকম কষ্ট পাইতে হইয়াছে। যখন তাঁর ২৬ বছর বয়স, তখন Gremonr বলে একটী লোকের সঙ্গে মিল হয়, তাঁর উদ্দেশ্য জীবন উৎসর্গ করিতে চান। তার পর লেখা পড়া করে জীবন উৎসর্গ করে দেন ও বলেন যে আমার জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু তাঁর সেবা করা। গাইয়নের যখন ২৬ বৎসর বয়স, তখন একটা খুব অভাব বোধ করেন, এবং এই রূপ ৬ বৎসর বোধ করেন। যাহা করিতে চান যাহা বুঝতে পারছেন, অথচ তাহা করতে পারছেন না, একটা ছটফটানির ভাব হয়। ২৮ বছর বয়সে বিধবা হন। এই ১২ বছর যদিও অনেক কষ্ট সহ্য করেন, কিন্তু বিধবা হবার পরথেকে বেশী প্রলোভন বেশী পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল। বিধবা হবার পর তিনি ভাবলেন জীবনের একটা বন্ধন কেটে গেল, এখন আমি মুক্ত, এখন আমার জীবনের উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হতে পারে। Catholic দের মধ্যে তখন একটা দল ছিল, তাহা পরসেবা করিবার দল। সেই দলে Sisters of charity আছে, তাঁরা সমস্ত জীবন রোগীর সেবা করেন, তাহাতেই জীবন উৎসর্গ করেন, বিবাহ করেন না। Madam Gayon দিন কতক ঐ রমক দলে থেকে সেবা করেন। যখন তাঁর ৩২ বছর বয়স তখন একটা মুক্ত ভাব বোধ করলেন। সমস্ত দুঃখ কষ্ট গেল অর্থাৎ এত দিন যে মনে হত, যা হারালাম তাহা আর পেলাম না, ভগবান্ যে উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না, এখন আর সে রকম ভাব রইল না, যা হারাইয়াছিলাম, তাহা পাইলাম, যা ছিল না তাহাও পাইলাম, অনেক বেশী পাইলাম। পাইয়া মনে আনন্দ হল ও কৃতজ্ঞতা আসিল। তিনি বলিয়াছেন, তখন যে কেবল শান্তি পেলাম তা নয় তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক পেলাম। তিনি প্যারিসে ছিলেন, সেখানে অনেক প্রলোভন ও লোকের গঞ্জনা ছিল ও তাঁর ধর্ম্মের কথা লোকে পছন্দ করিত না। এজন্য আস্তে আস্তে প্যারিস থেকে অন্য জায়গায় গেলেন। যেতে যেতে রাস্তার Francis এর গোর দেখলেন, সেখানে আবার নিজের জীবন উৎসর্গ

করলেন। আর একবার যদিও জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু হয় নাই। Cathelic দের মধ্যে এক দল স্ত্রীলোক আছেন তাঁদের nun বলে, তাঁরা বলেন, তাঁদের যিশু খ্রীষ্টের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে, এই বলিয়া তাঁহারা বিবাহ করেন না। ধর্ম্মবিষয়ে ইহাদের একজন গুরু থাকেন, তিনি সব বলে দেন, কি করতে হবে কি না। ইহারা অনেকে রোগীর সেবাতে জীবন কাটান। Madam gayon ও প্রথম প্রথম রোগীর সেবা করিতেন। তিনি তখন যে গ্রামে থাকিতেন, সেই গ্রামে রোগীর সেবা করিতেন, গরীবদের সাহায্য করিতেন, পরামর্শ দিতেন। তার পর সেখানকার Bishop Madam gayon এর কথা শুনিতে পাইয়া, তিনি কি রকম লোক জানিবার জন্য ব্যস্ত হন। Bishop শুনিলেন এ রকম একজন স্ত্রীলোক এসেছেন যিনি বড় মানুষের মেয়ে খুব ধর্ম্মভাব আছে। এই সব কথা শুনিলে Bishop দের ভয় হয়, কে কখন এসে একটা নূতন মত প্রচার করবে। এ জন্য Bishop খুব ভাল করে খোঁজ নেন। Madam gayon এক দিকে রোগীর সেবা আর একদিকে ছোট লোকদের নিয়ে ধর্ম্মালোচনা করিতেন; মুটে মুজুরদের মিয়ে আলাপ করতেন, হাঁসপাতালে যেতেন। ৩৫ বছর বয়সে, Spiritual Torrents বলে একখানা বই লেখেন, ইহাতে ধর্ম্মজীবনের সাধন ও সত্য বিষয় লেখেন। short Method of Prayer বলে আর এক খানা বই লেখেন, তাহাতে ভগবানে যখন প্রেম হয় তখন যেমন ঝরণার জল পাহাড় থেকে উঠে, তার পর সব জায়গায় চলে যায়, তেমনি তাহাতে অনেক দেশের ভাল হয়, এই ভাব ফরাসী ভাষায় লেখেন। এখন তাহা ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। তখন কোন একখানা বই বাহির হইলে তাহা লইয়া সব বড় বড় ধার্ম্মিক লোক বিচার করিতেন, দেখিতেন, তাহাতে কোন নূতন মত আছে কি না, পুরাতন মত অস্বীকার করছে কি না। চারি দিকে সব লোকে তাঁর বই পড়িতে লাগিলেন, বই পড়ে তাঁর নামে সকলে নানা অভিযোগ উপস্থিত করলেন। তাঁর মতের সঙ্গে গুরুর মতের মিল ছিল, এজন্য তাঁর গুরুকে সে জায়গা ছেড়ে যেতে হল। অবশেষে তাঁহাকেও পালাইতে হইল। Spiritual Torrents বইখানাতে অনেক উচ্চ কথা আছে, আপনারা যদি পড়েন ত বুঝিতে পারিবেন। ইহার মধ্যে একটী কথা আছে আমরা যে কথাতে প্রার্থনা করি তাহা মনে মনেও হয়, তবে, লোকের সামনে কথা বলে করার দরকার হয়। তিনি সেখান থেকে পালিয়ে গিয়া ইউরোপের ৪। ৫ জায়গায় nice genoa প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া বেড়ান। অনেক লোক তাঁর কথা শুনিতে আসিত, সকলে খুব ভক্তি করিত ও সেবা করিত। ৩৮ বছর বয়সে আবার প্যারিসে ফিরে আসেন, সেখানে বড় বড় লোক তাঁর উপদেশ শুনিতে আসিতেন। তা শুনে খুব ভাল বাসিতেন ও সুখ্যাতি করিতেন। কিন্তু ওদেশে এরূপ নিয়ম যে এরকম কাহারও উপদেশে সকলে মুগ্ধ হইলে, সকলের বড়

বড় সভায় নিমন্ত্রণ করিতেন। মাডাম গাইনকেও অনেক জায়গায় এইরূপ নিমন্ত্রণে যাইতে হইত। তাঁর গুরুও সেখানে ছিলেন। হঠাৎ একদিন এসে তাঁকে ধরলেন, ওদের দেশে এরকম যে ধর্ম্ম মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে, তাকে আর দেশে থাকিতে দেয় না। মাডাম গায়েনের মতে যে ধর্ম বিরুদ্ধে কথা আছে তাহা তাঁর গুরুর দোষেই হইয়াছে। অতএব, প্রথমতঃ গুরুকে ধরিল, তার পর মাডামগায়েনকে ধরিল। Agathaকে যেমন Christian বলে খ্রীষ্টধর্মের আরম্ভে কষ্ট পেতে হইয়াছিল, তেমনি এখন এত দিন পরে এই কয়টি অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, তিনি যে সব মত প্রচার করেন, তাহা এখনকার ধর্ম্মমত বিরুদ্ধ, তিনি লোকজনদের নিয়ে বিনা অনুমতিতে সভা করেন ও তিনি যে বই ছাপিছেন তাহা ভয়ানক বই। কিন্তু বাস্তবিক তাঁর বই সে রকম নয়, তাহাতে অনেক গভীর তত্ত্ব আছে, ভয়ানক কিছু নাই; এবং ওদের দেশে এরকম যে, কেহ কোন সভাসমিতি বিনা অনুমতিতে করিতে পারিতে না। এই সব বলে কয়ে দিলে সে সময় সেখানে টেণিসন ছিলেন, ইনিও ফ্রানিসসের মত একজন বিখ্যাত সাধু লোক, যেমন ধার্ম্মিক তেমনি পণ্ডিত। ইহার অনেক গুলি চিঠি স্ত্রীলোকের ও পুরুষের নামে আছে বলে বইতে এখন ছাপা হইয়াছে। সে সব চিঠিতে অনেক বিষয় লেখা আছে। সংসারে কিরূপ ধর্ম্মসাধন করিতে হয় বিবাহিত জীবনে কিরূপ, অবিবাহিত জীবনে বড়মানুষের ও গরিব লোকেরই বা কিরূপ, কিরূপে ধর্ম্মসাধন করিতে হয় সব বিষয় লেখা আছে। টেণিসন মাডামগায়েনের বই পড়ে বলেন, এতেত মন্দ কিছু নাই, তাঁহাকে কেন কয়েদে দেওয়া হয়েছে, ভারি অন্যায় হয়েছে। তখন ডোসোওয়াই একজন প্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন, চারি দিকে তাঁর খুব নাম ছিল, ইনি ও টেণিসন মিলে সভা করেন ও তাহাতে বিচার করেন ইনি যে উপদেশ দেন তাহা মন্দ কি না, তাঁরা বলিলেন, আচ্ছা আগে আমাদের মাডামগায়েনকে এক দিন দেখতে দাও তার পর ঠিক করিব। তাঁরা ওঁকে দেখে খুব সন্তুষ্ট হলেন, বলিলেন, এত খুব ভাল লোক, তোমরা একে নিয়ে এত গোলমাল করছো কেন? কিন্তু ডোসোওয়াই শেষকালে ম্যাডাম গায়েন এর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, তৎপর কমিশন করে তাঁকে কয়েদে দেওয়া হয়। তখন ওঁর ৪৭ বৎসর বয়স। সে সময়কার কয়েদ বড় ভয়ানক ছিল, এখন যে আমরা কয়েদখানা দেখি ইহাত অনেক ভাল, তখনকার কয়েদখানা ভয়ানক স্থান ছিল। ইংলণ্ডে যাঁরা গিয়াছেন তাঁরা দেখেছেন, সেখানে আগেকার সব বড় কেসল আছে সেই কেসলে কারাগার আছে, তার চারিদিকে দেওয়াল, উপর দিয়ে খাবার ফেলে দেয়। এই রকম জায়গায় বদ্ধ করে কয়েদীদেরে রাখত। তাঁহাকেও শেষকালে সেই কারাগারে ফেলে দেয়।

(ক্রমশঃ।)

মূল্যপ্রাপ্তি।

৮ম বৎসর।

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ দাস,	বালেশ্বর	২৲
" সত্যেন্দ্রকুমার বসু,	গৌহাটী	২৲

৯ম বৎসর।

শ্রীমতী সরলাবালা দত্ত,	কুমিল্লা	২৲
" সুশান্তবালা বসু,	ভবানীপুর	১৲
" মৃণালিনী দাস,	বাঁকিপুর	২৲
" কিরণশশী দাস,	কলিব গা	১৲
" ইন্দুমতী দাস,	ঢাকা	২৲
" কুসুমকুমারী রায়,	পিঙ্গনা	২৲
শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দাস	বালেশ্বর	২৲
" দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	কুমিল্লা	২৲
" ললিতামোহন রায়,	কলিকাতা	২৲
" সিদ্ধেশ্বর মিত্র,	অমরপুর	১৲
" তারকনাথ রায়,	কলিকাতা	২৲
" বারাণসী বন্দ্যোপাধ্যায়,	তমলুক	২৲
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	সিউরি	১৲

১০ম বৎসর।

শ্রীমতী সরলাবালা দত্ত,	কুমিল্লা	১৲
" নির্ম্মলাসুন্দরী সেন,	পূর্ণিয়া	২৲
" সৌদামিনী রায়,	চট্টগ্রাম	২৲
" সরযূবালা সেন,	রঙ্গপুর	২৲
" ক্ষীরোদাসুন্দরী দত্ত,	কুমিল্লা	২৲
শ্রীযুক্ত কালীগোপাল রুদ্র,	শ্রীহট্ট	২৲
" অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী,	চট্টগ্রাম	২৲
" হাজারিলাল,	বাঁকিপুর	৷৹
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	সিউরি	১৲

১০ম ভাগ।
৮ম সংখ্যা।
ফাল্গুন।
১৩১১।
মহিলা
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
মাসিক
পত্রিকা।

সূচী।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"

১০ম ভাগ]   ফাল্গুন, ১৩১১ ; মার্চ্চ, ১৯০৫।   [৮ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

নব্য বঙ্গ গৃহিণি, তোমাকে প্রাচীনা মহিলাদিগের রীতিনীতি ও ভাবের নিতান্ত পক্ষপাতিনী হইবার জন্য বলা যাইতেছে না, তুমি অন্ধভাবে বিদেশীয়া বিজাতীয়া মহিলাদের আচার ব্যবহার ও চরিত্রের অনুকরণ কর ইহাও অতিশয় অপ্রার্থনীয়। উভয় শ্রেণীর মহিলাদিগের রীতিনীতির মধ্যে যাহা ভাল, তুমি অন্তর্দ্দৃষ্টিযোগে তাহা নির্ব্বাচন করিয়া অবলম্বন কর, সুনীতির পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা কর, ইহাই আমাদের অনুরোধ। দেশীয় প্রাচীন শ্রেণীর মহিলাদের আচার ব্যবহার সকলই যে মন্দ তাহা নয় ; ইয়ুরোপীয়া সভ্য মহিলাদিগের রীতিনীতি সমুদায় যে ভাল তাহাও ঠিক নহে। তুমি হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা হইয়া তাহাদের চাকচিক্য ভাবের স্রোতে গা ঢালিয়া চলিও না। তাহাতে তোমার অশেষ অকল্যাণ হইবে।

প্রাচীনশ্রেণীর বঙ্গ মহিলাদিগের রন্ধনপটুতা, গৃহকর্ম্মনৈপুণ্য, লজ্জাশীলতা, ভক্তি নিষ্ঠা, ধর্ম্মভাব নবীনা গৃহিণি, তোমার কি শ্রদ্ধাসহকারে নিত্য অনুকরণীয় নহে ? আমরা বলিতেছি না, তুমি তাঁহাদের ন্যায় তিন হাত লম্বা ঘোমটা টানিয়া অস্বাভাবিক লজ্জার পরিচয় দান কর, বিদ্যাশিক্ষার অবহেলা কর ও কতক গুলি কুসংস্কার মানিয়া চল।

আমরা আবার ইহা বলিতেছি না যে, ইয়ুরোপীয় মহিলাদিগের ন্যায় পরপুরুষের সঙ্গে অযথা ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া নির্লজ্জতার পরিচয় দান কর, এবং তাঁহাদের অনুকরণ করিতে যাইয়া বিজাতীয় নানা বিলাসিতা এবং ভোজনপানাদিতে যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বন কর। সভ্যতার সঙ্গে প্রকাশ্যে ও ছদ্ম বেশে নানা পাপ ও অনীতি এ দেশের নারী সমাজে প্রবেশ পূর্ব্বক সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

নারী জাতির প্রতি পুরুষের ব্যবহার।

হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান বৌদ্ধ মোসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের পুরুষগণ নারীজাতির প্রতি—আপন আপন স্ত্রী ভগিনীর প্রতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোন কোন সম্প্রদায়ের শাস্ত্রকারগণ নারীর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, এবং পুরুষগণ স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া চলিয়াছেন। আবার কোন কোন সম্প্রদায়ের শাস্ত্রকারদিগের এবং পুরুষ জাতির তদ্‌বিপরীত নীতি লক্ষিত হয়।

হিন্দু শাস্ত্রকার বলিয়াছেন;—

"যত্র নার্য্যস্তু পুজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ"

অর্থাৎ যে স্থানে নারীগণ সম্মানিত হন, সেই স্থানে দেবতারা বিরাজ করেন। মহিলা জন্মগ্রহণাবধি এই মহাবাক্য শিরোভাগে ধারণ করিয়া আছেন।

বিবাহকালে হিন্দু বরের প্রতি পুরোহিতের এই উপদেশ হয়;—

"ন চ পুষ্পেণ তাড়য়ণ"

অর্থাৎ তুমি তোমার এই পত্নীকে পুষ্প দ্বারাও পীড়া দিবে না।

হিন্দু শাস্ত্রকার লিখিয়াছেন;—

"ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ সদা সন্তোষয়েদ্দারান্ নাপ্রিয়ং ক্বচিদাচরেৎ।"

অর্থাৎ ধন বস্ত্র ও প্রেম শ্রদ্ধা এবং মিষ্ট বচন দ্বারা সর্ব্বদা ভার্য্যাকে সন্তুষ্ট রাখিবে, কদাচ তাঁহার প্রতি অপ্রিয়াচরণ করিবে না।

"নাস্তি ভার্য্যা সমো বন্ধুর্নাস্তি ভার্য্যা সমো গতিঃ। নাস্তি ভার্য্যাসমো লোকে সহায়ো ধর্ম্মসংগ্রহে।"

অর্থাৎ ভার্য্যার সমান আর বন্ধু নাই, ভার্য্যার সমান আর গতি নাই। ইহলোকে ধর্ম্মসাধনে ভার্য্যার সমান আর সহায় নাই।

পত্নীর সঙ্গে মিলিত হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সাধন ভজন করা হিন্দু শাস্ত্রের বিধি। এজন্য পত্নীকে সহধর্ম্মিণী বলে। যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানে পত্নী পতির সঙ্গিনী ও সহায় না হইলে সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের পূর্ণ ফল হয় না, তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্র যখন অশ্বমেধ যজ্ঞসম্পাদনে প্রবৃত্ত হন, তখন কুল পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ আসিয়া বলেন, সহধর্ম্মিণীর যোগ ব্যতীত এই মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হইতে পারে না। ইতি পুর্ব্বে শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় প্রিয়তমা ভার্য্যা সীতা দেবীকে প্রজারঞ্জনানুরোধে চির জীবনের জন্য বনে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য বশিষ্ঠদেব রাম-চন্দ্রকে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে বলেন. সীতাগত-প্রাণএকপত্নীনিষ্ঠ সাধু শ্রীরাম বলেন, আমি পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিতে পারি না, যজ্ঞ বরং অপূর্ণ থাকিবে তথাপি আমি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে অক্ষম, সীতা ব্যতীত আমার জীবন-সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী অন্য কোন নারী হইতে পারে না। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ অনন্যোপায় হইয়া হিরণ্ময়ী সীতামূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা বামভাগে স্থাপন করিয়া সেই মহাযজ্ঞসম্পাদনে প্রবৃত্ত

হইতে বিধি দিলেন। এক্ষণও সমুদায় ধর্ম্ম-পরায়ণ হিন্দুগণ সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম ক্রিয়া সম্পাদন এবং তীর্থ-পর্য্যটনাদি করিয়া থাকেন। সহধর্ম্মিণীকে অর্দ্ধাঙ্গী বলিয়া থাকে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;—

"যাবন্ন বিন্দাতে দারান্ তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।"

অর্থাৎ পুরুষ যে পর্য্যন্ত দার-পরিগ্রহ না করে, সে পর্য্যন্ত অর্দ্ধ থাকে দার-পরিগ্রহ করিলে সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

একজন পুরুষ এক পত্নীনিষ্ঠ হইবে, একাধিক পত্নী গ্রহণ করিবে না ইহাই বিধি। তবে স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে বংশ-রক্ষার জন্য সেই পত্নীবিদ্যমানে পত্নান্তরগ্রহণের বিধি আছে। স্ত্রী চিররুগ্না এবং ব্যভিচারিণী হইলে দারান্তর গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু অনেক উন্মার্গগামী অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ এই সকল বিধি ব্যবস্থা উলঙ্ঘন করিয়া বহু বিবাহ করিয়াছেন ও করিতেছেন ; সম্মানীয়া সহধর্ম্মিণীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত এবং তাঁহার প্রতি নানা প্রকার অসদাচরণ করিতে কেটি করেন না। "নচ পুষ্পেণ তাড়য়েৎ" পুষ্প দ্বারাও ও পত্নীকে তাড়না করিবে না বিধি। কিন্তু দণ্ড দ্বারা নিপীড়ন করিতে অনেক পাষণ্ড কাপুরুষ স্বামীকে দৃষ্ট হইয়াছে। এ সকল পাপ দুরাচারের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু নারী পুরুষ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সম্মানিত হইবেন ইহা হিন্দু শাস্ত্রের মূল মত ও বিধি। ধর্ম্মভীরু চরিত্রবান্ হিন্দু পুরুষগণ শ্রদ্ধা সহকারে সেই বিধি পালন করিয়া থাকেন।

খ্রীষ্টবাদী পুরুষেরা মহিলাদিগকে অতিশয় গৌরব দান করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গ, স্ত্রী ও পুরুষ এই দুয়ের যোগে পূর্ণাঙ্গ হয়। কিন্তু তন্মধ্যে স্ত্রী উত্তম অর্দ্ধাঙ্গ। অর্থাৎ স্ত্রী মানবরূপ দেহের ঊর্দ্ধ ভাগ ; মস্তকাদি, পুরুষ নিম্ন ভাগ। হিন্দুগণ নারীকে অর্দ্ধাঙ্গ বলেন, কিন্তু নারী বামাঙ্গ, পুরুষ দক্ষিণাঙ্গ, নারী নিকৃষ্ট অর্দ্ধাঙ্গ, পুরুষ শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধাঙ্গ, তাঁহাদের এই সংস্কার বা বিশ্বাস। ইয়ুরোপের বিশেষ বিশেষ খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় স্ত্রীজাতিকে ঈশ্বরের তুল্য বা ঈশ্বরাপেক্ষা উচ্চ সম্মান দান করিয়াছেন। এক সময় ফ্রান্সের রাজধানী পারিস নগরের লোক সকল ঈশ্বরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাকে দগ্ধ করিয়া তৎ-পরিবর্ত্তে নারী-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল, আমরা ঈশ্বরের অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইলাম, এক্ষণ হইতে নারীর অধীন হইলাম, নারীর পূজা করিব। এই রূপ কুৎসিত ঘৃণিত ব্যাপারও খ্রীষ্টীয় সমাজে ঘটিয়াছে। এক্ষণও অনেক লোক তদ্রূপ ঈশ্বরবিদ্বেষী ও নারী-ভক্ত। ফ্রান্স দেশের মহাদার্শনিক পণ্ডিত কম্‌ট নারী-প্রকৃতি-পূজার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া-সেই মত প্রচার করিয়াছেন। ইয়ুরোপে ও আমেরিকাতে খ্রীষ্টবাদিনী নারীদিগের পূর্ণ স্বাধীনতা, পুরুষেরা তাঁহাদিগকে অত্যন্ত ভয় ও সম্ভ্রম করিয়া চলেন। কেহ একটী নারীকে কোনরূপ অপমান করিলে অপমান-কারীর বিষম শাস্তি ভোগ হয়। এরূপও শুনা গিয়াছে, বিবীর বুট জুতাকে পান-পাত্র করিয়া তাহাতে মদ ঢালিয়া পান

করিয়া কোন ২ সাহেব নারীভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইয়ুরোপীয় পুরুষদিগের বিলাস-গর্ব্বিত স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অনেক স্থলে নিতান্ত পার্থিব ও শারীরিক বলিয়া বোধ হয়। খ্রীষ্টবাদী পুরুষগণ শাস্ত্রানুসারে এক পত্নী বিদ্যমানে পত্ন্যন্তরগ্রহণে অধিকারী নন। তবে বিশেষ বা সামান্য কারণে divorce (পত্নী-ত্যাগ) হইয়া থাকে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "যে ব্যক্তি আপন পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া অপর কাহাকে বিবাহ করে সে ব্যভিচার করে, এবং যে ব্যক্তি সেই স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে।" এই বিধি কয় জন খ্রীষ্টান মান্য করিয়া চলেন ?

বাইবেল শাস্ত্রে ইহাও উক্ত হইয়াছে ; "যাহাদিগের পত্নী আছে, তাহারা এরূপ জীবন যাপন করুক যেন পত্নী নাই।"

জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ সংযতচিত্ত হইয়া পবিত্র ভাবে পতি স্বীয় পত্নীসহ বাস করিবেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের এ সকল অতি মূল্যবান্ উপদেশ। পত্নীর প্রতি সেইরূপ পবিত্র ভাব রক্ষা করিয়া চলে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ে সেইরূপ পুরুষ বিরল। খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বহু মহিলা বৈরাগ্যব্রতাবলম্বনে ধর্ম্মের জন্য পরসেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করি, এবং দেবী বলিয়া ভক্তি করিয়া থাকি। এই সকল মহাত্মা দেবীপ্রকৃতি নারী দ্বারা খ্রীষ্ট সমাজের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। পুরুষগণ তাঁহাদিগকে সম্মান করুন, ভক্তি করুন, তাহাতে পুরুষ জাতির গৌরব ও আত্মার কল্যাণ হইবে। কিন্তু মোহমুগ্ধ ও অন্ধ হইয়া কোন নারীকে যেন ঈশ্বরের আসনে স্থাপন করা না হয়।

বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থবিশেষে উল্লিখিত হইয়াছে ;—

১। পত্নীকে সম্মান করিও।

২। তাঁহার প্রতি সদয়াচরণ করিও।

৩। তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্বাস ভাজন হইও।

৪। তিনি অপরের দ্বারা সম্মানিত হন, তুমি তাহার কারণ হইও।

৫। তাঁহাকে উপযুক্ত বস্ত্রালঙ্কার দান করিও।

বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিনী মহিলাদিগের মধ্যে দৃঢ় অবরোধের ব্যবস্থা নাই ; তাঁহাদের বহির্গমনে স্বাধীনতা আছে। সঙ্ঘমিত্রা প্রভৃতি বহু বৌদ্ধ মহিলা ধর্ম্মপ্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া দেশদেশান্তরে প্রচার করিয়াছেন। বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ মহিলাদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিয়াছেন, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে বহু বৌদ্ধনারী উচ্চনির্ব্বাণ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, ধর্ম্মনিষ্ঠায় ও জীবনের পবিত্রতায় সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। এক্ষণ তিব্বত পূর্ব্বোপদ্বীপ চিন প্রভৃতি বৌদ্ধ নিবাসভূমি দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা—বৌদ্ধ সমাজের পতন ও দুর্গতি ঘটিয়াছে। তথাপি স্থানে স্থানে উচ্চব্রতধারিণী বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী ভিক্ষুণী দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধ পুরুষগণ তাঁহাদিগকে মাতা বলিয়া শ্রদ্ধা

ভক্তি করেন। কক্স বাজারে বুদ্ধ মন্দিরের পার্শ্বে অনেক মাতাজির কুটীর দৃষ্ট হয়। তাঁহারা কুটীরবাসিনী হইয়া তীব্র বৈরাগ্যাবলম্বনে সাধন ভজন করেন। ক্রমশঃ

—•—

স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা।

(বিপৎ সম্মুখে। *)

প্রহরী নাবিক গভীর রজনীতে যখন চিৎকার করিয়া উঠে "বিদপৎ সম্মুখে," তৎক্ষণাৎ পোতাধ্যক্ষ জাহাজের কর্ত্তব্যনিরত সমুদয় কার্য্যকারকদিগকে সতর্ক করিয়া দেন। পূর্ব্বে সতর্ক হওয়া ও পূর্ব্বে সশস্ত্র হওয়া একই কথা। যদি সময়োচিত সতর্কতার প্রতি দৃষ্টি করা না যায়, তাহা হইলে শত শত মূল্যবান্ জীবনসহ জাহাজ জলমগ্ন হয়। যদি তদনুসারে কার্য্য করা যায়, শোচনীয় দুর্ঘটনা সহজে নিবারিত হয়। আমাদের সম্মুখে যে একটী ভয়ানক বিপদ উপস্থিত, ইহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য সাবধানতা অবলম্বন না করিলে দেশীয় সমাজ যে ইহা দ্বারা বিপন্ন হইবে একথা বলিতে কোন ভবিষ্যদ্‌বক্তার অসাধারণ শক্তির প্রয়োজন করে না। শয়তান আমাদের দেশে অসতীত্বের আকার ধারণ করিয়া আসিতেছে ইহা দেখিয়া আমরা সত্য সত্যই ভীত হইয়াছি। ইহাতে যুবকদিগের ভয়ানক সর্ব্বনাশ হইবে। হিন্দুধর্ম্মের যত ত্রুটিই থাকুক না কেন, ইহা সতীত্বকে মূল্যবান রত্ন-স্থানে সুরক্ষিত রাখিত। যদিও অনেকাংশে জাতিভেদ অনিষ্টকর, তথাপিও ইহা পাষণ্ড কুচরিত্র পুরুষগণকে এবং অসতী নারীদিগকে সর্ব্বদা কলঙ্কারোপ করত সামাজিক দণ্ড বিধান করিত, এবং দৃঢ়তার সহিত হিন্দুগৃহের পবিত্রতা রক্ষা করিত। কিন্তু এক্ষণে দেশে ভীষণ সংশয়বাদ প্রবল হইয়াছে, লোকে ঈশ্বর ও নীতির প্রতি উপহাস করিতে শিক্ষা পাইতেছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় এক দিকে কুসংস্কার ও জাতিভেদ হইতে, অপর দিকে ধর্ম্মের শাসন হইতে মুক্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় সুশাসনের নিতান্ত অভাব ঘটিয়াছে। এ প্রকার অশাসিত স্বেচ্ছাচারিতা এবং হঠকারিতার মধ্যে যুবক ও যুবতীদিগের অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা কি অনুমানের কথা বলিতেছি? না এমন সকল ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, বহু লোক কুপথগামী হইয়া বিনাশ পাইয়াছে। এই সকল সামাজিক নীতির বিরুদ্ধাচারিগণ তাহাদের পাপের প্রভাব চারি দিকে বিস্তৃত করিতেছে। আমাদের অধিক বলা আবশ্যক করে না। যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে অত্যন্ত ভয়ের কারণ বিদ্যমান। বর্ত্তমান সংশয়বাদ এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার সময়ে যাহারা স্ত্রী স্বাধীনতার বিপজ্জনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদের যথা সময়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। এতদ্দেশের সমুদয় ভক্তিমান্ হিন্দু এবং সমুদয় খ্রীষ্টীয়

*ইহা ইংরাজি হইতে অনুবাদিত। রবিবাসরীয় মিরর পত্রিকায় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল।

নরনারীর নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই, যাহাতে স্ত্রী লোক ও পুরুষগণ অযথা ভাবে সম্মিলিত না হয় তজ্জন্য তাঁহারা যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। যে ভাবে অব রোধপ্রথা প্রচলিত আছে তাহা অনেক দিন থাকিবে না ও থাকা উচিতও নয়। ইহা অতি অনিষ্টকর এবং প্রত্যেক সদ্বিবেচক ব্যক্তি এই ভাবেই ইহাকে নিষিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিবেন। স্ত্রীলোককে তাদৃশ ক্ষুদ্র গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখা যেখানে স্বর্গের দৈহিক বা নৈতিক আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, এবং যেখানে সে দাসীত্বে এবং দুর্দ্দশায় কালাতিপাত করে, ইহা মানবরী স্বাধীনতার প্রতি অক্ষমণীয় আক্রমণ, ধর্ম্ম ও সভ্যতা উভয়েই ইহার প্রতিবাদ করে। ভারতীয় নারীদিগকে স্বাধীনতা প্রদান কর, কিন্তু ইহা নৈতিক স্বাধীনতা হউক। ইহা যেন পাপ করিবার এবং প্রলোভন ও ইন্দ্রিয় পরায়ণতার পথে চলিবার অযথা অধিকার না হয়, কিন্তু ঈশ্বরের সেবা এবং যাহা সত্য ও সমুচিত তাহা সম্পাদন করিবার পক্ষে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়। যে ইন্দ্রিয় সুখ-প্রিয় যুবক পাশবিক ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় অথবা নীচ বিলাসিতায় অসতর্ক যুবতীকে এমন ইন্দ্রিয়াসক্ত ও পানাসক্ত যুবকদিগের দলে লইয়া যায়, যাহারা এ প্রকার নীচ আমোদ প্রমোদে লিপ্ত থাকে যাহাতে যুবতীর মন কলুষিত করে ও তাহার নীতি জ্ঞান দুর্ব্বল করে, সেই যুবকের ললাটে জনসমাজ কলঙ্কের চিহ্ন প্রদান করিবে। এরূপ ব্যবহার নিতান্ত বিপজ্জনক। কারণ এক্ষণে ভারতবর্ষ হিন্দু দেশ বা খ্রীষ্টান দেশ নহে। এখানে স্ত্রীলোকের কোন আশ্রয় স্থান নাই। নারী যেন ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনিই তাহাকে সামাজিক ও নৈতিক পবিত্রতার ভূমিতে লইয়া যাইবেন।

যে বীরত্ব নারীজাতিকে বিপদ এবং সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করে, আমরা সেই প্রকৃত বীরত্বের সম্মান করি। কিন্তু যাহারা ভদ্রনাম ধারণ করিয়া স্ত্রী স্বাধীনতা প্রদান করিবার ভাণ অবলম্বনে, স্ত্রীলোকের সন্দেহশূন্য মনকে পাপানুগত করে, এবং নরনারীদিগকে অধিকতর ইন্দ্রিয়াসক্ত করিয়া তাহাদিগের সামাজিকনীতি বিনষ্ট করে, সেই সকল কাপুরুষদিগকে আমরা ঘৃণা করি। যথেচ্ছাচার, পরদার, ব্যভিচার, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা ও রিপুপরিপোষণের প্রবল বন্যা সম্মুখে উপস্থিত। অর্দ্ধ শতাব্দী পরে দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়, পরায়ণতা এবং দুর্নীতি! ঈশ্বর এই মহাবিপদ হইতে রক্ষা করুন। হে দেশ-হিতৈষী ও জনহিতৈষী ব্যক্তিগণ রক্ষা কর, স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা কর। ঈশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

—•—

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

সন্দীপ দ্বীপ।

বঙ্গোপসাগরের বক্ষঃস্থিত সন্দীপদ্বীপ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অতিশয় প্রাচীন বৃহদ্ দ্বীপ। বিগত গ্রীষ্ম ঋতুতে যখন আমরা চট্টগ্রামে ও কক্সবাজারে গিয়াছিলাম, তখন সন্দীপে যাওয়ার উদ্যোগী হইয়াছিলাম। চট্টগ্রামস্থ ভ্রাতৃবর শ্রীযুক্ত কাশী-

চন্দ্র গুপ্ত আমাদের সঙ্গে তথায় যাওয়ার উদ্যোগী ও উৎসাহী হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে দিবারাত্রি প্রায় সর্ব্বক্ষণই প্রবল বায়ু বহমান ছিল, এবং সময়ে সময়ে সবেগে ঝড় হইতেছিল। তখন সন্দ্বীপ-প্রণালী পার হওয়া দুষ্কর ছিল। কুমিরিয়ার ঘাট হইতে জোয়ারের সময় ক্ষুদ্র নৌকায় ১৭ মাইল প্রণালীর বক্ষ অতিক্রম করিলে সন্দ্বীপে পঁহুছান যায়। সোজা পার হইতে গেলে ১৭ মাইল, সচরাচর স্রোতের গতি অনুসারে বক্রভাবে নৌকা চালাইতে হয়, তাহাতে প্রায় ২৫।৩০ মাইল অতিক্রম করা আবশ্যক হইয়া থাকে। যে সময়ে আমরা পারে যাইবার উদ্যোগী হইয়াছিলাম তখন বায়ুবেগে সন্দীপ-প্রণালার বক্ষে নিরন্তর উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হইতেছিল। সেই অবস্থায় সন্দীপে যাইতে চট্টগ্রামস্থ কোন বন্ধুই পরামর্শ দান করিলেন না। তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ না হইয়া নওয়াখালিতে যাইয়া মজিষ্ট্রেট শ্রীমান্ বীরেন্দ্রচন্দ্র সেনকে সন্দ্বীপে যাওয়ার বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। নওয়াখালি জেলার অন্তর্গত সন্দ্বীপ, মাজিষ্ট্রেট পরামর্শ দান করিলেন না। তিনি বলিলেন, এক্ষণ চেনালের ভয়ঙ্কর অবস্থা, সন্দীপ বেড়াইতে যাওয়ার এক্ষণ সময় নয়। সেদিনও নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, অনেকগুলি লোক মারা গিয়াছে। ষ্টীমারের গতিবিধি নাই, ক্ষুদ্র নৌকায় সেই সাগর শাখা পার হইতে হয়, শীত ঋতুতে তথায় যাওয়া অনেকটা নিরাপদ। তাঁহার পরামর্শানুসারে শীত ঋতুর প্রতীক্ষায় তখন সন্দীপগমনে নিরস্ত থাকিতে হইল। গত নবেম্বর মাসে আমরা পুনর্ব্বার নওয়াখালির মাজিষ্ট্রেট সেন সাহেবকে সন্দ্বীপে যাওয়ার বিষয়ে পত্র লিখি। তিনি তদুত্তরে আমাদিগকে এরূপ লিখেন যে, ডিসেম্বর ও জানুওয়ারি মাসে সন্দ্বীপে যাওয়া অনেক নিরাপদ। আপনারা নওয়াখালি হইতে পার হওয়ার ইচ্ছা করিলে আমি তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিব। কুমিরিয়ার ঘাট হইতে পার হইতে চাহিলে আমি পারের বন্দোবস্ত কিছুই করিতে পারিব না। কেন না কুমিরিয়া চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত। আপনারা কবে তথায় যাইতে চাহেন আমাকে লিখিবেন জানাইবেন, আমি সন্দ্বীপের ফৌজদারীর হাকিমকে পত্র লিখিব, তথায় পঁহুছিয়া যাহাতে আপনাদের কোনরূপ অসুবিধা না হয় তিনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। সেখানে স্থানে স্থানে ডাক বাঙ্গলা আছে, তাহাতে বাস ও বিশ্রাম করিতে পারিবেন। এই পত্র পাওয়ার পর আমরা চট্টগ্রামে যাইয়া কিয়দ্দিন অবস্থানানন্তর পর অর্ণপোতারোহণে কুতুবদিয়া দ্বীপে যাই। তাহির বিবরণ গত মাঘ মাসের মহিলাতে বিবৃত হইয়াছে। আমরা কুতুবদিয়া হইতে ১৮ই পৌষ সোমবার রাত্রিতে চট্টগ্রাম নগরে প্রত্যাগত হই, ১৯শে পৌষ মঙ্গলবার সায়ংকালে সন্দীপে গমন লক্ষ্য করিয়া বাষ্পীয় যানে কুমিরিয়া ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করি। কাশী বাবু আমাদের সহযাত্রী হন। বি, সি, সেনকে এই মাত্র জ্ঞাপন করা হইয়াছিল যে, আগামী সপ্তাহের মধ্যে আমরা সন্দীপে

যাত্রা করিব। কোন্ দিন যাত্রা করিব তাহা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিতে পারা যায় নাই। সেই পত্র পাইয়া তিনি তথাকার সবডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়কে আমরা যে সেখানে যাইব লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন ; কবে যাইব তাহা নিশ্চয় না জানাতে লিখিতে পারেন নাই। সন্দীপে যাওয়া যে ভারি মজা ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না, তাহা হইলে প্রস্তুত হইয়া যাইতাম, এবং কোন্ দিন যাইব পূর্ব্বেই নওয়াখালির মাজিষ্ট্রেটকে জানাইতাম। আমাদের সহযাত্রী কাশী বাবুও কখনও সন্দীপে গমন করেন নাই, তিনিও আমাদের ন্যায় নূতন যাত্রী ছিলেন।

রাত্রি প্রায় ৮টার সময় কুমিরিয়া ষ্টেশনে পঁহুছান যায়। আমরা সেই ট্রেণের সর্ব্ব শেষের গাড়ীতে ছিলাম, ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্ম হইতে বহুদুরে আমাদের গাড়ী ছিল। সেখানে ট্রেণ ৩।৪ মিনিটের অধিক থাকে না। অন্ধকারে ব্যাগ বিছানা ইত্যাদি বন জঙ্গলে ছুড়িয়া ফেলিয়া আমাদিগকে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িতে হইয়াছিল। ষ্টশনে মুটে নাই, অনেক ডাকাডাকি করিয়াও একটি মুটেও পাওয়া গেল না। দুই জন মুটের বহনযোগ্য মোট আমাদের সঙ্গে ছিল। ভ্রাতা কাশীচন্দ্র মুটের কাজ করিলেন. তিনি সঙ্গের মোট তিন চারি বারে ষ্টেশনে বহন করিয়া লইয়া গেলেন, দয়াবশতঃ আমাকে মোট বহন করিতে দিলেন না। ষ্টেশন মাষ্টার একজন মোসলমান. তিনি কিছু কিছু সেলামী না লইয়া যাত্রিকদিগকে মোট সহ ষ্টেশনের বাহিরে যাইতে দেন না। সেলামার জন্য ভারি উৎপীড়ন, আমাদের সহযাত্রী সন্দীপনিবাসী একজন মোসলমানের এবং অন্য কোন ব্যক্তিকের মোট ছিল, তিনি তাহাদিগ হইতে পীড়া পীড়ি করিয়া সেলামী বা বক্‌শিশ গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু কাশী বাবুর সঙ্গে তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল বলিয়া আমাদের নিকটে বক্‌শিশ চাহিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার অত্যাচারের কথা পরেও আমরা অনেক শুনিয়াছি। অনেক ষ্টেশনে এই রূপ বা অন্যরূপ লগেজসম্বন্ধে নিরীহ আরোহীদিগের প্রতি ষ্টেশনের কর্ম্মকর্ত্তা প্রভুদের অত্যাচার হয়, মুটেদের জুলুমের কথাই নাই।

কুমিরিয়া ষ্টেশনে পঁহুছিয়া কাহারও মুখে শুনা যায় ঘাট এক মাইল, কেহ বলেন আড়াই মাইল বা তিন মাইল। কিন্তু তাহা ষ্টেশন হইতে দুই মাইলের ন্যূন নহে। এখন অন্ধকার রাত্রিতে ঘাটে মোট সহ কিরূপে যাওয়া যায়। ষ্টেশনে মুটে বা গরুর গাড়ী নাই। প্রাতঃকালে জোওয়ার হইবে, সেই সময় পার হইবার নৌকা ছাড়িবে,ষ্টেশন অতি ক্ষুদ্র,তথায় রাত্রি যাপনের স্থানাভাব, এমন কি ২।৩ জন লোকের স্বচ্ছন্দে বসিবার স্থান নাই। বাজারে অনুসন্ধান করিলে মুটে বা গরুর গাড়ী পাওয়া যাইতে পারে। বাজার এক মাইল দূরে সন্দীপের যাত্রী মোসলমানটিকে এক খানা গরুর গাড়ী অনুসন্ধান করিয়া আনিবার জন্য বাজারে পাঠান যায়। তাহাকে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব দেখিয়া বা তাহা দ্বারা এ কাজ হইয়া উঠিবে না ভাবিয়া স্বয়ং

কাশী বাবু বাজারে যাত্রা করেন। নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া তিনি চলিলেন। সেই সময় কুমুরিয়া গ্রাম ওলাউঠা মহামারির দ্বারা ভীষণরূপে আক্রান্ত হইয়াছিল। হরির প্রসাদে সেই মহামারির উপশান্তি করার উদ্দেশ্যে বাজার ও পল্লার ইতস্ততঃ তুমুল হরিসঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, ষ্টেশন হইতে আমরা তাহা শুনিতেছিলাম। কাশী বাবু বাজার পর্য্যন্ত পহুছেন নাই, এমন সময়ে দেখেন সন্দীপনিবাসী মোসলমানটি গোশকট সহ ষ্টেশনাভিমুখে আসিতেছে। তাহার সঙ্গে সন্দীপের অন্তর্গত মাইটভাঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু বগলা চরণ চৌধুরীর অনুচর প্রসন্ন লণ্ঠনসহ আসিতেছিল। বগলা বাবু কাশী বাবুর পরিচিত ও আত্মীয়, সন্দীপের সঙ্কটাকীর্ণ পথে আমাদিগকে সাহায্য করে এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রসন্নকে পাঠাইয়াছিলেন। কাশী বাবুও তাঁহার নিকটে সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। প্রসন্ন ট্রেণ পহুছার সময় ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিলে আমাদিগকে এত গোলযোগে পড়িতে হইত না; ইহা তাহার ত্রুটি হইয়াছিল। সন্দীপনিবাসী মোসলমানটি তখনই ঘাটে যাইবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিল। প্রসন্ন তাহার বিরোধী হইয়া বলিল, "এই রাত্রিতে এই ভয়ানক শীতের মধ্যে আপনারা ঘাটে গেলে ঠাণ্ডা হওয়ায় আপনাদিগকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইবে।" গাড়ওয়ানও এই কথা বলিতে লাগিল। আমাদের ব্যাগ বেডিংত্যাদি গরুর গাড়ীতে চাপিয়া প্রসন্নের কথানুসারে আমরা বাজারে চলিয়া গেলাম। আমাদের সকলকে পদব্রজে যাইতে হইয়াছিল। প্রসন্নের নির্দ্দেশানুসারে বাজারের একটি দোকানে যাইয়া আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। তখন রাত্রি বোধ করি ১.টা বাজিয়াছে। আমরা রাত্রি প্রভাত না হইতেই গাত্রোত্থান করিয়া দেখি প্রসন্ন আমাদের জন্য ডাইল ভাত প্রস্তুত করিতেছে। আমরা বলিলাম, সকাল বেলা আমাদের খাওয়ার অভ্যাস নাই, এরূপ ভোর বেলা খাইতে পারিব না। প্রসন্ন বলিল, "কিছু খাইতেই হইবে, নতুবা সমুদায় দিন খাওয়া হইবে না, অত্যন্ত কষ্ট হইবে। অগত্যা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উপাসনা করিয়া প্রসন্নের কথানুসারে খাইতে বসা গেল। ডাইল ভাত দধি ইত্যাদি যোগে কথঞ্চিৎ প্রাতরাশ করিয়া আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘাটের অভিমুখে দৌড়িলাম। সঙ্গের দ্রব্যজাত গোশকটযোগে পূর্ব্বেই প্রেরিত হইয়াছিল। আমরা ঘাটে যাইয়া দুই ঘণ্টা বসিয়া থাকি, বেলা ১০টার সময় জোওয়ার হইল। পরপারে যাওয়ার জন্য এক খানা শামপান এবং এক খানা ক্ষুদ্র বালাম নৌকা ঘাটে বাঁধা ছিল। সন্দীপে গমনের বহু যাত্রিক উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশই হাটুরে যাত্রিক। তাহারা পণ্যপুঞ্জ সহ উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা মাঝিকে বলিলাম, ডাকের হরকরা ও আমাদের তিন চারি জনের জন্য শামপান খানা দিতে হইবে, ইহাতে অপর লোক থাকিতে পারিবে না; বালামে হাটুরে লোকদিগকে পার কর। মাঝি বলিল, "বাবু, চারি জন মাত্র দাঁড়ী আছে,

দুই জন শামপানে দুই জন বালামে ভাগ করিরা দিলে দুই দাঁড়ের টানে কোন নৌকাই সায়ংকালের পূর্ব্বে পারে পঁহুছিতে পারিবে না। সকলে বালামে আরোহণ করিলে চারি দাঁড়ে শীঘ্র পঁহুছান যাইবে। অগত্যা আমরা হাটুরে লোকে ও তাহাদের মোটে পরিপূর্ণ বালামে আরোহণ করিলাম। স্থানাভাবে বসিতে সকলেরই অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। নৌকায় ছাপ্পর নাই, সূর্য্যোত্তাপনিবারণের জন্য মস্তকে আতপত্র ধারণ করিয়া বসা গিয়াছিল। কাশী বাবু ট্রেণে নিজের ছত্রটি হারাইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি অন্য এক জনের আতপত্রের ছায়ার অংশ গ্রহণ করিলেন। মাঝি ও মাল্লার পরস্পর ঝগড়ার জন্য নৌকা ছাড়িতে প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব হইল। মাঝির বাড়ী হইতে খানা আসিলে পর তিনি একটু সুস্থির হইলেন, পরে নৌকা ছাড়িলেন। জোওয়ার মুখে নৌকা চলিল, গুরু ভারের চাপে তাহাতে সবেগে জল উঠিতে লাগিল, এবং নৌকা জলগর্ভে প্রবেশ করিবার উদ্যত হইল। তখন আমরা মাঝিকে ধমকাইয়া বলিলাম, শীঘ্র হাটুরে লোকদিগকে তাহাদের মোট সহ পারে নামাইয়া দিতে হইবে, তাহা না হইলে তোমাকে নৌকা চালাইতে দিব না। অগত্যা মাঝি অল্পসংখ্যক লোক রাখিয়া অধিকাংশ লোককে নৌকা হইতে নামাইয়া দিল। জোওয়ারের বেগে এবং চারি-দাঁড়ের বলে বালাম ছুটিল; তাহাতে জল উঠার নিবৃত্তি হইল। কতকদূর চলিলে পর আর চেনালের উভয় কূলের কোন কূল দৃষ্ট হইতেছিল না। আমরা যেন অকূল সাগরের বক্ষে ভাসিতে ছিলাম। কেবল উত্তর কূলে সুদূরে চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের চূড়া লক্ষিত হইতেছিল। চন্দ্রনাথগিরির শিখর দেশ হইতে নীলাম্বুনিধির বক্ষঃস্থিত হরিৎকান্তিতরুরাজিসমাচ্ছন্ন সন্দীপ দ্বীপ সুবিস্তীর্ণ নীলাম্বরে সবুজ কার্পেট খণ্ড স্থাপিত বলিয়া প্রতীয়মাণ হয়। তখন বায়ুর বেগ কিছুই ছিল না, তজ্জন্য প্রণালীর বক্ষে তরঙ্গলীলা লক্ষিত হয় নাই। নৌকা কিছুই দোলে নাই। জোওয়ারের বেগে ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে বালাম ২০ ২৫ মাইল চলিয়া বেলা চারিটার সময় সন্দীপ কূলে গুপ্তছড়ার ঘাটে পঁহুছিল। তখন ভাটা পড়াতে জল অনেক দূর সরিয়া গিয়াছিল। হাঁটু বা কোমর সমান গভীর কর্দ্দম ভাঙ্গিয়া পারে উঠিতে হয়, কাদায় ডুবিয়া পড়িবার ভয়ও হইয়া থাকে। মাঝি মাল্লাগণ কোনরূপে কোলে কাঁধে করিয়া আমাদিগকে পারে তুলিয়া দিল। তজ্জন্য তাহাদিগকে ॥০ বক্‌শিশ দেওয়া যায়। পারেত উঠা গেল, সেখান হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে হরিশপুরে যাইতে হইবে, ঘাটে কোনরূপ যান বাহন নাই, মুটেও নাই। একজন সহযাত্রী মোসলমান যুবাকে ও ডাকের হরকরাকে কিছু পয়সাদানের বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের মস্তকে মোট অর্পণ পূর্ব্বক প্রায় এক মাইল দূরে ডাকবাঙ্গলাভিমুখে চলিয়া যাওয়া যায়। সেখানে যাইয়া সন্দীপের সুমিষ্ট ডাবের জল পান ও সঙ্গে আনীত রুটি ভক্ষণ করিয়া কিংৎক্ষণ শ্রান্তি দূর করা গেল। প্রসন্ন অনেক চেষ্টায় সন্নিহিত

পল্লী হইতে এক খানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া লইয়া আসিল। আমরা সায়ংকালে সেই গোযানে আরোহণপূর্ব্বক হরিশপুরে যাত্রা করিলাম। প্রসন্ন আমাদিগকে রওয়াণা করিয়া জমিদার বগলা বাবুর মাইট ভাঙ্গার কাচারীতে চলিয়া গেল। বগলা বাবু তাঁহার সুদক্ষ অনুচর প্রসন্নকে আমাদের সাহায্যার্থ প্রেরণ করাতে আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ।

(ক্রমশঃ)।

—*—

মহিলাদিগের ভোজ্য ও পরিচ্ছদ।

মনুষ্যসমাজে সাধারণতঃ ত্রিবিধ শ্রেণীর ভোজন পরিলক্ষিত হয়। দৈব ভোজন, রাক্ষসিক ভোজন, এবং পৈশাচিক ভোজন।

১। শুদ্ধ সাত্বিক ভাবের ভোজনকে দৈব ভোজন বলা যায়। তাহাতে ভোজ্যের সঙ্গে কোন দুর্গন্ধ আসাত্বিক বস্তুর ও বিলাসভোজ্য সামগ্রীর যোগ হয় না, ভোজ্যজাতের কোন আড়ম্বর হয় না, এবং জীবদেহের সম্পর্ক থাকে না। সংযতেন্দ্রিয় ধর্ম্মসাধকগণ এই রূপ ভোজ্য ভোজন করিয়া থাকেন। শারীরিক মানসিক শুদ্ধতা ও সাত্বিকতা এই প্রকার শুদ্ধ সাত্বিক ভোজনের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। আমাদের দেশে মোসলমান জাতি প্যাঁজখোর জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। অন্য কোন জাতীয় স্ত্রীপুরুষ এত অধিক প্যাঁজ লসুন ভক্ষণ করে না। কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মোহম্মদ দুর্গন্ধ বস্তু বলিয়া লসুন ও পলাণ্ডু-ভক্ষণের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। হদিস শাস্ত্রের দুই তিন স্থানে তাঁহার এই প্রকার উক্তি উল্লিখিত আছে যে, "তোমরা এই দুর্গন্ধ পলাণ্ডু বা লসুন ভক্ষণ করিয়া মসজেদে প্রবেশ করিও না, যাহার দুর্গন্ধ মনুষ্যের ক্লেশজনক তাহা দেবতাদের সমধিক বিরক্তিকর।" হদিস মেশকাত শরিফের নমাজক্ষের ও মসজেদসম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদ পড়িলে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গ ভাষাতেও পুস্তকাকারে উক্ত হদিস গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়াছে। তাহার অন্য এক স্থানে এরূপ লিখিত আছে যে, সেই দুই দুর্গন্ধ বস্তু যদি একান্তই খাইতে হয় তবে তাহার দুর্গন্ধ বিনষ্ট করিয়া খাইবে। ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্য দেবের ও তাঁহার অনুগামী ভক্তগণের কেমন শুদ্ধ সাত্বিক ভোজন ছিল! ভক্ত কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহসাধক বন্ধুগণ বহুকাল প্রত্যহ শুদ্ধ ভাবে নিরামিষ অন্ন ব্যঞ্জন স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিয়াছেন। সেই ভোজ্য সামগ্রীতে কেবল সুগন্ধ ঘৃত মসলারই যোগ হইত। লসুন পলাণ্ডু কিংবা বরাহবসা (শূকরের চর্ব্বি) ইত্যাদি ইন্দ্রিয়োত্তেজক দুর্গন্ধ বস্তুর কোন প্রকার যোগ থাকিত না।

সাধুদিগের ভোজন ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। তাঁহারা ভোজনের সময়ে উপস্থিত ভোজ্যজাত অন্নদাতা বিধাতার মঙ্গল হস্তের দান, এই বিশ্বাসে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাবনত মস্তকে তাঁহাকে নমস্কার

করেন, এবং তাঁহারা ভোজনপানের সঙ্গে ভক্তচরিত্ররূপ রক্ত মাংস আত্মস্থ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ভোজন একটি উচ্চ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। তাঁহাদের ভোজন পশুর ন্যায়—নাস্তিকের ন্যায় নহে। মহর্ষি যিশুখ্রীষ্ট শেষ জীবনে আপন শিষ্যমণ্ডলীকে রুটি ও পানীয় পরিবেশন করিয়া তাঁহার চরিত্ররূপ রক্ত মাংস আত্মস্থ করিতে বলিয়াছিলেন। এক্ষণও খ্রীষ্ট শিষ্যমণ্ডলী গুডফ্রাইডের উৎসবে সমবেতভাবে Lord's supper (প্রভুর রক্ত মাংস ভোজন) করিয়া থাকেন।

হিন্দু বিধবাগণের কেমন শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভোজন! তাঁহাদের অনেকে দেহ মন শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম এবং ব্রহ্মচর্য্যের অনুরোধে এক বেলা স্বহস্তে প্রস্তুত হবিষ্যান্ন ভোজন করেন। তাহাতে তাঁহারা সুস্থ সবল দেহে ও সুস্থমনে দীর্ঘ জীবন যাপন করিয়া থাকেন। এইরূপ ভোজনদর্শনেও মনে শুদ্ধভাবের উদয় হয়। প্রধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় চিত্তসংযম ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনোদ্দেশ্যে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগকে কয়েক বৎসর মাঘোৎসবের সময় আমিষভোজনে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কয় জন ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মিকা মহর্ষি দেবের সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন, আমরা জানি না। মৎস্য-মাংসসমন্বিত পূর্ণ বিলাসভোজ্য ভোজন এই যুগের অনেক মহিলার জীবনের যেন প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। পারস্ত কবি শেখ সাদি বলিয়াছেন,"ভোজন করিয়া জীবন ধারণ ঈশ্বরগুণানুবাদ করার জন্য, তুমি ভাবিও না যে, জীবনধারণ কেবল ভোজনের জন্য।" কিন্তু অনেকে এক্ষণ মনে করেন যেন যথেচ্ছ ভোজনপানের জন্যই জীবন ধারণ।

২। অর্দ্ধ সিদ্ধ বা অর্দ্ধ দগ্ধ আস্ত কুক্কুট কিংবা গোবরাহাদি পশুর উরুদেশ টেবিলের উপর তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা ছিন্ন করিয়া শুদ্ধ সেই মাংস গুলি কাঁটা যোগে তুলিয়া মুখগহ্বরে প্রদানপূর্ব্বক অন্ন বা রুটিকা ব্যতিরেকে তাহা চিবাইয়া কোন মহিলাকে খাইতে দেখিলে কি বলা যাইবে না, যে তিনি রাক্ষসিক ভোজ্য ভোজন করিতেছেন, বিলাতের সমুদায় মহিলারই প্রত্যহ এই প্রকার রাক্ষসিক ভোজন হয়। তদ্রূপ মাংসের সঙ্গে লবণ ও চর্ব্বি এবং পলাণ্ডুর যোগ হয় মাত্র। সেই সকল মাংসকে এক প্রকার আম মাংস বলা যায়। উহা জীর্ণ করিবার জন্য মদ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সেই প্রকার মাংস উদরস্থ করিবার পূর্ব্বে গোমাংসরস বা কুক্কুটরস অর্থাৎ soup পান হয়। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন বিলাতে যাইয়া মেয়ে পুরুষে বসিয়া এরূপ রাক্ষসিক ভোজন করাবিষয়ে প্রকাশ্য সভায় সামান্য নিন্দা ও তিরস্কার করেন নাই। বিলাতে আজ কাল নানা বিষয়ের কত উন্নতি ও কত পরিবর্ত্তন, কিন্তু সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে যে, সেই দেশবাসীদের মধ্যে অসভ্যোচিত ভোজ্য পরিচ্ছদ প্রচলিত হইয়াছে তাহার আর কোন পরিবর্ত্তন হইতেছে না; সে বিষয়ে আর যেন কোন science আবিষ্কার হয় না। স্বজাতীয় আচার ব্যবহারসম্বন্ধে বিলাতের লোকেরা অতিশয় রক্ষণশীল। জাতীয় ভোজ্য পরি-

চ্ছদাদি-বিষয়ে ইয়ুরোপীয় জাতি যেরূপ পক্ষপাতী ও গোঁড়া পৃথিবীতে এরূপ কোন জাতি নাই; এবং বাঙ্গালীর ন্যায় অনুকরণপ্রিয় জাতিও দুনিয়ায় দ্বিতীয় নাই। সভ্য বঙ্গ মহিলারা কি বিলাতী মহিলাদের পানভোজনের অনুকরণ করিতেছেন না? আমাদের মনে হয় সকলে না হয় অনেকে করিতেছেন।

মাংসাহারবিরোধী মোগল সম্রাট্ আক্‌বর শাহ বলিয়াছেন, "মনুষ্য হইয়া আপন উদরকে পশুপক্ষীর মৃতদেহের গোরস্থান করা অতীব লজ্জার বিষয়।" বিলাতী ধরণের মাংসাদি ভোজনে পশু ভাব ও বিশেষ বিশেষ আন্তরিক রিপু যে সমধিক সমুত্তেজিত হয় তাহা বলা বাহুল্য। ঈদৃশ পান ভোজনের দোষদর্শনে বিলাতে নিরামিষভোজীর দল বৃদ্ধি পাইতেছে। শুনা যায় এক্ষণ লক্ষাধিক স্ত্রীপুরুষ আমিষ ভক্ষণ হইতে বিরত হইয়াছেন। এদেশে তাহার ঠিক বিপরীত। বাঙ্গালী মহিলারা মাংস ভোজন করিতেন না এক্ষণ তাঁহারা উৎসাহ সহকারে মাংসাহার করিতেছেন, অনেকে বিবীদের দৃষ্টান্তে ছুরি কাঁটা যোগে পশু পক্ষীর মাংসাহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এক্ষণ বিলাতে Temperance society র (মদ্যপাননিবারিণী সভার) ও উন্নতি হইয়াছে।

৩। যে সকল মহিলা পচা সড়া দুর্গন্ধ বস্তু ভোজন করিতে ভাল বাসেন, তাঁহাদের সেই ভোজন পৈশাচিক ভোজন। কীট জাতীয় বিকটাকার দুর্গন্ধ পচা কাঁকড়া ও চিঙ্গড়ী মাছভক্ষণে অনেক মহিলার অরুচি দেখা যায় না। তবে দুর্গন্ধ প্যাজ লসুনসংযোগে অনেকে সেই পচা জন্তু গুলির পূতি গন্ধকে কিছু মারিয়া ফেলেন। "বিষস্য বিষমৌষধম্।" তথাপি সেই বিষ খাইতেই হইবে। আশ্চর্য্য রুচি ও প্রবৃত্তি! পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীগ্রামবিশেষে একটী মহিলা ছিলেন, চাকর বা চাকরাণী হাটে বাজারে যাইবার সময় তিনি বলিতেন, "ও গো, আমার জন্য এক পয়সার কুইয়া মাছ আনিও।" পচা দুর্গন্ধ মাছকে পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা "কুইয়া মাছ" বলে। কুইয়া মাছ না হইলে সেই মহিলার ভাল খাওয়া হইত না। এই রূপ ভোজনকে কি পৈশাচিক ভোজন বলা যায় না? গত শীত ঋতুর ঝড়ে চট্টগ্রামের সন্নিহিত বঙ্গোপসাগরে চারি পাঁচশত জেলে মারা গিয়াছে। তাহারা পুঞ্জ পুঞ্জ লটিয়া মাছ ধরিয়া তাহা শুকাইয়া চট্টগ্রামের নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিত। সেই শুষ্ক লটিয়ার অর্থাৎ "লটিয়া ছুংনির" যে কি দুর্গন্ধ তাহার বর্ণনা হয় না। আমরা তাহা ভক্ষণ না করিলেও দুর্গন্ধ ভোগ করিয়াছি। সেই জেলে গুলি মারা যাওয়াতে চট্টগ্রামে লটিয়ার দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছে; মেয়েরা তাঁহাদের প্রিয় খাদ্য "লটিয়া ছুংনির" অভাবে হাহাকার করিতেছেন, চট্টগ্রাম নিবাসী একজন বন্ধু আমাদের কুতুবদিয়া দ্বীপে অবস্থান কালে দুঃখের সহিত এ সকল কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। গত বারে আমরা কুতুবদিয়ার ভ্রমণবৃত্তান্তে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত মৎস্যজীবীদিগের শোচনীয় মৃত্যু এবং তাহাদের পরিবারবর্গের দুঃখ ক্লেশের জন্য দুঃখ

করিব, না লটিয়া মাছের অভাবে সেদেশের মেয়েদের যে আহারে কষ্ট হইয়াছে তজ্জন্য দুঃখ করিয়া বন্ধুটির সঙ্গে সহানুভূতি করিব, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না।

মহিলাগণ আমিষভোজন ত্যাগ করিয়া নিরামিষভোজী হইবেন, ইহা আমরা বলিতেছি না, এই সভ্যতার যুগে কখনও এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। অনেক মহিলার পচা সড়া মৎস্য ভক্ষণে প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তি সংযত করিলে কি চলে না? অর্দ্ধসিদ্ধ বা অর্দ্ধ দগ্ধ বাছুরের বা শূকরের ঠ্যাঙ্গ ছুরি দ্বারা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া বিবীদের অনুকরণে কোন বাঙ্গালী মেয়ে ভক্ষণ করিতেছেন দেখিলে আমাদের শরীর কাঁপিয়া উঠে। প্রাচীনশ্রেণীর হিন্দুমহিলারা মাছ খাইয়া থাকেন, মাংস ভক্ষণ করেন না। অনেক নবীনা মহিলা মাংস না খাইয়া থাকিতে পারেন না, স্বীকার করি। এ বিষয়ে কি কিঞ্চিৎ সংযত হওয়া যায় না? কখন কখন ছাগমেষাদির মাংসের ঝোল পরিমিতরূপে ভক্ষণ করিলে কি রসনার তৃপ্তি ও দেহরক্ষা হয় না? বিজাতীয় সভ্যতারও প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়া না গিয়া আত্মসংযম করিতে পারিলেই মহত্ব। এ দেশীয় শাক্ত পুরুষেরা পূজা পর্ব্বাহাদিতে কখন কখন বলিপ্রসাদরূপে ছাগাদির মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন, উদরপূর্ত্তি ও রসনার তৃপ্তির জন্য একটা জীবকে বধ করিয়া তাহার মাংসভক্ষণে অনেকের আপত্তি। বামাচারী শাক্তদিগের কথা স্বতন্ত্র, তাহারা মাংসভক্ষণের সঙ্গে সুরা পান করিয়া থাকে। বিবীরা ঘোর বামাচারী শাক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। বামাচারী শাক্তগণও প্রতিদিন মদ্য মাংস পান ভোজন করেন না। বাইবেল শাস্ত্রে সাধু পলের এইরূপ উক্তি নিবদ্ধ; "মাংসভোজন সুরাপান অথবা অন্য কোন কার্য্য যাহাতে তোমার ভ্রাতার পদস্খলন হয়, বা হৃদয়ে আঘাত লাগে, বা দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি পায় এরূপ কিছু না করাই শ্রেয়।" খ্রীষ্টবাদী সাহেব বিবীগণ তাঁহাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত মূল ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলের আপ্তবাক্য কি এইরূপে তান্ত্রিকাচারে মান্য করিয়া থাকেন? কোমলপ্রকৃতি বাঙ্গালী মহিলা সেই বিবীদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া চলেন ইহা কি প্রার্থনীয়? ইহাতে কি আমাদের হৃদয়ে বিষম ব্যথা হয় না?

বিলাতী ভোজ্য ও পরিচ্ছদাদির অনুকরণ অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেকে বিলাতে না যাইয়া দেশে থাকিয়াই পূর্ণ মাত্রায় তাহার অনুকরণ করিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহারা ভাল মন্দ কিছুরই বিচার করিতেছেন না। তাঁহারা স্বদেশীয় স্বজাতীয় সুনীতি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় বিজাতীয় কুরীতি অবলম্বন করিতেছেন। বঙ্গহিতৈষিণী পরসেবাপ্রিয়া সাধ্বী বিবী লী একদিন ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ে বক্তৃতায় "তাঁহার স্বদেশস্থ মহিলাগণ যে মদ্যপান করেন তজ্জন্য অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং মাংসভোজনে যে, তাঁহার বিরাগ ইহাও বলিয়াছিলেন। অধিক মাংসাহারে ক্রোধাদি নীচ প্রবৃত্তি প্রবল হয় বলিয়া তিনি আপন

তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত দুই তিন শত অনাথ বালক বালিকাকে প্রায় মাংস খাইতে দেন না। এ দেশীয় সাধারণ লোকদিগের ন্যায় ডাইল ভাত মাছ সচরাচর খাইতে দেন, তিনি এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। একজন ইয়ুরোপীয় বিদুষী মহিলায় মদ্য মাংসের বিরুদ্ধে মহিলাসমিতিতে সমালোচনা করা সামান্য ক'া নহে।

এক্ষণ বিলাতী পরিচ্ছদবিষয়ে কিছু বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে। অনেক অনুকরণপ্রিয়া বাঙ্গালা মহিলা বিবীদের পান ভোজনের ন্যায় তাঁহাদের কাপড় পরার অনুকরণেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সম্ভ্রমরক্ষা শিতোত্তাপ ও লজ্জানিবারণের জন্য বস্ত্রপরিধান। বিবীদের বুক আঁটা কোমর আঁটা বস্ত্র পরিধান, বিশেষতঃ বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধ দেশ ও বাহুমুল মুক্ত থাকে এরূপ পরিচ্ছদ (night dress) পরিধান কি লজ্জাজনক নহে? তাহাতে কি উপযুক্ত রূপে শীত নিবারণও হয়? তাহা পরিয়া পুরুষসমাজে উপস্থিত হইলে কি সম্ভ্রম রক্ষা পায়? কেবল গাউন পরিয়া এক বোঝা বস্ত্র নীচের দিকে ঝুলাইয়া ভূতলে লোটাইয়া চলিলেই কি লজ্জা সম্ভ্রম রক্ষা পায়? এ অঞ্চলের মেয়েদের জেকেট জামা না পরিয়া উড়নী চাদরে আচ্ছাদিত না হইয়া এক পেচ দিয়া সূক্ষ্ম বসন পরিধান ভাল নয়, অতিশয় জঘন্য, ইহা স্বীকার করি। তবে ব্রাহ্মসমাজের মহিলাদিগের মধ্যে পরিচ্ছদবিষয়ে কিছু উন্নতি হইয়াছে, হিন্দু সমাজের মহিলারাও তাহার অনুকরণ করিতেছেন, ইহা আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু অনেক মহিলারই বিবিয়ানা পরিচ্ছদের দিকে বিশেষ ঝোঁক দেখা যায়। তাঁহারা স্ব স্ব বালিকাদিগকে তদ্রূপ পরিচ্ছদ পরাইয়া বিবী সাজাইয়া থাকেন।

আনুষঙ্গিক সাহেবী পোষাকের কথা কিঞ্চিৎ বলা যাউক। সাহেবদের গা আঁটা মোটা পেণ্টুলন ও খর্ব্ব কোট অতিশয় অসভ্যতা ও নির্লজ্জতার পরিচায়ক। হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত লম্ব চোগা বা চাপকান পরিলে শরীর অনেক আচ্ছাদিত থাকে, ধুতি পরিধানেও কোঁচা দ্বারা লজ্জানিবারণ হয়। সাহেবদিগের কোট পেণ্টুলনপরি ানের অনুকরণ করিতে যাইয়া বাঙ্গালি পুরুষদিগকে না ভাল দেখায়, না তাঁহাদের লজ্জা নিবারণ হয়। এরূপ পরিচ্ছদ পরিয়া মেয়েদের নিকটে যাওয়া অসঙ্গত। অপিচ এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করা কষ্টকর ভিন্ন সুখকর নহে। এদেশের প্রকৃতি তাহা পরিতে বারণ করে। গা আঁটা মোটা পে ষাক পরিধান শীত-প্রধান ইয়ুরোপেই শোভা পায়। সোলা বা বাখারির হ্যাট পরিধানে উত্তমাঙ্গ মস্তকের শোভা না হইলেও রৌদ্র ও বৃষ্টিতে পথ চলিবার সময় মস্তকোপরি কথঞ্চিৎ ছত্রের কাজ হইয়া থাকে। এই উপকারটি হয়। তবে সাহেবেরা অনুকরণপ্রিয় চঞ্চল প্রকৃতি নহে, রক্ষণশীল। সাহেব বিবীরা চির জীবন এদেশে যাপন করিলেও সজাতীয়তা—জাতীয় আহার পরিচ্ছদাদি তাঁহারা পরিত্যাগ করিবার লোক নহেন; সে সকলের গোঁড়া, উহা যত মন্দ হউক না কেন স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রিয়

সাহেব বিবীরা সেই আদিম কাল হইতে যে তাহা ধরিয়া আছেন তাহা কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন না, তাহা পরিত্যাগ করা ধর্ম্মত্যাগ করার স্থায় মনে করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এক্ষণ অনেক বাঙ্গালী যুবা বিলাতে না যাইয়াও অন্য বিষয়ে না হউক আহারপরিচ্ছদাদিতে পূর্ণ সাহেব হইতেছেন। পূর্ব্বে পাঁচ সাত বৎসর বিলাতে বাস করিয়াও অনেকে সেরূপ হইতেন না। আমরা কোন মন্দভাব হইতে ইহা লিখিতেছি না। বাঙ্গালীর বিলাতী ভোজনপরিচ্ছদ আমাদের নিকটে বড়ই অস্বাভাবিক বোধ হয়।

কেশবচন্দ্র এই সকল আচরণের বিরুদ্ধে কত বলিয়াছেন, কত লিখিয়াছেন, এবং নিজের জীবনে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বিলাত হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কোন কোন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমরা আমাতে কোন পরিবর্ত্তন দেখিতেছ কি?" তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "আমরা কিছুই পরিবর্ত্তন দেখিতেছি না।" "তিনি বলিলেন, হাঁ কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি অনেক সময়ে আদুল গায়ে থাকিতাম, এক্ষণ সর্ব্বদা একটি জামা ব্যবহার করিয়া থাকি।" কেশবচন্দ্র ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রাসাদে এবং বড় বড় লর্ডদিগের আলয়ে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, সকলেই তাঁহার জন্য যত্নপূর্ব্বক নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি বিলাতে থাকিয়া সাহেব বিবীদিগকে সুশিক্ষা দান করিয়াছেন, তাঁহাদের কুনীতি কুশিক্ষা কিছুই গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে উৎসাহ ও কর্ম্মশীলতা ইত্যাদি যে সকল ভাল গুণ পাইয়াছেন, গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশে আসিয়া উহা বিস্তার করিয়াছেন; ভারতসংস্কার সভাস্থাপন—দাতব্য, স্ত্রীশিক্ষা, সুলভশিক্ষা, সুরাপাননিবারণ ইত্যাদিবিষয়ে সোদ্যম যত্ন, তাঁহার বিলাতে যাওয়ার ফল। তিনি কি বিলাতে কি স্বদেশে সাহেব বিবীদিগের কুনীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। অনেক যুবা বিলাতে না যাইয়া স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় সুনীতি সদাচার বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সাহেবদিগের কুরীতি ও কুনিয়ম গুলি সর্ব্বাগ্রে অনুকরণ করেন। কেশবচন্দ্র স্পষ্ট বলিয়াছেন, অন্যান্য দোষ ছাড়া সাহেবী ভোজন পরিচ্ছদের অনুকরণে এদেশীয় লোকের ভাব ও মেজাজের অনেক বিপরিবর্ত্তন হয়, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি অনুরক্তির হ্রাস হয়, অন্তরে বিরাগ জন্মিয়া থাকে; "আমি বড়" এইরূপ মনে করিয়া কিছু গর্ব্ব হয়, এবং মেজাজ গরম হইয়া থাকে; সাহেবেরাও তাহাদিগকে স্বজাতিতে তুলিয়া লন না। ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড উফারিণ কতিপয় বিলাত ফেরত বাঙ্গালি সাহেবকে ভাল কথা বলিয়াছিলেন, "তোমারা আমাদের পোষাকের কেন অনুকরণ কর, আমাদের পোষাক কি ভাল? উহা যে অসভ্য পোষাক।" সেদিন এদেশীয় পরিচ্ছদ ইজার চাপকান পরিয়া একজন ভদ্র মোসলমান যুবা আমাদের কার্য্যালয়ে আসিয়া ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের এক জন বন্ধু বলিয়াছিলেন, "দেখুন এই পরিচ্ছদে যুবকটিকে

কেমন সুন্দর দেখাইতেছে! ইয়ুরোপীয় মূলবান্ পরিচ্ছদেও কি এ দেশীয় লোকদিগকে এরূপ সুন্দর দেখায়?"

খাওয়া পরা ইত্যাদি সমুদায় বিষয়ে সাহেব বিবীদিগের চালে চলিলে কাপড় চোপড় খানসামা বাবুর্চি ইত্যাদির জন্য একটি বাঙ্গালি পরিবারের দশগুণেরও অধিক খরচ পড়ে। আমাদের একটি আত্মীয় বিলাতে যাইয়া সাহেব হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি মাসিক পাঁচ শত টাকামাত্র বেতন পাইতেন, তাঁহার বাবুর্চি খানসামা ইত্যাদি চাকরের মাহিয়ানাতে প্রতিমাসে ১২৫৲ ব্যয় হইতেছিল। তাঁহার ঋণ কিছুতেই ঘুচিতে ছিল না। পাঁচ শত টাকা মাহিয়ানা পান এমন একজন বিলাত-ফেরত যুবার গৃহে আমাদের একটি বন্ধু যাইয়া দেখেন, তাঁহার ব্যবহার্য্য ত্রিশ জোড়া জুতা সাজান রহিয়াছে। তন্মধ্যে অনেক জোড়ার মূল্য হয়তো ৮।১০ টাকারও অধিক হইবে। কি বিষম বিলাসিতা ও অপব্যয়!

আর একটী কথা বলা যাইতেছে, ইয়ুরোপীয় মহিলারা কুৎসিত পোষাক পরিয়া পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হইয়া সভাস্থলে যে নৃত্য করেন, ইহা কি তাঁহাদিগের আদিম অসভ্যতার সময়ের কুৎসিত কার্য্য নহে? অতিশয় ঘৃণিত ও লজ্জাকর হইলেও তাঁহারা নিজেদের প্রাচীন রীতি ছাড়িতে পারেন না। গারো কুকিপ্রভৃতি ঘোরতর বন্য অসভ্য জাতীয়া যুবতীও পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হইয়া নৃত্য করিতে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়। তাহারা নৃত্য করিয়া থাকে, কিন্তু কখনও পুরুষের সঙ্গে নৃত্য করিয়া নির্লজ্জতা ও সাহসিকতা প্রকাশ করে না, কুরুচিব্যঞ্জক নৃত্য করে না, তখন কুরুচিজনক পোষাক পরে না।

এই ভোজ্য ও পরিচ্ছদশীর্ষক প্রবন্ধে বোধ হয় মহিলা অনেকের বিরাগভাজন হইবেন। কি করা যায়, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত।

কুমারী উইলি এলিজাবেথ।

যত্ন, অধ্যবসায় ও উপযুক্ত শিক্ষাগুণে যে বোবা ও কালা কথা কহিতে ও অন্যের কথা বুঝিতে পারে, এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারে কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা মূক ও বধির কুমারী লরা রেডেন সিয়ারিং-এর আলেখ্যসহ জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। এবার আর একটী অন্ধ মূক ও বধির কুমারীর বাক্‌শক্তি ও শিক্ষালাভের বিবরণ বিবৃত হইতেছে। ইনি কুমারী উইলি এলিজাবেথ। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উইলি আমেরিকাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি ১৮৯১ খ্রীঃ বোষ্টন নগরস্থ পার্কিনবিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে মূক ও বধিরদিগকে এবং অন্ধলোকদিগকেও শিক্ষা দান করা হয়। ছয় মাসের মধ্যেই উইলি অনেক উন্নতি লাভ করেন, এক বৎসরের মধ্যে সাত শত শব্দ সুস্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ইনি অশিষ্ট দুরন্ত বালিকা ছিলেন, অল্পদিনের মধ্যে অত্যন্ত শিষ্ট ও শান্ত হন। উইলি চারি

বৎসরের মধ্যে লেখাপড়াতে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন। তখন হইতে ইনি রীতি-মত কথাবার্ত্তা বলিতে পত্রাদি লিখিতে পারিতেন। ইহার সেই সময়কার লিখিত একখানা পত্রের অনুবাদ পাঠিকাদিগের কৌতূহলনিবারণার্থ আমরা মূকশিক্ষা পুস্তক হইতে এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ;—

কুমারী উইলি এলিজাবেথ।

"প্রিয় মা, আমার নিকটে পত্র লিখেন নাই কেন? আমার যে ভগিনীর মৃত্যু হইয়াছে তাহার নাম কি? এইমাত্র আপনার পত্র পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। রবার্টের ছবি পাঠাইয়াছেন বলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমার শিক্ষক তাহাকে দুষ্ট বলিয়া মনে করেন। রবার্টের বয়স কত? আপনি কি করিতেছেন অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিয়া জানাইবেন। পত্র যেন বড় হয়। অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা কিরূপে কথা কহিতে হয় তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছেন? আমি সকল সময়েই মুখে কথা কহিয়া থাকি। আমার শিক্ষয়িত্রী শীঘ্রই আপনাকে পত্র লিখিবেন। আমার ইচ্ছা আপনি আমার ভাইভগিনী ও বাবার সহিত বোষ্টন নগরে বাস করেন। আমি যে স্থানে আছি সেই স্থান তাহার নিকটবর্ত্তী। আমাদের বিদ্যালয়ে ২৫জন বালিকা আছে। এক জন ভদ্রমহিলা কিছু কাল গত হইল এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে একটি পুতুল দিয়াছেন। ইহা চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারে। আমার ভগ্নীগণ যেন আবার আমার নিকটে পত্র লিখে। বাবার নিকট শীঘ্রই পত্র লিখিব। বালিকাদিগকে

বলিবেন আগামী গ্রীষ্মকালে আমি বাড়ীতে যাইব। তাহাদিগকে আমার ভালবাসা জানাইবেন। এক্ষণ বিদায়।

জেমাইকা প্লেন
২৭ সেপ্টেম্বর,
১৮৯৪।

আপনার ছোট মেয়ে
উইলি।

উইলি পরমা সুন্দরী। ইনি এক্ষণও বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন, ইংরাজি সাহিত্যে ইঁহার অতিশয় পাণ্ডিত্য হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ইনি ইতিহাস প্রাণিবিদ্যা ভূগোল-প্রভৃতি শাস্ত্রে এবং লাটিন ভাষায় পারদর্শিনী হইয়াছেন। সূচীকার্য্যেও ইঁহার বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

—•—

বাঙ্গালী স্ত্রী পুরুষে ট্যাবলো।

গত বৎসর যেমন করন্থিয়ান নাট্যশালায় কতিপয় বিলাতফেরত উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী সাহেবদিগের এবং তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদিগের পরিবারস্থ যুবক যুবতীগণ টিকিট বিক্রয় করিয়া সাধারণ দর্শকবৃন্দ হইতে অর্থগ্রহণপূর্ব্বক ট্যাবলোর অর্থাৎ রূপপ্রদর্শনের অভিনয় করিয়াছিলেন, এ বৎসরও তাহা করিয়াছেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে সাধারণের অবগতির জন্য সংবাদপত্রে বিশেষ বিজ্ঞাপন করিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের এরূপ পরিচয় দান করা হইয়াছিল যে, অমুক যুবক রাম সাজিবেন, এবং অমুকের কন্যা বা ভগিনী কিংবা অমুকের স্ত্রী বা শ্যালী সীতা হইবেন, অমুক যুবতী মন্থরা সাজিবেন ইত্যাদি; যেন দর্শকগণ প্রত্যেক মহিলাকে বিশেষ করিয়া দেখিয়া চিনিয়া লন। সেবার যেমন এই কার্য্যের অনৌচিত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘোরতর প্রতিবাদ হইয়াছিল, তাঁহারা তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, এবারও তদ্রূপ। অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ এই অভিনয়ের অনৌচিত্য প্রদর্শনকারীদিগকে অজ্ঞ অন্ধ অনুন্নত কুসংস্কারী সঙ্কীর্ণমনা এবং আপনাদিগকে সমাজসংস্কারক দেশোদ্ধারকারী প্রশস্তচিত্ত উন্নত শিক্ষিত লোক মনে করিয়া থাকেন। এরূপ দুর্নীতিমূলক কার্য্যের বিরুদ্ধে আলোচনা করা বৃথা। এ আর কি, এই ব্যাপার অনেক দূর গড়াইবে। আমরা মনে করিতেছি যে, অচিরে রঙ্গভূমিতে সেই সকল যুবক যুবতীর নৃত্য (বল) আরম্ভ হইবে। কেন না তাঁহাদের আদর্শস্থানীয় অগ্রগামী সাহেব বিবীরা তাহা করিয়া আমোদ করিয়া থাকেন। উহার অনুকরণ না করিতে পারিলে কি চূড়ান্ত সভ্যতা হয়? দুঃখের বিষয় ইঁহাদের অনেকে ব্রাহ্মসমাজসংসৃষ্ট বলিয়া আপনাদের পরিচয় দান করেন।

বাঁকিপুরস্থ অঘোরনারীসমিতির সভ্যাগণ ট্যাবলোর প্রতিবাদসূচক যে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন এস্থলে তাহা প্রকাশিত হইল,—

“আবার ‘ট্যাব্লো’ অভিনয় হইবে শুনিয়া আমরা যেরূপ হতাশ ও মর্ম্মাহত হইয়াছি তাহাতে প্রতিবাদ করিবার প্রবৃত্তি আর নাই। ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী ও প্রতিষ্ঠাতৃগণের একান্ত অসম্মতি এবং সমস্ত ব্রাহ্মমণ্ডলীর তীব্র প্রতিবাদসত্বেও যাঁহারা

এ বিষয়ে পুনরায় উদ্যোগী হইলেন আমাদের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ তাঁহাদের নিকট পৌঁছাইবে কি না জানি না। তথাপি মনের আবেগ ও ব্যাকুলতা লইয়া আবার তাঁহাদিগকে মিনতি করিতে ইচ্ছা হয় যে, শিক্ষা ও সভ্যতায় যে মহিলাগণ এত উৎকর্ষ লাভ করিলেন তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখুন, তাঁহাদের জীবনে ভগবান যে উচ্চ আদর্শ দেখাইতে চাহিয়াছিলেন এবং সমস্ত বঙ্গদেশ ও সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহাদের নিকট যাহা আকাঙ্ক্ষা করে সেই আদর্শ কি এ প্রকার ব্যাপারে অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে?

সৌন্দর্য্যানুভবশক্তির উৎকর্ষসাধনের (Esthetic Culture) আমরা সকলেই পক্ষপাতী: কিন্তু পবিত্রতা হইতে কোন সৌন্দর্য্য কি সুন্দর হইতে পারে? অভিনয়ের মধ্যে এমন সব সাজিতে হইয়াছে যাহাতে পবিত্রতার আদর্শ কখনই অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না, যাহাতে অভিনেত্রীরও সঙ্কট, দর্শকেরও মনোমালিন্য হইতে পারে। আমাদের আবার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় ভগবান যে পবিত্রতার আদর্শ দেখাইবার জন্য নারীজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যাহা স্ত্রীজাতির সহজ ও প্রকৃতিগত অধিকার ও যে পবিত্রতা সমস্ত লাবণ্যের প্রাণস্বরূপ, নর্ত্তকীর সাজ সজ্জায়, রূপলাবণ্যে, ভাব ভঙ্গীতে কি তার পরাকাষ্ঠা পাইতে পারে? এবং ইহাতে নারীজাতির প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়িতে পারে?

"অঘোরনারীসমিতির সভ্যাগণ।"

নূতনপুস্তক প্রাপ্তি।

প্রবাহ;—ইহা পদ্যগ্রন্থ। এই পুস্তক একটী মহিলাকর্ত্তৃক রচিত। রচয়িত্রী নাম প্রকাশ করেন নাই। শ্রুত হইল তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরী লাল ঘোষের বিধবা কন্যা। এই পুস্তকে ছোট বড় ন্যূনাধিক দেড় শত কবিতা আছে। প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা এই তিন শ্রেণীতে কবিতাসকলকে বিভক্ত করা হইয়াছে। আমরা কতকগুলি কবিতা পড়িয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। পদ্যগুলি যেমন সুললিত তেমনি সুরুচিসম্পন্ন। রচয়িত্রীর কবিত্বশক্তি স্বাভাবিক, তিনি আপন রচনায় বর্ণনা ও কল্পনাতে পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দান করিয়াছেন। পুস্তকখানির ছাপা কাগজ ও বাইণ্ডিং অতিশয় সুন্দর হইয়াছে। ইহা ১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট চেরিটি প্রেসে মুদ্রিত। একটী ক্ষুদ্র কবিতা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল;—

অস্থায়ী আশ্রয়।

"অস্থায়ী আশ্রয়ে নাথ, দে'ছ পাঠাইয়া,
তাই সদা মনে মনে ভয়;
কোন্ দিন ভীমঝঞ্ঝা, উঠিবে গগনে,
ভেঙ্গে যাবে মোর এ আশ্রয়।
দিন রাত আশঙ্কা কেবল;
কোন্ মুহূর্ত্তেতে এই, আশ্রয় ভাঙ্গিবে মোর,
হারাইব সকল সম্বল।
হে আশ্রয় হে ভরসা, জীবের সম্বল,
এ ভয় ঘুচায়ে দিয়ে—তুমি কি আশ্রয় দিবে—
তোমার অরুণ পদতল।"

মহিলার রচনা।

স্ত্রীশিক্ষার ফল *।

সৃষ্টিকর্ত্তা স্ত্রীজাতিকে লজ্জা বিনয়, নম্রতা, সাধুভক্তি, পরসেবা, দেবার্চ্চনা, মিষ্টভাষিতা, সহিষ্ণুতা, সন্তোষ, কার্য্যশীলতা, জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং সুনীতি প্রভৃতি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির সকল কার্য্যই শিক্ষাকরা কর্ত্তব্য। বঙ্গীয় রমণীগণের বিদ্যা শিক্ষা করা অতীব আবশ্যক। বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত ও হৃদয়কে জ্ঞানালোকপূর্ণ করিবার পক্ষে বিদ্যা-শিক্ষাই একটি প্রধান উপায়। বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত না করিলে কল্পনা ও প্রতিভার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া পবিত্র সুখ সম্ভোগের অধিকারিণী হইতে পারা যায় না। শিক্ষা প্রতিভাশক্তিকে সুপ্রণালী ক্রমে উন্মেষিত করিয়া থাকে। যিনি শিক্ষা প্রভাবে হৃদয়স্থিত সদ্‌বৃত্তি গুলির পরিচালনা করিতে পারিয়াছেন তিনিই যথার্থ শিক্ষিতা নারী নামে অভিহিতা হইয়াছেন। কিন্তু যিনি শিক্ষা প্রভাবসত্ত্বেও হৃদয়স্থিত কলুষরাশি দূরীভূত করিতে এবং বিবেককে কর্ত্তব্যপথপ্রদর্শনে অগ্রসর করিতে পারেন নাই, তিনি কখনই সুশিক্ষিতা বলিয়া গণনীয়া নহেন। বর্ত্তমান যুগে অধিকাংশ ভারতীয় আর্য্যনারী বিদ্যাশিক্ষা করিয়াও হৃদয়কে যথার্থ জ্ঞানালোকে পূর্ণ করিয়া চিরস্মরণীয় হইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বিদ্যা ও ধনের গৌরবে গর্ব্বিতা হইয়া প্রকৃত জ্ঞানোন্নতি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। বহু কাল হইতে লীলাবতী, খনা, মৃগনয়না, আবিয়ার প্রভৃতি বিদুষীগণ বিদ্যাবলে জগতে নারীকুলে শ্রেষ্ঠা ও প্রাতঃস্মরণীয়ারূপে পরিগণিতা। কিন্তু এক্ষণ পূর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানোপার্জ্জনের বহুল সুযোগ থাকিলেও উক্ত বিদুষীগণের তুল্য কেহ জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারিতেছেন না।

স্ত্রীজাতির সর্ব্বগুণসম্পন্না হওয়া কর্ত্তব্য; নতুবা কালক্রমে নিরাশাসাগরে পতিত হইয়া দুঃখ ও অনুতাপানলে জ্বলিয়া যাবজ্জীবন পরমুখাপেক্ষিণী হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

স্ত্রীজাতি লক্ষ্মীস্বরূপা। তাঁহারা লজ্জা, নম্রতা, ধৈর্য্য,ক্রোধহীনতা, পরোপকারিতা, সারল্য, সত্যবাদিতা, নিরহঙ্কারিতা, কার্য্যশীলতা মিষ্টভাষিতা, পাতিব্রত্য, সৌজন্য, বিদ্যাচর্চ্চা, ধর্ম্মচর্চ্চা, গৃহশৃঙ্খলাদি সকল বিষয়ে সুব্যবস্থা সংরক্ষা করিয়া প্রশংসাস্পদ হইয়া থাকেন। যিনি এই সকল সদ্‌গুণে বিভূষিতা তিনিই যথার্থ গৃহপরিবারস্থ লক্ষ্মী। যিনি বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গৃহকার্য্য শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই ভবিষ্যতে সংসারে সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য সমাধান করিতে পারেন। পূর্ব্বকালে এমন কি কিছুদিন পূর্ব্বে এদেশীয় গৃহিণীদিগের গার্হস্থ্যকার্য্যে নিপুণতা-নিবন্ধন যেরূপ সুখ্যাতি ছিল বর্ত্তমান সময়ে আর সেরূপ নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষার যে সমধিক উন্নতি হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার সঙ্গে

* একটী অল্পবয়স্কা ছাত্রী কর্ত্তৃক লিখিত।

সঙ্গে সাংসারিক কার্য্যশিক্ষার যে প্রভূত পরিমাণে শৈথিল্য প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে কোনও সংশয় নাই। বিদ্যানুশীলন ও গৃহের পারিপাট্য এই উভয়ের যাহাতে সামঞ্জস্য থাকে প্রত্যেক রমণীরই তদ্বিষয়ে মনযোগিনী হওয়া উচিত, অর্থাৎ বয়ঃস্থা নারীদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহাদিগের কন্যাগণকে বাল্যকাল হইতেই এই ভাবে গঠিত ও শিক্ষিত করেন। যে স্ত্রী কলহ প্রিয়া, অলস, বিলাসিনী এবং অকর্ম্মণ্যা তিনি কখনই গৃহকে শৃঙ্খলাপূর্ণ রাখিতে পারেন না; এবং তাঁহার সংসার অশান্তির আলয় ও নরকতুল্য হইয়া থাকে। অধুনা বিলাসিতার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বতন রমণীগণের বর্ত্তমান কালের ন্যায় বিলাসিতা ছিল না। অধুনা মহিলাগণ বসন ভূষণেই ভূষিতা হইয়া থাকেন। নারীগণের ভূষণ কেবল বস্ত্রালঙ্কার নহে, ধর্ম্ম, মিষ্টভাষিতা, লজ্জাশীলতা, নির্ম্মলানন্দ, সুশীলতা, ভোগবিলাসশূন্যতা, স্বার্থহীনতা, সত্যপালন, দানশীলতা, অপরের সুখ ও দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ, মমতা, সাধুভক্তি, দয়া, পূজার্চ্চনা, শুদ্ধচরিত্রতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও একতা প্রভৃতি সদ্‌গুণই তাঁহাদিগের কোমল চরিত্রের একমাত্র অক্ষয় ও অমূল্য ভূষণ। যাঁহারা এই সকল সদ্‌গুণে সজ্জিতা তাঁহারা দুঃখ দারিদ্র্য-পূর্ণ ও রোগ শোকতাপময় সংসারক্ষেত্রে সর্ব্বদা শান্তির অমৃত ধারা বর্ষণ করিতে সক্ষম হয়েন। সকলেরই সর্ব্বক্ষণ সত্যকথা বলা ও সত্যপথে চলা আবশ্যক। সত্য-পথে চলিলে যে কত সুখ তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। যিনি সদা সত্যপথে চলিয়াছেন তিনিই সত্যের জয় ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই কবি বলিয়াছেন যথা;—

"চলিতে সত্যের পথে, দুঃখ যদি হয় পেতে
দাও মোরে হেন বল, তাও যেন থাকি সয়ে।"

পুরাকালে আর্য্য রমণীগণ সদ্‌গুণ সমূহে বিভূষিতা ছিলেন বলিয়াই অদ্যাবধি তাঁহাদিগের কীর্ত্তি-সমূহ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গবালাগণ বিদ্যার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত গুণাবলী হইতে বিবর্জ্জিতা হইয়া অবনতির চরম সীমায় পতিত হইতেছেন। প্রাচীন কালে রমণীগণ সংসারে পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, পতি, পুত্র, কন্যা, দেবর, ননদ ও পৌরজন দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পরম সুখ শান্তিতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, এবং উহা যেন নন্দন-কানন তুল্য সৌন্দর্য্য বিতরণ করিত।

প্রাচীন কালীন রমণীগণ সর্ব্বদাই অতিথি-সৎকাররূপ ব্রতপালনে নিযুক্ত থাকিতেন। গৃহে খাদ্য সামগ্রীর অভাব হইলেও তাঁহাদিগকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট এবং পরম গুরুজ্ঞানে যথোচিত সমাদর করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, অতিথি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলে অমঙ্গল হয়, এবং গৃহস্থের পুণ্য লইয়া বিমুখ হইয়া যায়। এই বিষয়ে শাস্ত্রে কথিত আছে। যথা;—

"অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥"
(হিতোপদেশ।)

বর্ত্তমানাবস্থায় পূর্ব্বাপেক্ষা বিদ্যাচর্চা

সমধিক হইলেও রমণীগণ প্রাচীনাদিগের ন্যায় পরিজনবর্গের সহিত সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে উপযুক্ত নহেন। পুরাকালে মহিলাগণ স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আত্মীয় পরিজন দিগকে খাওয়াইতেন, গৃহ পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খলাপূর্ণ রাখিতেন। তাঁহাদিগের সংসার বিশৃঙ্খল দেখিতে পাওয়া যাইত না। কিন্তু এক্ষণ অধিকাংশ মহিলা সে সকল অত্যাবশ্যকীয় গৃহ-কার্য্যগুলিতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন ও নিকৃষ্ট মনে করিয়া দাস দাসী পাচক পাচিকা প্রভৃতি ভৃত্যবর্গের প্রতি উক্ত কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। ইঁহারা একমাত্র বিদ্যাশিক্ষা ও কারুকার্য্য ব্যতীত সাংসারিক কার্য্যে নিপুণা নহেন। এক্ষণ কেহই প্রায় প্রাচীনাদিগের সদৃশ কর্ম্মপটু নহেন, এবং সাংসারিক কার্য্যগুলিকে বিশেষ আবশ্যকীয় জ্ঞান করেন না। এক্ষণ সর্ব্বতোভাবে এই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অন্য কোন বিষয়ের উন্নতি না হইয়া কেবল বিলাসিতারই বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহারা সাংসারিক গৃহকার্য্যে পটু, বিদ্যালাভে সম্পূর্ণ পারদর্শিনী এবং যাঁহাদিগের জীবন সমুদ্রের সুনীল স্বচ্ছ নির্ম্মল সলিল সদৃশ পবিত্র, তাঁহারাই যথার্থ সুশিক্ষিতা রমণী। স্ত্রীজাতি সুশিক্ষিতা হইলে পরিবারে বহুল পরিমাণে উপকার সাধিত এবং সন্তান সন্ততিগণকে যথোচিত শিক্ষা বিতরণ করা হইয়া থাকে। এমন কি জনসমাজেরও শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হয়। যে গৃহে সুচিন্তা, সুকল্পনা, শ্রী, শোভা, সরলতা, শান্তি ও পবিত্রতা আছে সেই গৃহই জ্যোৎস্নাময় ও আলোকিত। বিদ্যায় লীলাবতী, খনা ও পণ্ডিতা রমাবাইয়ের ন্যায় দানশীলতায় মহারাণীস্বর্ণময়ীর ন্যায় এবং সতীত্বে সীতা ও সাবিত্রীর ন্যায় দৃষ্টান্ত কামিনীকুলের শীরোধার্য্য। যদি কাহারও বিপদ উপস্থিত হইত, কিংবা যদি কেহ অনুগ্রহ প্রার্থনা করিত প্রায়ই সকলে মহারাণী স্বর্ণময়ীর দ্বারে উপনীত হইত। যে কেহ সেই স্থানে উপস্থিত থাকিত, কাহাকেও নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত না। মহারাণী স্বর্ণময়ীর দাতব্য, সীতা ও সাবিত্রীর সতীত্ব, লীলাবতী ও খনার বিদ্যা বঙ্গীয় রমণীদিগের পক্ষে অতীব গৌরবের বিষয়, এবং সকলের অনুকরণীয়। যদি কেহ এক্ষণ সীতা ও সাবিত্রীর সতীত্ব, লীলাবতী ও খনার বিদ্যার বিষয় একবার চিন্তা করেন তাহা হইলে মহানন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠেন। যে স্ত্রীর জীবনে সতীত্ব, দয়া, বিদ্যা, কার্য্যশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয়ের এক কণাও নাই তাঁহাতে মনুষ্যত্ব নাই; এবং সে জীবনে সুখরবির বিমল জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয় না। অতএব যাহাতে জ্ঞান, দানশীলতা, সতীত্ব, লজ্জা, নম্রতা, কার্য্যশীলতা, মিষ্টভাষিতা, নিঃস্বার্থতা, পাতিব্রত্য, ভক্তি, স্নেহ, অনুরাগ, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, শ্রী, শোভা, ধৈর্য্য, ঈশ্বরনিষ্ঠা এবং প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ইষ্টদেবতার উপাসনাস্রোত হৃদয়সরোবরে প্রবাহিত থাকে তজ্জন্য সকল কামিনীরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

সংবাদ।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে,শ্রদ্ধাস্পদ উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রীমতী সরস্বতী দেবী আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক বিবৃত জীবনবেদ পুস্তক উৎকল ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন, ইহা বোধ রাজের যন্ত্রালয়ে তাঁহার আনুকূল্যে মুদ্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ইনি নবসংহিতা পুস্তক উৎকল ভাষায় উৎকৃষ্টরূপে অনুবাদ করিয়া উড়িষ্যা প্রদেশের ভদ্রসমাজে বিতরণ করিয়াছেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠা ভাগিনী শ্রীমতী রেবাদেবী কর্ত্তৃক উৎকল ভাষায় অনুবাদিত ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোকসংগ্রহ পুস্তক উক্ত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে, অচিরেই তাহা প্রকাশিত হইবে। কিছু দিন হইল তিনি তাপসমালা পুস্তক হইতে মোসলমান তপস্বীদিগের প্রবচনাবলী উৎকলভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছেন। উক্ত পুস্তকের "প্রসাদ" নামকরণ হইয়াছে। এই দুই দেবীপ্রকৃতি কন্যা দ্বারা উৎকল প্রদেশে সাহিত্যের উন্নতি ও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার হইতেছে দেখিয়া কে আনন্দিত না হইয়া থাকেন? ইঁহাদের বিদ্যাচর্চ্চা সার্থক।

আমাদের একটী আত্মীয়া মহিলা স্বামীসহ কাক্সবাজারে স্থিতি করিতেছিলেন, সাগরকূলে কাক্সবাজার, এবং তাহার অদূরে ইতস্ততঃ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ বিদ্যমান। তিনি স্বামীর সাহায্যে সেই সকল দ্বীপ হইতে পুঞ্জপরিমাণে চিত্র বিচিত্র সাদা লাল ইত্যাদি বর্ণের নানা আকারের ছোট ছোট ঝিনুক ও শম্বুক এবং সামুদ্রিক সবুজ শৈবাল সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই ঝিনুক ও শম্বুকাদিযোগে গোলাপ চামেলি প্রভৃতি পুষ্পগুচ্ছ এমন নিপুণতার সহিত প্রস্তুত করিতেছেন যে, তদ্দর্শনে লোকের উদ্যানজাত সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমের গুচ্ছ বলিয়া ভ্রম হইতেছে, এবং ঝিনুক ও শম্বুক দ্বারা মৌমাছি প্রজাপতি পক্ষী ইত্যাদি তিনি আশ্চর্য্যরূপে নির্ম্মাণ করিতেছেন। যিনি দেখেন তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শতমুখে প্রশংসা করেন। এই নূতন প্রকার আশ্চর্য্য শিল্পকার্য্যে উক্ত মহিলা বিশেষ পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত। সে সকল এমন চিত্তাকর্ষক সুন্দর হইয়াছে যে, আমরা তাহার বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারি না। উপহারস্বরূপ আমরা উক্ত পুষ্পগুচ্ছ ও প্রজাপতি ইত্যাদি কিছু প্রাপ্ত হইয়াছি।

ভাগলপুর হইতে আমাদের একটী ৮।৯ বৎসরবয়স্কা নাতনী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, "দাদামহাশয়, আমি পরশ্ব দিন রান্নার পরীক্ষা দিয়াছিলাম। আমরা ছয়টী সমবয়সী মেয়ে উপস্থিত ছিলাম। রান্নাতে আমি প্রথম হইয়া পুরস্কার পাইয়াছি। ভাত, ডাইলের সুক্ত, কফির ডালনা ও সিদ্ধ ডাইলের বড়া রেঁধেছিলাম। আমি নিয়ম মত স্কুলে যাই। খোকাও পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।" বালিকাটী ভাগলপুরস্থ মিশনরীদিগের বালিকাস্কুলে অধ্যয়ন করে। রন্ধনের পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ৪৲ পুরস্কার পাইয়াছে।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

মাডাম্ গায়ন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

তার পর ওঁর যখন ৫৪বছর বয়স, তখন সব ভাল লোকেরা মিলে প্রমাণ করিলেন, বাস্তবিক ওঁর কোন দোষ নাই। তখন ১০বৎসর কারাবাসের পর উহাঁকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু সেখানে থাকিতে দিল না, ব্রিবি বলে একটা জায়গায় নির্ব্বাসন করিল। সেই-খানেই তিনি শেষ জীবন কাটান। তিনি ৭০ বছর বয়সে মারা যান। উনি ঐ কারা-গারে বসে বসে গান রচনা করেছেন। উহাঁর অবস্থা ভেবে দেখুন চারি দিক দেওয়াল অন্ধকার, তার ভিতর মনে কত ভাব আসছে, তাহা গানে রচনা করেছেন। একজন দাসী ওঁকে খাবার দিতে যাইত, খাবার দিলে উনি গান বলিতেন, সে তাহা মুখস্ত করিয়া লইত। কারণ, ম্যাডাম গায়নের কাছে কালি কলম ইত্যাদি কোন লিখিবার জিনিষ ছিল না। সেই দাসী লিখিয়া রাখিত। কাউপার সেগুলি ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। তাঁর গানে আছে "আমাকে যে এরা নির্ব্বাসন করালে আমার কোন ভয় ভাবনা নাই, ভগবানের প্রতি আমার এত প্রেম, তাতে আমার মন সাহসে পূর্ণ। তাঁকে আমি সর্ব্বত্র সকল অবস্থায় দেখি, চারি দিকের দেওয়াল ঈশার জ্যোতিতে পূর্ণ; এখানে বসে আমি গান করছি, মাঝে মাঝে কাঁদছি, খুব উচ্চ বিষয় ভাবছি। যখন ভাবি তাঁর জন্য কষ্ট পাচ্ছি তখন আর কষ্টে কষ্ট থাকে না, আমার খুব আনন্দ হয়। আমার মনে কোন অহঙ্কার নাই, কষ্ট পাওয়ায় তিনি আমার কাছে আরও মিষ্ট হচ্ছেন। তাঁর শক্তিতে আমি শক্তি অনুভব করচ্ছি। তাঁহাতেই সান্ত্বনা পাচ্ছি। লোকে আমার প্রতি অন্যায় করেছে বলে, তাদের উপর আমার রাগ হয় না, আমার ভিতর এত ভগবৎপ্রেম ও আনন্দ, আমি তাহাতেই পূর্ণ হইয়া আছি।" তার পর যখন নির্ব্বাসনে ছিলেন, সেখানে বলছেন যে, "সমস্ত পৃথিবীকে আমি ভুলে যাচ্ছি, পৃথিবীও আমাকে ভুলে যাচ্ছে, তাতে আমার কোন দুঃখ নাই। এখানে পাখী নদী দেখে, আমার কত ভাব হচ্ছে, পাখী গান করছে। আমিও ঠিক পাখীদের মত জঙ্গলে, বনে বনে বেড়াই, গান করি। সমস্ত রাত্রি আমি ভগবৎ-প্রেমে পূর্ণ হয়ে থাকি; রাত্রিতে যেন চারি দিক্ আলোতে পূর্ণ হয়; সমস্ত রাত্রি আমার কাছে এত মিষ্ট লাগে যে, কখন রাত্রি কেটে যায় কিছুই বুঝিতে পারি না। এখানে মানুষের শব্দ নাই; পাখীরা গান করছে, আমিও তাঁর গানে নিযুক্ত রহিয়াছি। আমি অনেক সময় কাঁদি, কিন্তু বুঝি না, আনন্দ থেকে কি কষ্ট থেক কাঁদছি। আমার

ভিতর তাঁর প্রেম অনন্ত ভাবে রয়েছে, কিন্তু আমি তা অনুভব করিতে পারি না। আমি দরিদ্র আমার কিছু নাই, অথচ আমি এই স্থানে খেতে পাচ্ছি, কিন্তু কে খাওয়ালে তাহা জানি না। তুমি আমার কাছে অন্ধকারে রয়েছ। আমি বুঝি না আমার এ অবস্থা সুখের কি দুঃখের। আর আমাকে মানুষের কাছে নিয়ে যেও না, আমায় এই খানেই রেখো। আমাকে এই মরুভূমিতেই থাকিতে দাও। পৃথিবীর লোক আমাকে ঘৃণা করে। আমারও তাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, আমি তোমাকে নিয়ে খুব সুখী ও শুদ্ধ আছি।" তিনি দুখানা বই লেখেন, তাহাতে নিজের জীবনের ভিতরের বাহিরের সকল অবস্থা বিস্তৃত ভাবে লিখিয়াছেন। রোমাণ ক্যাথলিকদের মধ্যে অনেক অনেক সাধু জন্ম গ্রহণ করেছেন। অনেকেই জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। ম্যাডাম গায়ন বড় লোকের মেয়ে ছিলেন, কত কষ্টে পড়িলেন, কত নির্য্যাতন সহ্য করিলেন, এবং তাহাতেই তাঁর সৌন্দর্য্য গুণ প্রকাশ হইয়াছে ; কষ্টের ভিতর খুব ভাল ভাব বাহির হইয়াছে। ওয়ারড্‌্রাউম প্রভৃতি করিয়া সেই ভাব খানিকটা পাইয়াছিলেন, কিন্তু ইনি জীবনে তাহা খুব বেশী করে অনুভব করেছিলেন। পরীক্ষায় পড়ায় অনেক গভীর খাঁটি কথা প্রকাশ পাইয়াছিল। সত্যই ইহার ভিতরে একটা বিশেষ ভাব ছিল, তা না হলে কেমন করে কারাগারের অন্ধকারের ভিতর নিজেকে এত সুখী করিয়াছিলেন, রাত্রি দিন ভগবানের প্রেম নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। রোগীর সেবা করিতেন, লোকের মধ্যে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি বলিতেন, পূজাত করিবই, কিন্তু সে সময় যদি কোন দরকারী কাজ আসিয়া পড়ে, তবে আগে তাহা শেষ করিয়া তবে পূজায় যাওয়া উচিত। কারণ কাজ রাখিয়া উপাসনায় গেলে, উপাসনাঘর খালি দেখিব। এই রকম সকল সাধুরাই যে কেবল নিজে নিজে বসে ভগবানের আনন্দে ডুবে থাকতেন, কোন কাজ করতেন না, তাও নয়। কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেন। অনেকে খুব সামান্য সামান্য কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন ; অনেক সময় তর্ক দ্বারা লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। রাত্রি দিন বসে কেবল নিজেদের নির্জ্জন সাধন গান ইত্যাদি করিতেন তা নয়, কিন্তু পরসেবা করিতেন। কারণ তা না হলে, তাঁদের এত বল হত না। সাধু ফিলিপনামক আর এক জন বিখ্যাত সাধুর বিষয়ে অনেক মজার মজার গল্প আছে, তিনি সহজে লোককে পরীক্ষা করে কে কেমন লোক শীঘ্র বুঝিতে পারিতেন। একবার একজন নন আসে, তাঁর চারি দিকে খুব প্রশংসা বাহির হইয়াছিল, তাঁকে লোকে খুব ভক্তি করিত। পোপ শুনে বললেন, তাইত খবর নিতে হয় কেমন লোক। ফিলিপ বলিলেন, আচ্ছা আমি খবর নিচ্ছি। এই বলে দৌড়ে তিনি সেই নন যেখানে থাকতেন গেলেন, গিয়ে সেই বাড়ীতে খবর দিলেন, একজন বাহির হইয়া আসিলে বলিলেন, এখানে যে এবিয়াস বলে নন আছেন, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব, পোপ আমাকে খবর নিতে পাঠিয়েছেন। তার পর সেই ননকে পাঠাইয়া দিল।

সে আসিবামাত্র উনি বলিলেন, উঃ আমি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমার জুতাটা খুলিয়া দাও। সেই নন অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকিতে তিনি দেখিয়া বলিলেন, আচ্ছা আমি যাচ্ছি, আমি বুঝেছি কেমন লোক। তখন পোপকে সব বলিলেন, আর বলিলেন, "যার বিনয় নাই সে আবার ভাল কিসের।" রোমাণ কাথলিক চর্চ্চে খুব বিনয় শিক্ষা করিতে হয়, তার জন্য অনেককে সাধন করিতে হয়। ওরা অনেক জনও চাকর রাখে না, সব কাজ নিজেরা করে। অনেক বড়লোকের ছেলে মেয়ে নন মঙ্ক হয়, তাঁদের সকলের ঐরকম নীচু কাজ করিতে হয়, অনেক সাধনের ভিতর দিয়া আসিতে হয়। ইহাতে তাঁহাদের খুব বিনয় শিক্ষা হয়। ১০ বছর পর্য্যন্ত শিখতে হয়, তার পর যখন লোকের ভাল ভাব হয়, তখন উচ্চ পদ দেওয়া হয়, যেমন মাডাম্ গায়ন প্রভৃতি। মাডাম গায়নকেও এই সব কাজ করিতে হইয়াছে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

৭ম বৎসর।

শ্রীমতী চিন্তামণি দাসী,	বাসন্তিয়া	২৲

৯ম বৎসর।

শ্রীমতী লীলাময়ী চৌধুরাণী,	বালিগঞ্জ	॥৵০
„ কুসুমকুমারী পাল,	ঢাকা	১৲
শ্রীযুক্ত রায় বেণীমাধব মিত্র,	কটক	২৲

১০ম বৎসর।

শ্রীমতী জ্ঞানদাসুন্দরী মজুমদার,	কটক	২৲
„ কুলদাসুন্দরী দেবী,	ভাগলপুর	২৲
„ লীলাময়ী চৌধুরাণী,	বালিগঞ্জ	২৲
„ ব্রজবালা সরকার,	বালেশ্বর	২৲
„ পুষ্পমালা দেবী,	রেঙ্গুণ	২৲
„ বিনোদমণি গুপ্ত,	কুমিল্লা	২৲
„ প্রফুল্লকুমারী দেবী,	পিনমালা	২৲
শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু,	লক্ষ্ণৌ	২৲
„ কালীপদ দাস,	গোরখপুর,	২৲
„ মহেন্দ্রনাথ সেন,	ডিব্রূগড়	২৲
„ কেদারনাথ মজুমদার,	কুচবিহার	২৲

সূচী।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ ।"

১০ম ভাগ] চৈত্র, ১৩১১ ; এপ্রিল, ১৯০৫ । [৯ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

বৈবাহিক জীবনের অনেক পরীক্ষা ও গুরুতর দায়িত্ব। বিবাহের পূর্ণতা এক দিনে হয় না, বহু সাধনে ক্রমে বিবাহ পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইয়া থাকে। আজ পুরোহিত একটী নারীকে একটি পুরুষের সঙ্গে যথারীতি উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ করিলেন ; বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন উদ্বাহক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিলেন, তাহাতে উদ্বাহ হইয়া গেল তুমি এরূপ মনে করিও না, ইহা বিবাহের উচ্চভূমিতে আরোহণ নয়, দম্পতী তাহার প্রথম সোপানে আরোহণ করিলেন মাত্র।

স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের শরীরকে বিবাহ করে না, প্রকৃত বিবাহে নারী আত্মা ও পুরুষ আত্মার পরস্পর পবিত্র ভাবে মিলন হয়। ঈশ্বরকৃপায় সাধনপ্রভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতাবস্থা লাভ হইলে উভয়ের মধ্যে এই শুভযোগ ঘটিয়া থাকে। নীচ সাংসারিক ভাবে শারীরিক ভাবে স্ত্রী পুরুষের মিলন পাশব মিলন ; ধর্ম্মের উচ্চভূমিতে দুই আত্মার মিলনই প্রকৃত পরিণয়।

কল্যাণি, তুমি ভগবানের চরণতলে স্বামীর অমর আত্মার সঙ্গে পবিত্র প্রেমবন্ধনে বদ্ধ হও, তাঁহার শরীরে আবদ্ধ হইয়া থাকিও না। তুমি সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহার আত্মার কল্যাণ সাধন কর, একত্র মিলিত হইয়া নিত্য ভগবানের গুণকীর্ত্তন কর ও প্রার্থনা করিতে থাক, এবং সকল কার্য্যে স্বামীর সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হও। তুমি হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে ভগবানের নিকটে লইয়া যাইবে ; তাঁহাকে কখনও বিপথগামী হইতে দিবে না। তাঁহার মনে সর্ব্বদা ধর্ম্মভাব ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রেম জাগরিত রাখিবে। এই পবিত্র পাতিব্রত্য দাম্পত্য ধর্ম্ম পালন করিয়া তুমি ধন্য হও, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সতীত্ব *।

নারীর সতীত্ব—অব্যভিচারী প্রেম। পাইলে জগৎপতি সন্তুষ্ট হইবেন না এফুল কোথায় পাইব? প্রাচীন কো স্থানে নাই। প্রাচীন কোন স্থানে নয় * * ঈশ্বরের নিকটে পতিপ্রিয়া সতী ন্যায় যাইতে হইবে। এ ফুলের এ আদর কেন? এই এক ফুলের মধ্যে সমুদায় ভাব নিহিত আছে। সতী প্রেমের ন্যায় আর প্রেম নাই, এ শা অভ্রান্ত উৎকৃষ্ট শাস্ত্র! সতীর সতীত্ব রূপ লাল ফুল, কত চিত্র বিচিত্র করা তাহাতে পিতৃভক্তি, বন্ধুর প্রণয়, ভ্রাতৃস্নে এ সকলও ইহার মধ্যে আছে। ইহা কে একটি নূতন ফুল, ইহা প্রণয়পূর্ণ। স্বামী সতীর সর্ব্বস্ব। নিরাশ্রয় অবস্থায় সতী কন্যারূপে স্বামীর সেবা করেন, কখনও ভগিনীভাবে পতি মুখপানে চাহিয়া হাস্য করেন। কোন ভাবই সতীত্বভাব হইতে ছাড়া নহে। * * ভাই ভগিনীকে খেলা করিতে দেখিলে, সতী ভাবেন আমরা কেন এইরূপ করিব না? স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া ভাই ভগিনীর সুখ কেন লাভ করিব না? আমরা কি ভাই ভগিনী নই? সে সম্বন্ধতো ঘোচে না। বিবাহ হইলে সে সম্বন্ধ আরও প্রগাঢ় হয়। সতী স্বামীকে ভ্রাতৃভাবে ফোঁটাও দিতে পারেন। আবার যখন স্বামী শয্যাতে শয়ান, উঠিবার সামর্থ্য নাই, রোগে জর্জ্জরিত, সে সময়ে মাতার ন্যায় গম্ভীর ভাব ধরিয়া শুশ্রূষা করিতে সতী ভিন্ন আর কেহই নাই। স্বামীর তখন মা বাপ ভা বন্ধু যা বল সবই একজন। টাকা স্ত্রী হস্তগত। পাইয়াছেন স্বামীর কাছে, এবার স্বামীকে দিবার সময়। ভাল বেদানা কোথায়, মিছরি কোথায়, স্ত্রী কেবল এই বলেন। স্বামীর জন্য স্ত্রীই মাতার কার্য্য করেন। সতীর মতন এমন পতিমর্য্যাদা বল আর কে জানে? কে আর এমন পতির সেবা করে? সতী যে এসব কার্য্য করেন, সে কি টাকার লোভে? না দশ জন লোক তাঁহার নামে কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রস্তুত করিবে বলিয়া? পাড়ার লোকের সুখ্যাতির জন্য কি সতী পতিসেবায় ব্যস্ত হন? না। পতি যে তাঁর সর্ব্বস্ব। পতিই তাঁহাকে ভাল লাগে। পতির যাহা কিছু তাহাই তাঁহার নিকটে সুন্দর ও মিষ্ট। সতীর যেমন দ্বিতীয় পতি থাকিতে পারে না, ব্রহ্মভক্ত তেমন বলিতে পারেন না জগৎপতি আর এক জন আছেন। অন্য পতি আছে বলিলে তাঁহার গলা কাটা হয়। সতী যে চেষ্টা করিয়া পতিমর্য্যাদা শিখিয়াছেন তাহা নয়। আপনিই আপনার অন্তরে, আপনার মনে আপনিই কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করেন। আর ব্রহ্মপতি যাঁহার, তাঁহারও তেমনি। আর তাঁহার কিছুই ভাল লাগে না। ব্রহ্মই প্রাণপতি; এ কথাতে ব্যাকরণের কিছুই ভুল নাই। কি বেদান্ত, কি শিখধর্ম্ম, কি ইংরাজ ধর্ম্ম,

---

* ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক মাঘোৎসবে শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন এ বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই আচার্য্যের জীবন অষ্টম বিবরণ তৃতীয় অংশ হইতে উদ্ধৃত।

সকল ধর্ম্মই তাঁহাকে পতি বলিয়া থাকেন। জগৎপতি স্বর্গপতি, তিনি যদি সাধারণ ভাবে পতি হন, তবে এক এক জনের পতি নন কেন? আমি কি এমনই কুলটা যে তাঁহাকে পতি বলিব না? সকলের পতি হইবেন তিনি, কেবল আমি বাদ পড়িব! তিনি জগতের পতি কেবল কি আমার পতি নন? এই পথে ব্যভিচার কণ্টক, অন্য কণ্টক নাই। জ্ঞান চাহি না, পতিভক্তি থাকিলে পতি কাছে আসিতে দিবেন। মানুষ পতির ন্যায় তিনি নন। নিরাকার পতি ব্রহ্ম পতি। আমি বালিকা পত্নীর মত তাঁহার পানে চাহিব, সতী দাসী হইয়া আমি তাঁহার কাছে থাকিব, আমি তাঁহার পদার্চ্চনা করিব, আমার ধন পতি, সংসার পতি, বন্ধু পতি ছিল, সকলে হাত ধরিয়া রাস্তার কাঙ্গাল করিয়া বসাইল। এখন সাত পতির অর্চ্চনা না করিয়া আসল পতি ব্রহ্মপতির শরণাপন্ন হইব। পতির হাস্যেই সতীর স্বর্গ। ব্রহ্মের হাস্যেই আমাদের স্বর্গ। অব্যভিচারী প্রেম যদি আমাদের পক্ষে থাকে ঈশ্বর দেখিয়াই চিনিবেন, হাতে ধরিয়া আমাদের কাছে বসাইবেন। আগে বলিতাম বেদ থেকে উপাসনা লও, পুরাণ হইতে উপাসনা গ্রহণ কর, ঈশ্বরের বিবেক লও, অমুকের ভক্তি লও। পাঁচটি ফুল তোল। ভাল করিয়া মালা গাঁথিয়া পর। প্রেমের মত্ততায় ভালবাসার ভিতরে পাঁচ নাই, দ্বিতীয় তৃতীয় নাই। পৃথিবীতে গুরু নাই, ভাই ভগিনী নাই, জগৎপতিই সমস্ত। পতিকুলই প্রিয় কুল। সতীর কাছে পতির বাড়ীর ভাঙ্গা জানালাটিও ভাল। পতির বাড়ীর লোক তোমরা, পতিকে না চিনিলে তোমাদিগকে কিরূপে চিনিব? পতি যাহাতে বিরক্ত না হন, তাহাই আমার কার্য্য। তাঁহার যত কুটুম্ব আমার কুটুম্ব। পতির জীব আমার প্রিয়। * * * * *

নারীজাতির প্রতি পুরুষের ব্যবহার।

২য়।

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, মোসলমান পুরুষদিগের নারীজাতির প্রতি ব্যবহার ভাল নয়। মোসলমান কন্যা পিতৃধনের কিঞ্চিৎ অধিকারিণী হইয়া থাকে, এই মাত্র তাহাদের প্রতি ভাল ব্যবহার। হিন্দু সম্প্রদায়ের কন্যাগণ পৈতৃক সম্পত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়। মোসলমান শাস্ত্রের বিধি সেরূপ নহে। পুত্রের তুল্য না হউক পিতৃধনের কিয়দংশ কন্যা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে নারীজাতির প্রতি অন্যায়াচরণ নিষ্ঠুরাচরণ হইয়া থাকে। স্ত্রীকে প্রহার করারও শাস্ত্রে বিধি আছে। বহু বিবাহ, সহজে তালাক (স্ত্রীবর্জ্জন) বা পুনর্গ্রহণ; যবনিকার পর যবনিকা, প্রাচীরের পর প্রাচীর স্থাপন, এবং প্রহরীর পর প্রহরী নিযুক্ত করিয়া সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগকে দুর্ভেদ্য কঠিন কারাগারে অসূর্য্যম্পশ্যারূপে আবদ্ধ করিয়া দুঃখ ক্লেশে রাখা হয়। আমরা তাহার প্রমাণ ও উদাহরণ স্বরূপ শাস্ত্রীয় বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

মোসলমানদিগের প্রধান ধর্ম্ম শাস্ত্র হদিস মেস্কাত শরিফের অন্তর্গত বিবাহ প্রকরণ ;—মহাপুরুষ মোহম্মদের সহধর্ম্মিণী সুদার ভ্রাতা এবং জামওয়ার পুত্র অবদো-ল্লার উক্তি ;—প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ বলি-য়াছেন, "তোমাদের কেহ স্বীয় স্ত্রীগণকে বেত্রাঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলে ক্রীতদাসকে যেরূপ বেত্রাঘাত করা হয় তদ্রূপ যেন না করে, সম্ভবত পরক্ষণেই তাহাদের সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করিতে হইবে।"

মোত্তয়াজ কোশয়রীর পুত্র হকিম স্বীয় পিতা হইতে শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন। পিতা মোত্তয়াজ এরূপ ব্যক্ত করিয়া ছেন যে, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ আমাদের "ভার্য্যার সম্বন্ধে কিরূপ কর্ত্তব্য?" তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি যখন ভোজন করিবে তখন তাহা-কেও ভোজন করাইবে, তুমি যখন পরি-ধান করিবে, তাহাকেও পরিধান করাইবে, তাহার মুখমণ্ডলে আঘাত করিবে না। অন্যা গালি দিও না, গৃহে ব্যতীত অন্যত্র তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না।"

সবেরার পুত্র লকিতের উক্তি ;—আমি বলিয়াছিলাম, প্রেরিত পুরুষ, আমার একটী স্ত্রী আছে, তাহার জিহ্বা কুবাক্য বলিয়া থাকে। তিনি বলিয়াছিলেন, "তুমি তাহাকে তালাক দাও (বর্জ্জন কর)।" আমি বলিয়াছিলাম, তাহার গর্ভজাত আমার সন্তান আছে, এবং আমি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট আছে। তিনি বলিলেন, "তবে তাহাকে উপদেশসূচক কিছু বল, যদি তাহাতে কল্যাণগুণ থাকে সে তাহা গ্রহণ করিবে, আপন দাসীকে প্রহার করার ন্যায় সুজাতা স্ত্রীকে প্রহার করিও না।"

আবু সয়িদ খোদ্‌রীর উক্তি ;—হজরত মোহম্মদের নিকটে একটী নারী উপস্থিত হইয়াছিল, তখন আমরা তাঁহার নিকটে ছিলাম, সে বলিয়াছিল, আমার স্বামী সফ্‌ওয়ান আমি যখন নমাজ পড়ি, তখন তিনি আমাকে প্রহার করেন। * * * সফওয়ান তাঁহার নিকটে ছিল, তিনি তাহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সে বলিল, "প্রেরিত পুরুষ সে যে বলে নমাজ পড়িবার সময় আমাকে প্রহার করা হয় তখন সে কোরাণের দুইটি সুরা পড়িয়া থাকে, আমি বাস্তবিক তাহা বারণ করিয়াছিলাম।" তাহাতে প্রেরিতপুরুষ বলি-লেন, "একটি সুরা পড়াই লোকের পক্ষে যথেষ্ট হয়।"

সাবেতের স্ত্রী প্রেরিত পুরুষের নিকটে যাইয়া বলিয়াছিল, "প্রেরিত পুরুষ, আমি স্বভাব ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাবেতকে ভৎসনা করি না কিন্তু আমি এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কোফ্‌রকে ঘৃণা করি *।" তাহাতে তিনি বলিলেন, "তুমি কাবিনের শর্ত্তে যে উদ্যান পাইয়াছ তাহা কি ফিরা-ইয়া দিতে প্রস্তুত?" নারী বলিল, "হাঁ প্রস্তুত।" তখন তিনি সাবেতকে বলিলেন, "তুমি উদ্যান গ্রহণ কর, এবং একবার পরি-ত্যাগ কর।"

হজরত মোহম্মদের দাস সোবানের উক্তি ;—হজরত বলিয়াছেন, "নিরাপদের

* এস্থলে কোফর কুরূপ, সাবেত খর্ব্ব-কায় কুৎসিত পুরুষ, উক্ত স্ত্রী সুন্দরী ছিল।

অবস্থায় যে স্ত্রী স্বামীর নিকটে তালাক প্রার্থিনী হয়, তাহার সম্বন্ধে স্বর্গোদ্যানের সুগন্ধ অবৈধ হইয়া থাকে।”

আবু হোরয়রার উক্তি ;—মহাপুরুষ মোহম্মদ বলিয়াছেন, “উন্মাদ রোগে রুগ্না নারী ব্যতীত অন্য সকল স্ত্রীকে তালাক্ দান বৈধ।”

আয়শার উক্তি ;—রেকায়া কোতীর স্ত্রী প্রেরিত পুরুষের নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল, “আমি রেকায়ার নিকটে ছিলাম। তিনি আমাকে তালাক দিয়াছেন, আমি তাহার পর জোবয়রার পুত্র অবদোর্‌রহমানকে বিবাহ করিয়াছি। * *” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কি রেকায়ার নিকটে ফিরিয়া যাইতে চাহ ?” সে বলিল, “হাঁ যাইতে চাহি।” তিনি বলিলেন না,“যে পর্য্যন্ত বলিলেন অবদোর রহমানেরও সে তোমার মাধুর্য্য সম্ভোগ না করে সে পর্য্যন্ত যাওয়া উচিত নয়।”

স্বামীর স্ত্রীকে প্রহার ও স্ত্রী বর্জ্জনের বিধিসূচক অনেক কথা মোসলমান শাস্ত্র হদিস গ্রন্থে পাওয়া যায়, বাহুল্য ভয়ে তাহা আর উল্লেখ করা গেল না। ভার্য্যাসম্বন্ধে রিপুপরতন্ত্রতাব্যঞ্জক অনেক অশ্লীল কথা আছে,তাহা মহিলায় প্রকাশ করা যায় না।

মূলধর্ম্ম গ্রন্থ কোরাণের নূর সুরার তিন রকুতে স্ত্রী জাতির অবরোধ বিষয়ে এরূপ লিখিত ;—(মূল গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত।) “বিশ্বাসিনী নারীদিগকে বল, যেন তাঁহারা স্ব স্ব দৃষ্টি সকলকে বদ্ধ করে এবং গোপনীয় অঙ্গ সকলকে সংযতরাখে, স্ব স্ব ভূষণ যাহা তাহাদিগ হইতে (স্বতঃ) ব্যক্ত হইয়া থাকে তদ্ব্যতীত প্রকাশ না করে, এবং যেন তাহারা আপন কণ্ঠদেশে স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল ঝুলাইয়া রাখে। স্বীয় পতি পিতা শ্বশুর নিজের পুত্র, বা সপত্নীগর্ভজাত পুত্র স্বীয় ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগিনেয় বা সমধর্ম্মাবলম্বিনী নারীগণ অধীনস্থ দাসদাসীগণ, নিষ্কাম অনুগামী পুরুষগণ অল্পবয়স্ক। বালকগণের নিমিত্ত ভিন্ন যেন তাহারা আপন আভরণ প্রকাশ না করে, এবং যেন তাহারা আপন শব্দায়মান (ভূষণযুক্ত) চরণ বিক্ষেপ না করে। তাহা করিলে তাহারা আপন ভূষণ যাহা গোপন করিয়া থাকে লোকে তাহা জানিতে পাইবে।”

গৃহস্বামী বিশেষ অবস্থাপন্ন দাসীকে পত্নীভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে শাস্ত্রে বিধি আছে।

মোসলমান পুরুষেরা নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া এবং রক্তের নিকট সম্বন্ধ আছে এমন কন্যাকেও বিবাহ করিয়া থাকেন। খুড়্‌তত, পিস্‌তত, ও মাস্‌তত, মামাত ভগিনীকে বিবাহ করিতে তাঁহাদের কিছুই বাধে না। উদ্বাহ বিষয়ে খ্রীষ্টানদিগেরও এরূপ কুনীতি। কিন্তু হিন্দু সমাজে পিতৃ কুল বা মাতৃ কুলের চারি পাঁচ পুরুষের অন্তর্গত কন্যার, এমন কি সবংশজাতা সগোত্রীয় কন্যার পাণিগ্রহণ নিষিদ্ধ। মোসলমান সম্প্রদায়ে বাল্য বিবাহ ও বার্দ্ধক্য বিবাহ প্রচলিত আছে। এক জন বৃদ্ধ পুরুষ অবাধে ক্ষুদ্র বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপ বিসদৃশ বিবাহ হিন্দুসমাজেও হয়। যে পর্য্যন্ত মোসলমান পুরুষগণের এ সকল বিষয়ে নৈতিক উন্নতি

না হইবে তাঁহারা নিজের ও সমাজের অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী নারীজাতির প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা, সম্মান প্রদর্শন না করিবেন এবং তাঁহাদের উপযুক্ত শিক্ষাও সমুন্নতির পথ মুক্ত করিয়া না দিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সামাজিক ও পারিবারিক দুঃখ ও অবনতি দূর হইবে না।

নারী ঈশ্বরের কন্যা—দেবী। ভগবানের কোমল মাতৃভাব তাঁহার জীবনে পরিস্ফুট বা অপরিস্ফুট রূপে বিদ্যমান। যাঁহারা দিব্যচক্ষে তাহা দেখিতে পান, তাঁহারাই নারীজাতিকে প্রকৃত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে পারেন। নতুবা রক্তমাংসময় দেহকে প্রীতিদান বা ঘৃণা করা হয়। তাহাতে পশু ভাবেরই প্রাবল্য হইয়া থাকে। নববিধানাচার্য্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেনের নারীজাতিসম্বন্ধে কিরূপ ভাব ও আচরণ ছিল, বিধান বিশ্বাসিগণ তাঁহাদের সম্বন্ধে কি প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করেন তদ্বিষয়ে আচার্য্যের লিখিত কয়েকটী কথা নবসংহিতা পুস্তক হইতে এস্থলে গৃহীত হইল।

নবসংহিতার অন্তর্গত "স্বামী ও স্ত্রী" অধ্যায় হইতে গৃহীত। "স্বামী স্ত্রী কেহ অহঙ্কারপূর্ব্বক আপন আপন জাতির শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ে কোন কথা তুলিবেন না, কিন্তু ঈশ্বরের গৃহের তুল্য পদস্থ সেবক সহকর্ম্মী জানিয়া পরস্পরকে মান্য করিবেন।

"যে স্বামী স্ত্রীকে সামান্য ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করে, এবং অবরোধে বন্দীর ন্যায় বদ্ধ থাকিতে না দেখিলে তাহার সতীত্বে বিশ্বাস করে না, যে সর্ব্বদা তাহাকে ক্রীতদাসীর মত করিয়া রাখিতে চায়, কখনও মাথা তুলিতে দেয় না, সেই স্বামী তাহায় অযোগ্য।"

"কেহ কাহারো উপরে অত্যাচারী হইবে না। প্রভু পরমেশ্বরের কার্য্য ক্ষেত্রে দুইজনে এক সঙ্গে কার্য্য করিবে।

"যদিও দুইজনে সমান, কিন্তু তথাপি অন্যায়রূপে একজন যেন অপরের প্রকৃতিকে অনুসরণ বা অন্যের পদকে অধিকার না করেন।

"পরিবারমধ্যে ঈশ্বর যে তাহাদের পৃথক্ স্বভাব এবং কার্য্যভার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহা কেহ যেন অতিক্রম না করেন।

"পুরুষ যেন নারী প্রকৃতি ধরিয়া কুলবধূর ন্যায় আপনাকে প্রকাশ না করে। স্ত্রীলোক হইয়াও কেহ যেন পুরুষত্ব অন্বেষণ করত পুরুষোচিত কার্য্যের অভিলাষিণী না হন।

"উভয়ে ঈশ্বর নিয়োজিত নিজ নিজ কার্য্য সমাধা করুক: প্রতিযোগীর ন্যায় পরস্পরে বিবাদ না করিয়া সমাংশীর ন্যায় পরস্পরের প্রতি বন্ধুতার সম্বন্ধ রক্ষা করুক।

"যে নারী আপনার বৈধ কর্ত্তব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষোচিত ক্রীড়া আমোদ বা অন্যান্য কার্য্যে মত্ত হয়, এবং পুরুষের অভ্যাস অনুকরণ করিয়া স্বভাববিরুদ্ধে ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করে, তাহাকে ধিক্! মহাবিনাশ তাহাকে প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং লজ্জা ও অধঃপতন তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী।

"অবিশ্বস্ততা অতি ভয়ানক পাপ, স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই তাহা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবে। মনের মধ্যে একটু সামান্য ব্যভিচার চিন্তাকেও অতি ঘৃণার্হ বলিয়া জানিবে।

যেমন তাহারা একসঙ্গে গৃহস্থালীর ও সাংসারিক কার্য্য সকল ব্যবস্থিত করিবে, তেমনি তাহারা এক সঙ্গে উপাসনা প্রার্থনা করিবে, এবং সময়ে সময়ে আত্মার নিত্য বস্তু সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা করিবে।

"স্ত্রী ও স্বামী যখন কোন নির্জ্জনস্থানে একত্র বসিয়া সঙ্গীত ও প্রার্থনা করেন এবং সানন্দ চিত্তে অনন্ত পরমাত্মার সহিত যোগ সাধনে প্রবৃত্ত থাকেন তখনকার সেই দৃশ্য স্বর্গীয়।

"ইহজীবনের অবসানে তাঁহারা এই রূপে স্বর্গের সুখধামে উত্থিত হউন।"

বিবাহ অধ্যায় হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বচন গৃহীত ;—

"কোন পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিবে না ; কোন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকিবে না।

"বহু স্ত্রী এবং বহু স্বামী গ্রহণ এ মণ্ডলী নিষেধ করে। বন্ধ্যাত্ব দুরারোগ্য ব্যাধি বা অসতীত্ব অসম্ভাব একোদ্বাহের দুশ্চ্ছেদ্য নিয়ম ভঙ্গ করার পক্ষে উপযুক্ত কারণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না।

"বিবাহিত ব্যক্তি পরস্পরকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, পুনর্ব্বার বিবাহও করিতে পারিবে না।

"ব্যভিচার, নিষ্ঠুর ব্যবহার অথবা অপ্রেম যদি সঙ্ঘটিত হয় তথাপি বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইবে না।

"যদিও বন্ধুগণ অনুরোধ করে, অথবা পৃথিবীর বিচারালয় অনুমতি দেয় তাহারা ঈশ্বরের স্বর্গীয় নিয়মের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কেবল সাংসারিক সুখ সুবিধার জন্য তাহা করে।

"ঈশ্বরের বিধি বিবাহবন্ধনকে পবিত্র এবং অচ্ছেদ্য বলিয়া ঘোষণা করে।

"পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া দাম্পত্য নিয়মের সকল বাধ্যতা হইতে মুক্ত হইয়াছে এই সুখকর মোহে মুগ্ধ হইয়া যদি কেহ পুনরায় বিবাহ করে তবে ঈশ্বরের সিংহাসন সমক্ষে দ্বিবিবাহ দোষে তাহারা দোষী হইবে। যাহারা এরূপ বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, এবং ঈদৃশ পরিণয়কার্য্যের যাহারা অনুষ্ঠান করে তাহাদিগকে ধিক্!

"অতএব নরনারীগণ মনে রাখিবে যে, একবার যাহারা বিবাহিত হইয়াছে, চির কালের জন্য তাহারা বিবাহিত হইয়াছে। ঈশ্বরের মণ্ডলীতে ত্যাগ বিধির স্থান নাই।

"বিবাহার্থীদিগের মধ্যে জাতীয় প্রথা-নিষিদ্ধ, জ্ঞাতিত্ব অথবা পারিবারিক কোন প্রকার নিকট সম্বন্ধ থাকিবে না।

"নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিকে কেহ বিবাহ করিবে না ; কারণ তাহা ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক নীতি বিগর্হিত এবং অনিষ্টকর"।

সাধু অগষ্টাইন-মাতা মণিকা।

পৃথিবীর মানবজাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে নারীজাতির শিক্ষা, উন্নতি এবং ধর্ম্মজীবনের সহিত পুরুষজাতির সমুদয় বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে পরিবারে একটী ধর্ম্মপ্রাণা এবং কর্ত্তব্য পরায়ণা রমণী অবস্থান করেন, তাঁহার কার্য্য প্রণালী এবং ধর্ম্মভাব পরিবারস্থ সমুদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সেই জন্য নারীজাতিকে আর্য্য শাস্ত্রকারগণ বড় উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের যে অনুশাসন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই বিধি অনুসারে জীবনযাপন করিলে বর্ত্তমান শিক্ষার প্রবীণাদিগের নিকটও উচ্চ স্থান লাভ করিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। নারীজাতি পুরুষজাতির সমকক্ষ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিবেন ইহা বোধ হয় সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নয়। বিদুষী আনি বাসন্ত এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন নারীদিগের শিক্ষা পুরুষদিগের শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র হইবে। তাহাদিগকে যে উপায়ে আমরা বাল্যে শিক্ষাদান দ্বারা সুগৃহিণী সুমাতা এবং গৃহধর্ম্মের সমস্ত কার্য্য সুনিয়মে সে নির্ব্বাহ করিতে পারে সেই বিষয়ে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রাতঃস্মরণীয়া সীতা, মৈত্রেয়ী গার্গী সাবিত্রী কোন্ সময়ে জীবিতা ছিলেন তাহার ইতিহাস আলোচনা করিতে চাহিনা, কিন্তু তাঁহারা স্বীয় স্বীয় চরিত্রের অলৌকিক প্রভাবের জ্যোতি সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছেন সেই জ্যোতি দিন দিন বিস্ফারিত হইয়া তাঁহাদের চরিত্রকে আরও উজ্জ্বলতর করিতেছে।

অদ্য আমরা ৪র্থ খৃঃ শতাব্দীর একটী সাধ্বী খৃষ্টীয় মহিলার জীবনের একটী অধ্যায় আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। তাঁহার জীবন আমাদের দেশীয় নারীজাতির নিকট বড় শিক্ষণীয়। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ধার্ম্মিকা রমণীগণ কি প্রকারে স্বীয় পরিবারে ধর্ম্ম বিপ্লবের সময় কি প্রকার স্বীয় আত্মার উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা আমাদের ভাবিবার বিষয়। শিক্ষিতা মহিলাগণ সকলেই সাধু অগষ্টাইনের নাম অবগত আছেন। মণিকা তাহার মাতা। অগষ্টাইন যৎকালে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় খৃষ্টসমাজে নৈতিক জীবনের বড় অভাব ছিল। নীতি যে ধর্ম্মসমাজের ভিত্তি সেই জ্ঞান তৎকালে সমাজ হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছিল। ব্যভিচার অবাধে সমাজমধ্যে রাজত্ব করিত। অগষ্টাইনের প্রথম জীবন বড় দূষিত ছিল। তাঁহার নৈতিক জীবন বড় কলঙ্কিত ছিল। অগষ্টাইন স্বীয় রচিত "পাপ স্বীকার" নামক পুস্তকে নিজের জীবনের অবস্থা বিশেষ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মণিকা স্বীয় পুত্রের ধর্ম্মজীবনের এবং নৈতিক জীবনের দুরবস্থা দেখিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। দিবারাত্রি প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিতেন, কি উপায়ে তিনি স্বীয় সন্তানকে সৎপথে আনয়ন করিবেন। শুধু প্রার্থনাবলে মণিকা জগতে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। মানবের আধ্যাত্মিক জীবন প্রার্থনার উপর নির্ভর করে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, Prayer and Inspiration are the two ends of the axis round which the sphere of man's

spiritual life revaolvs" এই কথাটি খুব সত্য কারণ তাঁহার জীবনই ইহার প্রমাণ। তিনি শুধু প্রার্থনা দ্বারা ধর্ম্ম-জগতে অবিনশ্বর নাম রাখিয়া গিয়াছেন। যাহারা তাঁহার প্রার্থনা পড়িয়াছেন, নিশ্চয়ই ভাষার ওজস্বিতা ও বাগ্মিতা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।

ধর্ম্মপ্রাণা মণিকা এক ধর্ম্মযাজককে অনুনয় করিয়া বলিলেন, আপনি কৃপা করিয়া আমার পুত্রের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন। তিনি অগষ্টাইনের চরিত্রের ধৃষ্টতা জানিয়া বলিলেন তোমার সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিয়া কোন ফলোদয় হইবে না। এই কথা গুলি কোমল-প্রাণা মণিকার হৃদয়ে শেলবৎ বিদ্ধ হইল এবং বলিতে লাগিলেন তবে কি আমার পুত্রের জীবন চিরকাল কলঙ্কিত থাকিবে, সংসারের আমোদ প্রমোদেই কি সে তাহার জীবন অতিবাহিত করিবে! তাঁহার এই সকল খেদোক্তি পবিত্রাত্মার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ঐ ধর্ম্মযাজকের প্রাণে এক নূতন আলোপ্রদান করিল। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'মাতঃ, আপনি আর আপনার সন্তানের জন্য ভাবনা করিবেন না। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, যে সন্তানের জন্য আপনি এত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন সে সন্তান আর কোন দিন কুপথগামী হইবে না, তাহার জীবন নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে।'

এই আশার বাণী শুনিয়া পুণ্য-শ্লোক-জননী আশ্বস্তা হইলেন। এতদিনে ভগবানের কৃপাবারি আগত হইয়াছে, বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিলেন। এত দিনে অগষ্টাইন নানা ধর্ম্মের আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পবিত্র জীবন লাভ করিবার জন্য কোন প্রয়াস পাইতেন না। বাইবেল পড়িতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু বাইবেলের সুমধুর সরল ভাষা তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারিল না। তিনি ভাষার বাহ্যিক আড়ম্বরে বড় আকৃষ্ট হইতেন। বাগ্মিপ্রবর সিসিরিওর পুস্তক তিনি বেশ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন।

স্বদেশ আর ভাল লাগিল না, সমৃদ্ধিশালী রোমনগরী দেখিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন। মাতা জানিতে পারিলে এত দূর দেশে যাইতে দিবেন না এই বিবেচনা করিয়া তাঁহার অজ্ঞাত সারে রোমে যাইবার জন্য তিনি মনস্থ করিলেন; কিন্তু তাঁহার মাতা এই অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সমুদ্রতটে উপনীতা হইয়া দেখিলেন স্বীয় পুত্র রোমে যাইবার জন্য প্রস্তুত। তিনি কত অনুনয় করিয়া বলিলেন, 'তুমি চলে যাইও না।' কারণ তাঁহার বিশ্বাস ছিল এই প্রকার বিলাসপূর্ণ নগরীতে যাইয়া তাহার পুত্রের নৈতিক জীবন আরও শিথিল হইবে। কিন্তু তিনি মাতাকে নানা প্রকার মিথ্যা প্রবোধ দিয়া জলপথে রোমনগরে যাত্রা করিলেন। মাতা অশ্রুপূর্ণ লোচনে স্বীয় আবাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অগষ্টাইনের জীবন দিন দিন আর এক দিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল, বাইবেলের সাধু মহাত্মাদিগের জীবনী বিশেষভাবে পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাদের এক জনের জীবন হঠাৎ এক দিন পড়িতে

পড়িতে তাঁহার মনে এক নূতন ভাব উদিত হইল। তিনি সংসারের নীচ আমোদ এবং বিষয়তৃষ্ণার প্রতি বীতরাগ হইলেন। যৌবনকালে যে আমোদ প্রমোদকে সুখের একমাত্র আধার মনে করিতেন তাহা এক্ষণ বিষসদৃশ হইল। হৃদয়ে অনুতাপ আসিল, জীবনকে ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গিত করিলেন। অগষ্টাইন তাঁহার বিরচিত পাপস্বীকারনামক পুস্তকে স্বীয় জীবন সবিস্তর সব লিখিয়া গিয়াছেন। বাইবেলের বিধি অনুসারে জলাভিষেক ক্রিয়া দ্বারা খৃষ্টমণ্ডলীতে প্রবেশ করিলেন। সাধ্বী মণিকা স্বীয় পুত্রের ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া হৃদয়ে পরমানন্দ লাভ করিলেন। এত দিনে মাতার দুঃখ নিশা প্রভাত হইল। মাতা ও পুত্র ক্ষুদ্র কুঠরীতে বসিয়া কত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। দিবারাত্রি পরিত্রাতার নাম গ্রহণ এবং ধর্ম্মচিন্তা তাঁহার জীবনের ব্রত হইল। সাধ্বী মণিকার শরীর দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে। প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। মৃত্যুর জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। ধর্ম্মপ্রাণা রমণী প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয়ে পবিত্রাত্মার শরণ লইলেন। জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইল। তাঁহার এই পূত জীবনী এই পঙ্কিলময় পৃথিবীতে চিরকাল পথপ্রদর্শকরূপে গৃহীত হইবে।

পূতচরিত্রা মণিকার জীবনীর অন্যান্য বিষয়ে আমরা আলোচনা করিলাম না, তাঁহার পুত্রের জীবনে তাঁহার স্বীয় জীবনের আলো পড়িয়া কি এক দিব্য দৃশ্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই আমরা এইটুকু অঙ্কিত করিলাম। মাতার চরিত্র সন্তানের চরিত্রে কি প্রকার কার্য্য করে তাহা মণিকার জীবনে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারি। যদি আমাদের দেশের রমণীগণ প্রার্থনাপূর্ণ হৃদয়ে সেই করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট স্বীয় স্বীয় পুত্র কন্যার আধ্যাত্মিক জীবন উন্নতির জন্য প্রার্থনা করেন তবে কি সন্তানগণ কুপথগামী হইতে পারে? কিন্তু আমাদের সমাজ ধর্ম্মবিহীন। জানি না ভগবান্ এমন দিন কবে ভারতে আনয়ন করিবেন, যখন দেখিব পুণ্যশীলা রমণীগণ স্বীয় ২ সন্তানের মঙ্গলের জন্য একাগ্রমনে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। কৃপাময় আশীর্ব্বাদ করুন যেন প্রত্যেক বঙ্গনারী মণিকার পদানুসরণ করিয়া ধন্যা হইতে পারেন।

(স্ব)

নারীর বশ্যতা *।

"নারীগণ স্বামিগণের বশ্যতা স্বীকার করুক।" পল এই কথা বলিয়া গেলেন। "স্বামিগণ তোমাদের পত্নীগণের বশীভূত হও," সভ্যতা এই শিক্ষা দিতেছে। স্বামী স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ ইহাই খ্রীষ্টানুগত পলের মত। স্ত্রী স্বামীর শীর্ষস্থানীয় উনবিংশশতাব্দীর ধর্ম্ম। সুতরাং সমাজে

* নববিধানাচার্য্য শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র সেন রবিবাসরীয় মিররে প্রবন্ধ আকারে ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অনুবাদিত।

নারীর স্থানসম্বন্ধে বিষম মতদ্বৈধ উপস্থিত। আমরা কাহার মতানুবর্ত্তন করিব? পলকে না আমাদের যুগের ফিলিস্‌টাইনদিগকে মান্য করিব! আমাদের সকলের পক্ষেই ইহা অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন: বহু আবশ্যকীয় বিষয়ের সহিত জড়িত। অতএব ইহার সন্তোষজনক একটা মীমাংসা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

পলের প্রত্যাদিষ্ট নীতিতে সন্দেহ স্থাপন এবং নিরীশ্বর জ্ঞানবাদীর মতের পরিপোষণ আমাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। স্বর্গীয় আদেশে যিনি প্রণোদিত তাঁহার সম্মুখে আমাদিগকে নত হইতেই হইবে। পল যখন নারীসম্বন্ধে ইহা বলিয়াছেন, তখন তিনি একটা অদ্ভুত মতের দ্বারা চালিত হইয়া বলেন নাই; কিংবা তাঁহার কথাকে আমরা ইংলণ্ডের কোন সামাজিক সমিতিতে নারীর স্বত্ব বিষয়ে পঠিত প্রবন্ধের সহিত তুলনা মনে করিতে পারি না। তিনি জীবন্ত ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, সামাজিক পাপ দুর্নীতির সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। তিনি লজ্জাহীনতা, চপলতা ও অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতারই প্রতিবাদ করিয়াছেন, নারীদিগের বিষয়াসক্তি ও ধর্ম্মবিমুখতাকেই তিরস্কার করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরপরায়ণ হইবার জন্য শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি পার্থিব বা সামাজিক বিষয়সম্বন্ধে স্ত্রীগণের বশ্যতার উল্লেখ করেন নাই। জনষ্টুয়ার্ড মিলের নিকৃষ্টতম ছাত্রের এ বিষয়ে এরূপ আলোচনা করা সম্ভব। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অত্যন্ত উন্নতভাবে প্রণোদিত হইয়া বলিয়াছেন। স্ত্রীলোকের বশ্যতার কথা বলিতে গিয়া তিনি কি কখনও সাংসারিক দাস্য কর্ম্মের বিষয় মনে করিয়াছেন? তিনি কি সেই সাংসারিক ও সামাজিক দাস্য নীতির সপক্ষে যাহা এই প্রাচ্য দেশে স্ত্রীলোকের ব্যক্তিত্ব পর্য্যন্ত হরণেও পরাঙ্মুখ নয় এবং যাহা স্ত্রীকে অত্যাচারী স্বামীর দাসীরূপে পরিণত করে সেইরূপ বশ্যতার কথা বলিয়াছেন? তাহা কখন নহে। তাঁহার উক্তি সাংসারিক সম্পর্ক ধরিয়া বিচার্য্য নহে। তিনি স্বামীকে খ্রীষ্ট ও স্ত্রীকে উপাসকমণ্ডলী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্ট যেমন উপাসকমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়, স্বামী তদ্রূপ স্ত্রীর শীর্ষস্থানীয়। মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের অধীন, তদ্রূপ স্ত্রীগণ প্রত্যেক বিষয়ে স্বামীদিগের অধীন হউন। পল আরও বলিলেন "স্ত্রী দেখিবেন, তিনি যেন আপন স্বামীকে ভক্তি করেন।" দাম্পত্যসম্বন্ধে পলের মত কিরূপ- এই সকল উক্তিতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। জেণ্টাইলের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক স্ত্রীলোকদিগকে নীচ দাস্যবন্ধনে বাঁধিতে চাহেন নাই, কিংবা স্বামীদিগকে রাজকীয় ও সামাজিক অত্যাচারিতার অধিকার দান করেন নাই, তিনি আধ্যাত্মিক একত্র বাসেরই কথা বলিয়াছেন, তাহার উপর আর কিছু নহে। তিনি স্পষ্ট বলিতেছেন, মণ্ডলীর সহিত যেরূপ খ্রীষ্টের সম্পর্ক স্ত্রীর সহিত সেইরূপ স্বামীর সম্পর্ক। অধীনতায় নহে; কিন্তু ভক্তির সহিত স্ত্রী স্বামীর বশ্যতাস্বীকার করিবে। জ্ঞানসর্ব্বস্ব সভ্যতা কি ইহা অপেক্ষা

উচ্চতর দাম্পত্যের আদর্শদান করিতে সক্ষম? কখনও নহে। দলের নির্দ্দিষ্ট স্থান ছাড়া স্ত্রীলোকদিগকে যে ব্যক্তি কোন স্থান বা অধিকার প্রদান করে তাহা কেবল বর্ব্বরতা ও ধর্ম্মহীনতারই পরিচায়ক হইবে; সুতরাং তাহা একান্ত পরিহার্য্য।

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

সন্দীপ দ্বীপ।

(২য়।)

আমরা ডাকবাঙ্গলা হইতে গোযানা-রোহণে ৪ঠা জানুওয়ারি (২০শে পৌষ) সায়ংকালে হরিশপুরাভিমুখে যাত্রা করি। তথা হইতে হরিশপুর ন্যূনাধিক ৭ মাইল দূরে। সেখানেই সন্দীপসম্বন্ধীয় গবর্ণমেণ্ট কার্য্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত। হরিশপুরে একজন সবডিপুটী কলেক্টর, দুইজন মুন্‌সেফ, ও একজন সবরেজিষ্টার এবং খাস তহসিলদার আছেন। কিয়দ্দূর পথ চলিলে চতুর্দ্দিক রজনীর ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। অনেক দূর পথ সমতল ছিল, মৃদুমন্দগতি গোযানে বেশ আরামে যাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু হরিশপুরের অনতিদূরে দুই একটি সেতু পার হইতে আমরা বিষম সঙ্কট বোধ করিতেছিলাম। এক এক বার শকটের উত্থান পতন হইতে-ছিল, আমরা আমাদের সঙ্গের দ্রব্যজাত সহ পুনঃ পুনঃ পতনোন্মুখ হইয়াছি। শকট আলোকশূন্য, বাহিরে নিবিড় অন্ধ-কার। পথের বন্ধুরতা জন্য গাড়ীর অসমগতিবশতঃ আমরা স্থানে স্থানে বিপর্য্যস্ত হইতেছিলাম, এক এক বার এমন ধাক্কা লাগিয়াছে যে, ব্যাগ বেডিং ইত্যাদি ও নিজেকে সামলাইয়া উঠিতে পারিতে-ছিলাম না। শকট হইতে পড়িয়া বা আহত হই আমাদের এরূপ ভয় হইতে ছিল। হরিশপুরে পঁহুছিয়া পথপ্রান্তে একটা খানায় গাড়ী পড়িয়া গিয়াছিল। আমরা অনাহত শরীরে রক্ষা পাইয়াছিলাম, তখন আর যানারূঢ় থাকা উচিত বোধ না করিয়া পদব্রজে চলিয়া ঘোরতর অন্ধ-কারে ইতস্ততঃ সবডিপুটী বাবুর আবাস খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বহু অনু-সন্ধানের পর তাঁহার বাসগৃহ স্থির করিয়া দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার একজন ভৃত্যকে প্রাপ্ত হই, তাহাদ্বারা আমাদের আগমন সংবাদ সবডিঃ বাবুকে জ্ঞাপন করি। তখন রাত্রি বোধ করি ৯টা হইয়াছিল সবডিপুটী শ্রীযুক্ত বাবু রজনী কান্ত মুখোপাধ্যায় অন্তঃপুরে ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন। ভৃত্য যাইয়া তাঁহাকে চট্টগ্রাম হইতে দুইজন বাবু আসিয়াছেন, এরূপ বলে। রজনী বাবু আমরা যে আসিয়াছি, তাহার কথায় কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। পরে আমরা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে আত্মপরিচয় দান করি। তাহাতে তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি আহার করিতে বসিয়াছি। আমাদের ম্যাজি-ষ্ট্রেট সাহেব আপনাদের বিষয়ে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। আমি ভোজন করিয়া উঠিয়াই সমুদায় বন্দোবস্ত করিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি আমাদিগকে ভৃত্যযোগে

খাস তহসিলদারের কাচারীতে পাঠাইয়া দেন। উক্ত তহসিলদার ত্রিপুরা নিবাসী একজন মোসলমান, তাঁহার নাম বোধ হয় মস্তাফা, পূর্ণ নাম স্মরণ হইতেছে না। তিনি আদর যত্ন করিয়া আমাদিগকে বসিবার আসন দান করিলেন, এবং আমাদিগের অবস্থিতির জন্য একটি গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কিয়ৎক্ষণানন্তর সবডিপুটী বাবু আসিয়া আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর তাঁহার অন্তঃপুর হইতে অন্ন ব্যঞ্জন আনীত হইল। সবডিপুটী রজনী বাবু কৃষ্ণনগর নিবাসী, তিনি সন্দীপে সপরিবারে স্থিতি করিতেছেন। গৃহকর্ত্রী স্বয়ং দুইবেলা রন্ধন করিয়া থাকেন, আহারাদি হইয়া গিয়াছিল, তিনি আবার রাত্রি দশটার সময় আমাদের জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দেন। আমরা আহারান্তে সুনিদ্রায় নিশাযাপন করি।

আমরা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখি যে, সন্দীপ অতি সুন্দর স্থান। Headquarter হরিশপুরের বাজার বৃহৎ, পণ্যশালা সকল নানা পণ্যজাতে পূর্ণ, ইতস্ততঃ হাকিম ও আমলা উকিলদিগের বাসা বিদ্যমান। এখানকার প্রশস্ত পথ, স্বচ্ছ সরোবর এবং নানা জাতীয় তরুরাজি আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। কাশী বাবুর আত্মীয় অন্তরঙ্গ বিক্রমপুরনিবাসী আমলা উকিল মোক্তার এখানে অনেক আছেন। এখানে মোসলমানের বসতিই অধিক, অনেকে আরব্য ও পারস্য ভাষায় পণ্ডিত, ইংরাজি লেখা পড়া জানেন, উকীলি মোক্তারী করেন, এরূপ স্থানীয় হিন্দু লোকের অভাব নাই। আমরা ডাকবাঙ্গলাতে যাইয়া নওয়াখালি হইতে সমাগত সেটেলমেণ্টের আফিসর শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয়কে প্রাপ্ত হই, তিনি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া তত্রত্য প্রথম মোন্‌সেফ শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত এবং দ্বিতীয় মন্‌সেফ শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র নাগ মহাশয়ের নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। প্রথম মোন্‌সেফ পরিণত বয়স্ক, তাঁহার বিচার, বিজ্ঞতা ও শিষ্টতার অনেক প্রশংসা শুনা গেল।

সন্দীপ অতিশয় প্রাচীন দ্বীপ, নওয়াখালি অপেক্ষা প্রাচীন। নওয়াখালির সঙ্গে এক সময় সন্দীপের যোগ ছিল। এরূপ কিংবদন্তী যে, এই দ্বীপে পুরাকালে দেলাল রাজা নামক একজন রাজা ছিলেন, তাঁহার অতিশয় প্রতাপ ও খ্যাতি ছিল। তিনি সুন্দর পুরুষের সঙ্গে সুন্দরী নারীর বিবাহ দিতেন, যেন তাহাদের যোগে সুশ্রী সন্তান উৎপন্ন হইয়া ক্রমে তাঁহার সমুদায় প্রজা সৌন্দর্য্যশালী হইয়া উঠে এবং এই দ্বীপের শোভা বৃদ্ধি করে। এক সময় এই দ্বীপ পোর্ত্তগীজদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহারা এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এক্ষণ সেই দুর্গের কোন চিহ্ন নাই, উহা নদীগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে। সন্দীপের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। অনেক তত্ত্ব জনশ্রুতিমূলক। এইরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে, মোগলসম্রাট আক্‌বর শাহার রাজত্বকালে চাঁদখাঁ নামক একজন

দুর্দ্দান্ত মোসলমান পুরুষ এই দ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, সম্রাটের প্রেরিত সৈন্য তাহাকে গেরেফ্‌তার করিয়া এখান হইতে লইয়া যায়।

সন্দীপ দৈর্ঘে প্রায় ১৩ মাইল ইহার পরিসর ১২। ১৩ মাইল হইবে। অধিবাসীর সংখ্যা ১১৫০০০। সন্দীপে বনজঙ্গল নাই, সুতরাং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ভয় নাই,কিন্তু সেখানে সর্পভয় প্রবল। বর্ষাকালে সর্পদংশনে বহু লোকের মৃত্যু হয়। ধান্য ক্ষেত্রে যে সকল সর্প প্রকাশ পায়, সে সমস্তই বিষাক্ত। সন্দীপের লোকেরা উহাদিগকে "পালস" সর্প বলে। বস্তুত গোখরা বা জাত সাপ। বিগত ১৮৮৩ সনের ভীষণ জল প্লাবনে এই দ্বীপের ৪০ সহস্র লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। গতবৎসর আমরা কক্সবাজারের সন্নিহিত মহিষখালি দ্বীপে গিয়াছিলাম, সেই দ্বীপের দৈর্ঘ্য ২৭ মাইল, সুতরাং উহা দৈর্ঘ্যে সন্দীপ অপেক্ষা বৃহৎ; কিন্তু মহিষ খালীর অধিকাংশ স্থানে পর্ব্বত ও অরণ্যাকীর্ণ, সন্দীপ জনাকীর্ণ ফলশস্যশালী দ্বীপ। এখানকার ভূমি উর্ব্বরা, এস্থলে নানা প্রকার শস্য জন্মে, ফলের মধ্যে নারীকেল উৎকৃষ্ট। তাহা অতিশয় বৃহদাকার হইয়া থাকে। সন্দীপে অনেকের জমীদারী আছে, গবর্ণমেন্টের খাস তহসিলও আছে। অত্রত্য নিম্ন শ্রেণীর মোসলমান সকল অতিশয় ক্রূর বৈরনির্য্যাতক ও অসত্যাচারী। শ্রুত হইল ঘর জ্বালানের মোকদ্দমা এখানে অধিক হয়, শত্রুকে নির্য্যাতন করিবার তাহাদের প্রধান উপায় নিশাকালে শত্রুর গৃহে অগ্নি সংলগ্ন করা। চারি আনা ব্যয় করিলেই একজন মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা পাওয়া যায়।

তিন দিবস পূর্ব্বে আমরা কুতুবদিয়া দ্বীপে যাইয়া সাগরকূলে বাস করিয়াছিলাম। গৃহে বসিয়াই সাগরের লহরীলীলা দর্শন করিয়াছি, কিন্তু সন্দীপে যাইয়া আমরা যে স্থানে ছিলাম, সেই স্থান হইতে বঙ্গোপসাগর ৪। ৫ মাইল দূরে। আমরা তাহার তরঙ্গায়মান নীলকান্তি দর্শন এবং গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিতে পাই নাই। গত রাস পূর্ণিমার ঝড়ে সন্দীপবাসীদিগকে ভীত করে নাই, এখানে সেই ঝড় বিশেষ অনুভূত হয় নাই। আমরা শুনিয়াছি যখন প্রবল বায়ু প্রবাহের সঙ্গে বিশাল সাগর ভীষণাকার ধারণ করিয়া ভীমগর্জ্জনে কুতুবদিয়া দ্বীপ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তথাকার খাস তহসিল দার বাবু কম্পিতকলেবরে ডাক্তার বাবুর নিকটে যাইয়া বলিয়াছিলেন, 'মহাশয় উপায়ান্তর নাই, প্রার্থনা করুন।' ইহা বলিয়াই তিনি "তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে, আর কেহ নাই, বিপদ ভয় বারে, আঁধারে যে তারে।" সকাতরে এই সঙ্গীতটি গাইয়াছিলেন। ঈশ্বরকৃপায় ভয়নিবারণ হইল, পরক্ষণেই প্রকোপিত সরিৎপতিশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

অপরাহ্ণে আমরা এক মাইল দূরে চারি আনির হাট নামক হাট দেখিতে গিয়াছিলাম। উহা বৃহৎ হাট, তাহাতে নানা প্রকার দ্রব্যজাতের আমদানি দৃষ্ট হইল, পশু পক্ষীও বিক্রয় হইতেছিল। এক জোড়া নারীকেল, কিছু কদলী ও অপর

কোন কোন দ্রব্য ক্রয় করা গিয়াছিল। কলি কাতায় লইয়া যাইবার জন্য নারিকেল কেনা হইয়াছিল।

সন্দীপে কখনও কোন প্রচারক প্রচার করিতে যান নাই। প্রাতঃকালেই বক্তৃতা-দানের প্রস্তাব করা গিয়াছিল। কেহ কেহ আসিয়া বলিলেন, আপনাদের নিকটে আমরা মোসলমান ধর্ম্ম বিষয়ে কিছু শুনিতে ইচ্ছু। তখন বিষয় পরিবর্ত্তন করিয়া এস্‌লামধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা হইবে, এরূপ বিজ্ঞাপন দিতে বলা যায়। তাহাতে কোন ভদ্রলোক আপত্তি করিয়া বলিলেন, হিন্দুধর্ম্মবিষয়ে কিছু না বলিয়া কেবল মোসলমান ধর্ম্মবিষয়ে বলিলে এখানকার হিন্দুগণ ক্ষুব্ধ হইবেন। এই কথায় আবার বিষয় পরিবর্ত্তন করিয়া "হিন্দুধর্ম্ম ও মোসলমানধর্ম্ম" এই বিষয়ে বক্তৃতা হইবে, এই প্রকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। সায়ংকালে স্কুলগৃহ শ্রোতৃবর্গে পূর্ণ হইল। হাকিম বাবুরা এবং আমলা উকিল শিক্ষক ছাত্রগণ সকলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বেদান্ত মূলক হিন্দুধর্ম্ম একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরোপাসনার প্রতিপোষক, মোসলমান ধর্ম্মেরও মূল তাহাই। ইহা বেদান্ত উপনিষদ ও কোরাণ হদিস ইত্যাদি উভয় সম্প্রদায়ের বিবিধ শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা প্রতিপাদন করিয়া হিন্দু মোসলমানের মধ্যে যে বিবাদ বিসংবাদ ঘৃণা বিদ্বেষ অনৈক্য থাকা অনুচিত এরূপ বলা গিয়াছিল। বিশেষতঃ উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের নিকট প্রতিবেশী, পরস্পর উপকারক ও উপকৃত। মোসলমানের সাহায্য ব্যতীত হিন্দুর জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ দুষ্কর, এদেশের অধিকাংশ কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী সামান্য শ্রেণীর মোসলমান। মোসলমান বহু পরিশ্রমে শস্য উৎপাদন করিয়া হিন্দুর জীবনধারণের জন্য অন্ন যোগাইয়া থাকে, এবং হিন্দুর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ বলিয়া মোসলমানকে হিন্দুর শৃগাল কুকুর অপেক্ষা ঘৃণা করা অত্যন্ত গর্হিত, বরং উপকারী ভ্রাতা ঈশ্বরেব প্রিয়পাত্র বলিয়া আদর করা কর্ত্তব্য। অধিকাংশ মোসলমান হিন্দু জমীদার তালুকদারের আশ্রয়ে নিরাপদে বাস করেন, এবং তাঁহার অধিকৃত ভূমি কর্ষণপূর্ব্বক শস্যোৎপাদন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। মোসলমান উপকারী হিন্দু জাতিকে ঘৃণা বিদ্বেষ করিতে পারেন না। দুঃখের বিষয় যে, মোসলমানগণ সামান্য কারণে উত্তেজিত হইয়া হিন্দুদিগের সঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে অপমানিত করেন পরস্পরের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করিয়া মতভেদ সত্ত্বেও আত্মীয় ভাবে ও ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইলে কত সুখ শান্তি ও আনন্দ হয়, ইত্যাদি ভাবে বলা হইয়াছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতার পর হিন্দু সম্প্রদায়ের দুইজন ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্র মোসলমান ক্রমে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতার পোষকতায় অনেক ক্ষণ বলেন, এবং বক্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। পরদিন প্রত্যুষে নওয়াখালি যাত্রা করিবার উদ্দেশ্যে বক্তৃতান্তে সকলের নিকটে বিদায় গ্রহণ করা গেল। সন্দীপে আমাদের এক দিন মাত্র স্থিতি হইল বলিয়া অনেকে

বিশেষ ক্ষুব্ধ হইলেন। আমরা অন্ততঃ দুই চারি দিন থাকিব, সকলে এরূপ আশা করিয়াছিলেন। সেইদিন অপরাহ্নে সব-ডিপুটী বাবু আমাদের প্রস্তাবানুসারে আমাদের যাত্রার এক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

২৪শে পৌষ (৮ই জানুওয়ারি) আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণের দিন। সেই দিন নওয়াখালি নগরে বিশেষ কার্য্য করিবার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে সন্দীপ হইতে যাত্রা করা আবশ্যক হইয়াছিল। নওয়াখালি গমনের দুইটি পথ। যে পথে সন্দীপে যাওয়া হইয়াছিল, সেই পথে কুমিরিয়া ষ্টেশনে যাইয়া রাত্রি ৮টার ট্রেণ ধরিয়া লাক্‌শাম জংশনে যাওয়া লাক্‌শামে রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতঃকালে নওয়াখালির গাড়ীতে আরোহণ করা, দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার মধ্যে সেখানে পঁহুছা। এই পথ স্থানে স্থানে নামা উঠা ও ষ্টেশনে রাত্রি যাপন জন্য একদিকে বড় কষ্টসাধ্য। বিশেষতঃ পূর্ব্বে বন্দোবস্ত না করিলে কুমিরিয়ার ঘাটে গোযান বা মুটে পাওয়া দুঃসাধ্য। মুটে না পাইলে ঘাটেই রাত্রি যাপন করিতে হয়, আবার ঘাটে নৌকা পঁহুছিতে বিলম্ব হইলে ট্রেণ ফেইল হইতে পারে।

দ্বিতীয় পথ;—কতকদূর পদব্রজে বা গোযানে চলিয়া পরে নৌকাযোগে ইচাখালীতে যাওয়া, তথা হইতে নওয়াখালি নগর চারিমাইল দূরে। এই চারিমাইল পথ গোশকটারোহণে বা পদচালনা করিয়া যাওয়া যায়। সাধারণ লোক সন্দীপের অন্তর্গত সিদ্ধিনামক স্থান হইতে পারের নৌকায় চেনালপার হয়। সেখানে প্রণালীর চোড়া ৯।১০ মাইল, কিন্তু ইচাখালির নিকটে একস্থানে প্রণালী সর্ব্বদা তরঙ্গায়মাণ। হরিশপুর হইতে সিদ্ধির দূরতা ১৫। ১৬ মাইলের ন্যূন না হইতে পারে। তথায় যাইতে পথে দুইটী দোনা (শাখা প্রণালী) পার হইতে হয়। দোনার চোড়া প্রায় এক মাইল, ভাটার সময় লোক হাটিয়াই পার হয়, জোওয়ারের সময় দোনা জলে পূর্ণ হইয়া যায়, তাহাতে স্রোতোবেগ প্রবল হয়। অধিক দিন হইবে না, একখানা ফেরীর নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, সেই নৌকায় চল্লিশ জন লোক ছিল, ২৩ জন মারা গিয়াছে। ভাটার সময়ও দোনা পার হইতে বিপদ্ আছে, পার হইবার সময় হঠাৎ জোওয়ার আসিলে মারা পড়িতে হয়। কিছুদিন হইল তিনখানা গরুর গাড়ী পার হইতেছিল, দুইখানা পারে উঠিয়াছিল, একখানা গাড়ী পারে উঠে নাই, এমন সময় প্রবল বেগে জোওয়ার হয়, স্রোতে সেই গোযান খানা ভাসাইয়া লইয়া যায়। তদ্ভিন্ন আর এক বিপদ এই যে, ভাটার সময় এরূপ গভীর কর্দ্দম হয় যে, কোন কোন স্থানে সেই পাকে মানুষ ডুবিয়া মরিতে পারে। একটি মহিষ পার হইবার সময় গলা পর্য্যন্ত পাকে বসিয়া গিয়াছিল, জোওয়ার হইলে সে ভাসিয়া উঠিতে পারিয়াছিল কি না জানা যায় নাই। হরিশপুর হইতে ক্ষুদ্র জল প্রণালীর পথে ক্ষুদ্র নৌকায় ৩।৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া চেনালে পঁহুছিয়া

নওয়াখালি যাওয়া যায়, কিন্তু এই উপায়ে এক জোওয়ারে ইচাখালী পঁহুছা অসম্ভব। সেই ভীষণ সাগরপ্রণালীর বক্ষে নৌকায় নিশাযাপন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ঝড় বৃষ্টি হইলে বিষম বিপদ ঘটে। নানা প্রকার আলোচনার পর কুমিরিয়ার পথে না যাইয়া সন্দীপ হইতে নৌকাযোগে নওয়াখালিতে যাওয়া স্থির হইল। সে দিন (৬ই জানুওয়ারি) অমাবস্যার প্রবল জোওয়ার, বেলা ১০ টার সময় জোওয়ার হইবে। কোন কোন মাঝি এক জোওয়ারে ইচাখালি পঁহুছাইতে সাহস করিল। নওয়াখালির সেটেলমেণ্টের আফিসর শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র বসু মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে অনেকগুলি আমিন কর্ম্মচারী সহ সন্দীপে গিয়াছিলেন, সেই দিন প্রাতে তিনি হরিশপুর হইতে নওয়াখালিতে যাত্রা করিতেছিলেন। শরৎবাবু অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে নিজের সহযাত্রী করিয়া লইলেন। প্রত্যূষে তিন মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া আমরা চেনালের কূলে উপস্থিত হই। সে পর্য্যন্ত খাসতহসিলদার সাহেবও আমাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন। কুতুবদিয়া দ্বীপে এক বিন্দু গোদুগ্ধ পাওয়া যায় না। সন্দীপের পথে দৃষ্ট হইল দলে দলে দুগ্ধ বিক্রেতা দুগ্ধ সহ হরিশপুরের বাজারে যাইতেছে। খাসতহসিলদার আমাদের জন্য কয়েক সের দুগ্ধ ক্রয় করিলেন, চেনালের তীরবর্ত্তী একজন গৃহস্থের বাড়ী হইতে ১৬।১৭টি ডাব সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে উপহার দিলেন। গোযানযোগে আমাদের ও শরৎবাবুর দ্রব্যজাত পঁহুছিয়াছিল। শরৎবাবু পূর্ব্বেই পাচক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন, বেলা ১০ টার পূর্ব্বে ডাইল ভাত প্রস্তুত হয়, এবং প্রচুর দুগ্ধ সংগৃহীত হইয়াছিল। আমরা ভোজন করিয়া উঠিলেই জোওয়ার আরম্ভ হয়। তখন নৌকায় আরোহণ করা যায়। নৌকাটী চারি দাঁড়ের ছিল। শীঘ্র পঁহুছিবার জন্য শরৎবাবু ছয়জন দাঁড়ী সঙ্গে লইয়া ছিলেন। প্রবল অমাবস্যার জোওয়ারে ছয় দাঁড়ে নৌকা তীরের ন্যায় বেগে ছুটিয়াছিল। শরৎবাবুর তাড়নায় দাঁড়ীরা তামাক খাইবার পর্য্যন্ত অবকাশ পায় নাই। তাহারা বসিয়া দাঁড়াইয়া সারিগায়ে মহাবেগে দাঁড় টানিয়াছিল। ভাটা হইবার ৮।১০ মিনিট পূর্ব্বে অপরাহ্ণ ৪ টার সময় ভাটা বেগে চলিয়া নৌকা কূলে পঁহুছিল। তথা হইতে শরৎ বাবু বাইসাইকেলে চলিলেন, আমরা গোযানে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সেই দিন সেটেলমেণ্ট অফিসর শরৎবাবু আমাদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিজের নৌকায় সঙ্গে করিয়া লইয়া আসাতে আমরা নিরাপদে পঁহুছিয়াছিলাম। নতুবা আমাদের সেইদিন ইচাখালি পঁহুছা অসম্ভব ছিল, আমাদের অত্যন্ত ক্লেশ হইত। এই উপকারের জন্য আমরা শরৎ বাবুর নিকটে বিশেষ কৃতজ্ঞ। দাঁড়ী মাঝি অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিল, তাহাদিগকে কিছু পুরস্কার দেওয়া যায়।

শরৎবাবু সন্দীপের একটি অদ্ভুত মান কচু আমাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন, সে বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। তাঁহার একজন আমিন বাবু পাঁচ সিকি

মূল্যে সেই কচুটি ক্রয় করিয়াছিল, উহা দালানের থামের ন্যায় স্থূল এবং সোজা একজন দীর্ঘকায় পুরুষের ন্যায় দীর্ঘ, ওজন ২৫।৩০ সের হইবে। আমিন বাবু হইতে উহা শরৎবাবু গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে উপহার দেন। রেলভাড়া দিয়া এই গুরুভার মান কেমন করিয়া কলিকাতায় লইয়া যাইব, তজ্জন্য ভাবিত হইলাম। নওয়াখালিতে পঁহুছিলে তত্রত্য প্রিয় নাতনী তাহার এক তৃতীয়াংশ কাটিয়া রাখিয়া লঘুভার করেন। অবশিষ্ট কুমিল্লাতে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া বন্ধুদিগকে বিতরণ করা যায়, এক খণ্ড বদরপুরে একজন আত্মীয়কে উপহার স্বরূপ রেলওয়ে পার্সেলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এক খণ্ড আমরা সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আনিয়াছিলাম এবং ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ে "আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত" বিষয়ক বক্তৃতার সময়ে মহিলাদিগকে উহা প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

নওয়াখালি নগরে আমাদের পঁহুছিবার পূর্ব্বে শরৎবাবু পঁহুছিয়া, আমরা যে ইচাপালি পঁহুছিয়াছি, মাজিষ্ট্রেট বি, সি, সেনকে পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করেন। সেন সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান, পঁহুছিবামাত্র তাঁহাদিগকে আমার কুঠিতে অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইয়া দিবেন। আমরা নওয়াখালির নববিধান সমাজের উপাচার্য্য রজনীবাবুর আবাসে যাইয়া আতিথ্য গ্রহণ করিব এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম; নগরের পথে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের লোক আমাদিগকে লইয়া সঙ্গে করিয়া তাঁহার কুঠীতে লইয়া যায়। আমরা নওয়াখালিতে দুই দিবস ছিলাম, বক্তৃতাদি হইয়াছিল। শ্রীমান্ আশুতোষ রায় এখানে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। ২৫ পৌষ (৯ই জানুওয়ারি) পূর্ব্বাহ্নে আশুতোষকে সঙ্গে করিয়া কুমিল্লায় যাত্রা করা যায়। ভ্রাতৃবর কালীবাবুও কুমিল্লা গমন পর্য্যন্ত সঙ্গে ছিলেন। হাতিয়া দ্বীপেও আমাদের গমনের সঙ্কল্প ছিল, সময়াভাবে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। হাতিয়া দ্বীপে জাহাজের গতিবিধি আছে। সন্দীপ কেবলাল যাতায়াতের পক্ষে নিরাপদ, এজন্য সন্দীপে ষ্টীমারের যোগ নাই। একটি কোম্পানির সঙ্গে এক্ষণ ষ্টীমার চালাইবার প্রস্তাব চলিয়াছে। আমরা কুমিল্লা নগরে দুই দিবস স্থিতি করিয়া শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত আদাইর পল্লীতে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করি।

মহিলাদের রচনা।

কে তুমি বালিকা।

একদিন দিবা অবসানে,
জোছনায় ভরেছে ভুবন।
নীরবে,—অবনীতলে দেখিলাম কুতূহলে
প্রেমের পবিত্র ছবি
ভরিয়া নয়ন।
দাঁড়াইয়া সৌম্যশান্ত মূর্ত্তি,—
জিজ্ঞাসিলা কে তুমি বালিকা!
কি চাহিছ বল তুমি থাকে যদি দিব আমি
মরতের সুপবিত্র
কুসুম কলিকা!

দেবতাগো নাহি চাহি কিছু,—
নতশিরে কহিলা হাসিয়া।
তব প্রেম পুণ্য-জ্ঞান ধর্ম্ম, যশ, ধন, প্রাণ,
বাড়াক্ তোমারি মান
নিখিল ভরিয়া।
দেবতাগো নাহি চাহি আমি,—
কোন ধন তব সন্নিধানে,
কনক-মুকুট আনি নিতি দেয় উষারাণী
মহান্ মঙ্গলময়
বিধির বিধানে।
আসে,—ঘুম ভাঙ্গিতে আমার
প্রভাতের পাখীর কাকলী।
নিতি দেয় নিশিথিনী আকাশের হীরা চূণী,
দেছে মোরে কাদম্বিনী
ললিতা বিজলী।
বাগানের গোলাপ চামেলী,—
নিতি দেয় সৌন্দর্য্য সুবাস।
বি মোরে দেয় নিতি কত আলো, কত প্রীতি;
শশী দেছে সুধাময়
সুবিমল হাস।
স্নেহময় প্রিয় পরিজন,—
দেয় কত সোহাগ আদর।
তাঁদেরিতো প্রীতি স্নেহ এ জীবন, এই দেহ
বিধির করুণা দান
মহান্ সুন্দর।
দেবতাগো কিছু নাহি চাই,—
শুধু আমি করিব অর্পণ।
ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা, প্রাণের সকল আশা
তুমি কিগো দয়া করি
করিবে গ্রহণ?
দেবতাগো কিছু নাহি চাই,—
শুধু কিগো করিবে গ্রহণ?
জীবনের আগে পিছে যা' কিছু আমার আছে
সকলি তোমার পদে
দিব বিসর্জ্জন।
শুধু তুমি বল একবার,—
"যাহ দিবে করিব গ্রহণ,
ও ক্ষুদ্র হৃদয় প্রাণ আজি যা করিলে দান
হবে মোর চিরদিন
চিরন্তন ধন।"

শ্রীরে,—

শুভদিনে।

শুভদিনে নবরবি, এনেছে নূতন ছবি,
নবভাবে করিয়া রঞ্জিত।
এনেছে প্রকৃতি বালা, নব ফুলে গাঁথি মাল',
তব প্রাণ করিতে শোভিত।
আজি নব সমীরণ, লুটে তার "ফুলবন"
দিবে তোমা করিতে চয়ন।
সুধা-স্নিগ্ধ ধরাতল, স্নেহ ভরা আঁখিজল,
তব হাতে করিবে অর্পণ।
দেখ তব চারি ধার, খুলিয়া স্বরগ দ্বার,
এসেছেন যত দেবগণ;
নব প্রেম পুণ্য দিয়ে, সাজাইয়া ও হৃদয়ে,
অর্পিবেন নবীন জীবন।
এ নব জীবন তীরে, খুলে ফেল আজি ধীরে
সংসারের ক্ষুদ্র আকিঞ্চন;
হোক তব ও হৃদয়, পুণ্যময় প্রেমময়,
মহানের মহা সিংহাসন।

শ্রীমতী রে,—

স্বাধীনতা।

এরে বলি স্বাধীনতা ?
স্বাধীন সময় গুণে,
সবাই স্বাধীন মনে,
ছুটেছে জগৎ খানি স্বাধীনের তরে।
যে দিকে ফিরিয়া দেখি,
অবাক্ হইয়া থাকি,
স্বাধীনের সমাদর দেখি ঘরে ঘরে॥
এরে বলি স্বাধীনতা ?
স্বাধীন স্বাধীন বলি,
ফুটেছে কুসুমকলি,
গজাইছে তরুলতা স্বাধীনের বলে।
বিহগ বিহগী সনে,
স্বাধীন বিজন বনে,
স্বাধীনে বেড়ায় উড়ি আকাশের তলে॥
এরে বলি স্বাধীনতা ?
বেগে বাহি স্রোতস্বিনী,
কোন বাধা নাহি মানি,
উছলা তরঙ্গ মালা সিন্ধু সনে মিলি।
আকাশের রবি শশী,
স্বাধীন আসনে বসি,
রেখেছেন নিজ জ্যোতি দিবা রাতি জ্বালি॥
এরে বলি স্বাধীনতা ?
বালক বালিকা যত,
স্বাধীন খেলায় রত,
অবাধে ধুলায় বসি হাসি হাসি মুখে।
যুবকযুবতীগণে,
স্বাধীন প্রণয় ধনে,
শোক দুঃখ অনাহারে রহিয়াছে সুখে॥
এরে বলি স্বাধীনতা ?
জননীর স্নেহ ধারা,
শিশুর হৃদয় ভরা,
নিঃস্বার্থ স্বাধীন প্রেমে মাখামাখি হয়ে।
গেহ পুরে থাকি সদা,
বহিছেন কত বাধা,
কোমল প্রতিভাময়ী প্রেমবিনিময়ে॥
এরে বলি স্বাধীনতা ?
রাজা প্রজা সমস্বরে,
স্বাধীনতা গান করে,
জ্ঞানী, ধনী, মানিগণে স্বাধীনতা চায়।
নর নারী সম সাজে,
সমাজ সমান কাজে,
বিতরিছেন নিজ নিজ সরল হৃদয়॥
এরে বলি স্বাধীনতা ?
সাধু ভক্ত যোগী ঋষি,
সমাধি আসনে বসি,
স্বাধীন সাধনে তাঁরা সদা জাগরিত,—
জগতের যত জন,
করিছেন প্রাণপণ,
স্বাধীন সুখের আশে খাটেন সতত॥
এরে বলি স্বাধীনতা ?
কূজন কাকুতি স্বরে,
সুধায় শ্রবণ দ্বারে,
কাহার কুহকে পড়ি অধীন তোমরা।
চলে যায় সুসময়,
বলে যায় নাহি ভয়,
জাগিয়া ঘুমাতে আর পারিব কি মোরা॥
এরে বলি স্বাধীনতা ?
যত প্রশ্ন তুলি মনে,
কে যেন বলেন প্রাণে,
এত নহে জীবনের সত্য স্বাধীনতা।
যদি স্বাধীনতা চাও,
আপনারে ভুলে যাও,
ছাড়িয়া কুটিল পাপ মোহের মমতা॥

এরে বলি স্বাধীনতা ?

জাগিয়া জাগাও প্রাণ,
দিয়া আত্ম-বলিদান,
তাঁহারি দয়ার দান স্বাধীনতা ধন।
আকুল হৃদয় লয়ে,
তাঁর মুখ পানে চেয়ে,
নীরবে তাঁহারে সঁপি রাখ এ জীবন॥

হরিপাল। শ্রীমতী ত—

ধর্ম্মপুত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

স্ত্রীলোক বলিল, "দেখিতেছ না, পুণ্যাহ আসিতেছে বলিয়া গৃহ পরিষ্কার করিতেছি! আমার মেজ খানা কিন্তু কিছুতেই পরিষ্কার হইতেছে না। যেমন ময়লা তেমনিই রহিয়া গেল। আমি হায়রাণ হইয়া পড়িলাম।"

ধর্ম্মের পুত্র বলিল, "তুমি যদি আগে তোমার তোয়ালে খানা ধুইয়া লও, তাহা হইলেই মেজ খানা সাপ করিতে পারিবে।"

স্ত্রীলোক তোয়ালে ধুইয়া তদ্দ্বারা টেবিল মুছিল, দেখিল টেবিল খানি দিব্য পরিষ্কার হইয়াছে। তখন ধর্ম্মের পুত্রকে বলিল "বাবা, তুমি উপায় বলিয়া দিয়া বড় উপকার করিলে।"

পরদিন প্রাতঃকালে স্ত্রীলোকের নিকট বিদায় লইয়া ধর্ম্মের পুত্র আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিল। বহুদূর চলিতে চলিতে এক বনের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখে জনকতক কৃষক চাকা গড়িবার জন্য কাঠ নোয়াইয়া গোল করিবার চেষ্টা করিতেছে। নিকটে আসিয়া দেখিল যে, কাঠ খানা বাঁকিতেছে না। আরও নিকটে গিয়া দেখিল যে গোল জিনিসের উপর বসাইয়া কাঠ বাঁকাইবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা স্থির থাকে না, সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। সে দেখিয়া দেখিয়া বলিল ;—"ভাই সকল, তোমরা কি করিতেছ ?"

"আমরা চাকার জন্য কাঠ গোল করিতেছি, দুই বার ভূমে রাখিয়া নরম করিয়া লইয়াছি, তবু নোয়াইতে পারিতেছি না, আমরা হায়রাণ হইয়া পড়িলাম।"

"আচ্ছা, ভাই, যাহার উপর যাইতেছে আগে যদি সেখানা শক্ত করিয়া বসাও যেন না নড়ে, তাহার পর যদি তাহার উপর দিয়া চাকার কাঠ ঘুরাইয়া আনিতে চেষ্টা কর তাহা হইলেই হইবে।"

ধর্ম্মপুত্রের কথানুযায়ী কাজ করিয়া চাষারা কৃতকার্য্য হইল। ধর্ম্মের পুত্র তাহাদের সহিত রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন আবার চলিতে লাগিল। সারা দিন সারা রাত চলিয়া সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে এক দল রাখালের সঙ্গে দেখা হইল। ধর্ম্মের পুত্র আসিয়া তাহাদের নিকট শয়ন করিল। দেখিল রাখালেরা পশুদিগকে দাঁড় করাইয়া আগুন জ্বালাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা শুষ্ক ডাল লইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল, এবং সেগুলি খুব ভাল করিয়া জ্বলিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই অনেক ভিজা কাঁচা কাঠ তাহার উপর চাপাইয়া দিতে লাগিল। ভিজা কাঠ ছ্যাক ছ্যাক শব্দ করিয়া উঠিল, আগুন

নিবিয়া গেল। রাখালেরা আবার শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইল, এবং তাহার উপর আবার এক পাঁজা কাঁচা কাঠ চাপাইয়া আগুন নিবাইয়া দিল। এইরূপ ক্রমাগত করিতেছে, আগুন আর হয় না।

তখন ধর্ম্মের পুত্র বলিল, "এত তা তাড়ি কাঠ চাপাইও না, শুষ্ক ডাল প... ভাল করিয়া জ্বলিয়া উঠুক, ভাল আগুন হইলে পরে, আস্তে আস্তে কাঠ দিতে থাক।" রাখালেরা তাহার কথানুসারে কার্য্য করিল, আগে শুষ্ক কাঠ জ্বলিয়া ভাল আগুন হইল; তৎপর তাহার উপর অন্য কাঠ দিলে পর তাহাও জ্বলিয়া উঠিল এবং এক প্রকাণ্ড অগ্নি প্রস্তুত হইল। ধর্ম্মের পুত্র কিছুকাল তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া আবার হাটিতে আরম্ভ করিল। সে ভাবিতে লাগিল, এই যে তিনটি জিনিষ লক্ষ্য করিলাম ইহার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

ধর্ম্মের পুত্র আরও অগ্রসর হইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় সে এক বনের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সেই বনে এক খানি কুটীর। সে কুটীর দ্বারে গিয়া আঘাত করিল। ভিতর হইতে কেহ জিজ্ঞাসা করিল। "তুমি কে?"

"আমি একজন ঘোর পাতকী। আমি অন্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিয়াছি।"

জ্ঞানী পুরুষ বাহির হইয়া আসিলেন, বলিলেন "অপরের সে কি পাপ, যাহার ভার তুমি বহিয়া বেড়াইতেছ?"

ধর্ম্মের পুত্র একে একে ধর্ম্মপিতার বিষয়, ভল্লুকী ও তাহার শাবকদিগের কথা, রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে স্বর্গসিংহাসন ও তাহার ধর্ম্মপিতার আদেশের কথা, ক্ষেত্রে কৃষকদিগের গাভীর পশ্চাতে ছুটাছুটী ও শস্যক্ষতি, গাভীর নিজ-প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন ইত্যাদি সমুদয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল। পরে বলিল, "আমি এই টুকু বেশ বুঝিয়াছি যে, অমঙ্গলের দ্বারা অমঙ্গল বিনাশ হয় না, কিন্তু কিরূপে যে অমঙ্গল দূর করা যায় তাহা এখনও বুঝিতে পারিলাম না, আপনি আমাকে শিক্ষা দিন।"

বৃদ্ধ জ্ঞানী বলিলেন, "তুমি পথে আর কি দেখিয়াছ আমাকে বল।"

ধর্ম্মের পুত্র স্ত্রীলোকের সম্মার্জ্জনীর কথা, চাষাদের চাকার কাঠ বাঁকাইবার চেষ্টা, এবং রাখালদিগের অগ্নি প্রজ্বালনের কথা বলিল।

বৃদ্ধ মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিলেন, পরে কুটীরে গিয়া এক খানি অস্ত্র লইয়া আসিলেন, এবং ধর্ম্মপুত্রকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।"

কুটীরের অনতিদূরে এক খণ্ড পরিষ্কার জমীতে একটা বৃক্ষ ছিল, তাহা দেখাইয়া বলিলেন, "এই গাছ কাটিয়া ফেল।" ধর্ম্মের পুত্র গাছ কাটিয়া ফেলিল, গাছ পড়িয়া গেল। "এখন এই গুঁড়িটাকে তিন খণ্ড কর।"

ধর্ম্মের পুত্র তদ্রূপ করিলেন। তখন জ্ঞানী পুরুষ আবার কুটীরে গিয়া আগুন লইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, "এই তিন খণ্ড কাষ্ঠ দগ্ধ কর।"

ধর্ম্মের পুত্র আগুন জ্বালাইয়া কাষ্ঠ খণ্ড গুলি দগ্ধ করিল, কাঠ পুড়িয়া কৃষ্ণবর্ণ হইল।

"এখন এই এক এক খণ্ড কাষ্ঠ অর্দ্ধেক খানি মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত কর।"

ধর্ম্মের পুত্র দগ্ধ কাষ্ঠগুলি মাটিতে অর্দ্ধাবধি পুতিলেন।

এই যে পাহাড়ের নীচে নদী দেখিতেছ উহা হইতে মুখের মধ্যে করিয়া জল লইয়া আইস। যেমন স্ত্রীলোককে শিক্ষা দিয়াছিলে তেমন এই প্রথম দগ্ধ কাষ্ঠে জলসেক কর, যেমন চক্রনির্ম্মাতাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলে তেমন এই দ্বিতীয় দগ্ধ কাষ্ঠে জলসেক কর, যেমন রাখালদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলে তদনুরূপ ঐ তৃতীয় দগ্ধ কাষ্ঠে জলসেক কর। যখন তিনখানি দগ্ধ কাষ্ঠে জীবন সঞ্চার ও পত্রোদ্গম হইবে, এবং ইহার তিনটি সেও বৃক্ষে পরিবর্ত্তিত হইবে তখন জানিবে কিরূপে অমঙ্গল বিনাশ করিতে হয়, তখন তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।" বৃদ্ধ এই বলিয়া নিজের কুটীরে ফিরিয়া গেলেন। ধর্ম্মের পুত্র অনেক চিন্তা করিয়াও তাহার কথার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে পারিলেন না। যাহা হউক বৃদ্ধ যেমন আদেশ করিয়াছিলেন সেইরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ধর্ম্মের পুত্র নদীর জল মুখে করিয়া আনিয়া দগ্ধ কাষ্ঠে সেচন করিতে লাগিলেন। বার বার এইরূপ যাতায়াত করিয়া তিনখানি দগ্ধ কাষ্ঠই জলসিক্ত করিলেন। পরে তিনি শ্রান্ত ও ক্ষুৎার্ত্ত হইয়া কিছু আহারের জন্য বৃদ্ধের কুটীরে উপবেশন করিলেন। দরজা খুলিয়া দেখিলেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসীব মৃত্যু হইয়াছে। ধর্ম্মের পুত্র চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন, কিছু শুষ্ক রুটী পড়িয়া আছে, তাহাই খাইলেন। পরে এক খানি কোদাল খুজিয়া লইয়া বৃদ্ধকে সমাধি দিবার জন্য মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। সারা রাত্রি জল আনিয়া দগ্ধ কাষ্ঠে সেচন করেন, সারাদিন মৃত্তিকা খনন করেন, এইরূপ চলিতে লাগিল। যে দিন কবর প্রস্তুত হইল সে দিন দেশ হইতে বৃদ্ধের জন্য আহারীয় দ্রব্য লইয়া কতক গুলি লোক আসিল। তাহারা যখন শুনিল যে বৃদ্ধ ধর্ম্মের পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজের স্থান অধিকার করিতে বলিয়া গিয়াছেন, তখন তাহারা বৃদ্ধকে সমাধিস্থ করিয়া ধর্ম্মের পুত্রের জন্য রুটী রাখিয়া চলিয়া গেল; বলিয়া গেল যে আবার তাহার জন্য আহার্য্য আনিবে।

ধর্ম্মের পুত্র সন্ন্যাসীর কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন, লোকেরা যাহা আনিয়া দিত তাহা খাইতেন, এবং সন্ন্যাসীর আদেশমত মুখে করিয়া জল আনিয়া দগ্ধ কাষ্ঠে সেচন করিতেন। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার যশ চারিদিকে বিস্তৃত হইল। তিনি যে মুখে করিয়া জল আনিয়া দগ্ধ কাষ্ঠে সেচন করেন, সে কথা সকলে বলাবলি করিতে লাগিল; অনেক লোক তাহার নিকটে আসিতে লাগিল। বড় বড় সওদাগর তাহার কাছে আসিয়া তাহাকে ডালি দিয়া যাইত। তিনি নিজের জন্য যাহা নিতান্ত আবশ্যক কেবল তাহাই রাখিয়া

অবশিষ্ট দ্রব্যজাত দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন।

এই রূপে দিন যাইতে লাগিল। অর্দ্ধেক দিন মুখে করিয়া জল আনিয়া দগ্ধ কাষ্ঠ সিক্ত করেন, তাহার অপরার্দ্ধেক বিশ্রামে ও সকলের সহিত সাক্ষাৎকারে অতিবাহিত হয়। তাহার মনে হইতে লাগিল যে, এইরূপ জীবন যাপন করিতেই তাহার প্রতি আদেশ হইয়াছে। এই রূপেই তিনি অমঙ্গল ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল, ইতিমধ্যে এমন এক দিন নাই যে দিন তিনি দগ্ধ কাষ্ঠে জলসেক করেন নাই, অথচ একটীতেও জীবন সঞ্চার হইল না।

একদিন তিনি কুটীরে বসিয়া আছেন এমন সময় শুনিলেন বাহিরে কে ঘোড়ায় চড়িয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। কে দেখিবার জন্য কুটীর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, দেখিলেন একটি উৎকৃষ্ট অশ্বে, মূল্যবান জিন, তদুপরি একজন বলিষ্ঠ যুবা পুরুষ উপবিষ্ট। তাহার পরিধানে অতি সুন্দর পোষাক। ধনীর পুত্র তাহাকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" "কোথায় যাইতেছ?"

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত ভূপাল রাজ্য একটি মিত্র রাজ্য। এই রাজ্যের শীর্ষস্থলে একজন মহামান্যা মহিলা আছেন। যাঁহাকে সচরাচর ভূপালের বেগম অর্থাৎ ভূপালের রাণী বলা হইয়া থাকে। পারস্যে বেগম শব্দের অর্থ সম্ভ্রান্ত মহিলা। ভূপালের বেগম বোর্কা নামক অবগুণ্ঠন বিশেষে আচ্ছাদিত হইয়া দিল্লির দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রজাহিতকর নানা সৎকার্য্যে মুক্তহস্তা। বেগম স্বরাজ্যে একটি বৃহৎ স্ত্রীশিল্পবিদ্যালয় স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেই বিদ্যালয়ে ভদ্র পরিবারের অনাথা দারিদ্র্যদশাপন্ন মহিলাগণ নানা বিষয়ে শিল্প কার্য্য শিক্ষা করিয়া অনন্যসাহায্যপ্রার্থিনী হইয়া নিজেদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন ইহাই বেগম মহোদয়ার উদ্দেশ্য। তাঁহার সাহায্যে ভূপাল রাজ্যে একটি বালিকাবিদ্যালয়ের কার্য্য কয়েক বৎসর চলিতেছে। তিনি স্ত্রীশিক্ষা রীতিমত প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আলিগড় শিক্ষা সমিতিকে এক কালীন ৩৪ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ফাদার লাফোঁ এক সময়ে মহিলাদিগের সভাতে বক্তৃতা দান কালে এরূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্যগণের নিকটে তিনি কেশবচন্দ্রের নারীজাতির শিক্ষাপ্রণালী উপস্থিত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় যে তিনি একমাত্র তাহার সপক্ষ ছিলেন, কাজে কাজে স্ত্রী শিক্ষা প্রণালী অন্যরূপ শ্রীধারণ করিল। তাঁহার মতে স্ত্রী পুরুষের তুল্য রূপ শিক্ষা কিছুতেই সমুচিত নয়। নারীগণ যাহাতে উত্তম মাতা উত্তম কন্যা উত্তম ভগিনী হন তাঁহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষাদান সমুচিত।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

রোগীর শুশ্রূষা।*

রোগীর প্রতি শুশ্রূষা কারিণীর কর্ত্তব্য তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম কর্ত্তব্য রোগীর সাধারণ বন্দোবস্ত করা, যেমন বিছানা ঘর ইত্যাদি পরিষ্কার করা ও রোগীর অন্যান্য অভাব দূর করা, স্বচ্ছন্দতার জন্য রোগীর গা মুছাইয়া দেওয়া বা বাতাস করা।

দ্বিতীয়। রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করা, ও চিকিৎসক আসিলে উহা তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করা।

তৃতীয়। রোগীকে ঔষধ সেবন করান। ঔষধ সেবন করান সম্বন্ধে তিনটি বিষয় জানা খুব দরকার। প্রথম ঔষধ সেবনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতি Nurseএর বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর যে সময়ের কথা চিকিৎসক নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহা শিশির গায়ে লেখা থাকে। চিকিৎসক ঔষধ সম্বন্ধে যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, কম্পাউণ্ডার যখন ঔষধ দেন তখন সেইটি শিশির গায়ে লিখিয়া দেন।

দ্বিতীয়। ঔষধ প্রয়োগ প্রণালী। নানা উপায়ে ঔষধ সেবন করাইবার ব্যবস্থা আছে।

তৃতীয়। ঔষধের পরিমাণের প্রতি Nurse এর বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। এই তিনটি বিষয়ই শিশির গায়ে, বা পুরিয়ার বা কৌটার উপর লেবেলে লেখা থাকে।

শিশি, পুরিয়া বা কৌটার উপর যে Direction লেখা থাকে, যখন ঔষধ খাওয়ান হবে তখন সেইটি বিশেষ করিয়া পড়িয়া তবে ব্যবহার করা উচিত। কারণ অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে ভুলক্রমে মালিসের ঔষধ রোগীকে খাওয়ান হইয়াছে, এবং ভুলের জন্য রোগীর প্রাণ সংশয় পর্য্যন্ত হইতে পারে। Nurse যখনই ঔষধ দিবেন লেবেল খানি ভাল করে পড়ে দেখ্‌বেন। যেমন ১ দাগ প্রত্যেক ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর যেমন লেখা থাক্‌বে Nurse প্রথম সেইটি দেখ্‌বেন, তারপর দৈনিক তালিকায় দেখ্‌বেন কখন ঔষধ খাওয়ান হইয়াছে, এবং সেই

---

* ১৯০২ শক ১৬ই জুন ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ে ডাক্তর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে ঔষধ খাওয়াইবেন, এবং পুনরায় তাহা তালিকাতে লিখিয়া রাখিবেন। ঠিক সময়ে যাতে ঔষধ খাওয়ান হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। তবে ঠিক সময়ের জন্য রোগীকে বিরক্ত করিয়া ঔষধ খাওয়ান কখন দরকার হয় এবং কখন না হয় সে বিষয় Nurse এর বিশেষ বুদ্ধির দরকার। সাধারণতঃ রোগীর ঘুম ভাঙ্গান খুব খারাপ। সচরাচর সাধারণ রোগে ঘুম ভাঙ্গিয়ে ঔষধ খাওয়ান দরকার হয় না বরং যাহাতে রোগির ঘুমের ব্যাঘাত না হয় সে দিকেই দৃষ্টি রাখা উচিত। কিন্তু যখন অসুখ খুব বেশী এবং রোগীর অবস্থা খারাপ তখন যদি রোগী ঘুমুচ্ছে বলে Nurse চুপ করে থাকেন তবে বড় ভয়ানক হয়, এই খানেই বুদ্ধির প্রয়োজন। এবং চিকিৎসক কোন্ অবস্থায় ঘুমের ব্যাঘাত করিতে বলিয়াছেন বা বলেন সে বিষয় মনোযোগ দিয়া শোনা দরকার। সচরাচর পরিমাণ সম্বন্ধে শিশির গায়ে দাগ দেওয়া থাকে বা পুরিয়া ও বড়ি করা থাকে, সেখানে পরিমাণ সম্বন্ধে Nurse এর জ্ঞানের দরকার করে না। কিন্তু অনেক সময় ঔষধের পরিমাণ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা খুব দরকার হয়। সচরাচর ঔষধাদি মাপিতে যে ওজন ব্যবহার হয় সে গুলি জানা খুব দরকার। ঔষধাদি মাপিতে ছোট সূক্ষ্ম নিক্তি ব্যবহার হয়, সবচেয়ে কম মাপ হচ্চে এক গ্রেণ. পিতলের ছোট ছোট টুকরো এই গুলি ওজনের পরিমাণ এগুলির গায়ে কোনটির কত খানি ওজন লেখা আছে, সবচেয়ে ছোট ওই এক গ্রেণ ৬০ গ্রেণে এক ড্রাম হয়, ৮ ড্রামে এক আউন্স, ১৬ আউন্সে এক পাউণ্ড। সবচেয়ে ক্ষুদ্র ওজনের পরিমাণ গ্রেণ। গুঁড় বা Powder ঔষধের পরিমাণ সম্বন্ধে এই ওজন ব্যবহৃত হয়। আর জলীয় ঔষধ ওজনের সবচেয়ে কম পরিমাণ হচ্ছে এক ফোটা তবে ফোঁটা ঢালিতে গেলে একটি কম বা বেশী হইতে পারে সেই জন্য তারও ঠিক মাপ আছে, ফোঁটার পরিমাণের জন্য এই ছোট এক রকম গ্লাস আছে, ইহাকে Minim glass বলে। One minim হচ্ছে তরল পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্র মাপ, One minim প্রায় ১ ফোঁটার ওজনই হয়। ১ ফোঁটার ওজন ১ গ্রেণ তবে দ্রব্যভেদে কখনও একটু আলাদা হয়। ৬০ ফোঁটায় এক ফ্লুইড ড্রাম হয়, ৮ ফ্লুইড ড্রামে এক আউন্স। ২০ আউন্সে এক পাইন্ট। দুই পাইন্টে এক সেরের একটু বেশী হয় ঔষধাদি সম্বন্ধে এই মাপ। আর বাঙ্গলা মাপ সের পোয়া ছটাক ইত্যাদি তা সকলেই জানেন। সচরাচর ১৬ আউন্সে আধসের ও ৩২ আউন্সে এক সের হয়।

ঔষধের ঐ সকল পরিমাণ বেশ জানা উচিত এ ছাড়া আবার অনেক সময় শিশির গায়ে লেবেলে লেখা থাকে এক Tea Spoonful বা Dessert খাওয়াইতে হইবে।

Tea Spoonful মানে চায়ের চামচের এক চামচ কি সকল চামচ সমান না হতে পারে একটু কম বেশী হতে পারে, ঠিক এক Tea Spoonful এর ওজন হচ্ছে ১ ফুলুইড-ড্রাম। দুই ফুলুইড ড্রামে এক Dessert Spoonful হয় আর ৪ ফুলুইড ড্রাম বা আধ আউন্সের এক Table Spoonful হয়। এই একরকম

চামচ পাওয়া যায় এই একখানি রাখিলে খুব সুবিধা হয়, এই চামচে প্রত্যেক পরিমাণে মাপ অনুসারে এক একটী দাগ করা থাকে যেমন প্রথম Tea Spoon মাপে একটী দাগ তার পর Desert Spoon এর দাগ থাকে। সুতরাং এই একখানি চামচ থাক্‌লে সব মাপ পাওয়া যায়। এ ছাড়া ডাক্তারেরা বলেন এক Tea cup Breakfast cup বা এক Tumbler ঔষধ বা পথ্য খাওয়াইবে, এই পরিমাণ পথ্যেতেই দরকার হয়। সাধারণতঃ এক Tea cup মানে এক চায়ের পেয়ালা কিন্তু আজ কাল পেয়ালা নানা রকম হয়েছে। সুতরাং ঠিক এক cup এর ওজনটা জানা উচিত। ৫ আউন্সে এক Tea cup হয়, ৮ আউন্সে এক Breakfast cup আর ১০।১২ আউন্সে এক Tumbler এর ও [illegible]ন হয়। ঔষধ পথ্যাদি ব্যবহার করিতে হইলে এই সকল ওজন বিশেষ করি[illegible] জানা দরকার।

প্রথম ঔষধ খাওয়াইবার সময় ও পরিমাণ জানা তার পর ঔষধ প্রয়োগ প্রণালী জানা চাই।

শিশির গায়ে Mixture পুরিয়ার উপর powder বা pill বলে লেখা থাকে। ঔষধের আকারের ভিন্নতা অনুসারে সেবনের নিয়মেরও বিভিন্নতা আছে যেমন m x ure তরল পদার্থ সাধারণতঃ গ্লাসে ঢালিয়া রোগীর মুখে দেওয়া হয়, কিন্তু যদি উহা তিক্ত বা কোন কটু স্বাদযুক্ত হয় তবে খাওয়াইবার সময় একটু বুদ্ধির দরকার। তত ঔষধ যত গলার ভিতরে ঢালিয়া দেওয়া যায় ততই ভাল, জিহ্বাতে যাহাতে না লাগে তাহাই করা উচিত, সুতরাং Measure বা glass Feeding cup এ করিয়া একেবারে গলার ভিতর ঢালিতে হইবে। বিশেষতঃ ছোট ছেলেদের তিক্ত ঔষধ খাওয়ান কঠিন হ'য়ে পড়ে সেখানে একটু নিপুণতা প্রয়োজন। যাহা খাওয়াইলে কোন অনিষ্ট হইতে পারে না যেমন হরিতকী ইত্যাদি চিবাইয়া তারপর কুইনাইন খাইলে উহার তিক্ত স্বাদ বোঝা যায় না। ছোট ছেলেদের ঐরূপ করা দরকার হয়। পুরিয়া খাওয়ানতে একটু কষ্ট আছে, সাধারণ যে সকল ঔষধ জলে মেশে না তারই পুরিয়া করা হয় অনেকে পুরিয়া জলে গুলিয়া রোগীকে খাওয়াইতে যান কিন্তু তাতে অনেক ঔষধ নষ্ট হয় কারণ উহা জলে ভাল মেশে না, তা ছাড়া রোগীর সমস্ত মুখে লেগে যায় সবটা পেটে যায় না। মুখে একটু জল লইয়া তার উপর পুরিয়া ঢেলে দিলে ঐ জলের সঙ্গে উহা গিলিয়া ফেলে এইরূপ করাই সুবিধা তবে ছোট ছেলেরা মুখে জল রাখ্‌তে পারে না হয় গিলে ফেলে কিম্বা ফেলে দেয় সুতরাং উহাদের মধুর সঙ্গে পুরিয়ার ঔষধ মিশিয়ে খাওয়াইতে হয়। বড়ি ও পুরিয়ার মত খাওয়াই হয় তবে যদি বড়ি বড় হয়, গেলা না যায় তবে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এই রূপ আকার ভেদে প্রয়োগের প্রণালীও ভিন্ন। কতকগুলি ঔষধ আছে যাহা চক্ষে বা উহার নিকটস্থ কোন স্থানে লাগাইবার জন্য দেওয়া হয় যেমন প্রলেপ যাহাকে application বলে ইহা কেবল আস্তে আস্তে চক্ষের উপর লাগাইয়া দেওয়া হয়, আবার কতকগুলি আছে যে গুলি বিশেষ মর্দ্দন করিয়া দিতে হয় যেমন Liniment মলম বা Ointmen কেবল রংএর মত লাগান থাকে। সেই জন্য তাহাকে Panit বলে। আরও কতকগুলি ঔষধ

আছে যাহা চর্ম্মের উপর লাগাইতে হয় যেমন Plaster, Plaster অনেক রকম আছে যেমন Mustard Plaster বা Belladonna Plaster কোন কোন Plaster হয়ত ১০। ১৫ মিনিট বা আধ ঘণ্টা রাখা হয় আবার কোনটা হয়ত ২।১ দিন থাকে, সুতরাং এই গুলি কোনটার কতখানি সময় রাখতে হবে সেটা চিকিৎসকের নিকট ঠিক জানিয়া লওয়া উচিত।

অনেক সময় খুব গুঁড়ো Powder Puff এ করে ঘায়ে লাগাতে হয়। অনেক দ্রব্য আছে যাহা ধুমাকারে রোগীর গায়ে লাগাতে হয়, রোগীকে চেয়ারে বসাইয়া তার নীচে ধোঁয়া করে ঔষধ লাগানো, সচরাচর ধোঁয়া করিলেই রোগীর ঘাম হয় এবং ঐ ঘামের সঙ্গে ঔষধ শরীরে লাগিয়া যায়। অনেক ঔষধ কেবল মুখের ভিতরকার আবরণের জন্য দরকার হয়। নাকের ভিতর তুলি ক'রে ঔষধ দিতে হয়। কাণের ভিতর ঔষধ দিতে হইলে যদি তেলের মত তরল ঔষধ হয় তবে ফোঁটা ক'রে কাণে ঢেলে দেওয়া যায় কিন্তু যদি কোন রকম Powder হয় তবে একটা কাগজের সরু একটু লম্বা রকমে নল প্রস্তুত করিয়া তার ভিতর ঔষধ দিয়া কাণের ভিতর ফুঁ দিতে হয়। পিচকারী দিতে হলেও একটু শিক্ষার দরকার, কাণটা একটু নীচু করে সাবধানে দিতে হয় যেন ভিতরে জল ঢুকিয়া না থাকে। খালি পিচকারী দ্বারা জল টানিয়া বাহির করিতে হয়।

প্রলেপ Plaster প্রভৃতি ঔষধ স্থানীয় উপকারের জন্য লাগান হয়। তারপর সেই স্থান থেকে রক্তের সঙ্গে মিশে শরীরের ভিতর কাজ করে। বাহ্যিক প্রয়োগের এই সব নিয়ম তারপর মুখ দিয়ে পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া ঔষধ কাজ করে। গলায় বেদনাদি হইলে অনেক ঔষধ গরম অবস্থায় খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা হয় কারণ তাহাতে গলার বেদনারও খানিকটা আরাম হয় তারপর ভিতরে গিয়া রক্তের সহিত মিশিয়া কাজ করে। ঔষধ বা পথ্য কখন গরম খাওয়াইলে বা ঠাণ্ডা খাওয়াইলে রোগীর গিলিবার সুবিধা হইবে বা পেটে থাকিবে সে বিষয় Nurse এর বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। অনেক Mixture এ তৈলাক্ত পদার্থ থাকে তাহাকে তিক্ত mixture এর ন্যায় একেবারে রোগীর গলার ভিতর গালিয়া দেওয়া উচিত।

অনেক সময় নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নেবার জন্য অনেক ঔষধ দেওয়া হয়, তাহা রুমালে মাখাইয়া শুঁকিতে দেওয়া হয় বা গরম জলে মিশিয়ে Inhalation দেওয়া হয়। নিশ্বাসের সঙ্গে টানিবার জন্য যে ঔষধ দেওয়া যায় তাহা প্রায়ই উদ্বেয় হয় অর্থাৎ যে গুলি সহজেই বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়।

গলার ভিতর ঔষধ লাগাইতে হইলে বিশেষ নিপুণতার দরকার কারণ গলার ভিতর তুলি প্রবেশ করাইলেই বমনের উদ্বেগ হয় সুতরাং গলার ভিতর এত অল্পক্ষণের ভিতর লাগাতে হয় যে তাহাতে খুব নিপুণতার দরকার। সময় সময় গলার ভিতর তাপ দেবার দরকার, গলার ভিতর ঘা বা আলজিভ বাড়িলে Steam inhaler দিয়ে তাপ দিতে হয়। অনেক সময় ডাক্তারেরা ছোট এক রকম পিচকারী দ্বারা চামড়ার ভিতর দিয়া একেবারে রক্তের সঙ্গে ঔষধ মিশাইয়া দিয়া থাকেন, যেখানে খুব অল্প সময় অর্থাৎ ১ মিনিটের ভিতর ঔষধের উপকার দরকার হয়।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১০ম ভাগ] বৈশাখ, ১৩১২ ; মে, ১৯০৫। [১০ম সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

ঈশ্বরের কোমলগুণ, স্নেহ প্রেমাদি মাতৃভাব নারী প্রকৃতিতে প্রতিফলিত। নারী ধরাতলে পরম মাতার প্রতিনিধি। যে নারীতে কোমল ভাবের অভাব তিনি অস্বাভাবিক জীব; যাঁহাতে সেই স্বর্গের কোমল গুণ প্রস্ফুটিত, তিনি দেবী।

যে নারী স্বামীর প্রতি পুত্র কন্যাদির প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ ও কটূক্তি করে, আত্মীয় প্রতিবেশীদিগকে জঘন্য অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়, ক্রোধ ও অহঙ্কারের ভীষণ বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৃহকে কোলাহল ও অশান্তির আলয় করে, সেই নারী দানবী, তাহাকে দেবী কে বলিতে পারে? নগরে ও পল্লীতে ঈদৃশী নীচ প্রকৃতি শত শত নারী বিদ্যমান; লোকে তাহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করে না, তাহাদের নিকটে যাইতে ভয় পায়।

কল্যাণি, তোমার কোমলভাবে যেন লোকের কঠিন হৃদয় কোমল হয়, তোমার প্রীতিমধুর বাক্যে যেন সকলের মন অমৃতসিক্ত হয়, তোমার পুণ্য প্রেমে রঞ্জিত প্রফুল্ল বদন দেখিয়া লোকের মনে যেন পবিত্র আনন্দের সঞ্চার হইতে থাকে। দুঃখীর প্রতি যেন তোমার দয়া সর্ব্বাগ্রে ধাবিত হয়, পরসেবায় যেন তোমার হস্ত প্রসারিত থাকে। বিনয় লজ্জা কোমলগুণের অঙ্গীভূত, তোমার মুখমণ্ডলে নেত্রযুগলে কথায় ও কার্য্যে তাহা যেন প্রস্ফুটিত হয়। তুমি পরম জননীর সতী সুকন্যা হইয়া ধন্য হও, তোমাকে দেবী বলিয়া সকলে ভক্তি করুক, তুমি দুঃখী জনের প্রাণে শান্তি ও আনন্দদায়িনী হও, সকলের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হও, পরম জননীর আজ্ঞাধীনা পদাশ্রিতা কন্যা হইয়া জন্ম সার্থক কর, দীনা মহিলার ইহাই প্রাণের আকিঞ্চন।

পারিবারিক ভজন ও ভোজন।

হিন্দু পরিবারে ভজনে বা ভোজনে স্ত্রী পুরুষ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের পরস্পর যোগ প্রায় দৃষ্ট হয় না। এক এক জন স্বতন্ত্রভাবে ভজন অর্থাৎ আহ্নিক পূজাদি করেন। বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে পরিবারস্থ দুই একজন বৃদ্ধ বৃদ্ধা ব্যতীত অপর কেহ বড় একটা আহ্নিক পূজার ধার ধারে না। কাহারও কাহারও আবাসে লক্ষ্মী নারায়ণ ও রাধা গোবিন্দাদি পারিবারিক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে; বেতনভোগী পূজারি ব্রাহ্মণ আসিয়া নিত্য সেই সকল ঠাকুরের পূজা করিয়া যায়; গৃহস্থ ও গৃহিণী পুষ্প চন্দন তণ্ডুল শর্করাদি পূজোপকরণ যোগাইয়া থাকেন। এইরূপ মাত্র পারিবারিক দেবার্চ্চনাদির ব্যবস্থা। বৎসরান্তে যে পরিবারে দুর্গোৎসব হয়,দশমীর দিন পরিবারস্থ সকলে একত্র মিলিত হইয়া দুর্গাপ্রতিমার উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, এবং প্রার্থনাদির মন্ত্র সমস্বরে পড়েন। এই মাত্র পারিবারিক সম্মিলিত ভজন হয় বলা যাইতে পারে। কিন্তু পুরুষদের সঙ্গে পরিবারস্থ স্ত্রীলোকেরা এই কার্য্যে যোগদান করেন না, তাঁহারা ভিন্ন সময়ে স্বতন্ত্রভাবে তদ্রূপ দুর্গাদেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। প্রার্থনার মন্ত্র;—"ধনং দেহি বিত্তং দেহি পুত্রান্ দেহি দেহি মে।" অর্থাৎ আমাকে ধন দাও, বিত্ত দাও, এবং বহু পুত্র দান কর। আত্মরক্ষার বচন এই রূপ:—"মম নেত্রে রক্ষ রক্ষ, মম বাহু রক্ষ রক্ষ, মম পাদৌ রক্ষ রক্ষ ইত্যাদি।" অর্থাৎ তুমি আমার নেত্রযুগল রক্ষা কর, আমার বাহুযুগল রক্ষা কর ও আমার পদদ্বয় রক্ষা কর ইত্যাদি।" বাল্য কালে আমরা এই প্রকার ধনপুত্রাদিলাভে ও আত্মরক্ষার জন্য প্রার্থনাবচন পুরোহিত ঠাকুরের মুখে শ্রবণ করিয়া পড়িয়াছি। পরে যৌবনকালে সহধর্ম্মিণী তাহাতে যোগ দেন না, আমরাও তাঁহার অনুসরণ করি। তজ্জন্য সস্ত্রীক হিন্দু সমাজ হইতে তাড়িত হওয়ার সূত্রপাত হয়।

হিন্দু পরিবারে স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলে একত্র মিলিয়া ভোজন করেন না। তাহাদের স্বতন্ত্রভাবে ভোজন হয়। শিশু বালক বালিকাগণ অনেক সময় একত্র ভোজন করে, কিন্তু প্রায়ই স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া স্বতন্ত্র ভোজ্য পাত্রে ভোজন করিয়া থাকে। পরিবারস্থ, অনেক পুরুষ এক সময়ে এক গৃহে বসিয়া স্বতন্ত্র ভোজ্য পাত্রে ভোজন করেন। গৃহিণী সকলে ভোজন হইলে পর একাকী বা দুই একটী পুত্রবধূ বা কন্যা সঙ্গে করিয়া সেইরূপ ভাবে আহার করেন। ইয়ুরোপীয় সভ্যলোকদিগের অনুকরণে হিন্দু পরিবারস্থ সকলের একত্র ভোজন হয় না। হিন্দু সমাজের যেমন নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ভিন্ন ভিন্ন পূজা পদ্ধতি, তদ্রূপ প্রায় সকল বিষয়ে তাঁহাদের ভিন্নতা লক্ষিত হয়, একতার বড় অভাব। একান্নভুক্ত এক পরিবারেও পরস্পর ভাবের যোগ ও কার্য্যের যোগ নাই।

মোহম্মদীয় ধর্ম্ম একতার ধর্ম্ম মোহম্মদীয় সম্প্রদায় স্বকীয় ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের মধ্যে সকল বিষয়ে পরস্পর ঐক্যস্থাপনে

ব্যস্ত, তাঁহারা একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসক। কিন্তু পরিবারস্থ নারীগণ নিত্য পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হইয়া নমাজ পড়েন, ধর্ম্ম কর্ম্মাদি করেন আমরা এরূপ তো বড় শুনিতে পাই না। তাঁহাদের শাস্ত্রে এইরূপ বিধি আছে, ভজনালয় (মস্‌জেদে) পরিণত বয়স্ক পুরুষগণ নমাজ পড়িবার সময় প্রথম শ্রেণীতে যুবকগণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে বালকগণ তৃতীয় শ্রেণীতে বালকদিগের পশ্চাদ্ভাগে নারীগণ দণ্ডায়মান হইবেন। এইরূপ বিধি শাস্ত্রে পড়া গিয়াছে মাত্র, কিন্তু ইহা কোথাও এদেশে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, জানি না, সাধারণ মস্‌জেদে দূরে থাকুক পারিবারিক মস্‌জেদেও পরিবারস্থ সকল স্ত্রী পুরুষের যোগ হয়, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে মক্কা মদিনায় হয়তো এই বিধি প্রতিপালিত হইতেছে, সম্ভবতঃ মহিলাগণ বোর্কা পরিধান করিয়া মস্‌জেদে উপাসক পুরুষদিগের শেষ শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীমিলিত হইয়া নমাজ পড়েন এইরূপ সকল পরিবারে ঘটিয়া থাকে কি না সন্দেহ। ভদ্র মোসলমান পরিবারস্থ পুরুষগণ মিলিত হইয়া একত্র ভোজন করেন ইহা সচরাচর লক্ষিত হয়, কিন্তু সেই ভোজনে মহিলাদের যোগ থাকে কে বলিতে পারে? মহাপুরুষ মোহম্মদের দ্বিতীয় স্থলাভিষিক্ত (খলিফা) ওমর ফারুকস সম্রাট ছিলেন। তিনি নিজের নিম্ন শ্রেণীস্থ অনুচরদিগের সঙ্গে পর্য্যন্ত এক পাত্রে ভোজন করিতেন।

ইয়ুরোপীয় খ্রীষ্টবাদী সভ্য পরিবার সকলে সাধারণতঃ প্রতিদিন স্ত্রী পুরুষ মিলিত হইয়া একত্র ঈশ্বরোপাসনা শাস্ত্র পাঠ ধর্ম্মচর্চ্চাদি না করিলেও ধার্ম্মিক পরিবার মধ্যে নিত্য প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠাদি হইয়া থাকে, তাহাতে পরিবারস্থ প্রায় সকলেই যোগ দান করেন, রবিবার দিন সাধারণ ভজনালয় গিরজায় পরিবারের সকল লোক বালক বালিকা পর্য্যন্ত যাইয়া যোগদান করিয়া থাকে। নিতান্ত নিরীশ্বর নাস্তিক পরিবারের লোকেরাই তদ্বিষয়ে বিমুখ।

স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগিনী সকলের মিলিতভাবে উক্ত সভ্য জাতির মধ্যে নিত্য পারিবারিক ভোজন হয়, এ বিষয়ে সকল পরিবারেই দৃঢ়তা, সেই পারিবারিক ভোজনে অনেক সময় ব্যয় হইয়া থাকে। ভোজনের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ হাসি গল্প (Table Talk) হয়। ভোজন গৃহটি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত হইয়া থাকে। কেবল ডাইনিংরুমের জাঁক জমক কিন্তু প্রেয়াররুম অনেক পরিবারে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা বুঝা যায় পরিবারস্থ লোক সকল শরীরপ্রিয়, না আত্মানুরাগী।

বিশ্বাসী ব্রাহ্ম পরিবারে পারিবারিক উপাসনালয় আছে। সেখানে উপাসক উপাসিকাদিগের নিত্য উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন, সঙ্গীত পুস্তক ও উপাসনাসংক্রান্ত অন্য পুস্তকাদি রক্ষিত হয়; নবজাত পুষ্প পল্লবাদিতে উক্ত দেবালয়ের শোভা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। স্নানান্তে গৃহস্বামী বা পরিবারভুক্ত অন্য কোন জ্যেষ্ঠজন নিষ্ঠা-

পূর্ব্বক প্রণালী অনুসারে উপাসনা করেন, পরিবারস্থ সকল স্ত্রী পুরুষ তাহাতে যোগ দিয়া থাকেন। ইহা স্বর্গের দৃশ্য। গৃহস্বামী ও গৃহিণীর নিত্য উপাসনানিষ্ঠায় বালক বলিকাদিগের অন্তরে ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা হয় ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা পরিবারের অশেষ কল্যাণ হয়। অপর অনেক ব্রাহ্ম পরিবার আছে, সেই পরিবারস্থ লোকদিগের তাদৃশী উপাসনা-নিষ্ঠা নাই, কেহ কেহ স্বতন্ত্রভাবে উপাসনা করেন, কেহ কেহ একেবারে উপাসনা করেন না। নির্দ্দিষ্ট উপাসনালয়ও নাই; এই গুরুতর বিষয়ে তাঁহাদের অত্যন্ত শিথিলতা। অন্য এক শ্রেণীর ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা আছেন, তাঁহারা সকল বিষয়ে সাহেব বিবীদের অনুকরণ করিয়া চলেন। Dining Room এ সাহেব বিবীদের অনুকরণ পূর্ণমাত্রায় হয়। তাঁহাদের পরিবারে উপাসনার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। বাজে গল্প (Table Talk) ছাড়া সৎপ্রসঙ্গাদির অবকাশ নাই। ভোজন পান বেশ ভূষা বাহিক ক্রীড়া আমোদেই তাঁহাদের কাল যাপন হয়। বালক বালিকারা জননীর নিকটে ধর্ম্মের উচ্চ দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হয় না, নীতিশিক্ষা লাভ করে না; নিতান্ত শরীরপ্রিয় আমোদপ্রিয় হইয়া উঠে, ঈশ্বরনিন্দা, ভক্তনিন্দা করিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

বঙ্গদেশে অপর এক শ্রেণীর সভ্যতম পরিবার আছে, সেই সকল পরিবারে বিলাতের নরনারীদিগের কেবল মন্দ আচরণের অনুকরণ হয় মাংসের সঙ্গে মদ্যও আদৃত হইয়া থাকে, তাঁহারা হিন্দু নহেন, ব্রাহ্ম নহেন, মোসলমান খ্রীষ্টানও নহেন। যখন যেরূপ সুবিধা বোধ করেন সেই অনুসারেই চলেন। সুবিধা হইলে পুতুল পূজা করিয়া হিন্দুমতে পুত্র কন্যার বিবাহ দেন, ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারেও অনুষ্ঠানাদি করিয়া থাকেন। সাহেব বিবীদিগের সঙ্গে এক টেবিলে খানা খান, বাড়ীতে মোসলমান বাবুর্চ্চি খানসামা। পূজার্চ্চনাদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, অথচ তাঁহারা হিন্দু ও সংস্কৃত হিন্দু বলিয়া আপনাদের পরিচয় দান করেন। হিন্দুরাও তাঁহাদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, হিন্দুয়ানির দুর্দ্দশার এক শেষ। বালকবালিকারা ধর্ম্মপুস্তকাদি পড়িতে পায় না, নভেল পড়াতেই তাহাদের পাণ্ডিত্য। তাহারা ইংরেজী অনর্গল বলে ও লিখে, মাতৃভাষার দুইছত্র লিখিতে বা পড়িতে তাহাদের গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়। মাতৃভাষা শিক্ষা দানে তাহাদের পিতা মাতা প্রয়োজন বোধ করেন না। এই সকল ভীষণ নিরীশ্বর বঙ্গীয় পরিবারসকলের বিষয় ভাবিতে আমাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে।

পরিবারের কর্ত্রী জননীর বা গৃহিণীর জীবনের বড়ই দায়িত্ব। ধার্ম্মিকা গৃহিণী ও জননী দ্বারাই পরিবারে ধর্ম্ম ও সুনীতি বদ্ধমূল হইয়াছে, বালক বালিকারা ধর্ম্ম ও সুনীতির পথে চলিয়াছে। মা, তোমরা সুমাতা সুগৃহিণী হইয়া চরিত্রে ধর্ম্মের উচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করিলে বঙ্গীয় পরিবারসকলের বিষম অধঃপতন অদূরে। কেবল পান ভোজন ও পরিচ্ছদের জাঁক জমকে না কাহারও চরিত্র হয়, না জীবন হয়,

ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া থাক, ধর্ম্মকে পুণ্যকে হৃদয়ে বরণ কর। বাহ্যিক আমোদের স্রোতে নিজবুদ্ধিতে না চলিয়া ভগবানের ইঙ্গিতে চালিত হও, সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল হইবে, ধন্য হইবে।

চীনে রমণীদের চরিত্র।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত ইন্দু মাধব মল্লিক এম্ এ বি এল চীন দেশ ভ্রমণ করিয়া তথাকার বৃত্তান্ত ক্রমশঃ বঙ্গবাসী পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে চীন দেশীয় রমণীদিগের চরিত্র ঘটিত কয়েকটী কথা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ;—

"অভিনয়ে পুরুষেই স্ত্রীলোক সাজে। এ সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা এতই বেশী যে, দশজনের সাম্‌নেও ষ্টেজের উপর নাচাইয়া প্রকৃতি দত্ত স্ত্রীমর্য্যাদার হানি করা চীনেরা বর্ব্বরতা মনে করে। অতি পবিত্র জিনিষ অপবিত্র করিয়া পবিত্রতার অবমাননা করা হয়। চীন দেশে বিস্তর নাট্যশালা আছে ও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তথায় বহু লোক গমনাগন করিয়া থাকে।"

"চীনদেশের স্ত্রীলোকের মত অমন শান্ত লজ্জাশীলা গম্ভীর প্রকৃতি রমণী আমি কোথাও দেখি নাই। আমাদের হিন্দুর চোখে বড়ই ভাল লাগে। তাঁহারা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন, যেখানে যখন ইচ্ছা যাতায়াত করিতে পারেন। অথচ আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের মত সমাজের অনেক বিষয়েই অধিকারে বঞ্চিত। * * * চীন দেশের স্ত্রীলোকের অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। সুধু চীন দেশে কেন সকল প্রাচীন দেশেই এই প্রথা ছিল। সেখানে শিশু কন্যা জন্মিলে সকলে দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়। প্রকাশ্যে শিশুকন্যা জলে ভাসাইয়া মারার প্রথা এখনও সম্পূর্ণ রদ হয় নাই। শিশু বিক্রয়তো প্রায়ই ঘটে। বিবাহ হইলে বধূকে শাশুড়ীর হাতে প্রাণ সমর্পণ করিতে হয়। তিনি মারিলে মারিতে পারেন, রাখিলে রাখিতে পারেন। স্বামীর স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার একটি কারণ শাশুড়ীর সহিত ঝগড়া, অপর কারণ বেশী কথা কহা। স্ত্রীলোক একবার বিধবা হইলে তাহার আর বিবাহ হয় না। তবে অপর পুরুষের সহিত বিবাহিতের মত থাকা চলে। সহমরণের প্রথাও প্রচলিত আছে। তবে আমাদের দেশে যেমন চিতারোহণে সহমরণ হয় সেরূপ নহে। এখানে সকলের সাম্‌নে গলায় দড়ি দিয়া মরাই প্রথা। একটি মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া গলায় দড়ি পরাইয়া দিয়া মঞ্চটি সরাইয়া দেওয়া হয়। আর সকলের চোখের সাম্‌নে উদ্বন্ধনে বিধবার প্রাণ যায়। তাহাতে দর্শকগণ ধন্য ধন্য করিতে থাকে। সেস্থানে একটি পবিত্র স্মৃতিস্তূপ গাঁথা হয়।"

"আমাদের দেশের সঙ্গে চীনের আচার ব্যবহার কতকটা মিলে। কেবল প্রভেদের মধ্যে চীন দেশে অবরোধ প্রথা বহু বিবাহ প্রচলিত নাই। এই বহু বিবাহ প্রথা কেন যে নাই, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না।'

আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(আদাইর ও শিলচর।)

আদাইর শ্রীহট্ট জিলায় অন্তর্গত পল্লী বিশেষ। আদাইয়ের অদূরস্থ পল্লী হরিপুর গ্রামে দুই একজন ব্রাহ্ম যুবা বাস করেন। তাঁহাদের এক জনের নাম শ্রীমান্ বিশ্বম্ভর পাল। তাঁহা কর্ত্তৃক আমরা আদাইরে যাইবার জন্য বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। গত ২৮শে পৌষ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩টার ট্রেণে আমরা কুমিল্লা হইতে আদাইরে যাত্রা করি। শ্রীমান্ আশুতোষ রায় আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় আমরা মণ্ডলা ষ্টেশনে উপস্থিত হই। সেই ষ্টেশন হইতে আদাইর পল্লী ন্যূনাধিক পাঁচ মাইল দূরে, আমাদিগকে পদব্রজে বা পাল্কীযোগে যাইতে হইবে। আমরা ষ্টেশনে পঁহুছিয়া দেখি আদাইরের যুবক জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী পাল্কী বেহারা সহ ষ্টেশনে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। গাড়ী হইতে অবতরণ মাত্র তিনি আমাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। একখানা পাল্কী মাত্র ছিল, তন্মধ্যে আমি উপবিষ্ট হইতে বাধ্য হইলাম, চন্দ্র কুমার বাবু ও প্রিয় আশুতোষ লণ্ঠনের আলোতে পদব্রজে চলিলেন। রাস্তা দুর্গম বন্ধুর, স্থানে স্থানে জল কাদা ছিল। আমি মজা করিয়া পাল্কীতে চড়িয়া চলিয়াছিলাম, কিন্তু বন্ধুদ্বয়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে সেই দুর্গম পথে চলিতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। তাহা ভাবিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইতেছিল। কি করিব আমি বয়োবৃদ্ধ নিমন্ত্রিত, আমি নাচার, বেহারাদের স্কন্ধে আমাকে না চড়িলেই নয়। তাঁহাদের তুল্যাবস্থাপন্ন হইতে চাহিলে তাঁহারা হইতে দিবেন না, জোর করিয়া আমাকে পাল্কীতে বসাইবেন। তাঁহাদের সঙ্গে রাত্রিকালে অতদূর দুর্গম পথ পদব্রজে চলিতে পারি আমার ক্ষমতাও কোথায়? যৌবনের বল ও উৎসাহে তাঁহারা ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় আমরা চন্দ্রকুমার বাবুর ভবনে উপস্থিত হই। চন্দ্রকুমার বাবুর পরিবার বুনিয়াদী বড় মানুষ, নানা কারণে সম্পত্তি নষ্ট হওয়াতে এক্ষণ তাঁহাদের তাদৃশী স্বচ্ছলাবস্থা নহে। বিগত ভীষণ ভূমিকম্পের অত্যাচারে বাড়ীর কোঠাঘর সকল অনেক ভগ্ন ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। তাহার আর ভাল রূপ পুনঃসংস্কার হইয়া উঠে নাই। চন্দ্র কুমার বাবুর বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত গোলকচন্দ্র রায় মহাশয় একজন ভক্ত বৈষ্ণব অতিশয় বিনীত স্বভাব। তিনি বিষয় সম্পত্তি কিছুই দেখেন না, কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রকুমার এবং চন্দ্র কুমার বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাবু রামকুমার রায়, ও খুড়তুতো ভ্রাতা যশোদাকুমার রায়ের প্রতি বিষয় সম্পত্তি রক্ষার ভার। গোলকচন্দ্র রায় গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের পূজার্চ্চনার আয়োজন ও পুষ্পচয়ন এবং সঙ্কীর্ত্তনাদিতে সময় যাপন করেন, নিজে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন রচনা করেন এবং দলের নেতা হইয়া গাহিয়া থাকেন। বাড়ীতে একজন বিক্রমপুরনিবাসী হোমিয়োপ্যাথি ডাক্তার আছেন, তাঁহার নাম

শ্রীযুক্ত রাজমোহন সেন। তিনি যুবা পুরুষ আমাদের সঙ্গে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। গৃহকর্ত্রী অর্থাৎ চন্দ্রকুমার বাবুর মাতা গৃহকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্মাদিতে সুনিপুণা। তন্মধ্যে নানা কারু কার্য্যযুক্ত হাত পাখা ও আনলা বিবিধ আকারের সিকা, সুপরির ঝাড় বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে,এইসকল শিল্প দ্রব্যের অনেক গুলি উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি। আশুতোষ দুইখানা সুন্দর পাখা আদায় করিয়াছেন, আমি এক খানা মাত্র পাইয়াছি। কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া ভিক্‌টোরিয়া কলেজের অন্তর্গত মহিলা সমাজে সেই সকল প্রাচীন রীতির শিল্প দ্রব্য প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করা গিয়াছিল। আমাদের কলিকাতাস্থ বাস কুটিরে উক্ত দ্রব্য সকল সাজান রহিয়াছে। কলিকাতা অঞ্চলে দেশীয় প্রাচীন শিল্প কর্ম্মাদির উন্নতি নাই, বরং উহা প্রায় বিলুপ্ত। এ দেশীয় নব্য মহিলাগণ বিবীদিগের নিকটে বিলাতী প্রণালীর বহুব্যয় সাধ্য শিল্প কর্ম্মাদি শিক্ষা করেন, তাঁহারা দেশীয় শিল্পাদির প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া থাকেন। বাঙ্গাল বলিয়া যাহাদিকে তাঁহারা অবজ্ঞা করেন, সুখের বিষয় তাঁহাদের দ্বারা জাতীয় শিল্প কর্ম্মের উন্নতি হইতেছে। আমাদের সভ্যতাভিমানী কুলীন মেয়েরা রন্ধনাদি কার্য্যে সেই বাঙ্গাল মেয়েদের নিকটে নিতান্তই পরাস্ত। বধূদিগের স্বহস্ত প্রস্তুত নানা বিধ ব্যঞ্জনোপকরণ ভোজন করা গেল, সকলই প্রশংসার্হ সুস্বাদু। বধূদিগের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ্চা আছে, চন্দ্রকুমার বাবুর পত্নী মহিলার গ্রাহিকা হইলেন। পর দিন (২৯ পৌষ শুক্রবার) হরিপুরে যুবক বন্ধু রাধাগোবিন্দ রায়ের বাড়ীতে মধ্যাহ্নিক ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল। গৃহিণী (রাধাগোবিন্দ বাবুর তরুণ বয়স্কা পত্নী) আমাদের জন্য ২৫। ৩০ প্রকার নিরামিষ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এমন অনেক প্রকার ব্যঞ্জন ছিল যে, পশ্চিম বঙ্গের গৃহিণীরা সে সকল রাঁধিতেই জানেন না। সুক্ত হইতে অম্বল পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যঞ্জন সুরস হইয়াছিল। ব্যঞ্জনাদির অধিক আড়ম্বরে একদিকে বড় দোষ, কোন্‌টা কতটুক খাইব জানিয়া ভোজনকর্ত্তা বিব্রত হইয়া পড়েন, পরে তাঁহার উদরে স্থান হইয়া উঠে না অতিরিক্ত ভোজনে অজীর্ণ দোষ ঘটে। হরিপুরের ভোজনে আমাদের সেই দশা ঘটিয়াছিল। রাত্রিতে আহার বন্ধ করা যায়, পরদিন মধ্যাহ্নে আমাদের লঘু পথ্য হয়। গৃহিণী গো দুগ্ধে উৎকৃষ্ট দধি ক্ষীর পায়সাদি চারি পাঁচ প্রকার উপকরণ গৃহে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আশুতোষ সুস্বাদু দধির মায়ায় বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বরভঙ্গ হয়, তিনি সঙ্গীত করিতে অক্ষম হন, পর দিন আর প্রভাতী সঙ্গীত করিতে পারেন নাই। হরিপুরের ভোজনে এই প্রকার বিভ্রাট ঘটিয়াছিল। "অতি ভোজনং রোগমূলম্" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা প্রত্যক্ষ ফলিয়াছিল। কাহাকে ভোজন করাইতে হইলে তাহার প্রতি দয়া করিয়া ভোজ্যোপকরণাদির ব্যবস্থায় গৃহিণীদের

সংযত হওয়া প্রয়োজন। ভোজনকর্ত্তারও রসনাপূজায় কিঞ্চিন্নিবৃত্তিমার্গাবলম্বন আব শ্যক করে।

২৯শে পৌষ শুক্রবার পৌষ সংক্রান্তি ছিল, প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া দেখি, পল্লীর বালক বৃদ্ধ তীব্রশীতকে উপেক্ষা করিয়া উক্ত জমীদার বাবুর ভবনের সম্মুখস্থ সরোবরে ঝুপ ঝাপ করিয়া পড়িয়া স্নান করিল, পরে সরোবর তটে পুঞ্জীভূত খড়ে অগ্নি উদ্দীপন করিয়া উত্তাপ গ্রহণ করিল, তৎপর দলবদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকা হস্তে ধারণপূর্ব্বক পল্লীময় সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইল,সমগ্রদিবাভাগ ও রাত্রি তিন চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত আদাইর ও হরিপুর কীর্ত্তনের ঘটা হইয়াছিল। শ্রুত হইল প্রতিবৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিন এই প্রকার মহাকীর্ত্তন হয়। আশুতোষও একতন্ত্রী হস্তে পল্লীবাসীদের দ্বারে দ্বারে উমাকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। অনেকে শ্রদ্ধা ও আগ্রহ সহকারে তাহা শ্রবণ করিয়াছিল। সেই দিন অপরাহ্ণ হরিপুরে শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণপ্রসাদ রায় চৌধুরীর ভবনে "সংসারে ধর্ম্ম সাধন" বিষয়ে বক্তৃতা হইবে বলিয়া নানা স্থানে বিজ্ঞাপন প্রচার এবং ভদ্রসম্ভ্রান্ত লোকদিগকে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। আমরা যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখি দুইশতের অধিক শ্রোতা উপস্থিত। প্রথমত চৌধুরী মহাশয়ের নিয়োজিত সুগায়ক শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন পাল "গাও হে তাঁহার নাম রচিত যাঁর বিশ্বধাম" এই ব্রহ্ম সঙ্গীতটি গান করেন। পর্য্যাপ্ত দধিভক্ষণে তখন পর্য্যন্ত আশুতোষের স্বরভঙ্গ হয় নাই, তিনিও কিছু গাহিয়াছিলেন। বক্তৃতা প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাপিয়া হইয়াছিল। বক্তৃতার পর স্থানীয় বৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বক্তাকে ধন্যবাদ দেন এবং বক্তৃতার পোষকতায় কিছু বলেন। হরিপুর কুমিল্লা জিলার এবং আদাইর শ্রীহট্ট জিলার সীমান্তবর্ত্তী পরস্পর সন্নিহিত গ্রাম। কৃষ্ণপ্রসাদ চৌধুরী হরিপুরের এক জন উদয়োন্মুখ ধনী বড় মানুষ, তিতাসনদীর তীরবর্ত্তী পুষ্পোদ্যানযুক্ত তাঁহার নূতন বৃহৎ ভবন দর্শক বৃন্দের চিত্তাকর্ষক। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু গোপী মোহন রায় চৌধুরী একজন উৎসাহী যুবা। আমরা তাঁহাদের শিষ্টালাপে অতিশয় সুখী হইয়াছি। বক্তৃতান্তে আমরা আদাইরে যাইয়া রাত্রি যাপন করি; পরদিন অপরাহ্ণে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে মণ্ডলা ষ্টেশনে যাইয়া বাষ্পীয় শকটারোহণে শিলচরে যাত্রা করা যায়।

আমরা পরদিন (২রা মাঘ রবিবার) প্রাতঃকালে আসাম গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন বঙ্গদেশের পূর্ব্বোত্তর সীমান্তবর্ত্তী শিলচর নগরে উপনীত হই। তত্রত্য ব্রাহ্ম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন দত্ত এবং ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দত্ত ষ্টেশনে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমরা ডাক্তার সুরেন্দ্র নাথের আবাসে যাইয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করি। শিলচরে আমরা অনেক বার গিয়াছি, এবার তথায় এক দিন মাত্র বাস করা আমাদের সঙ্কল্প ছিল। তথাকার বন্ধুদিগের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইল, কিছু

কিছু কাজও করা গেল। পরদিন শিলচরের কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী ক্ষেত্রের দ্বার খোলা হইবে। নগরবাসী সমুদায় ভদ্রলোক উক্ত প্রদর্শনী মেলার কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত, ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ মেলা কমিটীর একজন মেম্বর ছিলেন। দর্শকদিগের জন্য ফ্রিটিকিটের ব্যবস্থা ছিল। বিকালে সুরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে মেলা ক্ষেত্র প্রদর্শন করিতে লইয়া যান। তখন প্রদর্শনী মঞ্চে সমুদায় দ্রব্যজাত সজ্জিত হয় নাই। যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাতেই আমাদের অতিশয় আনন্দ হইয়াছিল। দুরন্ত অসভ্য লুসাই স্ত্রী পুরুষের প্রস্তুত বিবিধ কারুকার্য্য যুক্ত নানা প্রকার ঘাস্কেট, এবং তাহাদের বাসগৃহের ক্ষুদ্র আদর্শ, নৃত্যকারিণী মেয়েদের চূড়াকৃতি শিরোভূষণ ও বিবিধ আকারের বস্ত্র এবং কার্পাসপুঞ্জে নির্ম্মিত পেরি নামক শয্যা ইত্যাদি দর্শনযোগ্য বস্তু ছিল। শ্রীহট্ট হইতে আনীত মূল্যবান্ শীতলপাটী এবং বংশনির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর চেয়ার বিশেষ প্রশংসার্হ ছিল। এক খানা পাটীর মূল্য ৫২৲ টাকা ছিল, বাঁশের চেয়ারের মূল্য তদনুরূপ হইবে। শ্রীহট্ট ও কুমিল্লা অঞ্চলের মহিলাদিগের প্রেরিত অনেক সুন্দর সুন্দর শিল্প দ্রব্য এক স্থানে সজ্জিত ছিল। এক স্থানে একটী মৃণ্ময় বাদ্যশঙ্খ দৃষ্ট হইল, উহা দৃশ্যে প্রকৃত শঙ্খ সদৃশ, শব্দও নাকি তদনুরূপ। এক খানি পোষ্টকার্ডে মদন মোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা পুস্তক খানি লিখিত আছে দৃষ্ট হইল, তথাপি সেই পোষ্টকার্ড খানার ৪র্থাংশ স্থানে শূন্য; পাঠিকা বুঝিতে পার কিরূপ ক্ষুদ্রাক্ষরে তাহা লিখিত হইয়াছে। তাহা আমাদের ন্যায় বৃদ্ধ পুরুষের পড়িবার জন্য অণুবীক্ষণের প্রয়োজন। শুনিলাম দুই জন সূত্রধর হারমোনিয়ম প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছিল। ময়লা মতির নানা প্রকার খেস মণিপুরী বস্ত্র, উৎকৃষ্ট ফল তরকারি শাক সব্জী, বিবিধ শস্য ও শত শত প্রকারের ধান্য প্রদর্শনী ক্ষেত্রে আনীত হইয়াছিল। পশু পক্ষী প্রভৃতিরও প্রদর্শন হইয়াছিল। নানা প্রকার নৃত্য গীত ও মল্লক্রিয়া হাতী ঘোড়ার দৌড় দর্শকবৃন্দের আমোদ বৃদ্ধি করিয়াছিল। এক জন বাঙ্গালী বাবু কদলী তরুর তন্তু এবং অন্য এক প্রকার বন্য উদ্ভিদ হইতে যে উৎকৃষ্ট সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে তাহার নমুনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সমুদায় উত্তম বস্তুর জন্য কিছু কিছু পুরস্কার নির্দ্দিষ্ট ছিল। শিলচরের সর্ব্বজনপ্রিয় উৎসাহী ডিপুটী কমিশনর এই প্রদর্শনীর প্রবর্ত্তক। চা বাগিচার অনেক সাহেব এই ব্যাপারে বাঙ্গালি বাবুদের সঙ্গে মিলিত হইয়া উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং প্রদর্শনী ক্ষেত্রে নানা প্রকার ভাল ভাল দ্রব্য পাঠাইয়াছেন। পরদিন ৩রা সোমবার প্রাতে আমরা বদরপুরে যাত্রা করি।

দাদামহাশয় ও নাতনী।

মাকড়সা।

সরলা। দাদামহাশয়, অনেক দিন হইল আপনি আমার সঙ্গে গল্প সল্প করেন নাই। আমি কিন্তু আজ ছাড়িব না; আমার জন্য একটু একটু সময় দিতে হবে।

আমি একটি কাজের ভার নিয়ে ফেলেছি, কিন্তু আপনার ভরসাই সে কাজের ভার নিয়েছি, আপনাকে আমায় সাহায্য করিতেই হইবে।

দাদামহাশয়। বেশ দিদিমণি, কি কাজের ভার নিলে? এবং আমার মত না জেনে আমার সহায়তা পাইবে কেমন করে মনে করিলে?

সরলা। আপনি যে আমায় খুব ভাল বাসেন, আর সকল ভাল বিষয়ে আমাকে উৎসাহ দেন, তাইতে আমার এত সাহস। কাল জ্ঞানদা দিদির বাড়ীতে বেড়াতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর রবিবাসরিক বিদ্যালয়ের আমাকে একজন শিক্ষয়িত্রী হইতে বলিলেন, তিনি আমাকে কত কষ্ট করে গান বাজনা শিলাই ও শিল্প কাজ শিখাইয়াছেন, আর আমায় এত ভালবাসেন যে, তাঁহার কথা না শুনিয়া থাকিতে পারিলাম না। মনে মনে জানি যে, যখন আপনি আছেন তখন আমার ভয় কি? ঠাকুরমা বলেন "খোটার জোরে মেড়া লড়ে।"

দাদা। বেশ আমি বড় খুসি হইলাম, তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব; কিন্তু আমি সেকালের লোক এখনকার উন্নতির স্রোত এত দ্রুত বেগে চলিয়াছে যে, আমি আর যোগ রাখিতে পারিতেছি না। এখনকার শিক্ষার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। এখনকার প্রণালীতে বালক বালিকাদের আগে বস্তু দেখাতে হয়, পরে তার ভাব বা বিষয় শিখাতে হয়। চতুর্দ্দিকস্থ বস্তু, স্থান জীব, জন্তু মনুষ্য ইত্যাদি বিষয় শিখাইয়া পরে অনুপস্থিত বিষয় ও দেশের কথা শিখাতে হয়, ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় হইতে মনোগোচর বিষয়ে লইয়া যাইতে হয়, এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া রবিবাসরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযোগী কতকগুলি বিষয় বলিব। তাহাতে তাহাদের চক্ষুকর্ণ ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মনের উৎকর্ষতা সাধিত হইবে, এবং তৎসঙ্গে ঈশ্বরের শিল্প কৌশল ও করুণার বিষয় তাহাদের মনে কিছু কিছু লাগিবে; এই শিক্ষার দ্বারা তাহাদের অনেক গুলি মনের সদ্‌গুণ ও ভাব বিকশিত হইবে। আচ্ছা বিষয় আরম্ভের পূর্ব্বে তুমি সেই গানটি গাও দেখি, তাঁর গুণে পূর্ণ জগৎ।—

সরলা হারমনিয়ম সহকারে গাহিল,

মূলতান—একতালা।

"তাঁর গুণে পূর্ণ জগত।

ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মহিমা, প্রকাশে জগত তাঁর মহিমার কণিকা।

যাঁহার করুণাবলে, বাঁচিতেছে ক্ষুদ্র কীট, ভুবনপালক, দয়াল, দুর্ব্বলবল, তিনি রাজরাজা।

চারিদিকে তাঁহার দয়া, তাঁহার করুণা বহিছে অনুক্ষণ শোণিতধারে, নিশ্বাস বায়ুতে; তাঁহার করুণা করে আনন্দ বিস্তার করে দান পরম জ্ঞান, পাপে ত্রাণ, তাপে শান্তিনীর।"

দাদা। দিদিমণি, এই সঙ্গীতটিতে এত কথা এত তত্ত্ব আছে যে, সে সমস্ত বলিলে ও লিখিলে কত কত বড় শাস্ত্র লেখা যেতে পারে। তোমার রবিবাসরিক ছাত্র ছাত্রীদের শিখাবার জন্য একটি ক্ষুদ্র

জীবের বিষয় বলিতেছি যে জীবটির নাম মাকড়সা বা ঊর্ণনাভ, ইংরাজিতে spider বলে। আমি জানি তুমি মাকড়সাকে ঘৃণা কর, এবং একটু একটু ভয়ও কর। অনেকে এইরূপ করে, দেখিলেই মেরে ফেলে; কিন্তু বিশ্ববিধাতা যে কত যত্ন ও জ্ঞানকৌশলে মাকড়সাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জানিলে তুমি অবাক্ হইয়া যাইবে এবং তাকে আর নীচ হীন ক্ষুদ্র বলিয়া ঘৃণা করিবে না। আমাদের বাগানে একটি মাকসার জাল হয়েছে, চল সেইটি দেখে দেখে কথাবার্ত্তা কহিগে। উভয়ে বাগানে যাইয়া একটি গাছের কাছে দাঁড়াইয়া মাকড়সার এবং তাহার জাল দেখিতে দেখিতে দাদামহাশয় বলিতে লাগিলেন;—সরলা দেখ মাকড়সাটির দেহ দুই ভাগে বিভক্ত, উপরের ভাগটি মাথা এবং বুক এক সঙ্গে এবং তার তলায় আটটি পা, পাগুলি বড় বড় এবং এক একটি সাত ভাগে বিভক্ত: এবং কবজাদিয়া জোড়া, নীচের ভাগটি পেট: সমস্ত অঙ্গটি একটি নরম তেল পিছলা ও আঁটাল জামাদিয়া ঢাকা, মাথার উপরিভাগে চক্ষু। মাকড়সার এক হইতে আট জোড়া চক্ষু থাকে। চক্ষু গুলির পাতা নাই, কিন্তু স্বচ্ছ সিঙ্গের মত পদার্থে ঢাকা। চক্ষুগুলি মাথার উপরিভাগে থাকাতে সে একেবারে চারিদিক্ দেখিতে পায়। মাথার সম্মুখে দুটি ছোট পা আছে একে ইংরাজিতে Feeler বলে। এ গুলি মোড়া যায়। ইহার শেষ ভাগে তীক্ষ্ন নখ আছে, ফিলর গুলি ফাঁপা। মাকড়সা নখের দ্বারা শিকারকে বিদ্ধ করে, ফিলরের মধ্য দিয়া এক প্রকার বিষাক্ত তরল পদার্থ ঢেলে দেওয়াতে শিকারটি অচেতন হয়ে যায়। এ বিষ কিন্তু মানুষের অনিষ্ট করিতে পারে না।

মাকড়সার উদর বড় বিস্ময়কর, এটি কেবল পাকস্থলিময়। ইহা আরও বিস্ময়কর যে এইখানে গঁদের মত এক প্রকার পদার্থ থাকে, তাই থেকে জালের সূতা প্রস্তুত হয়। এই আটা বাহিরে আসিবামাত্র কঠিন হইয়া যায়। পেটের ভিতরে চারিটি সূক্ষ্ম নল আছে। সেগুলির মুখ পশ্চাৎ-ভাগের শেষে। প্রত্যেক নলটিতে এক হাজার করে ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রের ভিতর দিয়া আটা বাহির হইয়া সূতা হয়। হাজার খেই পাকাইয়া জালের এক এক গাছা সূতা হয়। মাকড়সার পিছনের পায়ে অতি ক্ষুদ্র চিরুণি আছে। তদ্দারা মাকড়সা চারি হাজার খেই পাকাইয়া সূতা করে।

সরলা। দাদামহাশয়, সামান্য মাকড়সা সৃষ্টি করিতে ঈশ্বরের এত যত্ন ও কারিকুরি? আমি না জেনে মাকড়সাকে ঘৃণা করে বড় অপরাধ করিয়াছি।

দাদা। হাঁ দিদিমণি এজগতে কিছুই ক্ষুদ্র নাই, আমাদের মনের অজ্ঞতা ও ক্ষুদ্রতা বশতঃ বস্তুকে ক্ষুদ্র দেখি। সকলি অনন্ত জ্ঞানময় ও প্রেমময়ের সৃষ্টি। ক্ষুদ্র বস্তু আসিবে কোথা হইতে? সে যাক, এখন মাকড়সার কথা শেষ করি। মাকড়সার জাল বুনিবার কৌশল অতি চমৎকার। গাছ বা ঘরের কোণে মাকড়সা জাল প্রস্তুত করে। প্রথমে আপনার দেহ হইতে এক-

গাছি লম্বা সূতা ছাড়িয়া ঝুলাইয়া দেয়। বাতাস সে গাছি কোন খানে লাগাইয়া দেয়। এই সূতাগাছটি হইল প্রথম বুনিয়াদ। তারপর এইরূপে অন্য অন্য দিকে বুনিয়াদ, সূতা লাগান হয়। তারপর সেই সূতাগুলির গা হইতে চাকার অরের ন্যায় কতকগুলি সূতা একটি মধ্য বিন্দুতে লাগাইয়া দেওয়া হয়। মধ্য বিন্দু হইতে এই অরগুলি ঘেরিয়া সূতা লাগাইলে জাল প্রস্তুত হইয়া যায়। একখানি জাল প্রস্তুত করিতে এক ঘণ্টা লাগে, জালের খানিকটা ছিঁড়ে গেলে অতি শীঘ্র মেরামত হইতে পারে।

সরলা। মাকড়সার এমন কারিকুরি?

দাদা। হাঁ দিদিমণি, মাকড়সার বুনন কৌশল দেখে মানুষদের কি গর্ব্ব খর্ব্ব হওয়া উচিত নয়? সে যাউক, মাকড়সা বড় চতুর এবং ভয়ানক ক্ষুধিত শিকারী, জাল বিস্তার ক'রে আপনি আপনার বাসায় লুকাইয়া থাকে। জালে মাছি এবং অন্য কোন ক্ষুদ্র জীব পড়িলে তৎক্ষণাৎ দ্রুত গতিতে আসিয়া শিকারটিকে নখ ফুটাইয়া দেয়, এবং ক্ষত স্থানে বিষ ঢালিয়া দিয়া শিকারটিকে অচেতন করিয়া ফেলে, ও কতকগুলি সূতা বাহির করিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলে অনায়াসে টানিয়া লইয়া যায়। আপনা অপেক্ষা বড় পতঙ্গকে ধরিতে ভীত হয় না। কিন্তু কখন কখন সংগ্রামে পরাজিত হইয়া যায়। মাকড়সা আপনার জন্য সুন্দর বাসা নির্ম্মাণ করে, নিজ কৃত রেশম দ্বারা তাহার বাস গৃহের ছাদ এবং দেয়াল প্রস্তুত করে। এই আরাম গৃহে প্রায় সমুদায় শীতকাল নিদ্রিত থাকে। মেয়ে মাকড়সা কোকুন প্রস্তুত করে, অর্থাৎ ডিম্ব রাখিবার কোষ বা থলী, অণ্ডগুলি পূর্ণাবস্থালাভ করিলে মাকড়সা শাবক একেবারে সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণাকারে বাহির হইয়া আসে, এবং ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হয়। পতঙ্গের ন্যায় নানা অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হয় না কিন্তু সময়ে সময়ে ত্বক্ পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

সরলা। দাদামহাশয়, মাকড়সার কথা শুনে আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। ঈশ্বরের শিল্প কৌশল! আচ্ছা দাদামহাশয়, কিন্তু মাকড়সা দ্বারা আমাদের কি উপকার হয়?

দাদা। ঈশ্বরের অসীম সৃষ্টির মধ্যে আমরা অতি ক্ষুদ্র। অসীম সৃষ্টির কথা ছেড়ে দাও এই ভূপৃষ্ঠে কি কেবল আমরাই বাস করি? বিধাতা কত স্থানে কত ভাবে কত উদ্দেশ্যে কত লীলা করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে? আমাদেরই জন্য সে সমস্ত মানুষের এরূপ মনে করাও কেবল অজ্ঞানতা ও অহংকারের ফলমাত্র। মাছি এবং অন্যান্য পতঙ্গের দ্বারা মানুষের অনেক অনিষ্ট হয়। মাকড়সা এই মাছিকে নষ্ট ক'রে আমাদের কি উপকার করে না? আচ্ছা এই মাকড়সার তত্ত্ব জানিয়া তোমার কি আমাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হইতেছে?

সরলা। তা আর হচ্ছে না? আপনি আমাকে নানা তত্ত্ব শিখাইবার জন্য যত্ন করেন বলে আমি আপনাকে কত ভালবাসি তা আর কি বলে প্রকাশ করিতে পারি। ধন্যবাদ দেওয়া তো সামান্য।

দাদা। বেশ দিদিমণি, তোমার মত লেডির প্রশংসা পেলে বুড়োরা বড় সুখী হয়, কিন্তু দিদি আমি তাতে ভুলি না,

আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া ততো প্রয়োজন নাই, তোমার শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা যাঁহাদের প্রাপ্য তাঁহাদের কি মনে করিতেছে?

সরলা। কাহাদের মনে করিব আমার তো আপনাকেই মনে হইতেছে।

দাদা। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধ্যানশীল ও যোগী ছিলেন। বাহ্য বস্তুতে তাঁহাদের অনাস্থা ছিল। সে জন্য এই সমস্ত বহির্বিষয় সামান্য বলিয়া তত আলোচনা করেন নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ নিরতিশয় পরিশ্রম যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে নানা তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিয়া সুন্দর সুন্দর পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তোমার কাছে আমার গুণপণা সেই পূজ্যপাদ পণ্ডিতগণের উচ্ছিষ্ট ভোজনের ফল। আমি যখন এই পণ্ডিতগণের বিষয় ভাবি, আমার মনে হয় যদি তাঁহাদের একবার দেখিতে পাই তাহলে আর কিছু করিতে পারি আর না পারি তাঁহাদের চরণধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া কৃতার্থ হই। আহা! আমাদের উপাস্য দেবতা প্রেমময় শ্রীহরির গৌরব ঐশ্বর্য্য শক্তি জ্ঞান ও দয়ার তত্ত্ব যাঁহারা এমন করে দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের মত আমাদের সুহৃদ ও গুরু আর কে আছে? ঈশ্বর তাঁহাদের জীবনে গৌরবান্বিত হউন, তাঁহারা তাঁহার চরণতলে থাকিয়া ইহ ও পরলোকে চির উন্নত হইয়া চির সুখ ও শান্তি ভোগ করুন। এই আমার ক্ষুদ্র প্রাণের নিয়ত প্রার্থনা।

সরলা। দাদামহাশয় আমি কি কোন দিন আপনার মত মন পাব? ঈশ্বর কি আমাকে এত করুণা করিবেন?

দাদা। দিদিমণি, তোমরা ঈশ্বরের কৃপাকুমারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমাদের ভিতর যে কত উন্নতির বীজ নিহিত আছে তাহা কে বলিতে পারে? সেই গুলিতে একটু প্রার্থনা ও যত্নের জল পড়িলে কি ফল হবে কে জানে? আমাদের অপেক্ষা আমাদের ভাবি বংশধরেরা যে অনেক উন্নত হইবে, তাহা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি।

পাহাড়ি।—একতালা।

পিতা তব প্রেমরাজ্য আসিছে ধরাতলে।
আশাপথ চেয়ে মোরা রহিয়াছি সকলে।
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে নরনারী তব নামে।
রচে প্রেমপরিবার তোমার পদতলে।
পাপ রাজ্য হবে ধ্বংস বাড়িবে বিশ্বাসী বংশ
অভিনব আর্য্যবংশ জন্মিবে দলে দলে।
নূতন বিধানে সবে, রাজভক্ত হয়ে রবে,
নিরাপদে বাস করিবে তোমার খাস মহলে।

পুস্তক প্রাপ্তি।

মতিচূর—প্রথম খণ্ড। এই পুস্তক মোসলমান কন্যা শ্রীমতী আর্ এস্ হোসেন কর্ত্তৃক বিরচিত। পিপাসা, আমাদের অবনতি *, নিরীহ বাঙ্গালী, অর্দ্ধাঙ্গী, সুগৃহিণী, বোরকা, গৃহ, এই কয়টি প্রবন্ধ মতিচূরের অন্তর্গত।

---

* সুগৃহিণী অলঙ্কার না ব্যাজ অবমেভরি শীর্ষক প্রবন্ধ রচয়িত্রী প্রথমে মহিলায় প্রকাশ করেন। তাহাতে কিছু ভাবের আতিশয্য ও তীব্রতা ছিল। অনেক মহিলা উহা পড়িয়া প্রতিবাদ করেন সেই প্রবন্ধই সংশোধিতাকারে 'আমাদের অবনতি' নামে রচয়িত্রী মতিচূরে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীমতী আর্ এস্ হোসেন মহিলার পাঠিকাদিগের নিকটে বিশেষ পরিচিত। তদ্রচিত অনেক গুলি গদ্য পদ্য প্রবন্ধ ক্রমশঃ মহিলায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি একজন মহাপ্রতিভাশালিনী সুকবি মহিলা। তাঁহার কবিত্ব ও কল্পনাশক্তি অতি প্রশংসনীয়, এ বিষয়ে তিনি বিশ্বজননী বাগ্‌দেবীর বিশেষ কৃপা আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত, ভাষার লালিত্যে ও ভাবের প্রগাঢ়তায় তাঁহার গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। আমরা মতিচূর পড়িয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। ইহার অন্তর্গত কোন কোন প্রবন্ধ পূর্ব্বে মহিলায় প্রকাশিত হইয়াছে, তদবশিষ্ট প্রবন্ধের যেগুলি মহিলায় প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করিতেছি, তাহা ক্রমশঃ উদ্ধৃত করিয়া দিব।

শ্রীমতী আর্ এস্ হোসেন বয়সে প্রবীণা নহেন, কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধি কবিত্বে প্রবীণা। রঙ্গপুরের জিলা ইহার জন্মভূমি, ইনি সম্ভ্রান্ত জমীদার পরিবারের কন্যা; স্বামী ভাগলপুরনিবাসী ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত সুশিক্ষিত ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট.ভাগলপুর ডিবিজনের কমিশনরের পার্সেনেল আসিষ্টাণ্ট। অর্থের কোন অপ্রতুলতা নাই; অথচ মিসেস হোসেন প্রতিদিন স্বহস্তে রন্ধন এবং সমুদায় গৃহ কর্ম্ম সম্পাদন করেন। বাবুর্চ্চি ও দাস দাসীর উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকেন না। দিবাভাগে রন্ধন ও গৃহকর্ম্ম এবং সূচীকর্ম্মাদিতে ব্যাপৃত থাকেন। সন্ধ্যার পর হইতে ৩।৪ ঘণ্টা পড়া শুনার চর্চ্চা করেন। তাঁহার বাড়ী ঘর গোছান,ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; নিজের বেশ ভূষাও সাদা সিদে, বস্ত্রালঙ্কারের কোন আড়ম্বর নাই কোন প্রকার বিলাসিতা নাই। তাঁহার ন্যায় সুগৃহিণী নব্য সমাজে বিরল, তিনি যেমন গৃহকর্ম্মে নিপুণা তদ্রূপ সুপাঠিকা। আমরা ভাগলপুরস্থ অনেক মহিলার প্রমুখাৎ তাঁহার রন্ধন নৈপুণ্য ও গৃহ কর্ম্মের পারিপাট্যের বিশেষ প্রশংসা শুনিয়াছি, কেবল শুনি নাই, নিমন্ত্রিত হইয়া যাইয়া প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। কন্যাটি মূর্ত্তি, লক্ষ্মী মতী নানা বিষয়ে সমুন্নতা, কিন্তু তিনি পর্দ্দার দৃঢ়তা রক্ষা করিয়া থাকেন। আর্ এস্ হোসেন কখনও কোন স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করেন নাই। কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাহায্যে আপন প্রখর বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তাবলে এতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছেন। ইংরাজি লেখা পড়াও ভাল জানেন। রচয়িত্রী মতিচূরে যে উৎসর্গ পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এবং "পিপাসা" শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধের শেষাংশ এবার নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।—পুস্তক খানার ছাপা ও কাগজ এবং বাইণ্ডিং অতি সুন্দর হইয়াছে।

উৎসর্গ পত্র ;—"বালিকাবিদ্যালয় বা স্কুল কলেজ গৃহের অভ্যন্তরে আমি কখনও প্রবেশ করি নাই। কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে যৎসামান্য লেখা পড়া শিখিয়াছি। অপর আত্মীয় স্বজনেরা আমার শিক্ষায় উৎসাহ দান করিবেন দূরে থাকুক, বরং নানা প্রকার উপহাস ও বিদ্রূপ করিতেন, তথাপি ঈশ্বর প্রসাদে আমি পশ্চাৎপদ হই নাই, এবং ভ্রাতাও কাহারও বিদ্রূপে ভগ্নোৎসাহ হইয়া

আমাকে ইংরাজি পড়াইতে ক্ষান্ত হন নাই। স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আমার সেই জ্যেষ্ঠ সহোদর যাঁহার অসাধারণ কৃপায় আমি এই যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়াছি, যাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ আমাকে স্বাধীন চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়াছে, তাঁহার করকমলে সমর্পিত হইল।"

পিপাসা শীর্ষক প্রবন্ধে শেষাংশ "একদিন সিন্ধুতটে সিক্ত বালুকার উপর বসিয়া সাগরের ঢেউ গণনা করিতেছিলাম। তরঙ্গমালা কি যেন যাতনায় কি যেন বেদনায় ছট ফট করে গড়াইয়া গড়াইয়া আছাড় খাইয়া পড়ে। তাহাদের এ অস্থিরতা, আকুলতা কিসের জন্য? সবিস্ময়ে সাগরকে জিজ্ঞাসা করিলাম;—

"তব ওই সচঞ্চল লহরামালায়,
কিসের বেদনা লেখা?—পিপাসা জানায়।
পিপাসা নিবৃত্ত হয় সলিল—কৃপায়,
বলহে জলধি, তব পিপাসা কোথায়?

আবার তাহার গভীর গর্জ্জনে শুনিলাম "পিপাসা পিপাসা!" হায়! এই পোড়া পিপাসার জ্বালায় আমি দেশান্তরে পলাইয়া আসিলাম, এখানেও ঐ নিষ্ঠুর কথাই শুনিতে পাই। চক্ষু মুদ্রিত করি াম, ঐ তরঙ্গে তরঙ্গে আর পিপাসা দেখিতে ইচ্ছা হইল না। সমুদ্র আবার গম্ভীর গর্জ্জন করিল। এবার তাহার ভাষা বুঝিলাম, স্পষ্ট শুনিলাম, "পিপাসা পিসাসা।"

"পিপাসা, পিপাসা" মূর্খ মানব! জান না এ কিসের পিপাসা? তোমাকে কে বলিয়াছে আমার পিপাসা নাই? এ হৃদয়ের দুর্দ্দান্ত পিপাসা কেমন করিয়া দেখাইব? আমার হৃদয় যত গভীর, পিপাসাও তত প্রবল। এ সংসারে কাহার পিপাসা নাই? অনলেরও তীব্র পিপাসা আছে। পিপাসা পিপাস. এই টুক বুঝিতে পার না? ধনীর ধনপিপাসা, মানীর মানপিপাসা সংসারীর সংসার পিপাসা। নলিনীর তপনপিপাসা। চকোরীর চন্দ্রিকাপিপাসা। আহা! এই মোটা কথা বুঝ না? পিপাসা না থাকিলে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিত কি লক্ষ্য করিয়া? আমার হৃদয়ের অনন্ত প্রেমপিপাসা, যত দিন আছি, পিপাসাও থাকিবে। প্রেমিকের প্রেম পিপাসা, প্রকৃতির ঈশ্বরপিপাসা। এই টুকু কি বুঝিতে পার না? * * *।

"তাই বটে এতদিনে বুঝিলাম, আমার হৃদয় কেন সদা হুহু করে, কেন সদা কাতর হয়। ইহা তুচ্ছ জলপিপাসা নহে। ইহা অনন্ত প্রেম পিপাসায় কাতর। ঈশ্বর একমাত্র বাঞ্ছনীয়, আর সকল পিপাসী, ঐ বাঞ্ছনীয় প্রেমময়ের প্রেমপিপাসী!!

"আমি তবে পাগল নহি আমি যে পিপাসা দেখি তাহা সত্য, কল্পনা নহে! আমি যে পিপাসা শুনি, তাহাও সত্য কল্পনা নহে। ঈশ্বর প্রেম, এ বিশ্বজগৎ প্রেমপিপাসু।

২য় পুস্তক।

হাসি ও অশ্রু:— পদ্যময় পুস্তক। ইহ শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী কর্ত্তৃক প্রণীত এই পুস্তকে নানা বিষয় ছোট বড় ১৫৭টি কবিতা প্রকাশিত। সরোজ কুমারী দেবী এক একটি সামান্ত বিষয়াবলম্বনে আশ্চর্য্য কবিত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন। তাঁহা

ভাবের প্রসার ও কল্পনাশক্তি অসামান্য। তিনি একজন স্বভাবকবি। আমরা হাসি ও অশ্রু পুস্তকের অনেক গুলি কবিতা পড়িয়াছি, কবিতা সকল অতিশয় প্রাঞ্জল ও মধুর বোধ হইল। অনেক গুলি কবিতা বিশুদ্ধ প্রেমবিষয়ে রচিত। ঈশ্বর প্রেম বিষয়ে অধিক কথা থাকিলে পুস্তক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। আমরা দেখিতেছি সাধরণতঃ নারীর কোমল হৃদয় যেরূপ মধুর কবিত্বের আধার, তাঁহাদের যে প্রকার সৌন্দর্য্যানুভাবকতা ও কল্পনা শক্তি প্রবল, পুরুষের হৃদয় সেরূপ কবিত্ব কল্পনা শক্তি সম্পন্ন নহে। সরোজকুমারী দেবী আরও ২।১ খানা পদ্য পুস্তক প্রকাশ করিয়া বিশেষ যশস্বিনী হইয়াছেন। তিনি সম্বলপুরের প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ সেন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী।

হাসি ও অশ্রুর মূল্য ১৲ মাত্র। সরোজ কুমারী দেবী এই হাসি ও অশ্রু পুস্তক আপন স্বর্গগত জননীর নামে কয়েকটী কবিতা লিখিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন। সেই উৎসর্গ কবিতা ও "আঁধার" শীর্ষক একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ;—

উৎসর্গ—"মা আমার।„

"যেথানে গিয়াছ মাগো, নাহি সেথা অশ্রুধার।
ধরণীর ধুলরাশি ব্যথিত না করে আর॥
কত দূরে কোথা আছ আমিত মা নাহি জানি।
তবুও দেখি গো যেন বিমল হৃদয় খানি॥
সেই হৃদি নিরমল, তার স্নেহ কত প্রীতি।
আমারি মুখ চেয়ে ফুটিয়া উঠিত নিতি॥
হেরিলে আমারি মুখে প্রথম স্নেহের ছবি।
ফুটিয়া উঠিল প্রাণে কত তব আশারবি॥
সনতান ক্ষুদ্রলতা তোমারি সোহাগ ভরে।
আজি বিকশিত হয়ে দাঁড়াল সংসার পরে॥
জগতে কে বুঝিবে গো কতই মাধুরী তার,
আজি তুমি কোন দূরে কোথা আছ মা
আমার।

এ শোভা কাহারও নয়, শুধু মা তোমারি তরে
অর্পিনু চরণে তব যথা থাক যত দূরে।
শুনেছি তোমার মুখে মরণের আছে পার,
তবে তুমি সেথা হতে দেখিবেত মা আমার
বলে ছিলে সেথা গেলে ভুলিবে না কভু,
মোদের স্নেহের মুখ জেগে প্রাণে রবে তবু
যেথা থাক যতদূরে ক্ষুদ্র মোর উপহার,
তোমারি স্নেহের করে সমর্পিনু মা আমার।

আঁধার।

সংসার জানি না আমি এসেছি কোথায় ?
বারেক দেখাও প্রভু নিখিলের পথ *।
অন্ধের মতন ফিরি এথায় হোথায়,
গাহি বিলাপের গান কোথায় জগৎ ?
যত মনে করি যাব সংসারের দূরে,
কি মোহ বাঁধনে বাঁধি রেখেছে আমায়
তারি মাঝখানে মরি চির দিন ঘুরে,
প্রাণের তিয়াষা আশা সব নিভে যায়
তবে কি এমনি ধারা কাটিবে জীবন,
যাবে নাকি তব কাছে মোর আর্ত্ত স্বর !
সংসার রহস্য মাঝে রহিব মগন,
চাবে না বারেক তুমি নিখিল নির্ভর ?
দেখিতে পাই না পথ এ ঘোর আঁধারে।
কোথা তুমি আলো কণা রাখ এ পাথারে।

---

* "নিখিল" শব্দের অর্থ সমস্ত, বা সমুদায়। রচয়িত্রী নিখিল শব্দ এরূপ অনেক স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন যাহাতে অর্থ সঙ্গত হয় না।

প্রাপ্ত।

"মহিলার" পাঠিকাসমীপে নিবেদন।

ইউরোপীয় মহাদেশপর্য্যটনান্তে আমেরিকা যাইবার সময় আমরা জিব্রল্টার হইতে যাত্রা করি। জিব্রল্টার অতি ক্ষুদ্র স্থান, মোটে তিন মাইল লম্বা এবং আধ মাইলের কিছু বেশী চওড়া। সুতরাং তথায় যাহা কিছু দ্রষ্টব্য ছিল দুই দিনেই শেষ হইল, কিন্তু ভূমধ্যসাগরে তুমুল তুফান হেতু আমাদের জাহাজ পূর্ব্বদিক্ হইতে আসিয়া সময়মত পঁহুছিতে পারে নাই; তজ্জন্য আমাদিগকে জিব্রল্টারে দশ দিন বসিয়া থাকিতে হয়। অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি, বাহিরে যাইবার যো নাই, কাজেই প্রায় সমস্ত দিন হোটেলের বৈঠকখানায় কাল ক্ষেপ করিতে হইত। হোটেলে একজন ভারত ফেরত ইংরাজ কর্ণেল ছিলেন। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর কার্য্যোপলক্ষে ভারতের নানা স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; কলিকাতার কেল্লাতেও বহু দিন থাকেন, একারণ অনেক বাঙ্গালী বড়লোকের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ছিল, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা তিনি শুনিয়াছিলেন। আমাদের দেশের সম্বন্ধে এক দিবস তাঁহার সহিত অনেক কথা বার্ত্তা হয়।

প্রশ্ন। আপনি সমগ্র ইউরোপ ঘুরিয়া আমাদের স্ত্রীলোকসম্বন্ধে কিরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন?

উত্তর। ইউরোপীয় স্ত্রীলোকেরা অনেক বিষয়ে গুণবতী, এবং বিদ্যা বুদ্ধিতে আমাদের দেশের আধুনিক রমণীগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাতে সন্দেহ কি? অনেক স্ত্রীলোক দেখিলাম যাঁহারা জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা দ্বারা আপনাদিগকে সমুন্নত করিয়াছেন। অবশ্য কোন কোন স্থলে অতি বুদ্ধি, অতি স্বাধীনতা, অতি আদর প্রভৃতির আত্যন্তিকতা দোষের কুফলও দেখা গেল; কিন্তু মোটের উপর শিক্ষা স্বাধীনতা দ্বারা সুফল ফলিয়াছে না বলিলে সত্যের অপলাপ হয়।

প্র। পুরুষের সহিত স্ত্রীলোক সমান ভাবে শিক্ষা না পাইলে জাতীয় উন্নতির ব্যাঘাত জন্মে, একথা আপনি স্বীকার করিতে বাধ্য। ভাবুন, আপনাদের পুরুষগুলি সব শিক্ষিত হইল, কিন্তু মহিলাগণ ঘোর মূর্খ রহিল, তাহাতে আপনাদের জাতীয় শিক্ষায় এক সিকি মাত্র ফল আপনারা পাইলেন; স্ত্রীলোকেরা বাদ পড়িলে আসলে আট আনা শিক্ষা হইল, তাহারও অর্দ্ধেক রমণীগণের মূর্খতাহেতু বিফলে গেল, কাজেই বার আনা নষ্ট হইয়া চারি আনা মাত্র কাজে আসিল। এ হিসাবটা কিরূপ বুঝেন?

উ। ওরূপ হিসাব মন্দ নয়; কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া দেখুন,—শিক্ষা মানে কতকগুলি পুস্তক পাঠকরত বাজে পাণ্ডিত্য লাভ নয়; গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ব্যতীতও শিক্ষিত হওয়া যায়। আমার মতে উহাকেই পাকা শিক্ষা বলিতে পারা যায়। যাহাতে জ্ঞানধর্ম্ম লাভ দ্বারা জীবের প্রকৃত উন্নতি হয় সেরূপ শিক্ষা গ্রন্থপাঠ ব্যতীতও

আমাদের স্ত্রীলোকেরা বরাবর পাইয়া আসিয়াছেন। পরন্তু আপনাদের আমলের শেষার্দ্ধকালে সে সকল ব্যবস্থা ক্রমে উঠিয়া গিয়া এখন এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, যে সুশিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আপনাদের মনে মনে একটা সংস্কার আছে যে ভারতের স্ত্রীলোকেরা কোন কালে বিদ্যা উপার্জ্জন করেন নাই, সেটা সম্পূর্ণ ভ্রম। ভারত যখন স্বাধীন ছিল, যখন ভারতের ন্যায় সুসভ্য দেশ পৃথিবীতে আর একটী ছিল না, তখন লোকে পুত্রকন্যা উভয়কেই সমান ভাবে শিক্ষা দিতেন। সেকালে যে সকল বিদ্যাবতী বুদ্ধিমতী রমণী ভারতে বিরাজ করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের মত অধুনা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। পরে মুসলমানদিগের সময় হইতে স্ত্রীলোকের বিদ্যাচর্চ্চা একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তত্রাচ জ্ঞানধর্ম্মের আলোচনা তাঁহাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল; তাহার ফলে চরিত্রবতী রমণীর দেশে অভাব ছিল না। অবশেষে যত আপনাদের সভ্যতা প্রচারিত হইতে লাগিল তত ভারতের সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া স্ত্রীলোকগণ ভোগবিলাসে মত্ত হইলেন। এখন বেশভূষা আহার বিহার ও নভেল পাঠ আমাদের মহিলাগণের চিত্ত অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। পুরাতন ব্যবস্থা চলিয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে নূতন সুব্যবস্থা কিছু হয় নাই, কাজেই সমাজে যেরূপ অরাজকতা নারীমহলে ততোধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

প্র। আপনি আমাদের মধ্যে যেরূপ "পলিশ" (শিষ্টাচার) ও "কালচার" * (সৌষ্ঠব) দেখিলেন তাহার অধিকাংশ আমাদের জননীগণের নিকট আমরা শিখিয়াছি। আপনাদের দেশের অনেক ভদ্রলোকের যে "পলিশ" ও "কালচারের" অভাব দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ আর কিছুই নয়, ভারতবর্ষের জননীগণ নিজেরা ঐ দুই গুণের অধিকারিণী নন বলিয়া। "পলিশ" ও "কালচার" সুশিক্ষারই ফল।

উ। উদাহরণ দ্বারা পরিষ্কার ভাবে বলিলে ভাল বুঝিতে পারি।

প্র। ভাবিয়া দেখুন, রুক্ষ কথা বা অপ্রিয় সত্য ফস্ করিয়া লোকের মুখের উপর বলা কি সভ্যতা ও ভদ্রতার কাজ? আপনাদের ভদ্রলোকেরা বিশেষ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকাগণ লোকের মুখের উপর একটা অপ্রীতিকর কথা বলিয়া ফেলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। এরূপ আমি আপনাদেরই ইংরাজীশিক্ষিত ভদ্রলোকদের নিকট শুনিয়াছি, এবং কার্য্যক্ষেত্রেও কতক কতক নিজে দেখিয়াছি। আমাদের ভদ্র পুরুষেরা কখন ওরূপ করিবেন না, স্ত্রীলোকগণতো ও বিষয়ে আরও সাবধান। মুখের উপর কর্কশভাবে কোন বিষয়ের প্রতিবাদ করা আমাদের সমাজে বড়ই নিন্দনীয়; অন্য কোন প্রকারে অনর্থক লোকের মনোবেদনা উৎপাদন তো বিশেষ গর্হিত কার্য্য বলিয়া বিবেচিত।

উঃ। হাঁ, কোন কোন ক্ষেত্রে এপ্রকার দৃষ্ট হয় বটে। বিশেষ প্রাণ খুলিয়া কাহারও কোন কার্য্যের যশ

* pclish & clilture.

করা আমাদের দেশে এক রকম উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কাহারও সুখ্যাতি করিলে নিজে ছোট হইয়া যাইতে হয় এরূপ একটা আশঙ্কা যেন আবাল বৃদ্ধবনিতার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। আমার ত মনে হয় এটা আপনাদের স্বার্থপর সভ্যতার সংস্রবের ফল। আপনারা ভারতে শ্রীচরণার্পণ করিবার পূর্ব্বে "কম্পিটিশন" বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার হুড়াহুড়ি মারামারি আমরা আদৌ জানিতাম না, দুঃখী ধনী, সুক্ষম অক্ষম, সম্পন্ন বিপন্ন সকলে মিলিয়া যুলিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, সৌভাগ্যবান্ দুর্ভাগা দিগকে সাহায্য করিতে পরান্মুখ ছিলেন না। আপনারা যাহাকে "কো অপরেশন" বলেন তদপেক্ষা অনেক বেশী একটা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আপনাদের রাজত্ব ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ঐ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে; আমার বোধ হয় রাজধানী হইতে সুদূরস্থিত অজ্ পল্লিগ্রামের মধ্যে কোন কোন স্থানে এখনও তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। যাউক ওসকল দুঃখ কাহিনী বলিতে গেলে অনেক পুঁথি খুলিতে হয়। এখন আপনি যে 'ইউরোপীয় "পলিশ" ও "কলচারের" কথা বলিলেন সে সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা শুনুন। আপনি কি বলিতে চান সমগ্র ইউরোপ "পলিশ" ও "কলচারে" বিভূষিত? আমি যত দূর দেখিয়াছি আপনাদের ক্ষুদ্র দ্বীপ ব্যতীত আর কোথাও বেশী "পলিশ" ও "কলচার" দৃষ্ট হয় না। ইউরোপীয় মহাদেশের মধ্যে পারিস ও বিয়েনা অবশ্য দুইটি অতি সুসভ্য নগর—আমি অন্যান্য পশ্চাৎপদ নগরাদির কথা পরে বলিব—উভয় স্থানের ভদ্রমহিলাগণমধ্যে—পুরুষের কথা থাকুক—বিস্তর দেখিয়াছি যাঁহাদের কথা বার্ত্তা ব্যবহার নিতান্ত বর্ব্বরোচিত। দুই একটী উদাহরণ দ্বারা দেখাইতেছি বেশী বলিবার সময় ও আবশ্যকতা নাই। পারিসের কোন সম্ভ্রান্ত পল্লীস্থ একটি বড় স্কুলগৃহে আমরা এক মাসাধিক কাল বাস করি। স্কুলের সে সময় ছুটি ছিল। স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও সত্বাধিকারিণী এবং অন্যতম শিক্ষয়িত্রী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী মাত্র সেখানে ছিলেন; তাঁহাদের সঙ্গে আমরা একত্র আহারাদি করিতাম। প্রত্যুষে আমাদিগকে সামান্য মাত্র প্রাতরাশ দেওয়া হইত। এ দেশে সাহেবরা যাহাকে ছোটা হাজরী বলেন, তদ্রূপ; সেই আহারের কিছুক্ষণ পরে আমরা বাহিরে যাইতাম। এক দিবস বাহির হইতে আমাদের কিছু বিলম্ব হয়, বেলা দশটার সময় আহারের গৃহ দিয়া আমরা বাহিরে যাইতেছি, দেখি টেবিলের উপর বিপুল আহারের আয়োজন, অর্থাৎ প্রকৃত "ব্রেক্‌ফাষ্ট" বা হাজরী প্রস্তুত, প্রৌঢ়া ও তাঁহার যুবতী ভ্রাতুষ্পুত্রী তথায় দণ্ডায়মানা; আমরা টেবিলের দিকে তাকাইবামাত্র বড় কর্ত্রী অতি কর্কশভাবে বলিয়া উঠিলেন, "এ আহারের আয়োজন তোমাদের জন্য নয়, ইহা আমরা খাইব, আমরা খাইব; তোমরা প্রাতঃকালে যাহা খাইতে পাইয়াছ তদপেক্ষা আর অধিক আশা

করিতে পার না।” এখন দেখুন, ইহা কোন্ শ্রেণীর “পলিশ” বা “কলচার”। খানার টেবিলে এক দিন ইংরাজ জাতির প্রশংসা করাতে শিক্ষয়িত্রী ফরাসী যুবতী আমার উপর বিরক্ত হইয়া যেরূপ ভাবে কোপ ও ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী বিয়েনাতে একটা উচ্চশ্রেণীর হোটেলে থাকিতাম; তথায় অনেক ভদ্র মহিলা বাস করিতেন; সময়ে সময়ে তাঁহাদের কোলাহলে আমাদিগকে উত্যক্ত হইতে হইত। দান্যুব নদের উপর ষ্টিমারে অনেক গুলি রমণী আমাদের সহযাত্রী ছিলেন, তাঁহাদের কচ্কচিতে আমাদিগের প্রায় সমস্ত সময় জাহাজের ছাদে বসিয়া কাটাইতে হয়। দেহের স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি নিষ্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে উক্ত দুই নগরের মহিলাগণ যে রূপ আচরণ করেন তাহা কিছুতেই সভ্যোচিত বলা যায় না। ইটালি, স্পেন, গ্রীস প্রভৃতি রাজ্যের স্ত্রী পুরুষের “পলিশ,” “কলচারের” কথা মাথায় তোলা থাকুক, যত না বলা যায় ততই ভাল। এরূপ ক্ষেত্রে আমাকে বলিতে হয়;

> সর্ব্বত্র ত্রিবিধা লোকা
> উত্তমাধমমধ্যমাঃ।

প্রঃ। যাহা হউক, আপনাদের দেশে বীরপ্রসবিনী রমণীর নিতান্ত অভাব, একথা বোধ হয় অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমি শুনিয়াছি শৌর্য্য, বীর্য্য, সৎসাহসের কার্য্যে সন্তানকে উৎসাহ দেন এমন স্ত্রীলোক আপনাদের দেশে নাই। সুশিক্ষা ও সাংসারিক অভিজ্ঞতা ব্যতীত স্ত্রীলোকের সাহস জন্মে না; স্বভাবতঃ রমণীগণ ভীরু, তার উপর যদি তাঁহারা অন্তঃপুরনিবদ্ধ থাকেন, এবং ভাল শিক্ষা না পান, তাহা হইলে ক্রমে একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িবার কথা। এরূপ অসহায় অবস্থাতে বীর্য্যশালী সন্তান প্রসব করিবার ক্ষমতা কি প্রকারে সম্ভবে? আমরা এ সকল কথা বলিলে ভারতের লোক আমাদের উপর বিরক্ত হইতে পারেন; আপনি সাক্ষ্য দিলে হয়ত তাঁহারা শুনিবেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা ব্যতীত কোন দেশ উন্নত হইতে পারে না; ভরসা করি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া আপনি সেটা বেশ বুঝিয়াছেন।

উঃ। অবশ্য স্ত্রীলোককে ফেলিয়া কোন জাতি উন্নত হইতে পারে না; এ কথা খুব সত্য যে রমণীর প্রেম, সাহস ও বিবেচনা শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে পুরুষ ঠিক পথে চলিতে শিখে না। লোকশিক্ষক মহাত্মা রস্কিন এ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। “No man ever lived a right life who had not been chastised by a woman's love, strengthened by her courage and guided by her discretion.”—RUSKIN

পরিশেষে ইহাই বক্তব্য যে কর্ণেল মহাশয়ের কথা গুলি নেহাত ছুড়িয়া ফেলিবার যোগ্য নহে। যিনি আমাদের গুণেরই প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহার দ্বারা আমাদের হিত হওয়া সম্ভব নয়; পরন্ত

যাঁহারা চোখে আঙুল দিয়া আমাদের দোষ সমূহ দেখাইয়া দেন, আপাততঃ তাঁহাদের কথা কটু বোধ হইলেও তাঁহারা আমাদের প্রকৃত হিতৈষীর কার্য্য করিয়া থাকেন। জননীর কার্য্যকলাপ চিন্তাস্রোত যে সন্তানে সংক্রামিত হইয়া তাহার ভবিষ্যত জীবন গ্রথিত করে, ইহা একটী অতি সাধারণ বৈজ্ঞানিক সত্য। স্তন্যদানের সঙ্গে সঙ্গে জননী যে সকল ভাব সন্তানের হৃদয়ে বসাইয়া দিবেন তাহা সুদৃঢ় ভাবে তথায় স্থাপিত হইয়া চিরজীবন তাহার পরিচালকের কার্য্য করিবে, একথা যেন আমাদের মহিলাগণ বিস্মৃত না হন। সন্তানকে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেম পুণ্যে উন্নত দেখিয়া যাঁহারা সুখী হইবার কামনা রাখেন তাঁহাদের কর্ত্তব্য আগে আপনাদিগকে সেই সকল বিষয়ে স্বত্ববতী করিবার প্রয়াস পাউন। ইহাই নিবেদন।

মহিলাদিগের রচনা।

বাসিফুল।*

১

"পিসিমা! তোমারে দিতে আনিয়াছি ফুল,"
এত বলি আসি ছুটি,
হাতে দিতে ফুল ছুটি,
চেয়ে দেখি, আনিয়াছে ছুটি বাসি ফুল!

২

"ধরগো পিসিমা! আমি আনিয়াছি ফুল!"
সকালে কাননে গিয়ে,
বাসিফুল কুড়াইয়ে,
"পিসিমা"রে দিতে এসে হ সিয়া আকুল!

৩

"পিসিমা! তোমারি জন্য এনেছি এ ফুল।"
শুনে সে বচন সুধা,
দূরে গেল তৃষ্ণা ক্ষুধা,—
স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকার হ'য়ে গেল ভুল!

৪

মরি! সে স্বর্গের শিশু মরতে অতুল!—
তাহারে স্মরিয়া তাই
আপনা ভুলিয়া যাই—
কোন্ বিধি গড়েছিল সে ননী পুতুল?—

৫

কি দিয়ে কে গড়েছিল সে প্রেম-পুতুল?—
ইন্দ্রধনু বর্ণ দিয়ে,
চন্দ্রিকালাবণ্য দিয়ে,
পারিজাত গন্ধ দিয়ে মাণিক অতুল?

৬

ললিত রাগিণী নহে তার সমতুল,—
নহে সুখস্বপ্ন সম,
নহে ধনরত্ন সম,—
সে ত নহে বসোরার গোলাপ মুকুল!

৭

তুলনার উপযুক্ত নহে—সে অতুল!
তার সেই উপহার,—
কি দিব তুলনা তার?
কোটী কোহিনুর নহে তার সমতুল!

৮

প্রেমের সে উপহার মরতে অতুল,—
কোথা পাব সে আদর?
কোথা সেই স্নেহস্বর,
হৃদয় জুড়ান সেই সোহাগ অমূল?

---

* ৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রের বিরহে রচয়িত্রী এই পদ্যটি লিখিয়াছেন।

৯

স্নেহের শিশির মাখা সেই বাসি ফুল!!
অমিয় ঢালিয়া বুকে,
কে আর সহাস্য মুখে,
কহিবে "পিসিমা! ধর, আনিয়াছি ফুল।"

১০

"দেখ ত পিসিমা! আমি এনেছি এ ফুল।"
সেই কথা পুনরায়,
শুনিতে পরাণ চায়,—
কোথা সে বালক মোর, প্রেমের পারুল?

১১

ভূতলে চামেলি যূঁই নহে অপ্রতুল,—
আছে কত পুষ্পলতা—
শুধু নাই সেই কথা,
"পিসিমা! তোমারে দিতে আনিয়াছি ফুল।"

১২

সেই কথা শুনিতে এ পরাণ ব্যাকুল,—
বাজে কি স্বরগপুরে,
গন্ধর্ব্বের বীণা সুরে,
"পিসিমা! তোমারি তরে এনেছি এ ফুল?"

১৩

কি দিলে আবার পাব স্নেহের পুতুল?
কোন্ যজ্ঞ তপস্যায়,
বাঁচিয়ে সে পুনরায়,
হাসিয়ে আমারে এসে দিবে বাসি ফুল?

১৪

সে স্নেহ আদর কেন জগতে দুর্ম্মূল?
রত্নপ্রসবিনী ধরা,
বিবিধ রতনে ভরা,
তথাপি মিলে না হেথা দুটি বাসি ফুল!!

১৫

"বিধি সর্ব্বশক্তিমান্" নিতান্ত এ ভুল!—
নতুবা শকতি তাঁর,
নাই কেন পুনর্ব্বার,
ফিরাইয়া দিতে মোর সে প্রেম-পুতুল?

১৬

"বিধি সর্ব্বশক্তিমান্" ইহা নহে ভুল—
নতুবা আর কে পারে,
সমাহিত করিবারে,
অমন স্বরগ শিশু বিশ্বে যে অতুল?

১৭

পাবনা প্রাণের ধন—পাবনা সে ফুল!
আর শুনিবে না প্রাণ,
সে ললিত কণ্ঠতান—
প্রেমের পীযুষ ভরা রাগিণী মঞ্জুল!

১৮

শুধু স্মৃতি-কুঞ্জে ফুটে আছে "বাসি ফুল,"
সে সুখের স্মৃতি সুখ,
ভরিয়ে রয়েছে বুক,—
অঙ্কিত সে চিরতরে হইবে না ভুল!

Mrs. R. S. Hossein.

উড়িষ্যা-রাজপরিবার।

উড়িষ্যা মোগলবন্দী ও গড়জাত এই দুই ভাগে বিভক্ত। উড়িষ্যায় কটক, পুরি, বালেশ্বর ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে। ইহাকে মোগলবন্দী, এবং অবশিষ্ট অংশ কয়েকটি রাজাদের অধীনে। উহাকে গড়জাত বলে। মোগলবন্দীর মধ্যেও কয়েকটি রাজা উপাধিধারী জমিদার আছেন; ইহাদিগকে করদ রাজা, এবং গড়জাতের রাজাদিগকে মিত্র রাজা বলা যায়। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে গড়জাত রাজগণ যথেষ্ট সম্মান ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত। শিক্ষার অভাবে কিছু-

কাল পূর্ব্বে গড়জাত রাজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ রাজ্যশাসনে কেহ বা প্রজাপালনে অক্ষম হইয়া গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া বেতনভোগী হইতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ-রাজসংস্পর্শে শিক্ষার বলে কয়েকটি রাজা উত্তমরূপে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতেছেন। এ বিষয়ে অধিক কিছু বলা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। গড়জাত রাজান্তঃপুরের দুই একটী কথা কিছুকাল পূর্ব্বে আমি এই পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম, আজ আর দু একটী কথা বলিব।

গড়জাত অঞ্চলের কয়েকটী রাণীর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় আছে। যদিও রাণীরা উচ্চ জ্ঞান ও নীতিশিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, তবু ইঁহাদের অনেকগুলি আচার ব্যবহারের সুন্দর প্রণালী আছে।

অন্তঃপুরের মধ্যে ভৃত্য কিংবা অন্য কোন পুরুষের যাইবার অধিকার নাই। বিশেষ প্রয়োজন হইলে ডাক্তার, কবিরাজ কিংবা বিবাহের সময় পুরোহিত যাইতে পারেন। যুবতী পরিচারিকা বা পাচিকাদিগেরও অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিবার নিয়ম নাই। পরিচারিকার মধ্যে এক জন সকলের সর্দ্দার থাকে। পরিবারে রাণী, রাজকুমারী ও অন্যান্য স্বজন প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পরিচারিকা আছে। রাজকুমারীদেরপরিচারিকাগণ তাঁহাদের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ী যায়। সম্প্রতি একটি রাণীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহার একশত জন পরিচারিকা দেখিলাম। কাহারও ইহাপেক্ষা অনেক বেশী পরিচারিকা থাকে। পরিচারিকাগণ রাণীকে সাধারণতঃ লোকের নিকট "রাণী সাহেব" বলিয়া থাকে।

পারিবারিক কিংবা অন্য কোন বিষয়ে রাজা রাণী পরস্পরের মতের প্রয়োজন হইলেই যে তৎক্ষণাৎ পরস্পর দেখা ক'রে সেটা স্থির করিবেন, তাহা কচিৎ ঘটিয়া থাকে। অনেক সময় প্রধানা পরিচারিকা দ্বারা পরস্পরের মত জানিয়া লন। ইহা পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে কাঁহারও কাহারও নিকট অসঙ্গত মনে হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে অধিকাংশ সময় পরিচারিকা দ্বারা জানানই সুবিধা বলে মনে হয়, কারণ বহির্ব্বাটী হইতে অন্তঃপুর অনেকটা দূরে।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয় হইতে শ্রীমতী প্রেমবালা দত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম এবং শ্রীমতী কুমারী চারুবালা নিয়োগী দ্বিতীয় হইয়াছেন।

সম্প্রতি কিছু দিন হইল আমরা উড়িষ্যার গড়জাতের অন্তর্গত বোধ রাজের রাজধানীতে ছিলাম। সেখানে রাজ দেওয়ানের নিকটে এক মজার মকদ্দামা উপস্থিত দেখিয়া আসিয়াছি। একজন বৃদ্ধ পুরুষের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, বিধবা পুত্রবধূ অপর একজন পুরুষকে বিবাহ করিতে সমুদ্যত, শ্বশুর তাহাতে আপত্তি করিয়া এরূপ অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে যে, আমার একটি কনিষ্ঠ পুত্র বিদ্যমান,

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্ত্রী তাহাকে বিবাহ না করিয়া অপর কাহাকে বিবাহ করিতে পারে না। সে দেশের কোন স্ত্রী বিধবা হইলে তাহার দেবর থাকিলে তাহাকে বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু এই স্ত্রীর বয়ঃক্রম ২২। ২৩ বৎসর তাহার দেবরের বয়স ৮। ৯ বৎসর মাত্র। সেই যুবতীর শ্বশুর সেই বালকের সঙ্গেই তাহার বিবাহ-দানে ব্যস্ত। রাজদেওয়ান ব্রাহ্ম, তিনি কি আর বাদীর অন্যায় অভিযোগের সমর্থন করিবেন?

গড়জাতের অনেক রাজান্তঃপুরে শত শত যুবতী নারী বাস করে। ব্রাহ্মণাদি ভদ্র বংশীয়লোকেরা নিজ নিজ কন্যাদিগকে রাজান্তঃপুরে পাঠাইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে।

সে দেশে সাধারণ লোকের মধ্যে এমন একটি কুৎসিত প্রথা যে, স্ত্রী দোলে বা অন্য কোন পর্ব্বাহে স্বামীর নিকটে নূতন বস্ত্র না পাইলে বা অন্যকোন কারণে স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইলে স্বামীকে ছাড়িয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে। সেই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আর কোন অধিকার থাকে না। এই ব্যাপারকে "পয়াসামুণ্ডী" বলে। কিছু কাল হইল আটমালিকে এ বিষয়ে মোকদ্দমা হইয়াছিল। বোধরাজের বর্ত্তমান দেওয়ান তখন আটমালিক মহারাজের দেওয়ান ছিলেন। বিচারে তিনি আশ্রয়দাতা পুরুষকে দণ্ডিত করেন। কিন্তু মহারাজ তাহাতে অসন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন ইহা এখানকার প্রচলিত রীতি।

উড়িষ্যার প্রায় সমুদায় লোকই প্রত্যহ অন্ততঃ একবেলা পান্ত ভাত খায় শুনিলাম রাজা এবং রাণীও পান্ত খাইয়া থাকেন। পান্তভাতের বড় আদর। কটক নগরনিবাসী আমাদের স্নেহের কন্যা বলিয়াছেন, পান্ত ভাত শীঘ্র জীর্ণ হয় না, তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ ভোজন করা প্রয়োজন হইয়া উঠে না। এদেশের লোক সাধারণতঃ গরিব। তাহাতে তাহাদের আহারের ব্যয়ের লাঘব হয় আমরা তাহা মানিলাম, কিন্তু রাজা রাণী কি গরিব? তাহাদিগকে প্রত্যহ পান্ত ভাতের ভক্ত হইতেই হইবে।

গড়জাত প্রদেশ দিয়া জল পথে কটকে আসিতে মহানদীর কূলে বৈদ্যেশ্বর নামক স্থানে অনেক লোকালয় দেখিতে পাইয়া আমরা একটি বৃহৎ বাজার ভাবিয়া কিছু খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য সেখানে গিয়াছিলাম। দেখা গেল নামেমাত্র বাজার। দুইখানা মুড়ির দোকানমাত্র আছে। তাহাতে সামান্য ডাইল চাউল ব্যতীত অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। পথের দুই পার্শ্বে গৃহস্থদিগের বাড়ী। মেয়েরা ইতস্ততঃ কাজ কর্ম্ম করিতেছে। তাহাদের শরীরে পিত্তলের মোটা মোটা ভয়ঙ্কর অলঙ্কার। একটি ৮। ৯ বৎসরের বালিকাকে দেখা গেল মণিবন্ধ হইতে কুনুই পর্য্যন্ত ৩। ৪ সের ওজনের পিত্তলের বাহুটি। সে এই বিষম অলঙ্কারের বোঝা হাতে পরিয়া হাত নাড়া চাড়া করে কিরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারা গেল না। হায়! এ কি পাপের শাস্তি! ইহা অপেক্ষা হাতে হাতকড়া পায়ে বেড়ী জেলখানার কয়েদীও অনেক সুখী! এই প্রকার অলঙ্কার মেয়েরা আবার সাধ করিয়া পরে। কি ঘোরতর অসভ্যতা! ইহাদের বস্ত্র পরিধান প্রণালীও অতিশয় জঘন্য।

ভিখারিণীর পত্র স্থানাভাবে এবার বাহির হইল না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আগামী আষাঢ় মাসেই মহিলার ১০ম বৎসর পূর্ণ হইবে। গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিলম্বে মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করিবেন।
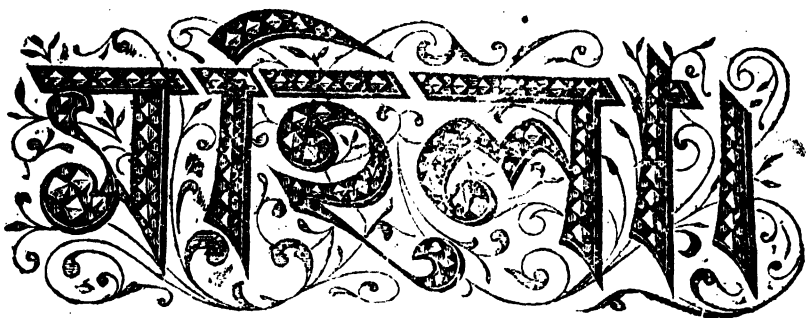
মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১০ম ভাগ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১২ ; জুন, ১৯০৫ । [১১শ সংখ্যা ।

স্ত্রীনীতিসার।

নারী, তোমার চরিত্রে কোমলতা ও কঠিনতার পূর্ণ বিকাশ ও সামঞ্জস্য হইলে তুমি ধরাতলে দেবী বলিয়া সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিবে। তুমি স্নেহ প্রেমে, গোলাপ কুসুমের ন্যায় কোমল এবং পবিত্রতায় লৌহের ন্যায় কঠিন হইবে। গোলাপ ফুল কোমলতায়, সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে সকলকে মুগ্ধ করে; কিন্তু তোমাতে কেবল কোমলতা ও সৌন্দর্য্যাদি থাকিলে চলিবে না, তাহাতে পুণ্যের তীব্রতার যোগ না হইলে, তোমার জীবন সহজে কলুষিত ও বিকৃত হইবে। পবিত্রতাশূন্য প্রেম মায়া মোহে পরিণত হইয়া পাপ দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দান করে। পুণ্যবিহীন প্রেমে বহুনারীর দুর্গতির একশেষ হইয়াছে, তাহাতে অনেকে পাপের প্রতিমূর্ত্তি পিশাচীর রূপ ধারণ করিয়াছে।

তুমি পুরাণ গ্রন্থে দেবী সীতা ও দময়ন্তীর চরিত্র কাহিনীপাঠ করিয়া থাকিবে; তাঁহারা প্রেমে পুষ্প অপেক্ষা কোমল; পুণ্যে লৌহ অপেক্ষা কঠিন ছিলেন ও বিষম পরীক্ষা পাপ প্রলোভনকে তাঁহারা কেবল পুণ্যবলে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের চরিত্রের এত সৌন্দর্য্য হইয়াছে, তাঁহারা দেবী বলিয়া পূজিত হইয়াছেন।

তোমার পুণ্যের তেজ দেখিয়া সকলে যেন তোমাকে ভক্তির সহিত সম্মানকরে, পুণ্যে তুমি লৌহসম—বজ্রসম কঠিন হও। কাহাকে ভাল বাসিতে যাইয়া যেন তোমার কোন রূপ নীতির স্খলন না হয়। নীতিহীন পতি-পুত্রাদির অন্যায় অনুরোধ ও উপরোধ উপেক্ষা করিয়া নিজের চরিত্রের দৃঢ়তা রক্ষা করিবে, কিছুতেই বিচলিত হইবে না। পুণ্যজ্যোতিঃতেই প্রেমের সৌন্দর্য্য। পুণ্যবিহীন প্রেম নিতান্তই মলিন নরকতুল্য। কল্যাণি, তুমি পুণ্যভূমির উপর প্রেম প্রতিষ্ঠিত রাখিবে। অন্যথা তোমার জীবন নানা পাপের আলয় হইবে।

হিন্দুসমাজে নারীপূজা।

খ্রীষ্টবাদী ক্যাথলিক সম্প্রদায় খ্রীষ্ট-মাতা মেরী দেবীকে ঈশ্বরের জননী বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন। ফ্রান্সের সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত কম্‌ট নারীপূজা প্রবর্ত্তনে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ ইয়ুরোপীয় খ্রীষ্ট সম্প্রদায় ভুক্ত লোকেরা উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে না হউক সাংসারিক ভাবে নারীজাতিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া থাকেন। নারী জাতীয়া ভগবতী শক্তি দেবী হিন্দু শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান উপাস্য দেবতা। তাঁহারা শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ও শক্তির উপাসক বলিয়া শাক্ত নামে পরিচিত। পুরাণশাস্ত্রে উল্লিখিত যে, শক্তি দেবী মহাদেবের পত্নী দক্ষরাজ-দুহিতা। তিনি পরমা সতী ভগবতীরূপে শাক্ত সম্প্রদায়ের বিশেষ ভাবে আরাধ্য হইয়াছেন। সেই ভগবতীর রূপান্তর কালী দুর্গা ইত্যাদি। পাপাসুর দলন করিবার জন্য সতী ভগবতী কালী বা দুর্গারূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এরূপ কল্পিত হইয়াছে। কালীর রণোন্মত্তা ঘোর করাল মূর্ত্তি, দুর্গা দেবী অসুরসংহারক ভয়ঙ্কর সিংহ বাহিনী সশস্ত্র দশ ভুজ ধারিণী হইয়া অসুরসংহারে প্রবৃত্ত, ইহা প্রতিমার আকারে প্রকাশিত। সেই প্রতিমা বঙ্গদেশে হিন্দু সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে পূজিত হইয়া থাকে। প্রথমে উপাসকগণ দেবী ভগবতীকে মা বলিয়া সম্বোধন করেন, পরে কবি সেই মার শক্তি স্বরূপাদি উপমায় বর্ণন করেন, অবশেষে তাহাকে প্রতিমায় প্রকাশ করা হয়। স্থূলদর্শী সাধারণ লোক প্রতিমাতেই আবদ্ধ ও অনুরক্ত হইয়া পড়ে। তাহা হইতেই প্রতিমা পূজার ঘটা হয়। প্রতিমাতে কালী পূজা দুর্গা পূজা জগদ্ধাত্রী পূজা ইত্যাদি হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র নর নারী সেই পূজায় আমোদে মত্ত হইয়া উঠে, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে, দেবীর তুষ্টির উদ্দেশ্যে ছাগ মেষাদি পশু বলিদান করিতে থাকে। কেবল শাক্ত সম্প্রদায় যে এই রূপে নারী পূজা করিয়া থাকেন তাহা নহে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও বিষ্ণুর প্রিয়তমা পত্নী লক্ষ্মীদেবীর উপাসক। লক্ষ্মী মূর্ত্তির পূজা ভক্তিপূর্ব্বক শাক্তগণও করিয়া থাকেন। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজা হয়। লক্ষ্মী কল্যাণ দায়িনী শ্রীসম্পদ্ বিধায়িনী বলিয়া বর্ণিত। ইহা হইল প্রতিমায় দেবী পূজা। কিন্তু কাশী কামাখ্যা প্রভৃতি তীর্থ স্থানে কুমারী ও সধবা নারীদিগকে, তীর্থযাত্রিকগণ পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে দেবীর আবির্ভাব জানিয়া তাঁহাদিগকে ভক্তিপূর্ব্বক বস্ত্রালঙ্কার ও মুদ্রাদি দান করা হয়, এবং তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করান হইয়া থাকে, তাহা না হইলে তীর্থ দর্শন সফল হয় না। তাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস প্রত্যেক তীর্থযাত্রিককে কুমারী পূজা ও সধবা পূজা করিয়া তাঁহাদের প্রসন্নতা লাভ করিতে হয়।

হিন্দু ধর্ম্মে নারীর এত দূর সম্মান ও গৌরব, নারী দেবী বলিয়া পূজিত হওয়ার বিধি। আজ দেখ গৃহে গৃহে, প্রতি পরিবারে মাতৃ জাতীয়া দেবীরূপিণী নারীর অবমাননা ও দুর্গতির একশেষ। কুমারীগণ লাঞ্ছিত ও সধবা বিধবায়া পদ দলিত

হইতেছেন। শ্বশ্রূ শ্বশুর স্বামীর অনাদর ও অবমাননায় কত সুকোমল প্রকৃতি পুণ্যবতী নারীর অশ্রু জলে বক্ষঃস্থল ভাসিতেছে। কেবল মৃৎপ্রস্তরাদিতে প্রতিমা গঠন করিয়া তাহাকে মা বলিয়া পূজা করিলে কি হইবে? যাঁহারা পরম জননীর মাতৃভাব ও তাঁহার জ্যোতি জীবনে প্রকাশ করিয়া থাকেন, হে অধম মানব, তুমি তাঁহাদিগকে সম্মান কর না, নিজের সেবার জন্য নিযুক্ত ক্রীতদাসীরূপে তাঁহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিয়া থাক, তাঁহাদের উপর অযথা প্রভুত্ব কর, তাঁহাদের প্রতি পশুবৎ ব্যবহার কর। এ অবস্থায় তোমার সেই প্রতিমা পূজার কি ফল লাভ হইবে। তুমি প্রথমতঃ নিজ গৃহে কুমারী কন্যা ও সধবাদিগকে শ্রদ্ধা সম্মান করিতে শিক্ষা কর, পরে তীর্থ স্থানে যাইয়া কুমারী পূজা ও সধবা পূজা করিও। তুমি মনে করিতেছ কি মাতৃজাতীয়া লক্ষ্মীরূপিণী নারীদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া বাহ্যে দেবী পূজার আড়ম্বর প্রদর্শনপূর্ব্বক পরম মাতার প্রসন্নতাভাজন হইবে, তাহা কখনও নহে। তোমার উপর স্বর্গ হইতে অভিসম্পাত আসিবে।

বাহ্যিক রূপ গুণ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কোন নারীকে আদর করিলে তাঁহার প্রতি প্রকৃত ভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মান দান করা হয় না। পাশ্চাত্য ও এদেশীয় লোকেরা নারী পূজা প্রতিষ্ঠিত করিলেন, ইহা কেবল তাঁহাদের বাহ্যিক আতিশয্য। তাঁহাদের নারীপূজা প্রকৃত নারীপূজা নয় বরং তাহাতে ঈশ্বরাবমাননারূপ পাপ সংঘটিত হয়। নারীতে স্বর্গীয় জ্যোতি ও পরম জননীর আবির্ভাব দিব্য চক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি স্থাপন করিলে প্রকৃত ভাবে পূজা হয়। নারীগণ, তোমরা আপনাদিগকে নীচ মনে করিও না তোমাদের মধ্যে স্বর্গের দেবী প্রচ্ছন্ন ভাবে আছেন, সাধ্বী সদাচারিণী হইয়া তাঁহাকে নিজেদের জীবনে ও চরিত্রে প্রস্ফুটিত হইতে দাও, কোন রূপ পাপ কুনীতির আবরণে তাঁহাকে ঢাকিয়া রাখিও না। তোমাদের ভাবে, বাক্যে, কার্য্যে পুণ্যপ্রভা বিকীর্ণ হউক, স্বর্গের লাবণ্য প্রস্ফুটিত হউক। তাহা হইলে সহজে তোমরা সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইবে। জ্ঞান সভ্যতায় মানবজাতি বহু দূর অগ্রসর হউক না কেন, তোমরা প্রকৃতরূপে সম্মানিত ও পূজিত না হইলে কিছুতেই মানবসমাজের সমীচীন সমুন্নতির সম্ভাবনা নাই।

অসভ্যজাতির নারী-মর্য্যাদা।

আমরা ভারতের নানা পর্ব্বত ও অরণ্যময় প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বহু অসভ্য বন্যজাতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাদের মধ্যে নারী মর্য্যাদা, নারীর প্রতি সম্মান দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হওয়া গিয়াছে। সেই বন্য জাতীয় স্ত্রীলোকেরা পুরুষ জাতি অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য। পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে না, কন্যাই অধিকারিণী হইয়া থাকেন। পুরুষ বিবাহের পর পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে যাইয়া বাস করে। সেখানে স্ত্রীর

কর্তৃত্বাধীন হইয়া তাহাকে থাকিতে হয়। সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য ও স্বাধীনতা, পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা সংসারে কাজ কর্ম্ম অধিক করে, এবং অধিক উপার্জ্জনক্ষম। অনেক স্ত্রী স্বামীকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রায় নাই। কুমারী যুবতীগণ স্বাধীনভাবে পুরুষদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া কাজ কর্ম্ম করে, সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে, অথচ কোন পুরুষ কুমতিবশতঃ তাহাদের মর্য্যাদার হানি করিয়াছে এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। কোন যুবক কুদৃষ্টিতে যুবতীদের প্রতি লক্ষ্য করে না, ও তাহাদের সঙ্গে কুভাবে হাস্যোপহাস করে না। ব্যভিচারে প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্ত হয়। নারীমর্য্যাদা ও চরিত্রের শুদ্ধতা বিষয়ে সেই মূর্খ অসভ্য লোকেরা জ্ঞান গর্ব্বিত সভ্যলোকাপেক্ষা যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সকল অসভ্য জাতির নিকটে আমাদের ন্যায় সভ্য জাতির অনেক সুনীতি শিক্ষা করিবার আছে। পুরুষেরা স্ত্রীলোককে অতিক্রম করিয়া কোন কাজ করে না। স্ত্রী পুরুষ সম্মিলিতভাবে স্থানান্তরে গমন কালে, স্ত্রী অগ্রগামিনী হয় পুরুষ পশ্চাতে থাকে। চরিত্রহীন ইংরাজ ও বাঙ্গালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে তাহাদের দোষে অনেকস্থলে অসভ্য যুবতীদিগের চরিত্র কলুষিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। স্বভাবতঃ ভুটিয়া জুমিয়া প্রভৃতি কয়েকটি অসভ্য জাতির চরিত্র প্রশংসনীয় নহে। তাহা ছাড়া মোটা মোটি যত দূর জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে অন্য অসভ্য জাতীয়া নারীদিগের চরিত্রের শুদ্ধতা বিষয়ে কোন সন্দেহ করা যায় না। অসভ্য জাতীয় পুরুষেরা নারীদিগকে ভয় ও সম্মান করিয়া থাকে, তাহাদের সঙ্গে কোনরূপ অপবিত্র সম্বন্ধস্থাপন করিতে সাহসী হয় না। বিশেষতঃ এবিষয়ে অসভ্য জাতি মধ্যে সামাজিক শাসন ও রাজশাসন অতিশয় প্রবল। আমরা এক সময়ে শিলচরে একজন কুকীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তোমাদের মধ্যে ব্যভিচার আছে? সে বলিয়াছিল, কোন পুরুষ ব্যভিচার করিলে রাজা তাহাকে কাটিয়া ফেলেন, চুরি করিলে গোলাম করিয়া রাখেন। কেমন কঠিন শাসন। অসভ্য কুকি জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ বিরল নহে, কিন্তু সচরাচর বয়ঃস্থা নারীদেরই বিবাহ হয়।

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(বদরপুর হইতে ধুবড়ী পর্য্যন্ত।)

বিগত ৩রা মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে আমরা শিলচর নগর হইতে বদরপুর জংশনে উপনীত হইয়া তত্রত্য রেলওয়ে ডাক্তার শ্রীমান্ সত্য প্রসাদ সেনের আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। শ্রীমান্ সত্যপ্রসাদ আমাদের একজন পুরমাত্মীয় যুবক, তিনি বদরপুরে সপরিবারে বাস করিতেছেন। তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সত্যপ্রসাদ ষ্টেশন হইতে আমাদিগকে স্বকীয় আবাসে লইয়া

আইসেন, তিনি আমাদিগকে পাইয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন। বদরপুরের চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিরমণীয়। ইতস্ততঃ ক্ষুদ্র পর্ব্বত শ্রেণী ও বিস্তীর্ণ প্রান্তর নয়ন মনকে আকর্ষণ করে। সে দিবস আমরা বদরপুরে স্থিতি করি। শ্রীমান্ আশুতোষ সঙ্গীত করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

৪ঠা মাঘ প্রাতঃকালে আমরা বদরপুর হইতে পার্ব্বত্য রেলপথে গৌহাটী নগরে যাত্রা করি। বদরপুর হইতে লামডিং জংশন পর্য্যন্ত প্রায় একশত বিশ মাইল পথ আমাদিগকে পর্ব্বতের উপর দিয়া রেলওয়ে যাইতে হইয়াছিল। বোধ হয় ক্রমে আমরা ৩। ৪ হাজার ফুট উচ্চ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়াছিলাম। একটী সর্পগতি খর স্রোত পার্ব্বত্য নদীর পার্শ্বদিয়া বাষ্পীয় শকট সবেগে চলিয়াছিল। উক্তনদীর নাম জাটিঙ্গা, এই নদী-জলে প্রচুর মৎস্য। জাল ফেলিয়া সে সকল ধরিবার লোক নাই। অসভ্যনাগারা এক প্রকার বিষাক্ত লতা জলে ফেলিয়াদেয় তাহাতে জল বিষাক্ত হয়, মাছ মরিয়া ভাসিয়া উঠে। ক্রমশঃ ৩২টি টনেল (পার্ব্বত্য সুড়ঙ্গ) আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। তাহার মধ্যে অনেকগুলি টনেল ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের অন্তর্গত জামালপুরের টনেল অপেক্ষা বিস্তীর্ণ। সেই সকল টনেলের ভিতরে প্রবেশ করিলে দিবাভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীর ন্যায় বোধ হয়। স্থানে স্থানে অনেকগুলি সেতু পার হইতে হইয়াছিল। কতক দূর পথ উচ্চ শৈল শিখরে অগ্র পশ্চাতে দুইটি ইঞ্জিনের বলে ট্রেণ আরোহণ করিয়াছিল। শকট হইতে উভয় পার্শ্বে বিবিধ তরুরাজি সমাচ্ছন্ন সাগরতরঙ্গাকৃতি সমুচ্চ শৈলশ্রেণীর সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের কথা বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না, স্থানে২ কত সুন্দর সুন্দর কুসুম বিকশিত হইয়া নিবিড় অরণ্যকে আলোকিত করিয়া রহিয়াছে দৃষ্ট হইল। সকল সৌন্দর্য্যের আকর বিশ্বশিল্পী কাহার মনমুগ্ধ করিবার জন্য এই নির্জ্জন গিরিকাননে এত সৌন্দর্য্য ঢালিয়া রাখিয়াছেন তিনিই জানেন, ধন্য তাঁহার শিল্প চাতুর্য্য! আশুতোষ উচ্ছ্রিত শিখর গিরি শ্রেণীর শোভা দর্শনে মগ্ন ও মত্ত হইয়া এক এক বার আমাকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "মহাশয় চশমা পরুন চাহিয়া দেখুন কি ব্যাপার।" এক এক স্থানের গিরি গহ্বর সতেজ তরুলতায় শোভিত হইয়া প্রকৃতি দেবীর বিহারভূমি নিকুঞ্জ-কাননস্বরূপ হইয়া আছে। এরূপ প্রতীতি হইল সেই সুগম্ভীর সুন্দর শৈলরাজি মহিমার্ণবের বিচিত্র মহিমাই প্রকাশ করে। যাঁহার দিব্য চক্ষু আছে, তিনি কেবল সর্ব্বত্র তাঁহার মহিমা দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দান করেন।

সেই রমণীয় পর্ব্বত সকলে দুরন্ত অসভ্য নাগাদিগের বাস। ট্রেণ হইতে গিরিচূড়ায় তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবাস কুটীর দৃষ্টিগোচর হয়। পথ প্রান্তে স্থানে স্থানে নাগা স্ত্রীপুরুষদিগকে শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান, দৃষ্ট হইয়াছে। বিগত বর্ষায় কোন কোন স্থানে পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রেলের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছিল। তজ্জন্য কিছুকাল রেলের গতি বন্ধ ছিল। বর্ষাপগম হইতে পথ

সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, শকট চালিত হই তেছে। সেই রেলপথকে নিরাপদ করিবার জন্য শত শত কাবোলী ও পঞ্জাবী পুরুষ সর্ব্বদা রেল পথের উভয় পার্শ্বে স্থিত গিরি প্রশস্ত পাথর গাথিয়া সুদৃঢ় করিতেছে। আসাম বেঙ্গল রেল ওয়ের প্রসার চট্টগ্রাম হইতে সর্ব্ব শুদ্ধ প্রায় ৭৪০ মাইল, ইহার অন্তর্গত পার্ব্বত্য রেলপথ নির্ম্মাণেই বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে। শ্রুত হইল গতবৎসর পর্য্যন্ত আশাম বেঙ্গল রেলওয়ের জন্য এগার কোটী ষাট লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। এই পার্ব্বত্য রেলপথ প্রত্যেক ৭ ফুট অন্তর এক ফুট করিয়া চড়াও। এই রেল পথের এক পার্শ্বে একটি কবর বিদ্যমান। উহা রেলওয়ে সংক্রান্ত একজিকিয়ুটি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কবর। উক্ত সাহেব একদিন কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া ঘোড়ার উপর হইতে একজন কন্‌ট্রাক্টর পাঠানকে চাবুক মারিয়াছিলেন। তাহাতে উক্ত পাঠান কোপিত হইয়া সাহেবকে করবালের আঘাতে নিহত করে। যেস্থানে সেই হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল,তথায় সাহেবের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ সমাধিবেদী স্থাপন করা হইয়াছে।

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের প্রায় কোন ষ্টেশনেই ভাল খাবার পাওয়া যায় না। আশ্চর্য্য এই যে, সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের অনেক গুলি ষ্টেশনে উৎকৃষ্ট লুচি মিষ্টান্নাদি বিক্রয় হয়। বহু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় ও পাঞ্জাবীলোক স্থানে স্থানে বর্ত্ম নির্ম্মাণাদি কার্য্যে নিযুক্ত, বোধ হয় সেই সকল খাবার অধিকাংশ তাহারাই ক্রয় করিয়া থাকে। নতুবা প্রতিদিন একবার মাত্র আপ ট্রেণ ও ডাউন ট্রেণের গতিবিধি হয়,তাহাতে অধিক আরোহী হয় না।

আমরা সায়ংকালে লামডিং জংশনে উপনীত হই, এখানে হইতে ব্রাঞ্চ লাইনে গৌহাটী যাইতে হয়। লামডিং হইতে গৌহাটী নগর ১১২½মাইল। রাত্রি ৩টার সময় তথা হইতে গৌহাটিতে যাত্রা করিতে হয়। ডাক্তার সত্যপ্রসাদ বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে বদরপুর হইতে আমাদের সঙ্গে কিয়দ্দূর এক গাড়িতে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে যত্নপূর্ব্বক নিশা যাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য লামডিংয়ের ষ্টেশন মাষ্টার ও ডাক্তারকে পত্র দিয়াছিলেন। গৌহাটির ট্রেণ সায়ংকাল হইতে লামডিং ষ্টেশনে স্থিতি করে। ষ্টেশনমাষ্টার বাবু পত্র পাইয়া ষ্টেশনেই আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করেন। ডাক্তার রাজেন্দ্র কুমার দাস গুপ্তকে ষ্টেশনে পাওয়া যায়। তিনি সত্যপ্রসাদের পত্র পড়িয়া ভোজন করাইবার জন্য আদরপূর্ব্বক আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে স্বীয় আবাসে লইয়া যান। কিয়দ্দূর গমন করিলে পর পথে আমাদিগকে বৃষ্টি ভোগ করিতে হইয়াছিল। তজ্জন্য কিছু দিন সর্দ্দি কাশী রোগ ভোগ করা গিয়াছিল। ভোজনান্তে আমরা ষ্টেশনে যাইয়া গৌহাটীর গাড়ীতে শয়ন ও বিশ্রাম করি।

পর দিন ৫ই মাঘ বুধবার বেলা ১১টার সময় আমরা গৌহাটী ষ্টেশনে উপনীত হই। আমাদের গৌহাটী নগরস্থ আত্মীয় শ্রীমান্ অশ্বিনীকুমার সেন আমরা যে সেই দিন

পঁহুছিব পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন। তিনি ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া অদূরস্থ স্বীয় আবাসে আমাদিগকে লইয়া যান। স্নেহ ভাজন কন্যা (ভ্রাতুষ্পুত্রী জ্ঞাতি ভ্রাতার কন্যা) উক্ত গৃহের গৃহিণী। গৃহে পঁহুছিবা মাত্র তিনি সহাস্য বদনে আসিয়া আমাদিগকে প্রণাম করেন। আমি তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, বহু কাল দেখি নাই, বাল্যকালে দেখিয়া থাকিব। পরে পরিচয় পাইয়া আমাদের আনন্দ হয়। আমাদের আগমনে তাঁহারও অতিশয় উৎসাহ ও আনন্দ হইয়াছিল। কন্যাটী যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী, তিনি আমাদিগকে মায়ের মত যত্ন করিতে লাগিলেন; উৎসাহপূর্ব্বক স্বহস্তে রন্ধন পরিবেশন করিয়াছেন, ভোজ্যাদির ঘটা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তবে পূর্ব্বোল্লিখিত হরিপুরে ভোজন করিয়া যেমন আমাদের কাহারও স্বরভঙ্গ এবং অজীর্ণ দোষ ঘটিয়াছিল, পরে আদাইয়ের গৃহিণী তদপেক্ষা অধিকতর ভোজ্যায়োজনে সমুদ্যত হইয়াও আমাদিগকে রোগীর উপযোগী লঘু পথ্য যোগাইয়া আমাদিগকে বিদায় দানে বাধ্য হইয়াছিলেন, এখানে সেই হরিপুরের ন্যায় ভোজনে অত্যাচার হয় নাই। তবে বিদায় হওয়ার দিন অপরাহ্নে স্নেহের কন্যা কতকগুলি পায়স ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া আমাদের সম্মুখে আনয়ন পূর্ব্বক তাহা ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করেন। আমরা তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করি। তিনি আগ্রহ সহকারে বলেন, "মা ছেলেকে দিতেছে, খাইতেই হইবে, কিছুই অসুখ হইবে না।" ইহা বলিয়া মিষ্টান্নাদি হাতে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। অনেক বৎসর হইল মাতৃদেবী ৯৪ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরা সেই স্নেহময়ী মাতাকে হারাইয়া মাতৃহীন হই নাই। স্বদেশ বিদেশে আমার অনেক তরুণবয়স্কা মা প্রকাশিত হইয়া আমাকে মায়াজালে বদ্ধ করিয়াছেন। সেই সকল মা যেন আমার হৃদয়ের পুতুল হইয়াছেন। তাঁহাদের মুখ মণ্ডল প্রসন্ন ও তাঁহাদিগকে সুখী দেখিলে আমার মনে পরমাহ্লাদ হয়, তাঁহাদের দুঃখে হৃদয় আহত হইয়া থাকে। আমি তাঁহাদের কল্যাণ ও উন্নতি নিয়ত প্রার্থনা করি, তাঁহাদের কোনরূপ সেবা করিতে পারিলে কৃতার্থ হইয়া থাকি।

আমরা গৌহাটী হইতে পর দিন কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিব, এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু তত্রত্য ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের অনুরোধে আমাদিগকে তিন দিবস তথায় স্থিতি করিতে হয়। আশুতোষের সুমধুর উষাসঙ্গীত ও উপাসনা সঙ্গীতে তথাকার বন্ধুগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আসামের প্রধান নগর গৌহাটী পূর্ব্বে আসাম প্রদেশে নানা বিভাগে ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া এই নগরে ৩।৪ বার আসিয়াছিলাম, আমাদের এবার নূতন আগমন নয়। গৌহাটীর বিশেষ বৃত্তান্ত পত্রিকা বিশেষে বহু দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ মনে হইতেছে। মহিলায় আর তদ্বিবরণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইল না।

৭ই মাঘ শুক্রবার সায়ংকালে গৌহাটীর পার্শ্ববর্ত্তী ব্রহ্মপুত্র নদে বাষ্পীয় পোতা-

রোহণে ধুবড়ী নগরে যাত্রা করা স্থির হয়। অপরাহ্নে যাত্রার আয়োজন করা গেল। আশুতোষ কোন প্রয়োজন বশতঃ বাজারে গেলেন। তিনি এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন, এরূপ আশা করা গিয়াছিল, ক্রমে ৩,৪ ঘণ্টা হইয়া গেল, আমরা তাঁহার জন্য অত্যন্ত ভাবিত হইলাম। যাত্রার সময় উপস্থিত প্রায়, এদিকে সহযাত্রী আশুতোষ নাই, তাঁহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া রওয়াণা হওয়া যায়। তাঁহার উদ্দেশ্যে আমরা বাজারের দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম কোথাও তাঁহার অনুসন্ধান না পাইয়া আকুল হইয়া পড়িলাম। আশুতোষ গোহাটীতে নূতন আসিয়াছেন, পথ হারাইয়া বা কোথায় চলিয়া গেলেন, একএক বার এই প্রকার ভাবিতে লাগিলাম, আবার ভাবিলাম আশু বাজারে আরও গিয়াছেন, তিনি কচি ছেলে নন, যে পথ হারাইবেন। রওয়াণা হইবার প্রাক্কালে দেখি আশুতোষ শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করা গেল, ব্যাপার কি? এত বিলম্ব কেন হইল? তখন তিনি সলজ্জভাবে মৃদুস্বরে বলিলেন, আজ্ঞা কামাখ্যা পাহাড়ে গিয়াছিলাম, উহা এত দূরে পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। গৌহাটী নগরের দক্ষিণ প্রান্তে দুই মাইল দূরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে কামাখ্যা পর্ব্বত, উহা হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ, সেই পর্ব্বত সমুচ্চ ও দুরারোহ, আশুতোষের কামাখ্যা পর্ব্বত দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। গৌহাটীতে আসিলাম, তীর্থ দর্শনের পুণ্য বাকি থাকে কেন? ইহা তিনি ভাবিয়াছিলেন। আমাদের নিকটে অনুমতি চাহিলে অনুমতি পাইবেন না, আমরা বাধা দিব ইহা ভাবিয়া আমাদিগকে জ্ঞাপন না করিয়াই চলিয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক আশুতোষকে পাইয়া হারাণ ধন পাওয়ার ন্যায় আমাদের মনে আহ্লাদ হইয়াছিল। সায়ংকালে জাহাজাভিমুখে যাত্রা করা গেল। প্রায় এক মাইল নগরবর্ত্ম এবং এক মাইল ব্রহ্মপুত্রের সিকতাময় পুলিন পদব্রজে অতিক্রম করিয়া জাহাজে আরোহণ করা যায়। আমরা তৃতীয় শ্রেণীর আরোহী হইলাম, ডেকে তৃতীয় শ্রেণীর লোকের বিষম ভিড় ছিল। জাহাজের পোষ্ট মাষ্টার বাবু অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার ক্যাবিনের পার্শ্বে সুবিধামত আমাদের রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রাতঃকালে আশুতোষ সঙ্গীত শুনাইয়া সেই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা দান করিলেন।

বেলা ৮ টার সময় ধুবড়ীতে পৌঁছিয়াছিলাম। তত্রত্য ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ সরকার আমাদের উদ্দেশ্যে দুইবার ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তৃতীয় বার আমাদের সঙ্গে ঘাটে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাদিগকে প্রায় এক মাইল দূরে তাঁহার আলয়ে লইয়া যান। তথায় স্নানোপাসনা ও ভোজন ও বিশ্রামান্তে অপরাহ্ণ ট্রেণে আরোহণ করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করা যায়। পর দিন ৯ই মাঘ রবিবার মধ্যাহ্নে আমরা মহানগরী কলিকাতায় উপস্থিত হই।

দাদা মহাশয় ও নাতনী।

বিশ্বধাম।

সরলা। দাদা মহাশয় আজ আমাকে কি বলিবেন বলুন।

দাদা মহাশয়। আচ্ছা তুমি একটি ব্রহ্ম সঙ্গীত গাও। সরলা গাইল।

খাম্বাজ। তাল চৌতাল।

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম, দয়ার যাঁর নাহি বিরাম ঝরে অবিরত ধারে।

জোতি যার গগনে গগনে, কীর্ত্তিভাতি অতুল ভুবনে, প্রীতি যাঁর পুষ্পিত বনে, কুসুম মত নব রাগে।

যাঁর নাম পরশ রতন, পাপ হৃদয় তাপ-হরণ, প্রসাদ যাঁর শান্তিরূপে ভকত হৃদয়ে জাগে, অন্তহীন নিরাকার, মহিমা যাঁর হয় অপার, যার শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি বচন হারে॥

দাদা। আচ্ছা দিদিমণি, "বিশ্বধাম" বলিলে তোমার মনে কি ভাব হয় বল দেখি?

সরলা। বিশ্বধাম "বিস্তীর্ণ জগত" এই তো জানি এর বেশী আর কি ভাব হতে পারে, তা তো কখন ভাবিনি।

দাদা। শিক্ষার পুরাতন প্রণালী অনুসারে শব্দার্থ শিখে রেখেছ। তাহার অনুরূপ ভাব ধারণার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তাহা তো পাও নাই। আমি আজ তোমাকে কতক গুলি বিষয় বলিব তাহাতে "বিশ্বধাম" শব্দের কিছু কিছু ধারণা করিতে পারিবে, বোধ হয় তুমি জান যে, আমাদের পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া একটি বায়ুরাশি আছে। ইহাকে বলে আকাশ Atmosphere। আকাশ ঊর্দ্ধে পঞ্চাশ মাইল পর্য্যন্ত আছে। তার পরে অনন্ত শূন্য Space এই শূন্যে কত গ্রহ কত নক্ষত্র কত সূর্য্য কত চন্দ্র যে আছে তাহা কে গণনা করিতে পারে। এই সমস্ত জ্যোতিস্ক মণ্ডলের স্থিতি ও গতি এক মাধ্যাকার্ষণী শক্তির দ্বারা হইতেছে।

সরলা। উঃ বাবা, মাধ্যাকর্ষণী শক্তির এত শক্তি!

দাদা। আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ। ইংরাজিতে Planet বলে, Planet শব্দের অর্থ পরীব্রাজক। কারণ গ্রহগণ নিজ নিজ সূর্য্যের চারি দিকে ঘোরে। আমাদের পৃথিবীও আর সাতটি গ্রহ পরস্পর হইতে বহু দূরে থাকিয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই সমস্তকে একটি সূর্য্যমণ্ডল বা সৌর জগত Solar System বলে। এইরূপ যে কত মণ্ডল আছে তাহা কেহ গণনা করিতে পারে না। যত গুলি ছোট ছোট তারা দেখিতে পাও তারা এক একটি সূর্য্য। তাহাদের গ্রহগণ আছে, প্রতি গ্রহের একটি বা ততোধিক চন্দ্র আছে, আমাদের পৃথিবীর একটি মাত্র চন্দ্র। আমাদের সৌরজগতের গ্রহগণের নাম Mercury বুধ Venus শুক্র Earth পৃথিবী Mars মঙ্গল Jupiter বৃহস্পতি Saturn শনি Uranus আর Neptune শেষোক্ত দুইটির দেশীয় নাম নাই কারণ আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যখন গ্রহগণের নামকরণ করিয়াছিলেন তখন এই গুলি

আবিষ্কৃত হয় নাই। সূর্য্য আমাদের পৃথিবী হইতে ৯১ মিলিয়ন মাইল দূরে। এক মিলিয়ন দশ লক্ষ, এক মাইল ১৭৬০ গজ। কতটা দুর মনে কি ধারণা করিতে পারিলে।

সরলা। নানা দাদা মশাই, কিছুই পারিলাম না। মাথা যেন ঘুরে যায়।

দাদা। আচ্ছা আমি একটু সাহায্য করি। যে রেল গাড়ী ঘণ্টায় ৫০ মাইল হারে চলে, সেই রেল গাড়ী ২০০ বৎসরে সূর্য্যে পৌছিতে পারে। আমাদের পৃথিবীর পরিধি Circumference ২৫০০ মাইল, ব্যাসার্দ্ধ Radius ৮০০০ মাইল। কত বড় ভেবে দেখ। আপনার মেরুদণ্ডের উপর ঘুরিতে পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা লাগে ইহাকে দিন বলে। পৃথিবী সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিবার সময় এক ঘণ্টায় এক মিলিয়ন মাইল চলে তবুও চারি দিক্ ঘুরে আসিতে এক বৎসর হয়। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে Mercury বুধের প্রায় তিন মাস, Venus শুক্রের ৮ মাস, Earth পৃথিবীর ১২ মাস Mars মঙ্গলের প্রায় ২ বৎসর Jupiter বৃহস্পতির ১২ বৎসর Saturn শনির ৩০ বৎসর Uranus য়ের ৮৪ বৎসর Neptuneর ১৬৪ বৎসর লাগে। এখন মনে করে দেখ দেখি একটি সৌর জগত কত দূর দেশ ব্যাপী।

সরলা। উঃ বাবা! আর ভাবা যায় না।

দাদা। এখন সূর্য্যের কথা শুন। সূর্য্য এত বড় যে ১৫ লক্ষ পৃথিবী একত্র করিলে কতক পরিমাণে ইহার সমান হইতে পারে। ৮,৫০, ৪৮৭ মাইল ইহার ব্যাস। প্রকৃত সূর্য্য অর্থাৎ ঘন বিভাগ এত বড় নয়। সেটি আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা হয়ত ক্ষুদ্র হইতে পারে। এই ঘন বিভাগটাই আমরা দেখিতে পাই। ইহার চতুর্দ্দিকে কোটি কোটি মাইল ব্যাপি যে উজ্জ্বল বাষ্পরাশি আছে তাহা আমরা দেখিতে পাই না। সূর্য্য এমন তেজোময় পদার্থ যে তেজে সমস্ত ধাতু গলিয়া বাষ্পাকার হয়। পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্য ও আপন মেরুদণ্ডের উপর ঘোরে; ঘুরিতে ২৫ দিন লাগে।

সরলা। এসমস্ত তত্ত্ব কিরূপে জানা গেল।

দাদা। বহু কাল পূর্ব্ব হইতে জ্যোতির্বিদ্যার আলোচনা হইয়া আসিতেছে। আমাদের পুজ্যপাদ পূর্ব্ব পুরুষগণ এই বিজ্ঞানসম্বন্ধে বহু তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি করিয়াছেন, এবং ইহা জন সাধারণের সহজ লভ্য করিবার জন্য সুন্দর সুন্দর পুস্তক লিখিয়াছেন। গণিত শাস্ত্রের সাহায্যে এবং তাঁহাদের কৃত দুরবীক্ষণ যন্ত্র Telescope সাহায্যে গ্রহগণের গতি এবং দূরত্ব স্থির হইয়াছিল। Spectroscope নামক ইহারা একটি আশ্চর্য্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করেছেন, যদ্দ্বারা সূর্য্যের কিরণ বিশ্লেষণ করিয়া সূর্য্য কোন্ কোন্ উপাদান দ্বারা নির্ম্মিত, তাহা ইহারা স্থির করিয়াছেন। আহা তাঁহাদের কি অসীম বুদ্ধি ও অধ্যাবসায়! আমি এক জন মূর্খ। তাঁহাদের কৃত সামান্য সামান্য পুস্তক পড়ে আমি যে কত সুখ পাই তাহা বলিতে পারি না, এবং তদ্দ্বারা আমার ব্রহ্মো-

পসনার বড় সুবিধা হয় সেই জন্য আমি তাঁহাদের নিকট ঋণী।

সরলা। আমাকে এক খানি বই পড়িতে দিন না?

দাদা। এক খানি কেন, কত ভাল সহজ বই তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু তোমার ইংরাজী ভাষা জ্ঞান আর একটু হওয়া চাই; তাই তো তোমাকে ইংরাজী ভাল করে পড়িতে বলি। ইংরাজী ভাষায় আমাদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বিষয় জানিবার অনেক সহজ সহজ পুস্তক আছে, এবং সেই সকল পুস্তকের লিখিত বিষয় যথা সাধ্য কাজে পরিণত করিতে পারিলে সুস্থ শরীরে, স্বচ্ছন্দ মনে, স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারা যায়।

সরলা। আমি এখন হইতে খুব ভাল করে ইংরাজী পড়িব।

দাদা। আমাদের পৃথিবীর সৌর জগতের যে নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে আছে তাহাকে মন্দাকিনী ইংরাজিতে Nebula বা Milkyway বলে। ইহার মধ্যে ১৮ মিলিয়ন সূর্য্য আছে। এমন যে কত মন্দাকিনী আছে, তার শেষ নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিতে পৃথিবীর বার মাস লাগে। ঘুরিবার সময় Nebula মধ্যস্থ এক একটি নক্ষত্র পুঞ্জের নিকট দিয়া যায়, এক মাস একটি পুঞ্জের নিকট থাকে। এই বারটি পুঞ্জকে রাশি চক্র বলে। Zodiac জ্যোতিষ বেত্তারা একটি একটি পুঞ্জকে একটি একটি কাল্পনিক আকার দিয়াছেন তাহাকে ইংরাজীতে Signs of the Zodiac বলে। বাঙ্গালায় মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট সিংহ, কন্যা, তুলা বৃশ্চিক ধনু মকর কুম্ভ মীন বলে। পঞ্জিকায় রাশি চক্রের ছবী দেখিলে বুঝিতে পারিবে।

সরলা। সে ছবি গুলিতে এত তত্ত্ব! আমি অগ্রাহ্য করিয়া দেখিতাম না এবার ভাল করে দেখিব।

দাদা। আমাদের সৌর জগতের ব্যাপারটা কে কত বড় তাহার কিছুই বলা হইল না। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ বলেন যে, যে সমস্ত জগৎ আবিষ্কৃত হয়েছে তদ্ব্যতীত অনেক জগত আছে। যাহাদের আলোক আজও পৃথিবীতে পৌঁছে নাই। উঃ কি বিস্ময়কর। আর "বিশ্বধামের" রচয়িতা কেমন মহান্! সমস্ত বয়স কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু যত বয়স হইতেছে, ততই বুঝিতেছি যে কিছুই জানা হয় নাই। যখন স্রষ্টা এবং তাঁহার সৃষ্ট জগতের তত্ত্ব ভাবি তখন আমার মনের ভাব যে কি হয় তা বলিতে পারি না। তাঁহার ঐশ্বর্য্য, শক্তি, জ্ঞান শিল্প কৌশল ও প্রেমের কথা যুগপৎ মনে উদয় হয়ে একেবারে আত্ম হারা করে ফেলে। আহা! যে ঈশ্বর এমন অসীম জগতকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই আবার ক্ষুদ্র কীটাণু সৃষ্টি করিয়াছেন। কি বৃহৎ কি অণু যাহার তত্ত্ব অলোচনা করি তাহাতেই তাঁহারই শক্তি জ্ঞান ও প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। আহা! তাঁহার প্রেমের কথা কি বলিব! এমন দিন যায় না যে দিন তাঁহার বিরুদ্ধে আমি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শত শত অপরাধ না করি, কিন্তু এই অপরাধীর মুখে তিনি স্বয়ং অন্ন তুলিয়া দেন, এবং স্বহস্তে তাহার সেবা করেন।

তিনি শরীর মন প্রাণের সকল অভাব নিয়ত মোচন করিতেছেন। আমার প্রতিদিনের পান ভোজন শ্বাস প্রশ্বাস নিমেষ উন্মেষ যে তাঁহার অনন্ত প্রেমের নিদর্শন। আমি কি সে সমস্তের উপযুক্ত?

"হরি আমাদের বড় দয়াময় মনে হলে,
পাষাণ গলে, দুনয়নে বারি ধারা বয়।
আহা কিবা ভালবাসা না চাহিতে পূরে
আশা, চাহিতে তাই বড় লজ্জা হয়।"

সরলা। দাদা, আপনার বিশ্বধাম শব্দের ভাব ধারণা করিতে গেলে এতো জানিতে হয়। আমি যে কত কথা ব্যবহার করি তার অর্থ তোতা পক্ষীর মতন মুখস্থ করে রেখেছি কিন্তু তার ভাব কিছুই জানি না। এখন থেকে আপনি আমাকে সকল কথার অর্থ ভাল বুঝাইয়া দিবেন।

মহিলাদের রচনা।

কাঞ্চন জঙ্ঘা *।

কুজ ঝটিকামাত্র নাই গগনমণ্ডলে,
এ সময়ে কাদম্বিনী কোথা গেছে চলে?
পেয়ে দিব্য অবসর, মেঘমুক্ত দিবাকর
সগর্ব্বে আসীন হ'য়ে সুনীল অম্বরে
ছড়াইছে হাসি হাসি, উজল কিরণ রাশি,
ভাসাইছে জ্যোতিধারে, বিশ্ব চরাচরে।
পেয়ে সে প্রখর কর, হাস্যময় চরাচর,
কিরণ-ঝলকে যেন হাসিছে পুলকে;
জীব জন্তু নর দেব দ্যুলোকে ভূলোকে।
এ দিকে একটি ছুটি, বন ফুল আছে ফুটি
ওদিকে চায়ের ফুল মাধুরী ছড়ায়।
বহে মৃদু সমীরণ, করে স্নিগ্ধ প্রাণমন;—
বসন্তের গন্ধ যেন তাহে পাওয়া যায়।
সাগর লহরী প্রায়, স্তরে স্তরে শোভা পায়,
ভূধর তরঙ্গমালা এদিকে বিস্তৃত।
কেবল দক্ষিণ দেশে অতি অপরূপ বেশে
হরিত প্রান্তর খানি রয়েছে নিদ্রিত।
পূর্ব্বের পর্ব্বত খানি, আপনারে শ্রেষ্ঠজানি,
গৌরবগরবে যেন চুম্বিছে গগন!
পশ্চিমের উপত্যকা, দাঁড়ায়ে রয়েছে একা,
বুকে লয়ে গোটাকত সুরম্য ভবন।
ওকি ও অনেক দূরে, উত্তর গিরির চূড়ে,
স্তূপাকার মুক্তা হেন ওকি দেখা যায়?
ওবুঝি কাঞ্চন জঙ্ঘা? তাইত কাঞ্চন জঙ্ঘা,
কি হেতু কাঞ্চন নাম কে দিল উহায়?
ওত স্বর্ণ বর্ণ নয়, মুক্তানিভ সমুদয়,
ধবল তুষার স্তূপ অতি মনোহর!

মরি কি বা সমুজ্জ্বল, রবি করে ঝলমল,
করে! কত মনোরম!—প্রাণ মুগ্ধ কর!!
শ্যামল ভূধর রাজি, যেন গো ভূপতি সাজি,
কাঞ্চনে মুকুটরূপে পরেছ মাথায়।

এমন ভূষণ পেয়ে, গিরিরাজ ধন্য হয়ে,
প্রণমিছে নত শিরে কাঞ্চনের পায়!

---

* মোসলমান কন্যা শ্রীমতী আর এস্ হোসেন কিছু দিন পূর্ব্বে দার্জিলিং পর্ব্বত হইতে কবিতায় কাঞ্চনজঙ্ঘার বর্ণনা লিখিয়া মহিলায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাও তাঁহা কর্ত্তৃক বিরচিত সেই কাঞ্চন জঙ্ঘা গিরির অন্যরূপ বর্ণনা। "ইগেলস ক্রেগ" নামক পর্ব্বত শিখর হইতে মধ্যাহ্নে (আকাশ নির্ম্মল থাকিলে) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেরূপ দেখায় তদবলম্বনে রচিত। গিরি "কাঞ্চনজঙ্ঘা" প্রায় সর্ব্বদা মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে। সুতরাং তাহার দর্শন লাভ সাধারণ ব্যাপার নহে।

নির্ম্মল তুষার গলে, কাঞ্চনের পদতলে,
বহিছে নীহার নদি কত না সুন্দর ?
কে যাবে ও হিমদেশে কে কহিবে দেখে এসে,
সে কেমন রম্যস্থান সৌন্দর্য্য আকর ?
না জানি কতই তাহা, বিমল শীতল আহা,
তাই বলি, ও কাঞ্চন ভূতলে অতুল,
যশস্বী, উহারে পেয়ে হন গিরিকুল।
কিন্তু সেই মহাকবি, আঁকিয়া এমন ছবি,
আপনি অদৃশ্য হয়ে আছেন কোথায় ?
পরস্পরে তরুলতা, কহিছে তাঁহারি কথা,
যেন বলিতেছে "বিভু এইত হেথায় !"
সে দিকে ফিরালে আঁখি, বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি
বিভু যেন সরে যান মরীচিকা প্রায় !
কিন্তু সে চরণরেখা সর্ব্বত্রই যায় দেখা,
কুসুম সৌরভে তার গন্ধ পাওয়া যায়।
(ভক্তিচক্ষু আছে যার, দেখিতে কি বাকি তার,
সে মুদ্রিত চক্ষে তাঁর দরশন পায়।)
অস্ফুট নীরব স্বরে, প্রকৃতি প্রচার করে,
শিল্পীর মহিমা শিল্প আপনি জানায়।

উড়িষ্যা-রাজপরিবার।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

সম্প্রতি কিছু দিন পূর্ব্বে যে রাণীর সহিত সাক্ষৎ হইয়াছিল, তিনি আমাকে দেখিবার জন্য ডাকিয়াছিলেন। তাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সুন্দর কারুকার্য্যপূর্ণ কার্পেটের উপর রাণী বসিয়াছেন ; তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বে কনিষ্ঠা যা'য়েরা এবং বাম পার্শ্বে কণ্যাগুলি বসিয়াছেন। ইহা উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় এই যে ইহার মধ্যে একটু ভাব আছে। কন্যাদের অপেক্ষা যা' দিগকে অধিক সম্মান দেওয়া হইয়াছে। রাণীর সম্মানের জন্য দুই পার্শ্বে পরিচারিকাগণ দণ্ডায় মান। রাণী তাঁদের সম্মুখে। তিনি যেরূপ কার্পেটের উপর বসিয়াছিলেন, ঠিক সেই রূপ কার্পেটের উপর আমাকে বসিতে দিলেন। তিনি আমাকে কন্যাতুল্য জ্ঞান করেন। শুনিলাম ইহা তাঁহার কন্যাজ্ঞানে আদরের চিহ্ন।

রাণীদের কাহাকেও মাথায় কাপড় দিতে দেখি নাই। উড়ুনী যখন ব্যবহার করেন তখন ইচ্ছা হইলে সাধ করে কেউ কেউ মাথায় উড়ুনী দেন। রাণীদের নাম গুলি প্রায়ই লম্বা লম্বা। কনকমঞ্জরী, মোহনমঞ্জরী, প্রভাসমঞ্জরী, নক্ষত্রমালা, ইত্যাদি।

এখন রাজ-পরিবারের বিবাহ-সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলিব। এরূপ হইতে পারে এক রাজ-পরিবারের যে প্রথা প্রচলিত অন্য রাজপরিবারে তাহা নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিতেছি।

রাজ কুমারীদের বিবাহ স্থিরীকৃত হইলে প্রথমতঃ বরের বাড়ী হইতে কন্যার জন্য যে সকল উপঢৌকন আসে তাহাকে "পট্টমুদি" বলে। মুদি বলিতে আংটী বুঝায়, পট্টমুদির পর বিবাহের মাস খানিক পূর্ব্বে বরের জন্য উপঢৌকন লইয়া কন্যা কর্ত্তার লোক বরকে আনিতে যায়। ইহাকে "চন্দন টীকা" বলে। এই চন্দন টীকার উপঢৌকনের সহিত বিবাহের দান সামগ্রীর যোগ নাই, ইহা স্বতন্ত্র। কিরূপ নিয়মে এই পট্টমুদি ও চন্দন টীকার কার্য্য সমাধা

হয়, তাহা সমস্ত অবগত নই। সে জন্য কিছু বলিতে পারিতেছি না

বিবাহের ৩।৪ দিন পূর্ব্বে বর শ্বশুরের রাজ্যে উপস্থিত হন। পথে যাওয়া আসার সময় (শ্বশুরের রাজ্যের সীমার মধ্যে) সমস্ত বর যাত্রীদের জন্য বাসের ও আহারের বন্দোবস্ত করা হয়। প্রথমে বর শ্বশুরালয়ের এক ক্রোশ বা দেড় ক্রোশ দূরে তাম্বুতে থাকিয়া রাজার কাছে সংবাদ দেন। রাজা জামাতাকে আনিবার জন্য প্রস্তুত হন। রাজকর্ম্মচারিরা সকলেই রাজার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন। সমস্ত কনেষ্টবল ও সেপাইরা বন্দুক হাতে সজ্জিত হয়। পট্ট হস্তী গলায় হার, মাথায় চন্দ্র, চারি পায়ে মোটা মোটা ঘুঁঘুর দেওয়া মল পরিয়া স্বর্ণ রৌপ্য মণ্ডিত হাওদায় সজ্জিত হয়। পট্ট ঘোড়াও সজ্জিত হয়। অন্যান্য হস্তী ও ঘোড়ারা যথা রীতিতে সজ্জিত হয়। এই রূপে সকলে প্রস্তুত হইলে প্রথম বাজনা, তৎপরে সেপাই কনেষ্টবল, তৎপর রাজা তারপরে রাজ পরিবারের লোক, তারপর দেওয়ান, তারপর রাজ কর্ম্মচারী এই ভাবে সকলে যায়। জামাতাও এই রূপ সজ্জিত হইয়া আগমন করেন, ওদিক থেকে আগমন এদিক হইতে গমন করিতে করিতে যে স্থলে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়, সেই স্থান হইতে ফিরিয়া রাজা জামাতাকে সঙ্গে করিয়া প্রাসাদে ফিরেন। জামাতা অল্পক্ষণ বহির্ব্বাটীতে বসিয়া কথোপকথন করিয়া তাঁহার থাকিবার জন্য যে স্থানে নির্দ্দিষ্ট বাড়ী প্রস্তুত থাকে সেই খানে গমন করেন।

উড়িষ্যায় প্রথমে গাত্র হরিদ্রা, পরে আইবড় ভাত। রাজ পরিবারেরাও সেই রূপ। অইবড় ভাতকে উড়িষ্যায় "মঙ্গলতা" বলে।

বিবাহের বিধি ব্যবস্থা পূর্ণ ভাবে জানি না বলে কিছু লিখিতে পারিতেছি না। কন্যা শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় পিতাকে রাজ যোগ্য সমস্ত দান, যৌতুক দিতে হয়। তদ্ভিন্ন এক বৎসরের জন্য কন্যা জামাতার আহার্য্য দেওয়া হয়। এমন কি লবণ, পাঁচ ফোড়ন পর্য্যন্ত দিতে হয়। ঝাঁটা, শাল পাতার ঠোঙ্গার কাঠি গুলি পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। নারীকেল তৈল, কেরোসিন তৈল পর্য্যন্ত বাদ যায় না।

আর একটী কথা এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, রাজ কুমারীরা শ্বশুরালয়ে যান, তাহা চির জীবনের মত। আর পিতৃগৃহে ফিরেন না। আশৈশব যে পরিবারে পালিত, আশৈশব যে স্নেহময় পিতার ক্রোড়ে লালিত পালিত তাঁদের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয় না। কোন কোন রাজকুমারীর ভাগ্যে পিতার সঙ্গে এক আধবার সাক্ষাৎ ঘটিয়া থাকে।

রাজজামাতা যখন নব পত্নীকে লইয়া নিজ গৃহাভিমুখে চলেন, তখন তাঁর রাজ ছত্র চামর ও অন্যান্য রাজচিহ্ন সমস্ত নব-রাজ্ঞীকে দেন। প্রথমে তাঁর পালকী ও তাঁর দাস দাসীর পাল্কী গমন করে, পরে জামাতা গমন করেন। এরূপ কি, যদি ছেলের পিতা সঙ্গে থাকেন তাহা হইলে তাঁর রাজপুত্র প্রভৃতি সমুদায় পুত্রবধূর সঙ্গে যাইবে, এবং পুত্রবধূর পাল্কী তাঁর অগ্রভাগে যাইবে। ইহার মধ্যে নারীজাতির

প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাব রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। কবে নারী জাতি ভগবৎকৃপার জ্ঞান, পুণ্য ও প্রেমে ভূষিত হইয়া নিজের দায়িত্ব অনুভব করিয়া জীবনের কার্য্য করিতে সুক্ষম হইবেন? ভগবানের চরণে ভিক্ষা করি, এই দুর্ব্বল নারীজাতির মস্তকের উপর তিনি নিজ আশীর্ব্বাদ হস্ত স্থাপন করুন এবং তাঁরই শুভ ইচ্ছা আমাদের এই নারীজাতির জীবনে জয়যুক্ত হউক।

কটক। শ্রীমতী রে—

ভিখারিণীর পত্র।

ভগিণীগণ শ্রীচরণেষু!

আজ কাল বঙ্গ দেশে বঙ্গ রমণীদিগের হিত কল্পে কয়েক খানি পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। তাহাতে কখন কখন দেখা যায়, প্রাচীনা বঙ্গরমণীদিগের সহিত তুলনায় আমরা ধর্ম্মে কর্ম্মে কত দূর হীন হইয়াছি তাহার উল্লেখ থাকে। অনেক দিন হইতে পড়িতেছি এবং ভাবিতেছি কি কারণে আমাদিগের এ অপবাদ এবং কি করিলে ইহা হইতে মুক্ত হইতে পারি। আজ পর্য্যন্ত ইহার কোন মীমাংসা করিতে পড়িলাম না, সেই জন্য আমার মনোভাব জ্ঞাপন করিতে এবং উপদেশ প্রার্থিনী হইয়া আপনাদিগের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক উত্তর দান করিলে এ দীনা কৃতার্থ হইবে।

হিন্দু রমণী চিরকালই পুরুষের অধীন, জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত কেহ না কেহ আমাদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন, এবং তাঁহাদিগেরই ইচ্ছায় আমরা বহুকাল হইতে উপযুক্ত শিক্ষালাভে বঞ্চিতা, অতএব আমাদিগের যাহা কিছু দোষ গুণ সকলই তাঁহাদিগের দোষ গুণে, এবং তাঁহাদিগের উন্নতি অবনতি অনুসারে আমাদিগেরও উন্নতি অবনতি অবশ্যম্ভাবী। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে "যেমন মনিব তার তেমনি চাকর।" আমাদিগের অবস্থাতেও তাহাই প্রযোজ্য। নব্য বঙ্গ রমণীগণ কেন যে ধর্ম্মে কর্ম্মে হীনা, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্যই এই সকল কথার উত্থাপন করিলাম, নচেৎ পুরুষদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা আমার তিলমাত্র অভিপ্রায় নহে।

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকারগণ গৃহীদিগকে তাঁহাদিগের গৃহধর্ম্মপালনোপযোগী করিবার নিমিত্ত ধর্ম্ম ও আচারে বিজড়িত কতগুলি বিধি বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ তাবৎকাল পর্য্যন্ত পুরুষ ও রমণীগণ তদনুসারে চলিয়া কি সুন্দর ভাবে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পিতামহ ও পিতাকে দেখিয়াছিলাম দেবতায় ভক্তি ও মানবে প্রীতি তাঁহাদিগের স্বভাব ছিল। দেখিতাম, তাঁহারা সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে, দেবতার নাম জপ, ধ্যান, প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার পর সংসারকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। তখন পরিবার প্রতিপালন অর্থে কেবল স্ত্রী পুত্র কন্যার প্রতিপালন কেহ বুঝিতেন না। কত নিকট ও দূরস্থ আত্মীয় কুটুম্ব, রোগার্ত্ত, শোকার্ত্ত, দীন দরিদ্র লইয়া এক একটী

পরিবার গঠিত হইত। পুরুষদিগের পরিজনের প্রতি স্নেহ, প্রতিপালনে আগ্রহ দেখিয়া রমণীগণও তাঁহাদিগকে সুখে ও শান্তিতে রাখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইতেন, এবং কায়মনোবাক্যে ঐ কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিতেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে তৎকালীন ধর্ম্মভীরু কর্ত্তব্যপরায়ণ পুরুষদিগের অনুকরণে রমণীগণও ধার্ম্মিকা ও শ্রমশীলা ছিলেন।

ক্রমশঃ পুরুষগণ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অঞ্জন চক্ষে দিয়া প্রাচীন হিন্দুদিগের সকল আচার ব্যবহারই ভ্রম ও কুসংস্কারপূর্ণ দেখিতে লাগিলেন। হিন্দু ধর্ম্ম পৌত্তলিকের ধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন, স্ত্রী, পুত্র, ব্যতীত ভ্রাতা ভগ্নী ও অন্যান্য আত্মীয় কুটুম্বকে ভরণ পোষণ করায় তাহাদিগের অলসতায় প্রশ্রয় দেওয়া দেওয়া হয় এবং অর্থের অপব্যবহার হয় বলিয়া সে সকল কার্য্য হইতে বিরত হইলেন, এমন কি ভিক্ষুককে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতে হইলে এ সম্বন্ধে বিশেষ উচিতানুচিত বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা হইল। এই রূপ অর্থের অপব্যবহার হইতে বিরত থাকিয়া আহার বিহার বেশ ভূষা এবং আহ্লাদ আমোদে অযথা অর্থ ঢালিতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ বোধ করিলেন না। আমরা এত কাল শিক্ষার অভাবে প্রাচীন শাস্ত্রকারকৃত বিধি ব্যবস্থার অর্থ বুঝিতাম না। কেবল কোন্ বিধিভঙ্গের অপরাধের কি শাস্তিভোগ করিতে হয় জানিয়াছিলাম বলিয়া কতক অভ্যাসবশতঃ এবং কতক বা ভয়ে সে গুলি প্রাণপণে পালন করিয়াছিলাম, কিন্তু যখন দেখিলাম কর্ত্তারা তাহা ভ্রম ও সংস্কার পূর্ণ বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছেন এবং আমাদিগকেও ঐ সকল কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে বলিতেছেন তখন আমরা আর কি করিতে পারি? বিশেষতঃ আমাদিগের অন্তরের অন্তস্তলে হিন্দুভাব বিরাজিত। সধবার পতিই দেবতা। পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিলে এবং প্রাণপণে ভক্তি করিতে পারিলে অন্য দেবতার আরাধনার আবশ্যক করে না। সেই পতি দেবতার ইচ্ছা এবং আজ্ঞা অবহেলা করা আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব। বিশেষতঃ যাঁহাদিগের আশ্রয়ে আমাদিগের বাস, যাঁহাদিগের হাসিমুখ দেখিলে আমাদিগের জীবন সুখময় হয় এবং বিষণ্ণ বা বিরক্ত মুখ দেখিলে জগৎ সংসার শূন্য বোধ হয়, তাঁহাদিগের অনভিমতে কার্য্য করিয়া কি সংসারকে অশান্তিময় করিব? কাজে কাজেই বাধ্য হইয়া, বুঝি আর না বুঝি, যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া ভাবিতাম তাহা পরিত্যাগ করিতে হইল। অপরাপর আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় শারীরিক পরিশ্রমের লাঘব এবং স্বামীর উপার্জ্জিত ধনের সঞ্চয় হইতে লাগিল। অশিক্ষিত ব্যক্তির বিশ্রাম এবং অর্থ উভয়ই অনর্থজনক। অতএব ইহারই সাহায্যে আমরা অলস, আত্মসুখী ও বেশভূষাপ্রিয় হইয়াছি।

বিধাতার কৃপায় পুরুষদিগের মতি গতি অনেক পরিমাণে সুপথের দিকে ফিরিয়াছে। যদিও নূতন শিক্ষার চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া একবার ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন

বটে, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগের মানসিক বল, চিন্তাশীলতা এবং কর্ম্মে অনুরাগ বশতঃ অধিকাংশ দোষই সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সম্পূর্ণ রূপে প্রাচীন রীতি অনুসারে না হউক, তথাপি সকলেরই যথাসাধ্য কর্ত্তব্যপালনে যত্ন ও উৎসাহ দেখা যায়। তাঁহাদিগের মতি গতি পরিবর্ত্তন আমাদিগের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের কারণ হইয়াছে। বহুকালাবধি শিক্ষাহীনাবস্থায় থাকিয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইতেছিলাম। যাহাতে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনে সুক্ষম হই তজ্জন্য শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার সহিত অবরোধপ্রথার শিথিলতাও দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

তাঁহারা আমাদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিতেছেন তদনুরূপ জীবন দেখাইতে পারিতেছি না বলিয়াই সম্ভবতঃ অভিযুক্ত হইতেছি। আমাদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদিগের নিকট করযোড়ে নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্মরণ রাখিবেন যে, সবল পদচ্যুত হইলে তাহার পক্ষে পুনরায় উঠিয়া দাঁড়ান সুসাধ্য বটে, কিন্তু দুর্ব্বলের পক্ষে অতি দুষ্কর ব্যাপার এবং সেই জন্যই তাঁহাদিগের দানের উপযুক্ত প্রতিদান করিতে অদ্যাবধি সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হই নাই।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে কর্ম্মেচ্ছু ব্যক্তিগণ কি করিতে হইবে না জানায় অলস ভাবে দিন যাপন করে এবং অলসগণের হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত হইলে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক কার্য্য গুলি সম্পন্ন করে। বিশ্বজননী আমাদিগকে কি মহাব্রত পালনের জন্য সংসারে পাঠাইয়াছেন, না বুঝিতে পারিয়া আমরা অধিকাংশ রমণী বৃথা জীবন অতিবাহিত করিতেছি। বাল্য কাল হইতে শুনিতেছি 'গৃহ রমণীর কার্য্য ক্ষেত্র' সুচারুরূপে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করা তাহাদিগের জীবনের ব্রত। 'কার্য্য' শব্দটির অর্থ আমরা নিতান্ত সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। গৃহের দ্রব্যাদি শৃঙ্খলা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত রক্ষিত করা, খাদ্যদ্রব্যাদি মুখরোচক করিয়া রন্ধন করা, অসুস্থদিগকে সেবা শুশ্রূষা করা এবং যত দিন না শিশু সন্তান নিজে স্নানাহার করিতে সুক্ষম হয় তত দিন পর্য্যন্ত তাহাদিগের ভার নিজ হস্তে লওয়াকে আপাততঃ আমরা আমাদিগের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। কিন্তু সত্যই কি এই কয়টা কাজ করিবার জন্য নারী জন্ম গ্রহণ? জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী অর্থোপার্জ্জন আশায় আজ কাল অনেক অজ্ঞ লোক ধনী এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের গৃহে এ সকল কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত আছে। বেতনপ্রাপ্ত দাসদাসী দ্বারাই যদি গৃহ কার্য্য চলিয়া যায় তাহা হইলে আমাদিগের কার্য্যে বিশেষত্ব রহিল কি এবং তাহার জন্য এত শিক্ষার আয়োজনই বা কেন? পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের শারীরিক কুশল সাধনের সহিত মানসিক শুভ ও উন্নতি বিধানে পারগ হইলে নারীজাতির মহাব্রত পূর্ণ মাত্রায় পালন হয়। আমাদিগের নির্ম্মল চরিত্র, সুরুচি, সদাচার, স্নেহ, মমতা

দ্বারা যত ক্ষণ না আত্মীয় স্বজনের ভক্তি, প্রীতি ও বিশ্বাস ভাজন হইতে পারি, তত-ক্ষণ আমরা ব্রতগ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, এবং উপরি উক্ত গুণের সহিত যে পর্য্যন্ত না সুবিবেচনা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং মনের দৃঢ়তা আসিয়া যোগ হয় তত ক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রত পালনের উপযুক্ত হওয়া যায় না। দয়া-মায়া, স্নেহ, মমতা এবং পবিত্র স্বভাব, রমণীর স্বভাবসুলভ গুণ এবং সত্যাসত্য ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেচনা অন্তর্নিহিত শক্তি বটে, কিন্তু উপযুক্তরূপ পরিচালনা দ্বারা গুণগুলির যথোচিত ব্যবহার করিতে জ্ঞানের আবশ্যক এবং এই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য শিক্ষার আবশ্যক। অজ্ঞতাবশতঃ অনেক রমণী এই স্বর্গীয় গুণ গুলির অপব্যবহার করিয়া সংসার বিষময় করেন। সন্তানের প্রতি মাতা চির-কালই স্নেহশীলা। নিজের সকল সুখ তুচ্ছ করিয়া মাতা সন্তানের মঙ্গলের জন্য কি না করেন। কিন্তু ইহাও প্রত্যক্ষ ঘটনা যে কোন কোন মাতা স্নেহে অন্ধ হইয়া অসৎ চরিত্র, পানাসক্ত পুত্রদিগের কুবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য স্বামীর ইচ্ছাবিরুদ্ধে অথবা অজ্ঞাতসারে অর্থ সাহায্য করিতেছেন। পুনরায়, নির্ম্মলচরিত্রা রমণী পাপে আন্ত-রিক ঘৃণাবশতঃ পাপীর প্রতিও এত ঘৃণা যে তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য স্নেহ মমতা-শূন্য হইয়া অপমাননা, লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন না। একবারও ভাবেন না যে পাপান্ধকার প্রাণে স্নেহ ও দয়ার রশ্মি প্রবেশ করিয়া যদিও বা কখন পাপান্ধকার বিনাশের আশা ছিল তাঁহার এই কঠিন ব্যবহারে তাহার প্রাণ আরও কঠিন হইতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ সংশোধনের আশাও তিরোহিত হই-তেছে। যখন শিল্প, রন্ধন প্রভৃতি সামান্য সামান্য কার্য্যে নিপুণতা লাভ করিতে হইলে ঐ সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি-দিগের নিকট হইতে নিয়ম শিক্ষা এবং যত্ন সহকারে অভ্যাসের আবশ্যক, তখন বহু শিক্ষায় ও আয়াস ব্যতীত এই দায়িত্ব পূর্ণ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা আশা করা কি বাতুলের কার্য্য নহে? লিপিতে ও পড়িতে জানা শিক্ষা লাভের প্রধান সহায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বহুদর্শী জ্ঞানী মহাজন-গণ নানা বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান চিন্তা, আলো-চনা এবং সাধনা দ্বারা যাহা সত্য এবং সম্ভবপর বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে। সকল সময়ে সকল বিষয়ে সংশয়ভঞ্জনকারী উপদেশ দাতা গুরু পাওয়া অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে এবং ঘটিলেও একবার শ্রবণ করিয়া সকল কথা স্মরণ রাখা যায় না। সেই জন্য সাধু জ্ঞানীদিগের লিখিত পুস্তক সকল আমাদিগের জ্ঞানলাভের সহায়, সম্বল এবং উপদেষ্টা স্বরূপ হয়।

জ্ঞান লাভ করিলে যেমন এক দিকে যে দেবাদিদেব মহাদেবের আজ্ঞায় এই মহা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছি তাঁহার অসীম শক্তির কণামাত্র হৃদয়ে উপলব্ধি করি এবং তদ্দ্বারা আমাদিগের ক্ষুদ্রতা ও হীনতা স্পষ্টরূপে অনুভব করিয়া সকল গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যায়,

তাঁহারি প্রেম ও দয়া সম্বল করিয়া পবিত্র অন্তঃকরণে সংসারের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে সক্ষম হই ; অপর দিকে কি উপায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি তাহাও বুঝিতে পারা যায়।

যিনি যত সদগ্রন্থ অধ্যায়ন করেন তিনি লোকসমাজে সেই অনুসারে জ্ঞানী ও বিদ্বান্ বলিয়া বিবেচিত হন। কিন্তু জ্ঞান লাভ করিয়া তদনুযায়ী জীবন গঠিত করিতে না পারিলে শিক্ষা ও পরিশ্রম বৃথা হয়।

আজ কাল অধিকাংশ বঙ্গীয় ভদ্র মহিলা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছেন এবং কেহ কেহ সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষাও অতি সুন্দররূপে আয়ত্ব করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ধারিণীদিগের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এটী অতি স্বাভাবিক যে যাঁহারা যে পরিমাণে শিক্ষাপ্রাপ্তা তাঁহাদিগের স্বভাব এবং আচার ব্যবহার সেই অনুসারে ভাল হইবে। কিন্তু সময়ে সময়ে পরিবারিক ক্রিয়া কলাপ উপলক্ষে অথবা সভা সমিতিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের এবং অবস্থার মহিলাদিগের সম্মিলনকালে কোন কোন বিদুষী অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ অথবা অনভিজ্ঞ ভগিনীদিগের প্রতি যেরূপ দূর দূর এবং উপেক্ষার ভাব দেখান তাহা দেখিয়া বড়ই ক্ষোভ হয়। তখনি স্বতঃই মনে হয় যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুদিগের জাতিভেদ প্রথার প্রাবল্য চলিয়া যাইয়া তাহার স্থানে ধন ও বিদ্যার তারতম্য অনুসারে এক এক নূতন শ্রেণী গঠিত হইতে চলিয়াছে। শুনিয়াছি অমৃতের অপব্যবহারে গরলভাব ধারণ করে, সেই রূপ মহিলাগণ যখন জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া কেবল উপাধি বা যশো লিপ্সায় অধ্যয়নে রত হন তখন এইরূপ অনর্থ সংঘটন অনিবার্য্য।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, গৃহ রমণীর কার্য্যক্ষেত্র। কিন্তু আত্মীয় স্বজনগণ সকল সময়ে গৃহে আবদ্ধ থাকিতে পারে না স্বেচ্ছায় অথবা কার্য্যবশতঃ বাহিরের লোকের সংসর্গে আসিতেই হইবে। অনেক সময়ে দেখা যায় অতি স্বাস্থ্যকর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাজপ্রাসাদ তুল্য বাটীর অধিবাসীদিগকে তাহাদিগের প্রতিবাসীর অযত্নে রক্ষিত পূতিগন্ধময় বাসস্থানের বিষাক্ত বায়ুতে অসুস্থ এবং কখন কখন সংক্রামক রোগে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। সেই রূপ গৃহে সুশিক্ষা পাওয়া সত্বেও আত্মীয়গণসংসর্গদোষে পাপপঙ্কে পতিত হয় এবং এক সময়ে এমনও দেখা যায় যে উঠিবার আর শক্তি থাকে না। পাপের পথ যত সহজ পূণ্যের পথ তত নয়। উত্থান অপেক্ষা পতনই শীঘ্র হয় এবং এই জন্যেই সুশিক্ষা অপেক্ষা কুশিক্ষার ফল অধিক শীঘ্র ফলে।

আমাদের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত আত্মীয়দিগকে কুসংসর্গ হইতে রক্ষা করা সুকঠিন। সুতরাং ধনগর্ব্ব, বিদ্যাভিমান অথবা বহুকাল অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া মনের সঙ্কীর্ণতাবশতই হউক বা যে কোন কারণই থাকুক না কেন, যত শীঘ্র আমাদিগের ভিতর হইতে দূর দূর ও উপেক্ষার ভাব চলিয়া যায় ততই মঙ্গল। আমরা যেন

কখন না ভুলি যে পরিবারস্থ সকলের শুভ ও উন্নতি সাধন আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য। সকল পরিবারের রমণীগণ যাহাতে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে যত্নশীলা ও উৎসাহান্বিতা হন তজ্জন্য সকলেরই চেষ্টা পরামর্শ এবং অন্যান্য প্রকার সাহায্য করা, উদ্দেশ্য সাধনের এক মাত্র উপায়।

পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় ব্যতীত সদ্ভাব সহানুভূতি সূত্রে আবদ্ধ হওয়া যায় না এবং তাহা না হইলে পরস্পরকে সাহায্য করিবার ইচ্ছাও হয় না। বাধ্য হইয়া অথবা কর্ত্তব্য জ্ঞানে কোন কার্য্য করিলে তাহা ত সুখকর ও স্থায়ী হয় না। মধ্যে মধ্যে মেলা মেশাতে ব্যক্তিগত মতান্তর হইতে মনান্তর হয় বটে, কিন্তু আমরা যদি স্মরণ রাখি যে আমরা সকলেই বিশ্বমাতার সন্তান এবং এক উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া মিলিত হইয়াছি তাহা-হইলে মনান্তরের সম্ভাবনা চলিয়া যায়। দোষে গুণে মানুষ। আমরা প্রত্যেকেই যদি ভাল হইব এবং ভাল করিব এই ভাবে মিলিতে পারি তাহা হইলে দোষের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া গুণেরই অনুকরণ এবং গুণীকে উপযুক্ত মর্য্যাদা করিব। আশা করি ভগবানের কৃপায় এই রূপ সম্মিলনে আমাদিগের একাধারে কার্য্য সিদ্ধি ও মানসিক সুখ শান্তির হেতু হইবে।

প্রীতি সহানুভূতির আদান প্রদান অভাবে মন শ্মশানতুল্য হয়, প্রেম ও দয়ার সাগর পরমেশ্বরকে নিষ্ঠুর রুদ্রদেব বলিয়া মনে হয়। ভয়ে ভক্তি ও পূজা অর্পিত হয় বটে কিন্তু প্রাণে অশান্তির আগুন জ্বলিতে থাকে। বিমল স্বর্গীয় সুখে বঞ্চিত হইয়া সংসারের ক্ষুদ্র এবং হীন সুখের জন্য মন লালায়িত হয়।

ভগিনীগণ, যতই ভাবিতেছি ততই মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে যে, জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া কেবল অন্যের নিকট প্রশংসা পাইবার আশায় বিদ্যার্জ্জন এবং পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতিশূন্য হওয়া আমাদিগের বর্ত্তমান অবনতির কারণ।

আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা এখন সংসারের নানা কার্য্যে সময় পান না, তাঁহাদিগের পক্ষে গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া জ্ঞানলাভের সুযোগ হয় না। কিন্তু আর্থিক অবস্থা ধর্ম্ম জাতি এবং দেশ বিচার না করিয়া কেবল ভগিনীজ্ঞানে, প্রত্যেকে জীবন, কার্য্য এবং কথা দ্বারা পরস্পরকে সহায়তা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে সম্মিলিত হইলে বিশেষরূপে উপকৃত হইব বলিয়া আশা করা যায়।

এ বিষয়ে আপনাদিগের মতামত জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

ভিখারিণী

ধর্ম্মপুত্র।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

লোকটি ঘোড়া থামাইয়া বলিল, 'আমি একজন 'দস্যু', ঘোড়ার চড়িয়া রাস্তায় যাইতে ২ মানুষ হত্যা করি, যত নরহত্যা করি, ততই স্ফূর্ত্তির সহিত গান গাই। কথা শুনিয়া ধর্ম্মপুত্রের শরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, এই

লোকটার মধ্যে যে পাপ ও অমঙ্গল আছে তাহা আমি কিরূপে বিনাশ করিব? যাহারা আপনা হইতে আমার নিকট আসিয়া পাপ স্বীকার করে, তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া সহজ কিন্তু এ লোকটা দুষ্কর্ম্ম করিয়া বড়াই করিতেছে ইহার উপায় কি করি?

কিছু স্থির করিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন। "এখন কি করি? এই দস্যু যদি এই পথ দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া যাতায়াত করে তাহা হইলে ইহার ভয়ে লোকেরা আমার কাছে আসিবে না, তাহাতে তাহাদেরও অপকার আমারও অপকার। আমার জীবনধারণের আর উপায় নাই।"

ধর্ম্মের পুত্র দস্যুকে বলিলেন, "লোকেরা কৃতপাপের যাহাতে মার্জ্জনা হয় সে জন্য আমার কাছে আসিয়া পাপস্বীকার করে, দুষ্কর্ম্ম করিয়া জাঁক করিতে আসে না, যদি ঈশ্বরের ভয় থাকে তবে পাপের জন্য অনুতাপ কর, যদি অনুতাপ না হয়, তবে এখান হইতে চলিয়া যাও, এদিকে আসিয়া আমাকে উদ্বিগ্ন ও অপর সকলকে ভীত করিও না। আমার কথা যদি না শোন তবে ঈশ্বর তোমাকে শাস্তি দিবেন।" দস্যু হাসিয়া উঠিল। কহিল, "আমি ঈশ্বরকে ভয় করি না, তোমার কথাও গ্রাহ্য করি না। তুমি আমার প্রভু নহ? তোমার ব্যবসা যেমন ধর্ম্ম, আমার ব্যবসা সেইরূপ ডাকাতি। তুমি ধর্ম্মের দ্বারা আমি দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করি। সকলকেই কোন না কোন উপায়ে জীবনধারণ করিতে হয়। যে সকল বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তোমার কাছে আসে তাহাদিগকে ধর্ম্মের উপদেশ দিও, আমাকে কিছু শিখাইতে হইবে না। তুমি নাকি আমাকে ঈশ্বরের কথা বলিয়াছ, সেই জন্য আগামী কল্যই দুই জন মনুষ্য হত্যা করিব। আজ তোমাকে বধ করিতে পারিতাম কিন্তু হাত ময়লা করিতে ইচ্ছা হইল না। যাহা হউক বলিয়া রাখিতেছি আমার সম্মুখে আর আসিও না।"

দস্যু এইরূপ ভয় দেখাইয়া চলিয়া গেল কিন্তু সে আর সে দিকে আসিল না। আর ৮ বৎসর কাল ধর্ম্মের পুত্র সেখানে নিরুপদ্রবে বাস করিলেন।

একদা দগ্ধকাষ্ঠে জলসেক করিয়া ধর্ম্মের পুত্র কুটিরে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এবং লোকের আগমন প্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া আছেন। সারাদিন একটি মানুষও তাঁহার কাছে আজ আসে নাই। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একলা বসিয়া বসিয়া তাঁহার মন বিষাদপূর্ণ হইল, একে একে নিজের জীবনের সব কথা মনে হইতে লাগিল। তাঁহার মনে পড়িল দস্যু তাঁহাকে বলিয়াছিল ধর্ম্মের ব্যবসা করিয়া তিনি আহারসংগ্রহ করিতেছেন। নিজের জীবনের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। মনে মনে বলিলেন, সন্ন্যাসী যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন আমি কি তদ্রূপ জীবন যাপন করিতেছি? তিনি আমাকে পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কৃচ্ছ সাধন করিতে বলিলেন, আমি কিনা সেই সাধনকে আহার ও সাধুবাদপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ করিয়াছি। আর

এই দুই বিষয়ে আমার এমন লোভ জন্মিয়াছে যে লোকে আমার নিকটে না আসিলে আমি অসুখী হই। তাহারা যে আসিয়া আমাকে একজন পরম ধার্ম্মিক পুরুষ বলিয়া স্তুতিবাদ করে, তাহাতেই আমি প্রীতিলাভ করি। এরূপ জীবন কখনই মঙ্গলজনক নহে। হায়! সুখ্যাতিলাভের ইচ্ছা আমাকে বিপথগামী করিয়াছে। আমি পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি নাই, বরং আরও নূতন পাপে লিপ্ত হইয়াছি। আমি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া বনের এমন এক স্থানে গিয়া থাকিব যেখানে কেহ আমাকে খুজিয়া পাইবে না। আমি নির্জ্জনে বাস করিয়া কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব এবং নূতন পাপ বর্জ্জন করিয়া চলিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া একটী থলিয়াতে কিছু শুষ্ক রুটী ও একখানি কোদালি হাতে করিয়া ধর্ম্মপুত্র কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। বনের অতি নিবীড় অংশে এক গুহা খনন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন, যেন লোকে তাঁহাকে খুঁজিয়া না পায়। যখন তিনি থলিয়া ও কোদালি লইয়া যাইতেছিলেন তখন দস্যুর সহিত তাঁহার দেখা হইল। তিনি ভয় পাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দস্যু আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল, বলিল, "কোথায় যাইতেছ?" তিনি বলিলেন, "যেখানে মানুষ আমার সন্ধান না পায় এমন স্থানে যাইতেছি।" দস্যু বিস্মিত হইয়া বলিল, "যদি লোকে তোমার কাছে না আসে তুমি কিরূপে বাঁচিবে?"

এ কথাটা ধর্ম্মের পুত্রের মনে একবারও উদয় হয় নাই, যখন দস্যু বলিল, তখন মনে হইল। দস্যু আর কিছু না বলিয়া ঘোড়া চালাইয়া দিল। ধর্ম্মের পুত্র ভাবিলেন, আজতো দস্যুকে তাহার জীবনের কথা কিছু বলা হইল না। কে জানে হয়তো এবার তাহার অনুতাপ আসিবে। অন্য বারের অপেক্ষা এবার তাহাকে শান্ত শিষ্ট বোধ হইল, এবার আমাকে মারিবে বলিয়া ভয় দেখায় নাই। ধর্ম্মের পুত্র দস্যুকে ডাকিয়া কহিলেন, "যাহা হউক, তুমি অনুতাপ কর, ঈশ্বরের হাত হইতে কোথায় যাইবে?"

দস্যু ঘোড়া ফিরাইল, কোমরবন্ধ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া ধর্ম্মের পুত্রকে মারিবে বলিয়া ভয় দেখাইল, ধর্ম্মের পুত্র ভয় পাইয়া বনের ভিতর পলায়ন করিলেন। দস্যু তাঁহার অনুসরণ করিল না, কেবল বলিল, "এই দুইবার আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম, তৃতীয় বার আমার সম্মুখে আসিও না, আসিলে তোমার প্রাণ সংহার করিব।"

দস্যু এই বলিয়া চলিয়া গেল। বিকাল বেলা ধর্ম্মপুত্র দগ্ধকাষ্ঠে জলসেক করিতে গিয়া দেখেন এক খানি কাষ্ঠ হইতে ক্ষুদ্র একটী দেবদারু জন্মিয়াছে।

ধর্ম্মের পুত্র একাকী অজ্ঞাতভাবে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার শুষ্ক রুটি ফুরাইয়া গেল; তিনি জঙ্গল হইতে মূল আহরণ করিয়া খাইবেন মনে করিয়া বাহির হইলেন; মূল খুঁজিতে গিয়া দেখেন এক বৃক্ষের শাখায় রুটীর থলিয়া ঝুলিতেছে। ধর্ম্মের পুত্র উহা হইতে রুটী লইয়া আহার করিলেন। রুটী ফুরাইয়া গেলেই তিনি

আসিয়া সেই ডালে আবার রুটী পাইতেন। এইরূপে তিনি জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এক চিন্তা এক ভয় সেই দস্যু। যখনই বনে দস্যুর সাড়া পাইতেন ভয়ে লুকাইয়া থাকিতেন। ভাবিতেন যদি দস্যু আমাকে মারিয়া ফেলে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। এই ভাবে আরও ১০ বৎসর কাটিয়া গেল। দেববৃক্ষ একাকী বাড়িতে লাগিল, অপর দুই খানি দগ্ধকাষ্ঠ এক ভাবেই আছে।

একদিন প্রত্যুষে উঠিয়া ধর্ম্মপুত্র নিজের কাজে গেলেন, দগ্ধকাষ্ঠের চতুর্দ্দিকের মৃত্তিকায় জল দিতে দিতে শ্রান্ত হইয়া সেখানে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন "আমি পাপ করিয়াছি, আমি মৃত্যুকে ভয় করিতেছি, যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, আমি বাঁচিয়া কেন, মরিলেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি।"

এই চিন্তা মনে উদয় হইতে না হইতেই ধর্ম্মপুত্র শুনিলেন দস্যু গালাগালি দিতে দিতে চলিতেছে। ধর্ম্মপুত্র ভাবিলেন স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন কেহই আমার রক্ষা করিতে বা বিনাশ করিতে পারে না। তিনি নির্ভয়ে দস্যুর নিকটে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন দস্যু একা নহে তাহার পশ্চাতে জিনের সঙ্গে আর একটী লোক আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার মুখ ও হাত বাঁধা। লোকটা বাক্যস্ফূরণ করিতে পারিতেছে না, দস্যু তাহাকে গালি দিতেছে। ধর্ম্মপুত্র ঘোড়ার মুখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "এ লোকটিকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?" ইহাকে জঙ্গলে লইয়া যাইতেছি। এ একজন বণিকের পুত্র, ইহার পিতার ধন কোথায় আছে, আমাকে বলিতে চাহে না, যতক্ষণ না বলে ইহাকে প্রহার করিব।" দস্যু এই বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, কিন্তু ধর্ম্মের পুত্র তাহাকে বাধা দিলেন, ঘোড়ার মুখের লাগাম নিজের হাতে ধরিয়া রাখিয়া বলিলেন "এই লোকটিকে ছাড়িয়া দেও।" দস্যু ক্রুদ্ধ হইয়া ছুরিকা উত্তোলন করিল। "ইহার মত তোমার দশা করিব তাহাই চাও কি? আবার আমার সঙ্গে আসিলে আমি তোমাকে বধ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, মনে আছে? ছাড়।"

ধর্ম্মপুত্র বলিলেন 'আমি ছাড়িব না। আমি তোমাকে ভয় করি না, আমি কেবল ভগবান্‌কে ভয় করি। ভগবান আমার মনের মধ্যে বলিতেছেন যেন তোমাকে না ছাড়ি। এই লোকটীর বন্ধন তুমি খুলিয়া দাও।"

দস্যু ভ্রুকুটি করিল, আপন হইতে ছোরা বাহির করিয়া বণিকপুত্রের বন্ধন রজ্জু কাটিয়া দিল। বলিল তোমরা দুজন গোল্লায় যাও আমার পথে আর আসিও না।

বণিক পুত্র লম্ফদিয়া পড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বনের মধ্যে পলায়ন করিল। দস্যু চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু ধর্ম্মপুত্র তাহাকে থামাইয়া আবার তাঁহাকে তাঁহার পাপ জীবন পরিবর্ত্তন করিবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিলেন। দস্যু ধীরভাবে সব কথা শুনিয়া নীরবে চলিয়া গেল। পর দিন প্রাতঃকালে ধর্ম্মপুত্র দগ্ধ কাষ্ঠে জল দিতে গিয়া দেখেন

আর একটীতে জীবন সঞ্চার হইয়াছে, দ্বিতীয় একটী দেব বৃক্ষ জন্মিয়াছে।

আরও দশ বৎসর কাটিয়া গেল। ধর্ম্মপুত্র তখনও জীবিত আছেন। তাহার কোন বাসন. নাই, কোন ভয় নাই, তাহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। এক দিন তাহার মনে হইল পরমেশ্বর মানুষকে কি সুখই দিয়াছেন, মানুষ অসীম সুখে কালযাপন করিতে পারে কিন্তু তাহা না করিয়া মিথ্যা আপনাকে আপনি কষ্ট দেয়। মানুষ পাপ বলিয়া কিরূপে পরের ও আপনার যন্ত্রণার কারণ হয় তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, মনুষ্য সমাজের জন্য তাঁহার মন করুণায় পূর্ণ হইল। মনে মনে বলিলেন, আমার এরূপ ভাবে জীবনযাপন করা অন্যায়, আমি মানুষের কাছে যাইব, যাহা জানি তাহাদিগকে শিখাইব। (ক্রমশ)

সংবাদ।

মহিলার পাঠিকাগণ আপনারা আপনাদের একটি পরমোপকারী বন্ধুকে ইহ পৃথিবীতে হারাইয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার আর এ পৃথিবীতে নাই। তিনি বিগত ২৭ মে ২।২৭ মিনিটের সময় স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন। বঙ্গ মহিলাদিগের জন্য তিনি অনেক উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার রচিত নারীচরিত্র পুস্তক পাঠ করিয়া অনেকেই বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। আজ ভারতের অনেক স্থানে তাঁহার জন্য কত লোক শোকপ্রকাশ করিতেছে। বিধাতার ইচ্ছায় তিনি তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমরা ইতিমধ্যে কিয়দ্দিন ঝান্‌সি নগরে ছিলাম, তথায় যে বন্ধুর বাড়ীতে স্থিতি করিয়াছিলাম, সেই বাড়ীর অদূরে পরস্পর সন্নিহিত পাঁচটি বৃহৎ ইঁদারা বিদ্যমান। তথাকার লোকেরা তাহাকে "পাঁচকুওয়ে" বলে। সেই পাঁচ কুওয়ের জল অত্যুৎকৃষ্ট, সেই জলেই নগরের অধিকাংশ লোকের পানীয়। রাত্রি ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা ৮টা পর্য্যন্ত ঝান্‌সীর ভিন্ন ভিন্ন পল্লী হইতে রমণীগণ পাঁচ কুওয়ের জল কলস পূর্ণ করিয়া লইয়া যাইতে আসেন। সমস্তদিনের মধ্যে বোধ হয় ৫। ৭ সহস্র নারীর জলের জন্য তথায় আগমন হয়। ইঁদারার পার্শ্বে মহা ভিড় হইয়া থাকে। আমরা সময়ে সময়ে তাহা দেখিতে গিয়াছি। দেখা গেল সে দেশের নারীগণ সাধারণতঃ সুস্থ বলিষ্ঠা, তাঁহাদের পরিচ্ছদ প্রণালী মন্দ নয়, হিন্দুসীমন্তিনীগণ স্থূল বস্ত্রের ঘাঘরা পরিধান করে বক্ষঃস্থলে কাঁচলী ও উড়ানী ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই উড়ানীর এক প্রান্তদ্বারা মস্তক আবৃত করে, অবগুণ্ঠন ধারন করে না। তাহাদের পদ যুগলে শব্দায়মান এক প্রকার স্থূল রজত ভূষণ, মণিবন্ধে কঙ্কণ বা চুড়ী দৃষ্ট হইল। আমাদের বাঙ্গালী মহিলারা যেরূপ রুগ্না কৃশাঙ্গী, সেরূপ তাহাদের একটীকেও দৃষ্ট হয় নাই! এক এক জনে মস্তকের উপর উপর্য্যুপরি দুইটি কলসে দেড়মণ দুইমণ জল বহন করিয়া অক্লেশে চলিয়া যায়। যে দেশের রাণী প্রসিদ্ধ লক্ষ্মীবাই স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া ইংরাজ সৈন্যদিগকে কম্পিত করিয়াছিলেন, তাঁহারই প্রজা, শ্রেণীর নারীগণ সুস্থ সবল দৃঢ়কায় হইবে না কেন?

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১০ম ভাগ] আষাঢ়, ১৩১২ ; জুলাই, ১৯০৫। [১২শ সংখ্যা।

স্ত্রীনীতিসার।

কল্যাণ, তুমি দিনান্তে বা নিশান্তে এক বার নিবিষ্ট মনে আত্মচরিত্র চিন্তা করিও। যথা, সমস্ত দিন অন্তরে কতদূর ভাল ভাব পোষণ করিয়াছ, এবং কত দূর মন্দভাবকে আশ্রয় দিয়াছ, কত দূর ক্রোধের অধীন হইয়া লোকের সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছ ; কত দূর প্রেম দ্বারা চালিত হইয়াছ। প্রত্যহ এরূপ চিন্তা করিলে তুমি কি রূপ লোক বুঝিতে পারিবে,—আপনাকে চিনিতে পারিবে যে, তুমি ভাল না মন্দ। আত্ম-চিন্তাশূন্য আত্মদৃষ্টিবিহীন লোক নিজের দোষ গুণ বুঝিতে পারে না, আপনার দোষ সংশোধন করিয়া আত্মোন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয় না।

তুমি এক বার ভাবিয়া দেখ, আজ ভগবানের প্রতি তোমার অন্তরে কত দূর ভক্তি প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহার পূজা বন্দনায় তুমি কত দূর আনন্দ শান্তি লাভ করিয়াছিলে, তাঁহার দর্শন ও শ্রবণ কত দূর উজ্জ্বল হইয়াছিল, কত দূর প্রেমের সহিত তুমি ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ ; বা কত দূর তুমি ঈশ্বর বিস্মৃত সংসারাসক্ত হইয়া জীবন যাপন করিয়াছ, রিপুপরবশ স্বার্থপর হইয়া কত দূর অনীতির পথে চলিয়াছ, স্বামীর প্রতি ও সন্তানদিগের প্রতি এবং অপর আত্মীয় স্বজনের প্রতি পবিত্র প্রীতিসহকারে কত দূর কর্ত্তব্য পালন করিয়াছ, বা অপ্রিয় বচনে ও অন্যায়াচরণে, তাঁহাদিগকে ব্যথিত করিয়াছ ; দীনদুঃখিগণ কত দূর তোমার স্নেহ ও দয়ায় বঞ্চিত হইয়াছে। বৃথা আলস্যে ক্রীড়া গল্পে বা পরচর্চ্চায় অমূল্য সময় কত দূর নষ্ট করিয়াছিল। তুমি এক বার আত্মালোচনা দ্বারা প্রত্যহ এ সকলের গূঢ় অনুসন্ধান করিলে তোমার জীবন উন্নত না অবনত তোমার চক্ষে ধরা পড়িবে।

ভদ্রে! তুমি ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া আত্মদোষসংশোধন সদগুণ সকলের সংবর্দ্ধন করিয়া এই সংসারে দেবী বলিয়া পূজিত হও, মহিলার এই আকিঞ্চন।

পর্দ্দানিশিন ও বেপর্দ্দা নারীগণ।

যাহাতে নারী জাতির লজ্জা সম্ভ্রম রক্ষা পায় আমরা তাহাকে পর্দ্দা বলিতেছি, গৃহদ্বারে ঝুলান স্থূল আবরণ ও অন্তঃপুরের যবনিকাকে পর্দ্দা বলিয়া গণ্য করি না। সেই আবরণ ও যবনিকাই যে নারীগণের লজ্জা সম্ভ্রম রক্ষার একমাত্র উপায় আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। দেশ ভেদে সম্প্রদায়ভেদে পর্দ্দা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, চূড়ান্ত বেপর্দ্দাও দৃষ্ট হইতেছে, এবং পর্দ্দার ব্যভিচার, পর্দ্দা নামে কুসংস্কার ও কুৎসিত সঙ্কীর্ণতা বদ্ধমূল হইয়া আছে। অনেকে বলেন যে, ইয়ুরোপীয় মহিলাদিগের একেবারে পর্দ্দা নাই। আমরা একথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছি না। তাঁহারা এদেশীয় নারীদিগের ন্যায় অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকেন না, যবনিকার অন্তরালে বাস করেন না, অবগুণ্ঠন ধারণ করেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে পর্দ্দাহীন বলা যায় না। তাঁহাদিগের বাসগৃহে এবং শয়ন-কক্ষে অপর লোক তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত কখনও প্রবেশ করিতে পারে না, সকল পুরুষ তাঁহাদিগকে ভয় ও সম্ভ্রম করিয়া চলিতে বাধ্য। ইহা সামান্য পর্দ্দার কার্য্য নহে? কিন্তু তাঁহারা বেপর্দ্দারও চূড়ান্ত। একটী যুবতী কুমারী অপর এক জন যুবকের হস্ত ধারণ করিয়া সভাস্থানে নৃত্য করেন, একটী মহিলা অপর পুরুষের পার্শ্বে বসিয়া মদ্যমাংসাদি পান ভোজন করিয়া থাকেন, চির অভ্যাস বশতঃ এ সকল কার্য্যকে তাঁহারা নির্লজ্জতার কার্য্য বলিয়া স্বীকার না করুন, কিন্তু আমাদের চক্ষে ঘোরতর বেপর্দ্দা, নির্লজ্জতা ও অসভ্যোচিত অনীতির কার্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কাবুলের বর্ত্তমান আমির হবিবোল্লা খাঁ যখন যুবরাজ ছিলেন তখন তিনি নানা বিষয়ে শিক্ষালাভের জন্য ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। একদা তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহাভোজে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড ল্যান্সডাউনের পত্নী আমির তনয় যুবক হবিবোল্লার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে ভোজন-কক্ষে লইয়া গিয়া ভোজনার্থ নিজের পার্শ্বে বসাইতে সমুদ্যত হন। মহামান্য আমিরতনয় লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অধোবদনে ভোজন কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এক জন সম্ভ্রান্ত মহিলার একটি নবপরিচিত ভিন্ন দেশীয় মোসলমান যুবকের হস্ত ধারণ এবং তাহার সঙ্গে একত্র ভোজনের চেষ্টা কি নিতান্ত বেপর্দ্দা ও নির্লজ্জতার ব্যাপার নহে? ইয়ুরোপীয় মহিলাদের কয়েক প্রকার পরিচ্ছদ অতিশয় বেপর্দ্দা ও নির্লজ্জতাব্যঞ্জক; তন্মধ্যে তাঁহাদের Evening Dress প্রধান। সেই পরিচ্ছদ পরিলে বাহুমূল ও বক্ষঃস্থলের উর্দ্ধ ভাগ উন্মুক্ত থাকে। উহা ঘোরতর বিলাসিতার পরিচ্ছদ। এ দিকে তাঁহারা কাহারও চরণ মুজাশূন্য দেখিলে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হন। এরূপ তাঁহাদের মধ্যে পর্দ্দা ও বেপর্দ্দা বিদ্যমান। বেপর্দ্দাই যেন অধিক।

এ দেশের হিন্দু মহিলাদিগের মধ্যে পর্দ্দা অনেক স্থলে অস্বাভাবিক। অত্র সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহিলাগণ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া

অন্তঃপুরে বাস করেন। তাঁহারা পতি-কুলের বয়ঃস্থ পুরুষদিগকে দেখা দেন না, এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে কথা কহেন না। স্বামীর আলয়ে স্বামীর আত্মীয় বন্ধু কোন পুরুষ নিকটে সমাগত জানিবামাত্র যুবতী বধূগণ ঘোম্‌টা টানিয়া সবেগে গৃহ কোণে যাইয়া লুক্কায়িত হন। এ দিকে ফেরি-ওয়ালা বাড়ীতে আসিলে মুক্তভাবে তাহার নিকটে বধূগণ উপস্থিত হইয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া ফল তরকারি ইত্যাদি ক্রয় করেন। বিশেষ কারণে কোন আত্মীয় পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেও বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠন ঝুলাইয়া মৌনভাবে থাকেন, কখন কখন বাধ্য হইয়া কথা কহিলেও অস্পষ্ট স্বরে ফিস ফিস করিয়া কথা কহেন। কিন্তু পিতৃপল্লী হইতে যে কোন পুরুষ উপস্থিত হউক না কেন, তাহাকে অবাধে মুক্তভাবে দর্শন দান করেন, এবং তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিয়া থাকেন। পতিগৃহে কুলবধূদি-গের কণ্ঠস্বর কেহই শ্রবণ করিতে পারে না; কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক স্থানে বিবাহাদি শুভ কর্ম্মোপলক্ষে মহিলারা অনেক দিন ব্যাপিয়া সঙ্গীত করেন। তখন ২।৪ জন নববধূ মিলিয়াও উচ্চৈঃস্বরে মঙ্গল সঙ্গীত করিয়া পল্লীকে কম্পিত করিয়া তোলেন! এ সকল অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দু-মহিলা কাশী বৃন্দাবনাদি তীর্থপর্য্যটনার্থ গৃহ হইতে বাহির হইলে পূর্ণ স্বাধীন ও প্রমুক্ত ভাবে গমনাগমন ও বিদেশীয় লোকের সঙ্গে ব্যবহার করেন। বাঙ্গালী হিন্দু মহিলাদের বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গের মহিলাদিগের বস্ত্র পরিধান প্রণালী অতিশয় জঘন্য। এ দেশের পল্লীগ্রামের কোন কোন স্থানে মহিলাদের প্রাত্যহিক আচরণ অত্যন্ত বেপর্দ্দা ও লজ্জাজনক। উৎকল-নারীদিগের বস্ত্র পরিধান রীতি যৎপরো-নাস্তি লজ্জাকর। বম্বে মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব প্রদেশস্থ মহিলাদিগের মধ্যে বঙ্গ দেশের মহিলাদিগের ন্যায় অবরোধের দৃঢ়তা নাই। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই অপর পুরুষদিগকে দেখা দিতে ও তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহিতে পারেন, অনেকে পদব্রজে বা শকটারো-হণে মুক্ত ভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কোন মহারাষ্ট্রীয়লোকের গৃহে কেহ সমাগত হইলে বা অতিথিরূপে উপ-স্থিত হইলে সর্ব্বাগ্রে গৃহিণী আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন; অতিথিকে স্বহস্তে রন্ধন পরিবেশন করিয়া ভোজন করান। গৃহিণী এরূপ অভ্যর্থনাদি না করিলে অভ্যাগত ব্যক্তি আপনাকে অপ মানিত বোধ করেন। এ দিকে বাঙ্গালীর বাড়ীতে গৃহস্বামীর কোন আত্মীয় বিদেশ হইতে উপস্থিত হইয়া মাসাবধিকাল বাস করিলেও পরিবারস্থ মহিলারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার কোন সংবাদ লন না। তিনি তাঁহাদের ছায়াও দর্শন করিতে পান না। কতদূর প্রভেদ! পঞ্জাবের অনেকস্থানে মহিলাদের মধ্যে এক বিষয়ে ভয়ানক বেপর্দ্দা তাঁহারা চুরি দার পায়জামা কোট ও উড়ানি ব্যবহার করিয়া থাকেন, সমুদায় বস্ত্র গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া প্রকাশ্য স্থানে নদীর ঘাটে স্নান করেন, স্নান করিয়া উঠিয়া পরে সেই সকল বস্ত্র পরিধান করেন। পুরুষদিগকে নিকটে দেখিয়া

সঙ্কুচিত হন না। শুনিয়াছি কাশ্মীরী মহিলারাও এরূপ জঘন্য নির্লজ্জতার পরিচয় দান করেন। ইহা মনে করিতেও শরীর মন বিকম্পিত হয়। একদিকে অন্তঃপুর ও অবগুণ্ঠন এবং পর্দ্দার দৃঢ়তা, অপরদিকে এই ভয়ানক নির্লজ্জ কাণ্ড।

মোসমান মহিলাদিগের ন্যায় অস্বাভাবাবিক পর্দ্দা দুনিয়ার কোন জাতীয় মহিলার মধ্যে নাই। বাদশা নবাব ও আমিরদিগের সচরাচর শত শত স্ত্রী, তন্মধ্যে সকল স্ত্রী যে বিবাহিতা, তাহা নয়, অধিকাংশ বাঁদী। বাদশা নবাব প্রভৃতির অন্তঃপুরে দ্বিতল অট্টালিকা হইতে পারে না। কি জানি কোন বেগম বা প্রাসাদের উপর হইতে বাহিরের কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, এবং অপর কোন পুরুষ বেগমের দিব্যাঙ্গ দর্শন করে, এই ভয়। ভূতপূর্ব্ব মোগল সম্রাটদিগের অন্তঃপুরিকাদিগের জন্য প্রথমতঃ স্ত্রী লোকের পাহারা, তৎপরে খোজার পাহারা, তাহার পরে রজপুত সিপাহীদিগের পাহারা, থাকিত। যবনিকার পর যবনিকা, প্রাচীরের পর প্রাচীরের তো কথাই নাই। চতুর্দ্দিকের প্রাচীর অন্তঃপুরস্থ অট্টালিকা অপেক্ষা উচ্চ করা হইত। এক্ষণও রাজ্য চ্যুত বাদশা নবাব প্রভৃতির অন্দর মহলের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমাদের উক্তির প্রমাণ পাওয়া যাইবে। আমরা নেজাম হায়দারাবাদে যাইয়া শুনিলাম যে, মহামান্য নেজামের প্রায় পাঁচশত স্ত্রী; চারি পাঁচ জন মাত্র প্রধানা বেগম। সামান্যা স্ত্রী অর্থাৎ বাঁদীগণের উপর এক জন খোজা কর্ত্তৃত্ব করে, আবশ্যক হইলে সে তাহাদিগকে বেত্রাঘাতও করিয়া থাকে। ঈদৃশ বাঁদীদের গর্ভেও বাদশা ও নবাবদিগের পুত্র কন্যার জন্ম হয়। তাঁহারা শাহজাদা ও শাহজাদীর কথঞ্চিৎ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এত গুলি স্ত্রীকে এই রূপে অন্তঃপুর কারাগারে দুর্দ্দশায় রাখিয়া তাহাদের উপর এইরূপ যথেচ্ছাচার অত্যাচার কি ভয়ানক ব্যাপার! শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, "অরক্ষিতা গৃহেরুদ্ধা পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ, আত্মানমাত্মনা যা চ রক্ষতি সা সুরক্ষিতা।" অর্থাৎ গৃহে অবরুদ্ধ যে নারী বহু বিশ্বস্ত পুরুষ প্রহরী কর্ত্তৃক রক্ষিতা সে অরক্ষিতা। যে আপনাকে আপনি রক্ষা করে সেই সুরক্ষিতা। মোসলমান মহিলারা নিজেদের অনেক ঘনিষ্ঠ স্থান হইতেও লুক্কায়িত থাকিতে বাধ্য হন।

অন্তঃপুরের বাহিরে সম্ভ্রান্ত মোসলমান মহিলাদিগের পদনিক্ষেপ করা এক প্রকার অসম্ভব। সৌন্দর্য্যের আধার এই বিচিত্র বিশ্ব তাঁহাদের সম্বন্ধে থাকিয়াও নাই। ট্রেণে কোথাও তাঁহাদিগকে যাইতে হইলে স্থূল আবরণে দৃঢ়রূপে আচ্ছাদিত এরূপ শিবিকারোহণে তাঁহাদিগকে ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে হয়, শিবিকা হইতে তাঁহাদের গাড়ীতে আরোহণের সময় অপর লোকে বা কোনরূপে তাঁহাদিগকে দর্শন করে এই ভয়ে দুই চারি জন লোক উভয় পার্শ্বে সাবধানে, পর্দ্দা ধারণ করে। সেই অবস্থায় অবগুণ্ঠনাবৃতা বধূ বা কন্যা বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করেন। শকটের সমুদায় দ্বার জনালা অবরুদ্ধ থাকে। গ্রীষ্ম

কালে এরূপ আরোহীর যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় তাহা বলা বাহুল্য। মোসলমান অন্তঃপুরিকারা যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া স্পষ্ট স্বরে অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা কহেন, তাহাতে বাধা নাই। হিন্দু অন্তঃপুরিকা আবশ্যক হইলে অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া অপর পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হন, কিন্তু কথা কহেন না। দুইয়ে এই প্রভেদ। এবার পেশওয়ার নগরের জনাকীর্ণ রাজপথে দেখা গেল, অনেক মহিলা বোর্কা পরিধান করিয়া পুরুষমণ্ডলীর মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। বোর্কা ধারিণীগণ সকলকে দেখিতে পান, তাঁহাদিগকে কেহ দেখিতে পায় না, এই এক মজা!

লক্ষ্ণৌ নগরস্থ আমাদের স্নেহভাজন আত্মীয় ডাক্তার তত্রত্য অনেক নবাব পরিবারে চিকিৎসার্থ আহূত হইয়া থাকেন। তাঁহার প্রমুখাৎ নবাবদিগের অন্তঃপুরের অনেক বিবরণ অবগত হওয়া গিয়াছে। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মহাবিলাসী নবাব ওয়াজেদআলি হইতে অযোধ্যা প্রদেশের মোসলমান আধিপত্য বিলুপ্ত। লক্ষ্ণৌ নগরই অযোধ্যা প্রদেশের রাজধানী। নবাব ওয়াজেদ আলির আত্মীয় স্বজনবর্গও নবাব বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের কেহ কেহ মাসিক হাজার দেড় হাজার টাকা কেহ কেহ বা ৫।৫ টাকা মা॰ গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ডাক্তার বলিয়াছেন যে, কোন বেগম সাহেবের চিকিৎসার জন্য নবাব বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হইলে একজন ভৃত্য বা দাসী সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া যায়। ৩।৪ স্থানে পর্দ্দা পার হইতে হয়। প্রত্যেক যবনিকার পার্শ্বে দুই এক জন দাসী নিযুক্ত থাকে। যে কক্ষে রোগী বাস করেন সে কক্ষে ঘোরতর যবনিকা। রোগীর শারীরিক লক্ষণাদি দেখিয়া ডাক্তারের রোগনির্ণয় করিবার সাধ্য নাই। নাড়ী স্পর্শ করিবার সময় ও তাঁহার হস্ত পর্য্যন্ত দর্শন করিতে পারেন না। যবনিকার অপর পার্শ্বে হস্ত চালাইয়া রোগীর নাড়ী নির্ণয় করিতে হয়। তখন রোগী স্বীয় নাড়ী অঙ্গুলি যোগে টিপিবার অধিকার দেন। ডাক্তার বলিয়াছেন, বেগমদিগের মধ্যে অধিকাংশ নব যুবতী নানা অনিয়ম অত্যাচারে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসাধীন হন। পর্দ্দার দৃঢ়তার জন্য তাঁহাদের শ্বাস যন্ত্র রীতি মত পরীক্ষা করা যায় না, মুখ মণ্ডলের অনেকাংশ চক্ষু ও জিহ্বা দর্শন করিয়া রোগের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায়। বস্ত্রাঞ্চলও অপরের দর্শন করিবার সাধ্য নাই, মুখ দেখিবে কি? নানা প্রতিবন্ধকতাবশতঃ উপযুক্ত চিকিৎসা হয় না, প্রায় রোগীই মারা যায়। অন্তঃপুরের ঘর বাড়ী জঞ্জাল পূর্ণ অতি অপরিষ্কার। গৃহের প্রাচীর তাম্বুলানুরাগিণী বেগম ও বাঁদীদিগের থুথুতে চিত্রিত। নবাব সাহেবদিগের কথাও কিছু বলা যাউক। তাঁহাদের অধিকমাত্রায় অহিফেন সেবন অভ্যাস। তাঁহারা বেলা ১০টা বা ১১টার সময় শয্যা ত্যাগ করেন, তখন মোসাহেবেরা জুটিয়া আমোদ গল্প করিয়া থাকেন, তৎপর পোলাও কাবাব যোগে খানা খান, পরে পায়রা ও ঘুড়ী উড়াইয়া আমোদ করেন, সায়ংকালে গাড়ীতে চড়িয়া নগর ভ্রমণ

করিয়া থাকেন। রাত্রিতে খোসগল্প ও আমোদ প্রমোদ চলে। এই রূপে তাঁহাদের সময়ের সদ্ব্যয় হয়! ১০।৫ টাকা বৃত্তি ভোগী নবাব সাহেবেরা বাজারে বাইয়া দোকানে বসিয়া পোলাও কাবাব ভক্ষণ করেন, এবং এক পয়সার মসলাদার তাম্বুল চর্ব্বণ এবং এক পয়সার আতর গোলাপ লেপন করিয়া চুল বাঁকাইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এখন এ সকল কথা থাক। এক দিকে ইয়ুরোপীয় যুবতীদিগের পর পুরুষের হস্ত ধারণ করিয়া সভায় নৃত্যামোদ, অপর দিকে মোসলমান মহিলাদিগের যবনিকার পর যবনিকা, প্রাচীরের পর প্রাচীরের ভিতরে অন্তরালে লুক্কায়িত থাকা এ দুই পর্দ্দা ও বেপর্দ্দার আতিশয্যের এক শেষ; অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও কুৎসিত। এই দুইয়ের মধ্য পথ অবলম্বন প্রয়োজন। পর্দ্দা থাকিবে, পর্দ্দার ব্যভিচার থাকিবে না। অন্তঃপুর থাকিবে, অবস্থা ভেদে অন্তঃপুরের বাহিরেও গমন হইবে। কিছু দিন হইল ইয়োরোপ হইতে এক জন সুবিজ্ঞ বন্ধু ভ্রমণোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়ে বক্তৃতাদানের জন্য আহূত হইয়া তথায় বহু বাঙ্গালী মহিলাদর্শনে আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, আমি এদেশে আসিয়া ভাবিয়াছিলাম, এ দেশে বুঝি নারী নাই, কেবল পুরুষ বাস করে। আজ এত গুলি ভগিনীকে এখানে একত্র দেখিয়া আমার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না।

শিক পরিবার।

বিস্তীর্ণ পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত নগরে ও পল্লিতে শিক জাতির বসতি। পঞ্জাবে হিন্দু মোসলমানের সংখ্যাও অল্প নহে। ন্যূনাধিক চারি শত বৎসর হইল মহাত্মা গুরুনানক পঞ্জাবে নিরাকার ঈশ্বরের পূজা বন্দনা প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহার ধর্ম্মমতাবলম্বী অনুগামী লোকেরা শিক্ নামে অভিহিত হন। শিক্ শব্দে শিষ্যকে বুঝায়। অর্থাৎ পঞ্জাবী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি হিন্দুগণ পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া গুরুনানকের প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্য শিক বলিয়া পরিচিত হন। উদারমতাবলম্বী পরমভক্ত গুরু নানক জাতিভেদ স্বীকার করিতেন না, সকল শ্রেণীর লোকদিগকে আপনার দলে গ্রহণ করিতেন।

শিক পুরুষেরা পাঁচটি বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত; মস্তকে কেশ ধারণ; কাঁকই (চিরুণী); কটীদেশে কচ্ছ (জাঙ্গিয়া বিশেষ); কোমরে কাচু (চাকু) হস্তে কড়া (লোহার বালা)। ককারাদি এই কয়টি দ্রব্য, সকলে না হউক অনেক শিকেই ধারণ করে। তাহাদের প্রত্যেকের মস্তকে দীর্ঘ কেশ, কেবল পাঞ্জাবী হিন্দুরা কেশ কর্ত্তন করিয়া থাকে। শিকেরা দীর্ঘকায় বীর পুরুষ, কিন্তু তাঁহারা অতিশয় ধর্ম্মোৎসাহী বিনম্র হৃদয়। স্থানে স্থানে শিখ ধর্ম্মশালা সকল প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে বেদীর উপরে গ্রন্থ সাহেব (শিক ধর্ম্মগ্রন্থ) স্থাপিত। এক্ষণ গ্রন্থসাহেবই এক প্রকার পুত্তলিকা স্থানীয় হইয়া পূজিত হইতেছে। পূর্ব্বাহ্নে অপরাহ্নে

দলে দলে স্ত্রীপুরুষ ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হয়, সুগায়কগণ সঙ্গীত করে, শাস্ত্র পাঠ, ব্যাখ্যা ও কথকতাদি হয়। সাধারণ ধর্ম্ম শালাতে প্রত্যহ দুই বেলা এইরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। ইহাতে বুঝা যায় শিক নরনারীদের কেমন অপ্রতিহত ধর্ম্মোৎসাহ ও ধর্ম্মানুরাগ। অমৃতসরের প্রধান ধর্ম্মশালায় অর্থাৎ গুরু দরবারে সর্ব্বদা মহোৎসব চলিয়াছে, সর্ব্বক্ষণ জনতা, কেবল নিশীথ কালে ৩। ৪ ঘণ্টা বিশ্রাম। এইরূপ দিবারাত্রি ধর্ম্ম মত্ততা, পৃথিবীর কোন তীর্থে লক্ষিত হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু শিকদিগকে ক্রমে পৌত্তলিকতা গ্রাস করিতেছে। তাহাদের নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরে নিষ্ঠা বিলুপ্ত হইতেছে। যে রমণীয় সরোবরের মধ্যস্থলে গুরুদরবার মন্দির সেই সরোবরের কূলে বিগ্রহাদি পূজিত হইয়া থাকে। রাউলপিণ্ডি নগরেই প্রসিদ্ধ ধনী সুজন সিংহের বৃহৎ ধর্ম্ম শালার মধ্যস্থলে বেদীর উপর গ্রন্থসাহেব, তাহার বাম পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণমূর্ত্তি এবং দক্ষিণ পার্শ্বের কুঠরীতে শিবস্থাপিত আছে। যাহারা উক্ত ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হয়, তাহারা সেই তিন দেবতার উদ্দেশ্যেই পূজোপহার প্রদান করে বা প্রণাম করিয়া থাকে।

শিখজাতির মধ্যে বাল্য বিবাহ বিরল। পিতা মাতা বাল্যকালেই পুত্র কন্যার সম্বন্ধ স্থির করেন—তদ্বিষয়ে বাগ্দান করিয়া থাকেন, কিন্তু সচরাচর উভয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ হইলেও যে পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় পাত্রীর স্বামী গৃহে যাইবার নিয়ম নাই। কখনও অপ্রাপ্তবয়স্কা পাত্রী স্বামী গৃহে প্রেরিত হয় না। বিবাহে বাগ্দান হইলে পর পিতামাতা কখনও কোন কারণে তাহা ভঙ্গ করেন না। বাগ্দানের পর হইতে পাত্র ও পাত্রী পক্ষের মধ্যে কুটুম্বিতা চলিতে থাকে, পরস্পর দ্রব্যাদির আদান প্রদান হয়। বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে যেমন জঘন্য বরপণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার সর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া অতীব নীচতার পরিচয় দান করে, শিখ সম্প্রদায়ের বিবাহাদিতে এরূপ নীচনিষ্ঠুর আচরণ হয় না। তাঁহারা পুত্র কন্যার উদ্বাহ ক্রিয়াতে নানা প্রকার আড়ম্বর করিয়া অর্থের অপব্যয়ও করেন না। বিবাহোৎসবে আত্মীয় কুটুম্বদিগের ভোজে অমিতাচার হয় না, সামান্যরূপে ব্যবস্থা হয়। কেবল কন্যাকর্ত্তা যথাসাধ্য বহু মূল্য বস্ত্রালঙ্কারে কন্যাকে সজ্জিত করিয়া থাকেন। শিখদিগের বিবাহের ব্যয়াদির ব্যবস্থা ভাল, তাঁহারা বাঙ্গালী হিন্দু ও অনেক ব্রাহ্মের ন্যায় এ বিষয়ে অমিতাচারী নহেন। শিখসম্প্রদায়ে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই, পুরুষের একাধিক দার পরিগ্রহে বাধা নাই। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বহু বিবাহ বিরল। সমধর্ম্মাবলম্বী হইলেও সচরাচর ব্রাহ্মণ শ্রেণীর শিক ক্ষত্রিয় শ্রেণীর শিকের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। কিন্তু ভোজনে তাঁহারা জাতি বিচার করেন না, সকল শ্রেণীর শিক একত্র পঙ্ক্তি ভোজন করেন। বিলাত ফের লোকের সঙ্গে একত্র ভোজনে তাঁহাদের আপত্তি নাই।

শিক পুরুষেরা মাংসভোজন করে, মদ্যপানও করিয়া থাকে। কিন্তু তামাক সেবন কখনও করেন, তাহা তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুরাপান করিয়া কোন শিক মাতাল হইয়াছে এরূপ শুনা যায় না। শিক সীমন্তিনীগণ মদ্য মাংস স্পর্শ করেন না। অনেক বাঙ্গালী মহিলা যেমন বিবীদিগের দৃষ্টান্তে মদ্যমাংসে অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন, শিক কামিনীগণ এরূপ তরল প্রকৃতি অনুকরণ প্রিয়া নহেন। তাঁহাদের মধ্যে গুরুমুখী ও উর্দুভাষার চর্চ্চা আছে, অনেকে লেখা পড়া জানেন এবং ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া থাকেন। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত কোন শিক মহিলা আছেন এরূপ বলা যায় না। তাঁহারা চুরিদার পাজামা পরেন, কেহ কেহ ঘাঘরাও পরিয়া থাকেন, উড়ানি ও কোট ব্যবহার করেন। তাঁহারা দৃঢ়রূপে অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকেন না। তাঁহাদিগকে মুক্তভাবে রাজপথে বাহির হইতে দৃষ্ট হয়। কোন ভদ্র সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলে তখন গৃহস্বামী গৃহে না থাকিলে মহিলারা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ সম্ভাষণ করেন। তাঁহাদের চরিত্র বিষয়ে কোন নিন্দা শুনা যায় যায় নাই। শিক কামিনীদিগের কুটন কুটা ও রন্ধনাদি বিষয়ে ব্যস্ততা নাই। সাধারণতঃ দোকান হইতে রুটি তরকারি খরিদ হইয়া আইসে। তাঁহাদের অনেক সময় আলস্য বা বৃথা গল্পে যাপিত হয়।

এই শিক সম্প্রদায়ের আদি গুরু ও নেতা মহামান্য গুরু নানক। উক্ত গুরুর তিরোধানের পর তেগ সিংহ গুরুগোবিন্দসিংহ প্রভৃতি দশজন বিখ্যাত গুরু শিক সম্প্রদায়ের নেতা ও ধর্ম্মরক্ষক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকেই মোগল সম্রাট্ ও মোসলমান রাজ পুরুষগণ কর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন। এই উৎপীড়নের প্রতিকার জন্য গুরুগোবিন্দ সিংহ কর্ত্তৃক খালসা নামে শিক সেনা প্রস্তুত হয়। তিনি দেবীভবানী হইতে শত্রু সংহারার্থ করবাল প্রাপ্ত হইয়াছেন, শিষ্যদিগের নিকটে এরূপ ব্যক্ত করেন। বোধ করি গুরুগোবিন্দ হইতেই শিক সম্প্রদায়ে পৌত্তলিকতা প্রবেশ করে। শিকদিগের মধ্যে খালসা সম্প্রদায়, গুরুগোবিন্দ সিংহের বিশেষ চিহ্নিত সেনা। খালসারা মস্তকে চক্র নামক বিশেষ যুদ্ধাস্ত্র ধারণ করেন।

দাদামহাশয় ও নাতনী।

খাম্বাজ বাহার।—কাওয়ালী।

সরলা।—গাইল

হরি হে এ দেহে আছ সদা বর্ত্তমান।
নিশ্বাসে শোণিতাধারে করে তোমার নাম গান॥

তুমি মম বাহুবল, বিদ্যা বুদ্ধি সম্বল,
আশা ভরসা কেবল আমি তো তৃণ সমান।
জীবন্ত আদেশবাণী, শুনাও দিন যামিনী,
পবিত্র নিশ্বাসে কর মহাবীর বলবান্।

লয়ে ভক্ত পরিবার, হৃদয়ে কর বিহার,
দেখাও প্রাণ মন্দিরে পুণ্যময় স্বর্গধাম।

দাদামহাশয়। দিদিমণি, তুমি বেশ

গাইতে শিখিয়াছ, তোমার গলাটি বেশ মিষ্ট ও সুর ভাল বোধ হইয়াছে। ইংরাজী হারমনিয়ম্ চলন হওয়াতে গান গাইবার বড় সুবিধা হয়েছে। আচ্ছা সে কথা যাক, এ গানটির ভাব কি ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে?

সরলা। হাঁ, কিছু কিছু পারিয়াছি, তবে কি আর আপনার মত পেরেছি? আপনি গান শুনে যেরূপ মত্ত হয়েছিলেন, তাহাতে বোধ হয় আমার চেয়ে গানের ভাব আপনি ঢের বেশী বুঝিছেন। আজ এই গান সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলুন।

দাদা। হাঁ দিদিমণি,এই গানের ভিতরে কত গভীর ও উচ্চ ভাব আছে সে সমস্ত আমিও হৃদঙ্গম করিতে পারি না, কিন্তু যতটুকু পারি তাহাও ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি না। আচ্ছা তোমায় এ বিষয়ে কিছু কিছু বলি মন দিয়া শুন। "নিশ্বাসে শোণিতাধারে করে তোমার নাম গান" আমাদের শোণিত প্রবাহে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বিধাতা যে ব্যবস্থা করিয়াছেন সে সমস্ত ভাবিলে বিস্মিত হইয়া যাই এবং লীলা রসময় হরির লীলায় ডুবিয়া যাই।

সরলা। সে ব্যবস্থার কথা আমাকে বলুন না।

দাদা। এ ব্যবস্থার সমস্ত কথা শারীর তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ জানেন তাঁহাদের একটু আধটু উচ্ছিষ্ট খাইয়া আমি যাহা জানিয়াছি তাহা কিছু কিছু তোমাকে বলি। এই মহা নগরী কলিকাতার Draining filter water পয়ঃপ্রণালী এবং নির্ম্মল জলের ব্যবহারের বিষয় বোধ হয় তুমি কিছু কিছু জান। গঙ্গা হইতে কলের দ্বারা জল তোলা হয়, সেই জল পরিষ্কার হইয়া প্রধান নলের মধ্য দিয়া সহরে আসিতেছে, সেই নলের শাখা প্রশাখা ক্রমে ছোট ছোট হইয়া গৃহস্থের ঘরে পৌছিয়াছে। সেই ক্ষুদ্র নলের মধ্য দিয়া অজস্রধারে জল পাইয়া গৃহস্থ স্নান, পান করিয়া সুস্থ ও সবল সুখী হইতেছে। গৃহস্থের বাটী হইতে সমস্ত অপরিষ্কার জল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল দিয়া ড্রেনেজের মেইন পাইপে পড়িতেছে এবং সেই জল কলিকাতার বহুদূরে গিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে তথায় ঐ কলুষিত জল সমুদ্রে মিশিয়া গিয়া পরিষ্কৃত হইতেছে এবং হয় ত সেই জলের কিয়ং অংশ বাষ্পাকারে আকাশে উঠিয়া বৃষ্টিধারারূপে আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে, দেখ এখানে কেমন দেব মানবে মিলিয়া লীলা করিতেছে। মানুষ বহু পরিশ্রমে ও সুকৌশলে পয়ঃপ্রণালী প্রস্তুত করিয়া কলুষিত জল সমুদ্রে ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, আর সেই পতিতপাবন ভগবান্ যিনি কলুষিত বস্তুর মলকে সর্ব্বদা নির্ম্মল করেন, তিনি আমাদের সহরে কলুষিত জলকে নির্ম্মল করিয়া আবার আমাদের সেবার উপযুক্ত করিয়া দিতেছেন। আহা তাঁহার করুণার কি ব্যবস্থা!

সরলা। দাদামহাশয়, এ কথা তো কিছু বুঝিলাম, কিন্তু এই কথার সঙ্গে রক্ত চলাচলের কি যোগ আছে?

দাদা। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। রক্ত চলাচলের জন্য আমাদের শরীরের মধ্যে দুই প্রকার প্রণালী আছে, ঐ রকম প্রধান নল (pipe) এবং শাখা প্রশাখা আছে। এব

প্রকার প্রণালীর ভিতর দিয়া পরিষ্কার রক্ত চলে, অন্য প্রকার প্রণালী দিয়া বিষাক্ত রক্ত চলে; এই রক্ত শরীরে থাকিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জীবন শেষ হইয়া যায়। পরিষ্কার রক্ত চলিবার Main-pipe নল Artery (আরটারি) এই আরটারি হার্ট (হৃদ্‌পিণ্ড) এক বিভাগ হইতে বাহির হইয়া ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখাতে বিভক্ত হইয়াছে। অতি ক্ষুদ্র পাইপ গুলি চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম সে গুলির নাম Capillary কৈশিক নাড়ী বলে। এই গুলি শরীরের সর্ব্বত্রে বিস্তৃত আছে। আমাদের পরিশ্রম এবং নানা প্রকার কারণে আমাদের শরীরে কতক গুলি অণু Tissue নষ্ট হইয়া পড়ে, নষ্ট হইয়া গিয়া রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায় তাহাতে রক্ত কলুষিত ও বিষাক্ত হইয়া যায়, এই কলুষিত রক্ত প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাইপে তার পর ক্রমে বড় বড় পাইপের মধ্য দিয়া হার্টের অন্য বিভাগে গিয়া পড়ে। তথা হইতে অন্য প্রকার প্রণালীর ভিতর দিয়া Lungs (ফুস্ফুসে) গিয়া পড়ে। Lungs দুটি আছে। ইহারা বাহিরের বায়ু গ্রহণ করে তাকে নিশ্বাস বলে। আর শরীরের কলুষিত ও বিষাক্ত বায়ু বাহির করিয়া দেয় একে প্রশ্বাস বলে। বাহিরের বায়ু Lungs আসিয়া কলুষিত রক্তকে স্পর্শ করে এবং তদ্দ্বারা সে রক্তকে শুদ্ধ করিয়া আপনি কলুষিত হইয়া বাহির হইয়া যায়। সেই জন্য আমাদের প্রশ্বাসের বায়ু আমাদের ও অন্য জীবের পক্ষে এত অনিষ্টকর, কিন্তু এই বায়ুই উদ্ভিদের পক্ষে ইষ্টকর। বায়ু দ্বারা পরিষ্কৃত রক্ত নানা প্রকার প্রণালীর ভিতর দিয়া হার্টের আর একটি বিভাগে পড়ে এবং তথা হইতে সমস্ত অঙ্গে চলাচল করে, এই রূপ প্রতিনিয়ত রক্ত চলাচল করিতেছে এবং কলুষিত রক্ত পরিষ্কৃত হইতেছে। আমরা সুখে আহার বিহার নিদ্রা যাই কিন্তু বিধাতার নিদ্রা নাই, তিনি প্রতিনিয়ত জাগ্রত থাকিয়া অনন্ত প্রেম শক্তি ও জ্ঞান কৌশলে আমাদিগকে সযত্নে শরীরের যন্ত্র সকল চালাইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতেছেন। আহা আমরা কি পাষণ্ড, আমরা কোন্ প্রাণে সেই প্রেমময় হরিকে ভুলিয়া থাকি। কোন্ প্রাণেই বা তাঁহার স্নেহের কুমার কুমারীদিগকে অযত্ন ও অনাদর করিব।

বাউলে, কীর্ত্তন সুর। একতালা।

নববিধানের হরি আহা মরি কি সুন্দর জাগ্রত জীবন্ত প্রেমে মত্ত নব রসে গর গর নহে ধাতু কাষ্ঠ নির্ম্মিত, নহে অনুমান সিদ্ধ কবির কল্পিত; ঠাকুর চলে বলে খেলা করে ভক্ত সঙ্গে নিরন্তর।

নাহি নিদ্রা আরাম বিশ্রাম, নানা কাজে ব্যস্ত নিরলস অবিরাম, নব লীলা বিলাস বিহারী রসরাজ নটবর।

একদণ্ড দেয় না বসিতে, নাকে দড়ি দিয়ে টানে মারে পিঠেতে, ঠাকুর আপনি নেচে নাচায় যত সাঙ্গোপাঙ্গ সহচর।

সরলা। দাদামহাশয় এই গানের মধ্যে এত কথা?

দাদা। দিদিমণি, এই গানটির বিষয় বেশী কিছু বলা হইল না, শ্রীহরি তাঁহার ভক্তগণকে লইয়া মানবপ্রাণের ভিতর লীলা করেন। সে বিষয় তোমাকে কিছু বলিলাম না, কারণ সে কথা শুনিবার জন্য
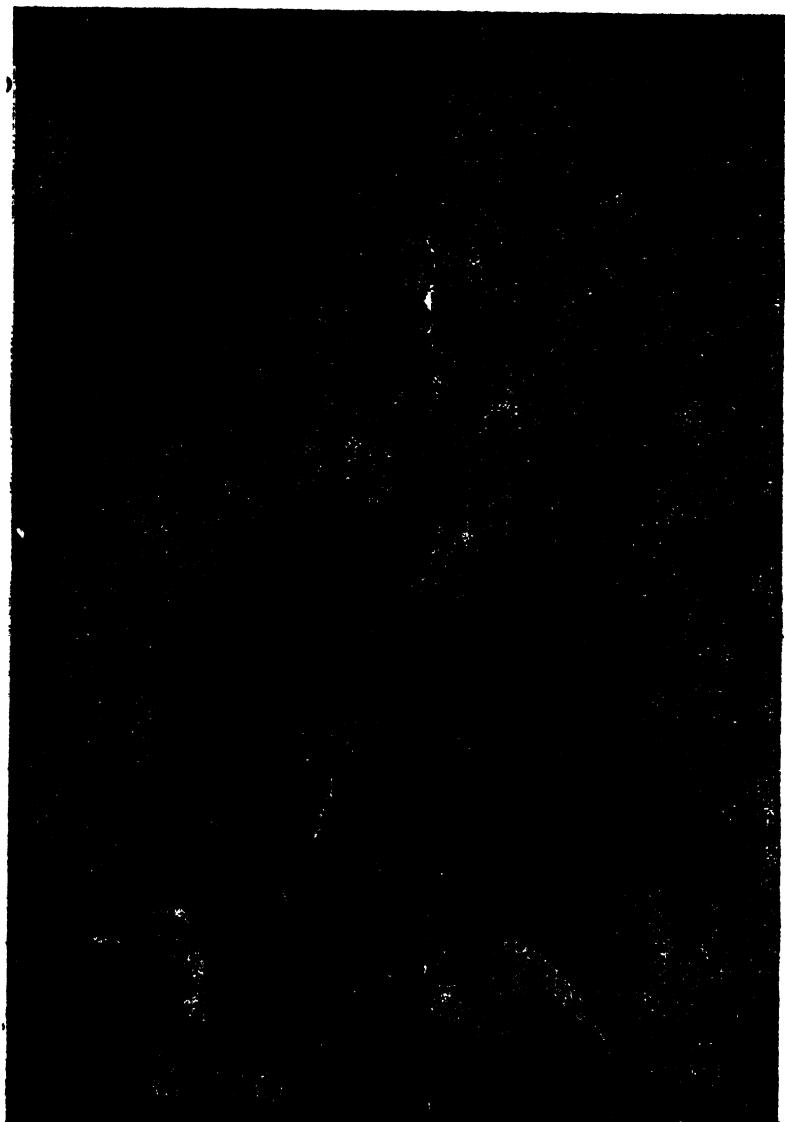
স্বর্গগত মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

এখন তুমি উপযুক্ত হও নাই শারীর তত্ত্ব যাহা একটু বলিলাম তাহাও অতি অসম্পূর্ণ। রক্ত বস্তুতঃ কি তাহা দেহের মধ্যে কি কার্য্য করে Heart এবং Lungs, Artery, Veins, Airpipe (শ্বাস প্রণালী) ইত্যাদির আকার গঠন, তাহাদের স্থানের বিষয় কিছুই বলা হইল না, কিন্তু আজকে যাহা বলিলাম তাহা আজকের জন্য যথেষ্ট। এই বিষয়টি তুমি ভাল করে ভাবিয়া দেখিবে।

নারীহিতৈষী মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

মাতৃগণ, কন্যাগণ শ্রদ্ধাস্পদ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তোমাদের একজন পরম বন্ধু ছিলেন। বিগত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার তিনি ঐহিক লীলা সংবরণ করিয়া দিব্যধামবাসী হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আমরা এই শোকসংবাদ প্রদান করিয়াছি। মজুমদার মহাশয় নববিধান সমাজের এক জন প্রচারক ছিলেন, যৌবনের আরম্ভ হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত ভারতের নানা স্থানে এবং ইয়ুরোপ আমেরিকাতে উৎসাহ উদ্যম সহকারে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া শত সহস্র নর নারীর হৃদয় ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, ইংরাজি ও বঙ্গভাষায় তাঁহার ন্যায় সুবক্তা ও সুলেখক অত্যল্প লোক নয়নগোচন হয়। ইংরাজ সমাজে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ও মর্য্যাদা ছিল। সুপণ্ডিত ইংরাজগণও প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ তাঁহার যোগ্যতা ও ক্ষমতার জন্য তাঁহাকে উচ্চ সম্মানদান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অন্য অন্য সদ্‌গুণ ও যোগ্যতার কথা বর্ণন না করিয়া তিনি যে এক জন নারীজাতির পরম বন্ধু ছিলেন, যত্নপূর্ব্বক যে তাঁহাদের সেবা ও হিত সাধন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কয়েকটী কথা বলিতেছি ;—

ভক্তিভাজন আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন, ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া স্ত্রীজাতির জ্ঞানোন্নতির জন্য স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপন করিলে মজুমদার মহাশয় তদ্বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় হন, তিনি সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মহিলাদিগকে শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার যত্নে ও শিক্ষাদান নৈপুণ্যে কয়েকটী মহিলা সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় যশস্বিনী হইয়াছেন, তিনি কোন কোন মহিলাকে নিজগৃহে রাখিয়া কন্যাতুল্য স্নেহে শিক্ষাদান করিয়া জ্ঞান ধর্ম্মে সমুন্নত করিয়াছেন। মহিলাদিগের জ্ঞানোন্নতিবিধানার্থ পরিচারিকা পত্রিকা তাঁহা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। অনেক বৎসর তিনি পরিচারিকার সম্পাদক ছিলেন, পরে নানা স্থানে প্রচারাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার জন্য অনবকাশবশতঃ পরিচারিকা সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া তাহার ভার হস্তান্তরে ন্যস্ত করেন। তিনি কলিকাতায় উপস্থিত কালে সময়ে২ ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ে ও অন্যান্য নারী সমাজে সদুপদেশ দান করিতেন। তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশাদি সকল মহিলার অতিশয় শিক্ষাপ্রদ ও চিন্তাকর্ষক হইয়াছে। আচার্য্যের তিরোধানের পর হইতে প্রতিবৎসর মাঘোৎসবের সময় শান্তিকুটীরে তাঁহা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহার

উপদেশে ব্রাহ্মিকাগণ বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। এ বৎসর মাঘোৎসবের সময় তিনি এক প্রকার উত্থানশক্তিরহিত শয্যাগত ছিলেন, তথাপি আদর ও আগ্রহ সহকারে শান্তিকুটীরে ব্রাহ্মিকা উৎসব করিয়াছিলেন। উপাসনাকার্য্যের ভার শ্রীমান্ প্রমথ লাল সেনের প্রতি অর্পিত ছিল। মনের আবেগে তিনি উপরের ঘর হইতে নীচের ঘরে উপাসনা স্থলে নামিয়া আইলেন। ২।৩ ব্যক্তি তাঁহাকে চেয়ারে বসাইয়া ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া আইলেন। তিনি মহিলাদিগকে অশ্রুপূর্ণ লোচনে অন্তিম উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশ বাক্য কয়টি লিখিত হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত মহিলাদের যাহাতে ভালরূপে ভোজন হয় তজ্জন্য তিনি বিশেষ ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভোজনে ব্যবস্থা হইয়াছিল। স্বর্গগত মজুমদার মহাশয় কর্তৃক "স্ত্রীচরিত্র গঠন" নামক পুস্তক রচিত হইয়া কয়েক বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে, মহিলার পাঠিকাদের অনেকে তাহা পড়িয়াছেন, সেই পুস্তক কেমন সুন্দর উপদেশপূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছেন। স্বর্গগত মহাত্মার অন্যান্য চরিত্রকাহিনী চরিত লেখকগণ লিখিতেছেন ও লিখিবেন। মহিলা বিস্তারিত বলিতে পারিলেন না। মজুমদার মহাশয়ের সন্তানাদি কিছুই নাই। শোকদগ্ধা পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী অবিরত শোকাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহার হৃদয়ে সান্ত্বনা দান করুন। তিনি স্বর্গগত প্রিয়তম পতির সঙ্গে মঙ্গলময় ঈশ্বরের চরণে আত্মায় আত্মায় মিলিত হইয়া গভীর শান্তি সুখ সম্ভোগ করুন।

আমাদের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(বোধরাজ্যে গমন।)

উড়িষ্যা প্রদেশের ন্যূনাধিক দুই তৃতীয়াংশ স্থান গড়জাত রাজ্যের অন্তর্গত। ময়ূরভঞ্জ ঢেঙ্কানল কেঞ্জর বোধ প্রভৃতি ১৭।১৮টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে গড়জাত বিভক্ত। গড়জাতের রাজাদিগের মধ্যে ময়ূর ভঞ্জরাজ প্রথম, বোধ রাজ এক্ষণ চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। যখন কন্দমহল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তখন গড়জাতের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় রাজা ছিলেন। গড়জাত রাজাদিগের রাজ্য অরণ্য পর্ব্বতে পূর্ণ, অনেকের রাজ্যের আয় বঙ্গ দেশের একজন সামান্য জমীদারের আয় অপেক্ষা ন্যূন, কিন্তু প্রত্যেক রাজার পূর্ণ ক্ষমতা, তাঁহারা নামে মাত্র গবর্ণমেণ্টের অধীন। এক সময় প্রাণ দণ্ড বিধানেও তাঁহাদের অধিকার ছিল, বহুকাল হইতে সেই ক্ষমতা রহিত হইয়াছে। দুই চারিজন রাজা ভিন্ন গড়জাতের সমুদায় রাজাই অশিক্ষিত ও অমিতাচারী, উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনর তাঁহাদের উপর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে নিযুক্ত। রাজারা অন্যায়াচরণ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে শাসন করিয়া থাকেন। কথিত আছে যে, উৎকলরাজ অনঙ্গভীমের রাজত্ব কালে পঁচিশ সহস্র হস্তী, পঞ্চাশ সহস্র অশ্বারোহী লক্ষপদাতিক সৈন্য ছিল। গড়জাতের রাজগণ তাহার অধীনস্থ সামন্ত রাজা ছিলেন।

বোধ রাজ্যের বর্ত্তমান সুযোগ্য দেওয়ান কটকনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাও মহাশয় আমাদের কুটুম্ব ও পরম বন্ধু।

একবার আমরা বোধে গমন করি তিনি এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গত শীত ঋতুর প্রারম্ভে দেওয়ান মহোদয় সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা কন্যাও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তখন তিনি বোধে যাওয়ার প্রস্তাব আমাদের নিকটে পুনর্ব্বার উপস্থিত করেন। আমরা সম্মত হইয়া বলি যে আগামী মার্চ্চ মাসে তথায় যাত্রা করিবার চেষ্টা করিব। স্নেহের কন্যা, বলেন "মার্চ্চ মাসের প্রথমভাগে আমাকে সম্ভবতঃ কটকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, আমি বোধে উপস্থিত থাকিতে আপনাকে যাইতে হইবে।" কলিকাতায় বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলিয়া আমরা মার্চ্চ মাসের প্রথমে বোধে যাত্রা করিতে অক্ষম হই, স্নেহভাজন কন্যাকে ইহা জ্ঞাপন করি। তিনি লিখিয়া জানাইলেন, "আমি আর অধিক দিন বিলম্ব করিতে পারিতেছিনা, সত্বরই কটকে যাইতে বাধ্য হইয়াছি, যখন এখানে আসার কথা হইয়াছে, কটক নগরে যাইয়া আমার আতিথ্যগ্রহণ করিলে আমার মনোদুঃখ দূর হইবে। সম্বলপুর পর্য্যন্ত ট্রেণে আসিবেন, তথা হইতে হস্তি পৃষ্ঠে আরোহণে বোধে আগমন করিবেন। আপনি কোন্ দিন সম্বলপুরে পঁহুছিবেন, এই সংবাদ পাইলেই এখান হইতে আপনার জন্য হস্তী ও লোক প্রেরিত হইবে।" এই পত্রের সঙ্গেই রেলের ভাড়া প্রেরিত হইয়াছিল। আমাদের বোধে পঁহুছিবার পূর্ব্বে কন্যা কটকে চলিয়া গিয়াছিলেন।

বিগত ২রা চৈত্র (১৮ই মার্চ্চ) মধ্যাহ্নে আমরা কলিকাতা হইতে বাষ্পীয় শকটযোগে মধ্যভারতবর্ষের অন্তর্গত সম্বলপুর নগরে যাত্রা করি। তথা হইতে হস্তীর উপর আরোহণপূর্ব্বক ৭২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বোধে যাইব প্রথমে এইরূপই প্রস্তাব ছিল। গজপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া আমরা অনেক বার সুদূর পথ চলিয়াছি, বিশেষ ক্লান্ত হই নাই, ইহা ভাবিয়াই আমরা গজারোহণে ৭২ মাইল দূরে বোধরাজের রাজধানীতে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। তীব্র রৌদ্র ও উত্তাপে অত দূর পথ হস্তীর উপর চড়িয়া যাইতে অনেক বন্ধু বারণ করেন। তদনুসারে নৌকার ব্যবস্থা করিবার জন্য দেওয়ানজিকে পত্র লিখা যায়।

আমরা ৩রা চৈত্র পূর্ব্বাহ্ণে সম্বলপুর নগরে উপনীত হই। তত্রত্য প্রধান আদালতের উকীল প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত বামাপদ চট্টোপাধ্যায় টঙ্গাসহ ষ্টেশনে আসিয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আমরা তাঁহার সঙ্গে তাঁহার আবাসে যাইয়া স্থিতি করি। তিনি তাঁহার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার রায়ের সঙ্গে সপরিবারে একত্র বাস করিতেছেন। আমরা অক্ষয় বাবুদিগের সাদর আতিথ্যগ্রহণে সম্বলপুরে চারিদিবস স্থিতি করি। সেখানে ৩।৪টি ব্রাহ্ম পরিবার আছেন, ২।৩ জন বর্দ্ধিষ্ণু বাঙ্গালী উকিল, দুইজন বাঙ্গালী হাকিম আছেন। মহানদীর তীরে সম্বলপুর পুরনগর, নগরের ইতস্ততঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত বিদ্যমান। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর। কয়েকটি বৃহৎ দেবমন্দির, একটি বহু পুরাতন রাজবাড়ীর চিহ্ন ও বৃহৎ

পরিখা আছে। সম্বলপুরে অবস্থানকালে প্রত্যহ টঙ্গাযোগে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা গিয়াছিল। সম্বলপুরের বিশেষ বিবরণ আমাদের কন্যা ইতিপূর্ব্বে মহিলায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পুনরালোচনা অপ্রয়োজনীয়।

৫ই চৈত্র দেওয়ানজীর প্রেরিত দেবী সিংহ অশ্বারোহণে উপস্থিত হইয়া নৌকার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। এ অঞ্চলের ও গড়জাতের নৌকা অতি বিচিত্র। তাহা দীর্ঘে বৃহৎ, পরিসরে অতি ক্ষুদ্র। আরোহীকে নৌকার খোলে বসিতে হয়, তাহাতে তক্তা পাটাতন নাই, ছাপ্পরের উভয় প্রান্তে নৌকার উভয়পার্শ্বে সংলগ্ন, গোলই পাছা বদ্ধ। ছাপ্পরকে ঠেলিয়া কিছু উচু করিয়া সরীসৃপের ন্যায় বুকে ভর দিয়া নৌকার তলা হইতে আরোহীকে এক পার্শ্বদিয়া বাহির হইতে হয়। নৌকা হইতে নামা ও বাহির হইতে তাহার ভিতরে প্রবেশ করা গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়াও পুনর্ব্বার গর্ত্তে প্রবেশ করার ন্যায় বিষম কাণ্ড। প্রায় নৌকাই ছাপ্পর শূন্য, ঈদৃশ ছাপ্পর যুক্ত নৌকাও দুর্লভ। কোন ভদ্র লোক কোথাও যাইবার জন্য নৌকাভাড়া করিলে, তখন ২।৩ খানা দরমা যোগ করিয়া ছাপ্পর প্রস্তুত করা হয়। দেবী সিংহ ক্রমাগত দুইদিন মাঝি মাল্লার বাড়া দৌড়া দৌড়ি করিয়া বোবে যাইবার জন্য এক খানা নৌকা স্থির করে। ৬ই অপরাহ্নে নৌকায় আরোহণ ধার্য্য হয়। বাবু বামাপদ চট্টোপাধ্যায়, এক্‌ষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাবু সুরেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ এবং মুনসেফ বাবু নটবিহারী ঘোষ নৌকায় পঁহুছাইয়া দিবার জন্য আমাদের সঙ্গে মহানদীর ঘাটে গমনকরেন। তখন বেলা এক ঘণ্টার অধিক ছিল না, মাঝি কিছুতেই সেদিন নৌকা চালাইতে সম্মত হইল না। আমাদের ও মাঝি মাল্লার জিনিষ পত্রে নৌকার অধিকাংশ স্থান পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আমার দেহ ও মস্তক মাত্র আচ্ছাদিত থাকে সেই পরিমাণ দুইখানা দরমাযোগ করিয়া ছাপ্পর করা হইয়াছিল। ঝড় বৃষ্টি হইলে মাথা বাঁচাইবার উপায় ছিল না। এদিকে এক মাইল বা অর্দ্ধমাইল দূরে নদীর ভীম গর্জ্জন শুনা যাইতেছিল। মহানদীর গর্ভে ইতস্ততঃ বৃহৎ প্রস্তর সকল স্থাপিত। জল স্রোত সবেগে সেই সকল প্রস্তরে আহত হইয়া ভীষণাকার ধারণ করিতেছে, তরঙ্গও আবর্ত্ত সহকারে ভীমগর্জ্জন করিতেছে। প্রস্তরাঘাতে এইরূপ জলস্রোতের উচ্ছ্বাসকে সেদেশীয় লোকেরা “বিষম” বলে। “বিষম” বাস্তবিক বিষম ব্যাপার। মহানদীর কয়দূর অন্তরই নানা আকারের “বিষম”। বিষমে নৌকা চালাইবার সময় মাঝি মাল্লা কিঞ্চিৎ অসাবধান হইলেই বিষম বিপদ্। প্রস্তরে ঠেকিয়া নৌকা খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতে পারে। দূর হইতে বিষমের গর্জ্জন শুনিয়া আমাদের বিষম ত্রাস হইল, এইরূপ শত শত বিষম অতিক্রম করিতে হইবে বলিয়া ভাবিত হইলাম। বৃদ্ধ মাঝি বিষমের ভয়ে সায়ংকালে নৌকা-চালাইতে অসম্মত হইল। আমরা আর কেন বৃথা কষ্ট ভোগ করিয়া ঘাটে নৌকায় রাত্রি যাপন করিব, ব্যাগ বিছানায়

ইত্যাদি নৌকায় রাখিয়া বাবুদের গৃহে ফিরিয়া গেলাম। মহিলাদের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলাম, এক রাত্রির জন্য সেই বিদায় ফিরাইয়া দিলাম। পর দিন প্রত্যুষে পুনর্ব্বার ঘাটে যাওয়া গেল। যাইয়া দেখি এক জন মাল্লা নাবিক রাত্রিতে নৌকা ছাড়িয়া নগরের কোন স্থানে শয়ন করিবার জন্য চলিয়া গিয়াছে, তখন পর্য্যন্ত সে ফিরিয়া আইসে নাই। তিন জন নাবিকের মধ্যে দুই জন মাত্র নৌকায় আছে। এক জন আবার উক্ত অদৃশ্য নাবিকের উদ্দেশ্যে নগরাভিমুখে যাত্রা করিল, বহু বিলম্ব হইল সেও ফিরিয়া আসিল না। নদী তীর হইতে তাহাদিগকে ডাকা ডাকি হইতে লাগিল, সাড়া শব্দ নাই। দেবী সিংহও নাবিকদ্বয়ের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল, সেও আসিতেছিল না। রাত্রি ভোর হওয়া মাত্র নৌকা ছাড়িয়া ৭।৮ মাইল দূরে হোনা নামক স্থানে ডাইল চাউলাদি খরিদ করিতে হইবে, সেখানে মাধ্যাহ্নিক রন্ধন ও ভোজন হইবে, এরূপ প্রস্তাব ছিল। সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়া দুষ্কর হইল। অনেক বেলা হইল, নৌকায় এক মাঝি মাত্র, আর আমরা নানা ভাবনায় অস্থির হইলাম। ইতি মধ্যে মুনসেফ বাবু ও একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট বাবু ভৃত্য সঙ্গে ঘাটে স্নান করিতে আসিলেন তাঁহারা আমাদের এই অবস্থায় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আমাদের সঙ্গে সহানুভূতি করিয়া ঘাটে বসিয়া কিঞ্চিৎক্ষণ প্রতীক্ষা করিলেন, পরে স্নান করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। ইতিমধ্যে মাল্লা দুই জন উপস্থিত হইল, দেবী সিংহও তাঃ দিনের আহারোপযোগী ডাইল চাউল তরকারী ঘৃত লবণ ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে করিয়া প্রত্যাগমন করিল। বোধ করি মাল্লা বাড়ীর মায়া ছাড়িতে পারে নাই, তাহার ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল না। তাহাকে এক প্রকার ধরাও-পাকড়াও করিয়া আনা হইয়াছিল। বেলা ৮টা বা ৯টার সময় ঘাট হইতে নৌকা ছাড়া হইল। আমরা স্নানান্তে সেই ক্ষুদ্র ছপ্পরটির নিম্নে বসিয়া ভগবানের চরণ বন্দনা করিতে লাগিলাম। সে দেশের নৌকার সঙ্গে দাঁড় পাল গুণ ইত্যাদির কোন সম্পর্ক নাই, কেবল লগির বলে নৌকা চালিত হয়। গড়জাতের লোকেরা নৌকা চালাইবার বংশ দণ্ড লগিকে কাত বলে। সেই কাতের নিম্নে গো সিংহাকৃতি বক্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠ খণ্ড সম্বদ্ধ থাকে, তাহাতে বালুকা পুঞ্জে ও প্রস্তরে কাতকে দৃঢ় রূপে আবদ্ধ করা যায়, বিষমের তীব্র স্রোতে নৌকা রক্ষা করিবার উহা একটি প্রধান উপায়।

কিয়দ্দূর নৌকা চালিত হইলে পর প্রথম বিষম প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুই দিকে সঙ্কীর্ণ প্রস্তর প্রাচীর, তাহার ভিতর দিয়া বিদ্যুদ্গতিতে ভীম গর্জ্জনে জল স্রোত চলিয়াছে, উক্ত সঙ্কীর্ণ পথে স্রোতোমুখে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল, মহাবেগে ক্ষুদ্র নৌকা বিষম পার হইয়া গেল। এই রূপ একটির পর একটি অনেক বিষমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। অনেক স্থানে প্রস্তর খণ্ড সকল ইতস্ততঃ নিকটে নিকটে ছড়ান, স্রোতের বক্রগতি, এরূপ সঙ্কীর্ণ পথে

নৌকা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চালাইতে হইয়াছিল যে, মনে হইতেছিল আর রক্ষা পাওয়া গেল না। পাথরে ঠেকিয়া নৌকা চূর্ণ হইয়া যাইবে।

মধ্য ভারত বর্ষের পর্ব্বত বিশেষ হইতে মহানদীর উৎপত্তি। উড়িষ্যা প্রদেশে এই নদীই সর্ব্ব প্রধান। ইহা হইতে কষ্টজুড়ী কোওয়াখাই প্রভৃতি বড় বড় নদী উৎপন্ন হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মহানদীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, ভিন্ন ভিন্ন শোভা ও সৌন্দর্য্য। স্থানে স্থানে ইহার তীরবর্ত্তী গিরিশ্রেণী ও অরণ্যানীর বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য দর্শকের হৃদয় বিমোহিত করে। বহু নদীর প্রসূতি এই মহানদী সৌন্দর্য্য ছটা ছড়াইয়া সুবিস্তীর্ণ উৎকল প্রদেশকে শস্যসম্পৎশালী করিয়া বহু দূরে যাইয়া সাগরকে আলিঙ্গন করিয়াছে।

ঘাটে বিলম্ব হওয়াতে আমরা মধ্যাহ্নকালে হোমায় পঁহুছিতে পারি নাই। দেবীসিংহ হোমাতে পঁহুছিবার পূর্ব্বে নদী নীরে ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডযোগে উনন প্রস্তুত করিয়া মাধ্যাহ্নিক রন্ধন করিয়াছিল। দেবীসিংহ রাজপুতনানিবাসী সুচতুর লোক, রন্ধনাদিকার্য্যে বিলক্ষণ পটু। গৃহকর্ত্রী তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন, বাবুর প্রতি যেন কোন রূপ অযত্ন না হয়, উত্তমরূপে রন্ধন করিয়া তাঁহাকে দুই বেলা তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইবে, তাহাতে কোন রূপ ক্রটী যেন না হয়। এক এক সময় দেবীসিংহ অনেক প্রকার ডাল তরকারী ভুনাখিচড়ি পুরি মালপোয়া মোহন ভোগ ইত্যাদি অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করিয়াছে, কখন কখন নদীতীরবর্ত্তী পল্লীতে যাইয়া দুগ্ধ ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়াছে। অত্যন্ত যত্ন ও সেবা করিয়াছে, তাহার সহকারিরূপে অন্য এক রাজপুত সঙ্গে ছিল। সে তাহার কার্য্যের সহায়তা করিয়াছে। দুই বেলাই নদীতীরে রন্ধন ও ভোজন হইয়াছিল।

তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে শোণপুরে উপনীত হওয়া যায়। শোণপুর একজন রাজার রাজধানী, রাজার নাম বীর প্রতাপ সিংহ। তিনি বোধ রাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতাসূত্রে বদ্ধ। নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া রাজবাড়া ও বাজার ইত্যাদি দর্শন করা গেল। শোণপুরের বাজার হইতে অনেক প্রকার খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করা হইয়াছিল। শোণপুরের নিকটে বহু দূরব্যাপী এক ভয়ঙ্কর বিষম পার হওয়া গিয়াছিল। ৪র্থ দিবস পূর্ব্বাহ্নে বোধ নগরে নৌকা সংলগ্ন হয়। দেওয়ান মহোদয় সংবাদ পাইয়া অগ্রসর হন, তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া আমরা আহ্লাদিত হই, আমাদের সকল পথশ্রান্তি দূর হয়। নদীতীরবর্ত্তী কাছারী ঘরে আমাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেই স্থান হইতে নদীর অপর তীরস্থ শৈলমালার শোভা দর্শনে হৃদয় পুলকিত হইত। বোধের অন্যান্য বিবরণ পরে বিবৃত হইবে।

নিরীহ বাঙ্গালী।

("মতীচুর" হইতে উদ্ধৃত।)

আমরা দুর্ব্বল নিরীহ বাঙ্গালী। এই বাঙ্গালী শব্দে কেমন সুমধুর তরল কোমল

ভাব প্রকাশ হয়। আহা! এই অমিয় সিক্ত বাঙ্গালী কোন্ বিধাতা গড়িয়াছিলেন? কুসুমের সৌকুমার্য্য, চন্দ্রের চন্দ্রিকা, মধুর মাধুরী, যূথিকার সৌরভ, সুপ্তির নীরবতা, ভূধরের অচলতা, নবনীর কোমলতা, সলিলের তরলতা—এক কথায় বিশ্বজগতের সমুদয় সৌন্দর্য্য এবং স্নিগ্ধতা লইয়া বাঙ্গালী গঠিত হইয়াছে! আমাদের নামটি যেমন শ্রুতিমধুর তদ্রূপ আমাদের সমুদয় ক্রিয়াকলাপও সহজ ও সরল।

আমরা মূর্ত্তিমতী কবিতা—যদি ভারতবর্ষকে ইংরাজী ধরণের একটি অট্টালিকা মনে করেন, তবে বঙ্গদেশ তাহার drawing room এবং বাঙ্গালী তাহাতে সাজসজ্জা! (drawing room suit) যদি ভারতবর্ষকে একটা সরোবর মনে করেন, তবে বাঙ্গালী তাহাতে পদ্মিনী! যদি ভারতবর্ষকে একখানা উপন্যাস মনে করেন, তবে বাঙ্গালী তাহার নায়িকা! ভারতের পুরুষসমাজে বাঙ্গালী পুরুষিকা!! * অতএব আমরা মূর্ত্তিমান্ কাব্য।

আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি,—পুঁইশাকের ডাঁটা, সজিনা ও পুঁটি মৎস্যের ঝোল—অতিশয় সরস। আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি—ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, ছানা, নবনীত, ক্ষীর, সর, সন্দেশ ও রসগোল্লা—অতিশয় সুস্বাদু। আমাদের দেশের প্রধান ফল, আম্র ও কাঁটাল— রসাল এবং মধুর। অতএব আমাদের খাদ্যসামগ্রী ত্রিগুণাত্মক— সরস, সুস্বাদু, মধুর।

খাদ্যের গুণ অনুসারে শরীরের পুষ্টি হয়। তাই সজিনা যেমন বীজবহুল, আমাদের দেহে তেমনই ভুঁড়িটি স্থূল। নবনীতে কোমলতা অধিক, তাই আমাদের স্বভাবের ভীরুতা অধিক। শারীরিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন; এখন পোষাক পরিচ্ছদের কথা বলি।

আমাদের বরঅঙ্গ যেমন তৈলসিক্ত নবনীগঠিত সুকোমল পরিধেয়ও তদ্রূপ অতি সূক্ষ্ম শিমলার ধুতি ও চাদর। ইহাতে Ventilation এর কোন বাধা বিঘ্ন হয় না! আমরা সময় সময় সভ্যতার অনুরোধে কোট শার্ট ব্যবহার করি বটে, কারণ পুরুষমানুষের সবই সহ্য হয়। কিন্তু আমাদের অর্দ্ধাঙ্গী—হেমাঙ্গী, কৃশাঙ্গীগণ তদনুকরণে ইংরাজললনাদের নির্লজ্জ পরিচ্ছদ (শেমিজ জ্যাকেট) ব্যবহার করেন না। তাঁহারা অতিশয় সুকুমারী ললিতা লজ্জাবতী লতিকা, তাই অতি মসৃণ ও সূক্ষ্ম "হাওয়ার সাড়ী" পরেন! বাঙ্গালীর সকল বস্তুই সুন্দর, স্বচ্ছ ও সহজলব্ধ।

বাঙ্গালীর গুণের কথা লিখিতে হইলে অনন্ত মসী, কাগজ ও অক্লান্ত লেখকের আবশ্যক। তবে সংক্ষেপে দুই চারিটা গুণের বর্ণনা করি।

ধনবৃদ্ধির দুই উপায়, বাণিজ্য ও কৃষি।

* "নায়িকা" বলিয়া আমি ব্যাকরণের নিয়মভঙ্গ করি নাই। কারণ অনেকে বাঙ্গালী পুরুষকে "বেচারী" বলে। উর্দ্দু ভাষায় পুরুষকে "বেচারা" ও স্ত্রীলোককে "বেচারী" বলে। যদি আমরা "বেচারী" হইতে পারি, তবে "পদ্মিনী" "নায়িকা" ও "পুরুষিকা" হইলে দোষ কি?

বাণিজ্য আমাদের প্রধান ব্যবসায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা (আরব্যোপন্যাসের) সিন্ধবাদের ন্যায় বাণিজ্যপোত অনিশ্চিত ফললাভের আশায় অনন্ত অপার সাগরে ভাসাইয়া দিয়া নৈরাশ্যের ঝঞ্ঝাবাতে ওতপ্রোত হই না। আমরা ইহাকে (বাণিজ্য) সহজ ও স্বল্পায়াসসাধ্য করিয়া লইয়াছি। অর্থাৎ বাণিজ্য ব্যবসায়ে যে কঠিন পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা বর্জ্জন করিয়াছি। এই জন্য আমাদের দোকানে আবশ্যকীয় জিনিষ নাই, শুধু বিলাসদ্রব্য—নানাবিধ কেশতৈল ও নানা প্রকার রোগবর্দ্ধক ঔষধ এবং রাঙা পিত্তলের অলঙ্কার নকল হীরার আংটী, বোতাম ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে। ঈদৃশ ব্যবসায়ে কায়িক পরিশ্রম নাই। আমরা খাঁটী সোণা রূপা বা হীরা জওয়াহেরাৎ রাখি না, কারণ টাকার অভাব। বিশেষতঃ আজি কালি কোন্ জিনিষটার নকল না হয়?

যখনই কেহ একটু যত্ন পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক "দীর্ঘকেশী" তৈল প্রস্তুত করেন, অমনই আমরা তদনুকরণে "হ্রস্বকেশী" তৈল আবিষ্কার করি। যদি কেহ "কৃষ্ণকেশী" তৈল বিক্রয় করেন, তবে আমরা "শুভ্রকেশী" বাহির করি। "কুন্তলীনের" সঙ্গে "কেশলীন" বিক্রয় হয়। বাজারে "মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী" ঔষধ আছে, "মস্তিষ্ক উষ্ণকারী" দ্রব্যও আছে। এক কথায় বলি, যত প্রকারের নকল ও নিষ্প্রয়োজনীয় জিনিষ হইতে পারে, সবই আছে। আমরা ধান্য তণ্ডুলের ব্যবসায় করি না, কারণ তাহাতে পরিশ্রম আবশ্যক।

আমাদের অন্যতম ব্যবসায়—পাশ বিক্রয়। এই পাশ বিক্রেতার নাম "বর" এবং ক্রেতাকে "শ্বশুর" বলে। এক একটি পাশের মূল্য কত জান? "অর্দ্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকুমারী"। এম, এ, পাশ অমূল্যরত্ন, ইহা যে সে ক্রেতার ক্রেয় নহে। নিতান্ত সস্তা দরে বিক্রয় হইলে, মূল্য—এক রাজকুমারী এবং সমুদয় রাজত্ব। আমরা অলস, তরলমতি, শ্রমকাতর, কোমলাঙ্গ বাঙ্গালী কি না, তাই ভাবিয়া দেখিয়াছি, সশরীরে পরিশ্রম করিয়া মুদ্রালাভ করা অপেক্ষা Old fool শ্বশুরের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা সহজ!

এখন কৃষিকার্য্যের কথা বলি। কৃষি দ্বারা অন্ন বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি Agriculture করা অপেক্ষা Brain culture করা সহজ। অর্থাৎ কর্কশ উর্ব্বর ভূমি কর্ষণ করিয়া ধান্য উৎপাদন করা অপেক্ষা মুখস্থ বিদ্যার জোরে অর্থ উৎপাদন করা সহজ; এবং কৃষিকার্য্যে পারদর্শিতা প্রদর্শন করা অপেক্ষা কেবল M. R. A. C. পাশ করা সহজ! আইনচর্চ্চা করা অপেক্ষা কৃষিবিষয়ে জ্ঞানচর্চ্চা করা কঠিন। অথবা রৌদ্রের সময় ছত্র হস্তে কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন জন্য ইতঃস্ততঃ ভ্রমণ করা অপেক্ষা টানাপাখার তলে আরাম কেদারায় বসিয়া Famine Report পাঠ করা সহজ। তাই আমরা অন্নোৎপাদনের চেষ্টা না করিয়া অর্থ উৎপাদনে সচেষ্ট আছি। আমাদের অর্থের অভাব নাই, সুতরাং অন্নকষ্টও হইবে না। দরিদ্র হতভাগা সব অন্নাভাবে মরে মরুক, তা'তে আমাদের কি?

আমরা আরও অনেক প্রকার সহজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। যথা—

(১) রাজ্য স্থাপন করা অপেক্ষা "রাজা" উপাধি লাভ সহজ।

(২) শিল্পকার্য্যে পারদর্শী হওয়া অপেক্ষা B. SC. ও D. SC. পাশ করা সহজ।

(৩) অল্প বিস্তর অর্থব্যয়ে দেশে কোন মহৎ কার্য্য দ্বারা খ্যাতি লাভ করা অপেক্ষা "খাঁ বাহাদুর" বা "রায় বাহাদুর" উপাধিলাভ জন্য অর্থ ব্যয় করা সহজ।

(৪) প্রতিবেশী দরিদ্রদের দুঃখ শোকে ব্যথিত হওয়া অপেক্ষা বিদেশীয় বড় লোক দের মৃত্যুদুঃখে "শোক সভার" সভ্য হওয়া সহজ।

(৫) দেশের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য পরিশ্রম করা অপেক্ষা আমেরিকার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করা সহজ।

(৬) স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান্ হওয়া অপেক্ষা স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ঔষধ ও ডাক্তারের হস্তে জীবন সমর্পণ করা সহজ।

(৭) স্বাস্থ্যের উন্নতি দ্বারা মুখশ্রীর প্রফুল্লতা ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করা (অর্থাৎ healthy & cheerful হওয়া) অপেক্ষা (শুষ্কগণ্ডে!) Kalydore milk of rose ও Vinolia powder মাখিয়া সুন্দর হইতে চেষ্টা করা সহজ।

(৮) কাহারও নিকট প্রহারলাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহুবলে প্রতিশোধ লওয়া অপেক্ষা মানহানির মোকদ্দমা করা সহজ ইত্যাদি।

তারপর আমরা মূর্ত্তিমান্ আলস্য—আমাদের গৃহিণীগণ এ বিষয়ে অগ্রণী। কেহ কেহ শ্রীমতীদিগকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু বলি, আমরা যদি রৌদ্রতাপ সহ্য করিতে না পারি, তবে আমাদের অর্দ্ধাঙ্গীগণ কি রূপে অগ্নির উত্তাপ সহিবেন? আমরা কোমলাঙ্গ—তাঁহারা কোমলাঙ্গী; আমরা পাঠক, তাঁহারা পাঠিকা; আমরা লেখক, তাঁহারা লেখিকা। অতএব আমরা পাচক না হইলে তাঁহারা পাচিকা হইবেন কেন? সুতরাং যে লক্ষ্মীছাড়া দিব্যাঙ্গনাদিগকে রন্ধন করিতে বলে, তাহার ত্রিবিধ দণ্ড হওয়া উচিত। যথা তাহাকে (১) তুষানলে দগ্ধ কর, অতঃপর (২) জবেহ্ কর, তারপর (৩) ফাঁসী দাও!!

আমরা সকলেই কবি—আমাদের কাব্যে বীররস অপেক্ষা করুণরস বেশী। আমাদের এখানে লেখক অপেক্ষা লেখিকার সংখ্যা বেশী। তাই কবিতার স্রোতে বিনা কারণে অশ্রুপ্রবাহ বেশী বহিয়া থাকে। আমরা পদ্য লিখিতে বসিলে কোন্ বিষয়টা বাদ দিই? "ভগ্ন শূর্প", "জীর্ণ কাঁথা", "পুরাতন চটীজুতা"—কিছুই পরিত্যাজ্য নহে। আমরা আবার কত নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়াছি; যথা—"অতি শুভ্রনীলাম্বর", "সাশ্রুসজল নয়ন" ইত্যাদি। শ্রীমতীদের করুণ বিলাপ-প্রলাপপূর্ণ পদ্যের "অশ্রুজলের" বন্যায় বঙ্গদেশ ধীরে ধীরে ডুবিয়া

যাইতেছে! সুতরাং দেখিতেছেন, আমরা সকলেই কবি।

আর আত্মপ্রশংসা কত করিব? এখন উপসংহার করি।

মহিলাদিগের রচনা।

অনিশ্চয়তা *।

আমার সোণার তরী যারে ভেসে যারে যা।
এখনি আসিবে ঝড় লাগিবে বিষম ঘা।
বিলম্ব সহে না আর প্রতিকূল আসে যায়।
তরঙ্গ আসিল বলে ওই বুঝি এল হায়॥
টুটিল টুটিল হাল ভেঙ্গে বুঝি গেল হায়॥
আমার সাধের তরী অতলে ডুবিল।
এত আশা এত সাধ নিমিষে ভাঙ্গিল॥
আগে হতে তবে কেন এত আয়োজন?
কিছুরই নিশ্চয় নাই মনে রেখো অনুক্ষণ॥

জ্যোৎস্না রাত্রি।

মধুর জ্যোৎস্না রাতি,
চৌদিকে বিমল ভাতি,
সে মোহ মদিরা পানে,
বিহ্বল প্রকৃতি সতী। ১।
সে শোভা করিয়া পান,
চকোর মোহিত প্রাণ,
অনিমেষে চেয়ে থাকে,
সেই আকাশের পান। ২।
সে আলো মাখিয়া গায়,
নদী সিন্ধু পানে ধায়,
ঝিকি মিকি ঝিকি মিকি,
মরি কিবা শোভা পায়। ৩।
সেই শোভা হাসিরাশি,
ধরণীতে পড়ে আসি,
মানবহৃদয়ে সুধা,
ঢালে সদা হাসি হাসি। ৪।

কি আর চাহিব?

কি আর চাহিব প্রভু?
(আমি) যখনি চেয়েছি যাহা,
তখনি হৃদয় সখা
আমারে দিয়েছ তাহা,
না চাহিতে পাইয়াছি
যাহা মোর প্রয়োজন,
কি আর তোমার পদে
চাব আমি ভগবান।
না চাহিতে পাইয়াছি
ললিত বিহগ-গীতি,
প্রভাত গগন পরে
তরুণ অরুণ ভাতি,
উষার মোহন ছবি
চাঁদের অমিয় ধারা,
দুরন্ত সে কুরঙ্গিণী
আকুল উন্মাদ পারা;
পাইয়াছি সমীরণে
মধুর কুসুম-বাস,
উদার, উন্মুক্ত অই
অনন্ত নীলিমাকাশ।

---

* কিছুকাল পূর্ব্বে যে একটী ক্ষুদ্র বালিকার পদ্য রচনা মহিলাতে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল, এই পদ্য ও ইহার নিম্নে প্রকাশিত পদ্যটি উক্ত বালিকা কর্ত্তৃক রচিত। তাঁহার পিতৃদেব আরও কতকগুলি পদ্য তাঁহার খাতা হইতে নকল করিয়া প্রকাশার্থ আমাদের নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

এত সুখ তুমি মোরে
দিয়েছ জগতস্বামী,
তব পদে ভগবান
কি আর চাহিব আমি ?
হৃদয়ে দিয়েছ শক্তি
অন্তরে দিয়েছ জ্ঞান,
পরাণে যে ভালবাসা
সেওত তোমারি দান,
শিরায় শিরায় যে গো
দিয়েছ পরম আশা—
জীব অন্তে পায় তোমা,
এত তব ভালবাসা,
করুণ নয়নে বিভু
চেয়ে আছ দিবা যামি,
তবে বল স্নেহময়
কি আর চাহিব আমি ?

শ্রীমতী প্র—

সংবাদ।

শাহজাহান বাদশার প্রিয়তমা পত্নী রাজ্ঞী মম্‌তাজ মহলের কবরের উপর কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয়ে আগ্রানগরে অপূর্ব্ব সমাধি মন্দির তাজমহল নির্ম্মিত হইয়াছে। ধরাতলে কোন প্রাসাদের সঙ্গে তাহার সৌন্দর্য্যের তুলনা হইতে পারে না। লাহোর নগরের ন্যূনাধিক চারি মাইল দূরে রাবি নদীর অপর পারে শাহডেরা নামক স্থানে শাহজাহানের পিতা সম্রাট্‌ জাহাঙ্গিরের বিস্তীর্ণ সমাধি মন্দির বিদ্যমান। জাহাঙ্গিরের প্রিয়তমা পত্নী রাজ্ঞী নূরজাহান সৌন্দর্য্যে ও নানা সদ্‌গুণ বিদ্যা বুদ্ধিতে রমণীকুলের শিরোভূষণ ও ভুবনবিখ্যাতা ছিলেন। সম্রাট্‌ জাহাঙ্গির নূরজাহানের আশ্চর্য্য প্রতিভা ও বুদ্ধি কৌশলে অনেক বিপদ্‌ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার হস্তের ক্রীড়াপুত্তলস্বরূপ ছিলেন। সুবিস্তীর্ণ উদ্যানস্থ জাহাঙ্গির বাদশার রমণীয় মক্‌বরার (সমাধিমন্দিরের) কিয়দ্দূর অন্তর রাজ্ঞী নূরজাহানের কবর অরণ্যমধ্যে এক জন সামান্য লোকের কবরের ন্যায় যৎসামান্য অনাদৃত ভাবে আছে। উহা কাহারও দর্শন যোগ্য নহে। আমাদিগকে কেহ বলিলেন, একজন ফকির কোন কারণে রাজ্ঞীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এরূপ অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে তোর কবরের উপর শৃগাল কুকুর মূত্র ত্যাগ করিবে। তাহাতেই এই দশা হইয়াছে। জাহাঙ্গির বাদশা ১০৩৭ সালে লাহোরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোধ করি তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্ঞী নূরজাহানের মৃত্যু হইয়াছিল। শাহজাহান তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাঁহার কবরের উপর রমণীয় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। এক দিন প্রাতে আমরা তিন জন বন্ধু মিলিয়া লাহোর নগর হইতে শাহডেরায় যাইয়া জাহাঙ্গির বাদশার কবর দর্শন ও তাঁহার অদূরে তরুতলে বসিয়া প্রার্থনাদি করিয়াছিলাম।

পেশওয়ার-সেনানিবাসের অনতিদূরস্থ পর্ব্বতনিবাসী দুর্দ্দান্ত আফ্রিদি জাতি সময়ে সময়ে অকস্মাৎ উক্ত সেনানিবেশ আক্রমণপূর্ব্বক সিপাহীদিগকে হতাহত করিয়া তাহাদের বন্দুক অশ্বাদি লুণ্ঠন করিয়া

লইয়া যায়। তাহারা বোর্কা পরিয়া স্ত্রী সাজিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক অত্যাচার করে।

একদা পেশওয়ারের নিকটে পার্ব্বত্য দুরন্তজাতি আফ্রিদি বা উজিরীদিগের সঙ্গে ইংরাজসেনাদের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে বহু বিপক্ষ পার্ব্বত্য লোক হতাহত হইয়াছিল। যুদ্ধের নিবৃত্তি হইয়াছে, এমন সময় ইংরাজ-জেনারল দূর হইতে দূরবীক্ষণ যোগে দেখিলেন যে একটী নারী রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এক জন পুরুষের শব অধোমুখে পতিত ছিল, সেই ব্যক্তি পৃষ্ঠে গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। রমণী দেখিয়া তাহার পৃষ্ঠে কয়েকটি পদাঘাত করিল, আর একটি নব যুবা বক্ষঃস্থলে গুলির আঘাতে ঊর্দ্ধমুখে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, নারী তাহার মুখে চুম্বন করিয়াছিল। নারী যাহাকে পদাঘাত করিয়াছিল সে তাহার স্বামী ছিল, সে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবার সময় গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে পদাঘাত করিয়াছিল। যুবাপুরুষটি তাহার পুত্র ছিল, সম্মুখ সংগ্রামে নিহত হইয়াছে বলিয়া আদরপূর্ব্বক তাহার মুখচুম্বন করিয়াছিল। ইহাকে বলে বীরপত্নী ও বীর মাতা।

৮ই জুলাই বুধবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় ময়ুরভঞ্জের মহারাজা বাহাদুর ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ের বালিকাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছিলেন। অনেক গুলিন সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং কয়েকটি স্কুলের শুভাকাঙ্ক্ষী মহোদয় উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধেয় ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সন্ন্যাল প্রার্থনা করিলে কার্য্যারম্ভ হয়। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাক্তার চুনিলাল বসু রায় বাহাদুর, ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায়, রায়বাহাদুর, অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন, বিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষত্ব কি ভাল করিয়া ব্যক্ত করেন এবং বালিকাদিগকে অতি সুমিষ্ট ভাবে সদুপদেশ প্রদান করেন। পরিশেষে মাহারাজা বাহাদুর বিদ্যালয়ের কার্য্য দেখিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ইহার দ্বারায় দেশীয় স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইবে, এরূপ বিশ্বাসপ্রকাশপূর্ব্বক ইংরাজীতে কিছু বলিয়া উদ্যোগকর্ত্তৃদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন। পরে অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ৬০টী বালিকার মধ্যে ২৩টী বালিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পারিতোষিক পাইয়াছে। অবশিষ্ট সমস্ত বালিকাকেই খেলানা বই প্রভৃতি কিছু কিছু পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে।

ভিক্টোরীয়া মহিলাবিদ্যালয়ে ধর্ম্মশাস্ত্র ধ্যয়নের শ্রেণীতে যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে পাঁচটি ছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রথম ৪০৲ ২য়, ৩০৲, তৃতীয় ২০৲ চতুর্থ ১০৲. পঞ্চম ১০৲, মোট ১১০ টাকা নগদ ও পুস্তক প্রভৃতিতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাণী এই পারিতোষিক দিয়াছেন।

ভিক্টোরিয়ামহিলাবিদ্যালয়।

বাঙ্গলাভাষার উৎপত্তি ও উন্নতি *।

মানুষের যে একটা কথাবল্‌বার শক্তি, তা ভারি আশ্চর্য্য। যত জীব জন্তু আছে তার মধ্যে এমন ক্ষমতা নাই, যা মানুষকে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য জীবজন্তুদের একটা শব্দ আছে, যাকে তাদের গান বলে এবং সেই গানকে তাদের ভাষা বলে। অকস্মাৎ মরণ, কিম্বা গাছের মধ্যে হতে পড়ে গেলে যেমন অনেকগুলো কাক কা কা শব্দ করে, তার মধ্যে একটা ভাব আছে। দুটো পিঁপড়ে দেখা হলেই মুখোমুখি হয়ে কি বলে, যাতে বোধ হয় মনের ভাব ব্যক্ত করে। তোতাপাখীর জাতীয় এমন সব পাখী আছে, যারা কত চাতুরি প্রকাশ করে, যা বলা যায় না। সিঙ্গাপুরে তোতাপাখীর এত জাত এত রং ও এত সস্তা যে মনে হয় কতকগুলো কিনে আনি। এই যে পাখীর শত শব্দ যদি মানা যায়, মনে হবে যে এদেরও একটা ভাষা আছে। ঘোড়া ও কুকুরের এত গুণ দেখা যায় যে, মনে হ'লে বোধ হয় মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। লর্ড বায়রণ তাঁর একটা কুকুর ছিল, তিনি বল্‌তেন কুকুর মানুষের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, কেবল ভাষা না থাকাতে ছোট হয়েছে। বাঁদরজাতীয় জন্তুরও অনেক চাতুরি দেখা যায়। মানুষের মধ্যেও এমন সব গুণ আছে যাতে মানুষ বাঁদর হতে পারে, কিন্তু বাঁদর মানুষ হ'তে পারে না। চিড়িয়া-খানায় অনেক জন্তু আছে, কত শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ ভাষা শিক্ষা দিতে পারে নাই। কিন্তু মানুষ জীবনের বিশেষত্ব বৈচিত্র্য ভাষা কি? মানুষের শক্তি যা ভগবান্ দিয়েছেন তাতে তিনি আত্মপ্রকাশ কর্‌বার শক্তি দিয়েছেন। এই শক্তির নাম ভাষা। খুব অসভ্য লোকেরা যেমন তেমনি আমাদের দেশের ৪।৫ হাজার বৎসরের পূর্ব্বেও যে সব লোক ছিল তাদেরও ভাষা ছিল, আর আজকালকার খুব সভ্য, শিক্ষিত, রূপোর বকলস্ লাগান তাদেরও ভাষা আছে। এই ভাষার উৎপত্তি কি? আমাদের দেশের বাঙ্গলা আর চট্টগ্রামের বাঙ্গলা কি এক? বাঙ্গলা, হিন্দি, মৈথিলী, উড়িয়া, উর্দ্দু, পারসী, মার-হাট্টী, গুজরাটী সিন্ধি, তেলেগু, পঞ্জাবা আরও কত বলিব প্রায় ভারতবর্ষের পঞ্চাশটা ভাষা আছে। সমস্ত ভাষার মূলে সংস্কৃত। এক হচ্চে বৈদিক আর একটি হচ্চে অধুনা-তন। বিক্রমাদিত্য রাজার সময়ে ভবভূতি প্রভৃতির সংস্কৃতভাষা ছিল। ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। (১ম) যেমন সূর্য্য, তারা, আকাশ, জল, জল অর্থে সমুদ্র অর্থাৎ প্রশস্ত জলরাশি, ঝড়, বায়ু এই রকম বাহিরের কতকগুলি প্রবল জিনিসের দ্বারা ভাষার উৎপত্তি। (২য়) মানুষের মনের ভাব, ইন্দ্রিয়রাগ, ভালবাসা এই রকম

* ১৯০২ শক ১লা ডিসেম্বর ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুম-দার প্রদত্ত বক্তৃতামূলক।

কতকগুলি জিনিষ থেকেই ভাষার উৎপত্তি। নীচ জীবের মধ্যে মনের প্রবৃত্তি উত্তেজিত হলেই প্রকাশ করে থাকে, ইহা হইতেও ভাষার উৎপত্তি। আজকালকার বাবুদের ইংরাজি ভাষাতে গালি না দিলে ভাষা প্রকাশ করা হয় না। প্রথম এই বাহ্যজগতের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তু, দ্বিতীয় মনের ভাব, প্রবৃত্তি, রাগ। তৃতীয় যেমন অগ্নি, জল, বাপ, মা, দুহিতা, ফল, গাছ প্রভৃতি যেগুলি খুব প্রয়োজন। সেইগুলি প্রকাশ না করিলে ভাষার উৎপত্তি কি জানা যায় না। নানা ভাষার উৎপত্তি এক না অনেক? ভারতবর্ষের ভাষা প্রভৃতির উৎপত্তি সংস্কৃত হইতে। আরবী পারসী ইহুদি ফিনিশিয়ান প্রভৃতির ভাষা কি ইহা হইতে? আমরা যেমন লিখি বাঁ দিক হইতে, আর একদেশের লোকেরা লেখে ডান দিক হইতে, আমাদের বইয়ের আরম্ভ প্রথম থেকে, তাহাদের বইয়ের আরম্ভ পশ্চাৎ দিক থেকে। ইউরোপীয় ভাষার উৎপত্তি সংস্কৃত হইতে। মূল শব্দ ইউরোপীয় ভাষার এক। গ্রীক ভাষাতে বলে পিটার, সংস্কৃতে পিতৃ, বাঙ্গলায় পিতা। প্রত্যেক জাতীর ভাষার সঙ্গে একটা মিল আছে এবং সকলেরই মূল সংস্কৃত। যেমন দেয়াল্ পিটাস্ সংস্কৃতে স্বর্গীয় (দ্যৌঃ) পিতঃ। বাপ মা, ভগবানের নাম, আকাশ প্রভৃতি সচরাচর ব্যবহার্য্য। সুতরাং বোঝা যাইতেছে ইউরোপীয় ভাষা ইহাদের সঙ্গে এক। ভারতবর্ষের ভাষা, ইংরাজের ভাষা ও ইউরোপীয় জাতীর ভাষা সকলের মূল এক। সুতরাং বোঝা যাইতেছে ভারতবর্ষে যে জাতি প্রথম এসেছিল, যারা এরিয়ান, আমরা যাকে আর্য্য বলি; তাদের এক শাখা চলে এলো ভারতে ও পারস্যে, আর এক শাখা গ্রীক প্রভৃতি দেশে এলো। এই যারা পারস্যে বাস করিল ও ভারতবাসী এই দুই জাতি তফাৎ হ'লো এবং ইহাদের মধ্যে একটা বিবাদ বাধিল। ইহারা 'স' স্থানে 'হ' উচ্চারণ করে। পারসীদের ভাষা যাকে পাল্‌বি বলে, তার সঙ্গে সংস্কৃতের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমরা যাকে বলি অসুর তারা বলে দেবতা, ইহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা আহুর মজদা। আমাদের যে দেবতা, তাহা উহাদের দানব। কেবল জাতিভেদে অবস্থাভেদ হইয়াছে। কথা এমন নেই যার সঙ্গে না মিল আছে। ইউরোপীয় অক্ষর আর হিন্দুর অক্ষর সব এক। কেবল অক্ষরবিন্যাসের ভিন্নতা। মোক্ষমূলার বলেন এই যে প্রকাণ্ড একটা আদি ভাষার উৎপত্তি ও ভাষার উন্নতি হয় কি করে? ভাষা বাড়ে কি করে? ভাষা প্রকাশ করে কি থেকে? কথার বিভক্তি আর তার ডালপালা থেকে ভাষা। একটা ভাষাকে বিভক্তি করে বাড়ান যায়। ভাষার উন্নতি হয় যে পরিমাণে সেই পরিমাণে ভাষাও প্রকাশিত হয়। ধর্ম্মই সব ভাষার মূল। ধর্ম্ম থেকেই নানা জ্ঞান, সভ্যতা, সৌন্দর্য্যবোধ হয়, সেই পরিমাণে ভাষার উন্নতি। একটা জাতির বিবরণ ও ধর্ম্মের বিবরণ কি এক? মুসলমান ধর্ম্মের সৃষ্টি হ'লো, কোরাণ হ'লো, তর্জ্জমা হ'লো। আরব্যবাসী ও পারস্যবাসীর উন্নতি হ'লো। মুসলমানধর্ম্মের বৃত্তান্ত আরও উন্নতি হ'লো। যে পরিমাণে ধর্ম্মের উন্নতি হয় সেই পরিমাণে জাতির উন্নতি হয়। জাঠদের কোন ভাষা ছিল

কি না? যেই গুরু নানকের জন্ম হ'লো, তাই থেকে একটা কথিত ভাষা ও উন্নতিভাষা হ'লো। ইহুদিদিগের ধর্ম্মবৃত্তান্ত ও বাইবেলের পুরাতন ইহুদিজাতির বৃত্তান্ত। যাহা Old Testment'এ আছে। কি করে কোন্ জাতির উন্নতি হ'লো ও ধর্ম্মবৃত্তান্তের উন্নতি হ'লো। ধর্ম্মের অঙ্গ কি ভাব, ভক্তি, উপদেশ, যুক্তি, তর্ক, শিক্ষা, ব্যাখ্যা, ধারণা, ধ্যান, এই যে আন্তরিক ভাষার উৎপত্তি ধর্ম্ম হইতে। ব্যাকরণ মানে ভাষার উৎপত্তি, যা থেকে লিখতে আরম্ভ কর্ত্তে হবে। এরই যে নীতি, আইন এই সব নিয়েই ব্যাকরণের উৎপত্তি। সংস্কৃত ভাষায় তিনটা শ ষ সএর উৎপত্তি বিভিন্ন, কেবল সমস্ত মুখের শব্দ উচ্চারণ করবার চিহ্নের জন্য। বাঙ্গলা ভাষায় 'স'র উচ্চারণ এক। একটা 'স'র ভুল করিলে অখ্যাতির কথা নেই। ব্যাকরণের জ্ঞান আর ভাষার জ্ঞান এক নয়। অনেকে ভাষায় মূর্খতা প্রকাশ পায় ব্যাকরণের জ্ঞান ভাল করে না জানাতে। যাঁর মানসিক জ্ঞান ও ভাষা উজ্জ্বল তার ভাষাই শুদ্ধ। ব্যাকরণ জানা হলেই যে ভাষা জানা হ'লো তা নয়। কবি জ্ঞানী উপদেষ্টা প্রভৃতি হউন না কেন। বাঙ্গালা ভাষার বয়ঃক্রম কত? সংস্কৃত ভাষার বয়ঃক্রম খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে। বঙ্গভাষার উৎপত্তি সংস্কৃত হ'তে। সংস্কৃত কাব্য ও নাটকের মধ্যে প্রাকৃত বলে একটা জিনিষ ছিল। ভাষার দুই অঙ্গ। যখন কিছু লিখ্‌তে হবে সেই ভাষাটী জেনে, আর গ্রাম্য ভাষায় যে লেখা যায় তাহাই এই প্রাকৃত। প্রাকৃত, সংস্কৃতের কথিত আকার। বৌদ্ধ ধর্ম্ম যখন এলো, এই প্রাকৃত তখন পালি ভাষা নাম নিল। পালি ভাষাকে এমন উচ্চ করিল যে যখম বাঙ্গালা আরম্ভ হলো তখন বৌদ্ধ ভাষা পালি নিলো। সকল ভাষার প্রাকৃতিক উন্নতি এই বঙ্গভাষা হইতে। তিন ধর্ম্ম বঙ্গভাষাতে পড়েছে। প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম দ্বিতীয় পৌরাণিক তৃতীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম। ছয়সাত শত বৎসর পূর্ব্বে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম উঠে গেল তখন বাঙ্গালাদেশের সঙ্গে খুব তর্ক আরম্ভ হলো। বৌদ্ধধর্ম্মের পরে পুরাণের ধর্ম্ম। যেমন বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতি জেগে উঠলো এই বৌদ্ধধর্ম্ম থেকে। কাশীদাসের মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ এই সব বাঙ্গালা ভাষার মূল। সেই সময়ে ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি কবিতাতে লেখা হইত। প্রাথমিক গ্রন্থ সমস্তই কবিতা হইতে। ইহার ভাব অত্যন্ত সরল। এই সময়ে গদ্য রচনা ছিল না। এই যে শাক্তদের সঙ্গে বৈষ্ণবদের বিবাদ, ইহার জন্ম এই বাঙ্গলা ভাষা হতে। পাঁচশত বৎসর হলো যখন চৈতন্যের জন্ম হলো, সেই সময়ে বৈষ্ণবদের ভিতর যে ভগবানের নাম করবার কথা উঠিল, তা হতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি হলো। কতক বৈজ্ঞানিক কতক নৈতিক। তারপর হলো হরিসঙ্কীর্ত্তনে। বঙ্গভাষার এমন উন্নতি করেছে, ভগবানের সহিত মনের উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন এই যে সঙ্গীতের কথা, যাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব অতিশয় উন্নতি, এমন আর কোথাও দেখা যায় না। সে সময়ে মুসলমানদের রাজত্ব ছিল। বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যে মুসলমানধর্ম্মের অনেক গান ও কথা দেখা যায়। মুসলমান ভাষার অনেক আভাস বাঙ্গলা

ভাষায় এসে পড়েছে প্রায় একশত বৎসরের পূর্ব্বে। বঙ্গভাষার উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিল। বিদ্যাসাগর এই ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার দত্ত এই সকল একশ দেড়শ বৎসরের ভাষার রচনা ও ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর হতে যে সব কঠিন ভাষা, তাহা বাহির করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থায় বাঙ্গলাভাষার গড়ন পেটন অনেক উন্নতি লাভ করেছে। গত পঞ্চাশ বৎসরে দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর কেশব বাবু যে সব বাঙ্গলা বক্তৃতা দিয়াছেন যার ভিতরের ভাব কেমন মিষ্ট। যদি ভাষার শক্তি চায় লোককে বোঝাবার উদ্দেশ্যে তাহলে মনে হয় ভাষার উৎপত্তি সেই জ্ঞানের উচ্ছ্বাস। যদি শব্দ বোধ থাকে নিশ্চয়ই ভাষার শব্দের উন্নতি করতে পারবে। ভাষা দুরকম, এক হচ্ছে যা লোককে বোঝান যায় না, অভিধানের মত ভাষা, আর এক হচ্ছে শিক্ষিত সরল শান্ত ও স্বাভাবিক ভাষা। তোমাদের ভাষা যাতে এইরকম হয় তার চেষ্টা কর। বঙ্কিমবাবু যিনি এই আভায় প্রতিভা দিয়াছেন। রবিবাবুর ও এমন সব মুগ্ধকর কবিতা আছে যা পড়িলে ইহার আভাস পাওয়া যায়। তাই বলে আমি তোমাদের বঙ্কিমবাবু কি রবিবাবুর অনুকরণ করিতে বলিতেছি না। আমি অনেক মেয়েদের প্রার্থনা শুনিয়াছি, তাঁরা খুব বিদ্বান কি বিএ, এম্‌এও নন, কিন্তু এমন সরল সহজ ও স্বাভাবিক ভাষা, যাতে আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হয়। যার পক্ষে যে রকম সরল ও স্বাভাবিক হয় সেইরকম করে তাহা করা উচিত। আচার্য্যের উপদেশ, সেবকের নিবেদন প্রভৃতির ভাষা অনুকরণ কর। তার ভিতর কেমন ভাব আছে, সরল ভাষা ও জ্ঞান গভীর হবে। যারা উর্দ্দূ ভাষা বলে অর্থাৎ যখন তারা বেগমদের সঙ্গে বলে। সেই বেগমরা তাদের উর্দ্দূ ভাষা এমন শুদ্ধ ও সরল স্বাভাবিক ভাবে বলে যাতে মনে হয় তাদের একটা ভাষার পরিপাট্য আছে। তাই তোমাদের বলছি তোমরা সরল ও স্বাভাবিক ভাবে ভাষা প্রকাশ কর। ইহাতে ভাষার উন্নতি করতে পারবে। ইংরাজির চেয়ে বাঙ্গলার উন্নতি করতে খুব ভাল করে চেষ্টা কর। যেখানে বাঙ্গলাভাষা পাওয়া যায় না সেখানে ইংরাজির ব্যবহার করবে। আমি তোমাদের বলচি যখন তোমরা যা বলবে যেন শুদ্ধ ও স্বাভাবিক ভাবে বাংলা ভাষা বলিবে। আমি মেয়েদের অনেক প্রার্থনাতে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। তোমরা বাংলা ভাষার উন্নতিতে দেশের মঙ্গল কর। মাতৃভাষার পূর্ণতা লাভ করে দেশের উন্নতি লাভ কর।

মহিলার দশম বর্ষের নির্ঘণ্ট।

১ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩১৫।

২য় সংখ্যা, ভাদ্র।

৩য় সংখ্যা, আশ্বিন।

৪র্থ সংখ্যা, কার্ত্তিক।

৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ।

৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৌষ।